বনফুল রচনাবলী

একবিংশ খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

উপন্যাস

অসংলগ্না

রসস্রষ্টা সুরসিক

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বন্ধুবরেষু

॥ প্রথম পর্ব ॥

এক

সকালবেলা শীত ছিল বেশ। মেঘ ছিল আকাশে, চাপ চাপ তুলোর মতো। বারান্দায় রোদ আসেনি। তবু বারান্দায় পাতা লেখার টেবিলে এসে বসলেন সুভদ্রবাবু। এসে লেখার খাতাটা খুললেন। কিন্তু লিখলেন না কিছু। আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখে পড়ল হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটা—পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িটা। পূর্ণেন্দুবাবুর স্মৃতির মতন বাড়িটার জৌলুসও কমে গেছে। হলদে রঙের উপর কালো কালো 'কাজলি' লেগেছে। পূর্ণেন্দু রায় সেকালের 'আধুনিক' ছিলেন। মদ খেতেন, গো-মাংস খেতেন, মেম বিয়ে করে এনেছিলেন বিলেত থেকে। প্রচুর টাকা ছিল, ইংরেজ সরকারে বড় চাকরি করতেন, সুতরাং সমাজের বুকে বসেই সমাজের দাড়ি ওপড়াতে পেরেছিলেন তিনি। কেউ কিছু বলতে সাহস করেননি। খোশামোদই করত বরং সূর্যকান্ত শিরোমণি—গোঁড়া হিন্দুদের কট্টর নেতা। পূর্ণেন্দু কিন্তু চোট খেয়েছিলেন তাঁর মেমসাহেবের কাছেই। মেমসাহেব এ-দেশে এসে বাংলা সংস্কৃত শিখে এ-দেশের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে হয়ে গেলেন গোঁড়া হিন্দু। পাটের কাপড় পরে গঙ্গাস্নান শুরু করে দিলেন তিনি। তেতলার চিলেকোঠার ঘরে স্বপাক নিরামিষ আহারের আয়োজন করে অবাক করে দিলেন সকলকে। সুভদ্রবাবুর কল্পনা-তুরঙ্গম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাঠঠোকরা পাখিটা দেখে। ছাতে যে এরিয়েলের বাঁশটা আছে তারই উপর এসে বসেছিল পাখিটা। তার লাল ঝুঁটি আর সোনালী পিঠ আর তার ট-র-র-র-র-র শব্দ যেন সতর্ক করে দিলে সুভদ্রবাবুকে, বললে—মশাই, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। উইশফুল থিংকিং-এরও (Wishful thinking) একটা সীমা থাকা উচিত। সুভদ্রবাবুর তখন সত্য ঘটনা মনে পড়ল। মিসেস পূর্ণেন্দু হিন্দু হননি। হয়েছিলেন মিসেস চ্যাটার্জির নকলে পূর্ণেন্দুবাবুর তাগড়া বাবুর্চি ইসমাইলের প্রণয়িনী, পূর্ণেন্দুবাবুর আকস্মিক মৃত্যুটাও সন্দেহজনক ঠেকেছিল অনেকের কাছে। মিসেস পূর্ণেন্দু মেমসাহেব ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং এস. পি-র বান্ধবী ছিলেন, তাই পূর্ণেন্দুবাবুর পোস্টমর্টেম হয়নি। পূর্ণেন্দুবাবুর ডাক্তার অবিনাশবাবু সন্দেহ করেছিলেন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি তাঁর। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের সন্দেহ বিলাতী মেমসাহেবকে কাবু করতে পারেনি একটুও। তিনি যতদিন সবলা এবং স্বাস্থ্যবতী ছিলেন···কাঠঠোকরা পাখিটা উড়ে গেল। মেঘও সরে গেল। রোদ উঠল। এক ঝলক এসে পড়ল সুভদ্রবাবুর টেবিলে। সুভদ্রবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে যে রক্তকরবীর গাছটা আছে (যেটাকে সম্প্রতি ছেঁটেও একেবারে শাখা-পত্রহীন করতে পারা যায়নি) তারই ছায়ায় দেওয়ালের উপর দুটি শালিক খুব ঘনিষ্ঠ-ভাবে পাশাপাশি বসে আছে। ওরা সুভদ্রবাবুর হাতাতেই থাকে। ওরা এ-বাড়ির পরিজন হয়ে গেছে। বাড়ির সর্বত্র নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি খাবার টেবিলেও আসে। মনে পড়ল এই প্রসঙ্গে চড়ুইপাখি আর কাকদেরও। তারাও বাড়ির পরিজন। সুভদ্রবাবুর

হাতায় অবশ্য আরও নানারকম পাখি আছে। দোয়েল, বুলবুল, ঘুঘু, হলদে পাখি, দরজী পাখি, টুনটুনি, মোহনচূড়ো ফিঙে, নীলকণ্ঠ, কাজল পাখি (Shrike), তালচোঁচ এবং আরও কয়েকরকম নাম-না-জানা পাখি। কিন্তু এরা কেউ পরিজন হয়ে উঠতে পারেনি। ওরা সুভদ্রবাবুর শোয়ার ঘরে, খাওয়ার ঘরে যায় না কখনও। ওরা সুভদ্রবাবুর এঁটো ভাত বা চায়ের টেবিলের বিস্কুট-পাঁউরুটির টুকরো খাওয়ার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে লোভ প্রকাশ করেনি কখনও। এইজন্যেই ওরা আপন হতে পারেনি। চড়ুই, কাক, শালিকদের হ্যাংলামি, চোরামি আর লোভই ওদের আপন করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এইজন্যই আমাদের প্রিয়। শালিক দুটি সুভদ্রবাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল। সুভদ্রবাবু তাদের দিকে চাইতেই তারা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর উড়ে গেল। সুভদ্রবাবুর এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন দৃষ্টির একটা আঘাত আছে, পাখিরা এ বিষয়ে বড় বেশী সচেতন। পিছন ফিরে থাকলেও তারা অনুভব করতে পারে কেউ তাদের দিকে চেয়ে দেখছে। মানুষরাও পারে অনেকে। পিছন ফিরে আছে মেয়েটি, তুমি তার দিকে চেয়ে থাক, সে ঠিক ঘুরে দেখবে তোমাকে। সুভদ্রবাবুর মনে হলো, মিসেস পূর্ণেন্দুও বোধ হয় এই রকম দৃষ্টিস্পর্শসচেতন ছিলেন।

সুভদ্রবাবুর যখন জন্ম হয়নি, তখনই মিসেস পূর্ণেন্দুর লীলাখেলা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস পূর্ণেন্দুর এত রকম কাহিনী শুনেছেন তিনি যে, তাঁর কল্পনাও তাঁকে ঘিরে নানারকম ছবি এঁকেছে, অনেক সময় আজগুবি অসম্ভব ছবি, কিন্তু সে-সব ছবি এঁকে ভারি আনন্দ পেয়েছেন তিনি। মিসেস পূর্ণেন্দু গোঁড়া হিন্দু মহিলাতে রূপান্তরিত হয়ে মাতাল গোখাদক পূর্ণেন্দুকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করছেন এ কল্পনাটা এত পেয়ে বসেছিল তাঁকে যে, ওটা যে তাঁর কল্পনা এটা ভুলে গিয়েছিলেন দিন কতক। এখনও মাঝে মাঝে ভুলে যান। আজই তো ভুলে গিয়েছিলেন। কাঠঠোকরা পাখিটা তাঁর ভুল শুধরে দিয়ে উড়ে গেল। পাখিটা যেদিকে উড়ে গিয়েছিল, সেই দিকে চাইলেন তিনি। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

সুভদ্রবাবু ঠিক প্রকৃতিস্থ লোক নন। অনেক ডাক্তার তাঁকে পাগল বলেছেন। তাঁর পাগলামির প্রধান লক্ষণ তিনি স্বাভাবিকভাবে খান না, স্নান করেন না, ঘুমোন না। তাঁকে নাওয়াতে খাওয়াতে আর ঘুম পাড়াতে পারলে তাঁর নাতনী মহুয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তাকে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হতে দেন না। মহুয়া সুভদ্র-বাবুর আপন নাতনী নয়, পাতানো নাতনী। সাঁওতাল পরগনার এক মহুয়া গাছের তলায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন প্রায় কুড়ি বছর আগে। তখন তাঁর মেয়ে শ্যামলী সদ্য বিধবা হয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। শ্যামলীই মানুষ করেছিল মহুয়াকে। মহুয়া নাম তারই দেওয়া। মহুয়ার বাবা-মার খোঁজ অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত কোন ভর্তৃহীনা সাঁওতালনী জবালার ক্রোড়ে ওর জন্ম। মহুয়ার চেহারা দেখেও মনে হয়, ও সেই আদিবাসীদের একজন যাদের জীবনবীণা প্রকৃতির সুরে বাঁধা। যদিও কৃত্রিম পরিবেশে মানুষ হয়েছে, স্কুল-কলেজে পড়েছে, সাঁওতালী ভাষা জানে না, কিন্তু তবু পূর্ণিমা রাত্রে যখন জ্যোৎস্নার পাথার আকাশে থই থই করতে থাকে, যখন প্রখর সূর্যালোকে রুক্ষ প্রান্তরে চিলের ডাকে মূর্ত হয় সুরের মরীচিকা, অন্ধকারে নিশাচর পেচকের ডাকে সহসা ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন অজানার

রহস্য, তখন মহুয়া কেমন যেন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। হনহন করে হেঁটে আসে খানিকক্ষণ। কিছু দূর গিয়ে কিন্তু ফিরে আসে আবার। মনে পড়ে যায়, সুভদ্রর এখনও খাওয়া হয়নি, কিংবা নাওয়া হয়নি। সুভদ্রর পাগলামিই বাড়িতে বেঁধে রেখেছে তাকে। তা না হলে সে যেদিকে দুচক্ষু যায় চলে যেত, ক্রমাগত চলতে থাকত, আর ফিরত না। দিনে রাত্রে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে পথ প্রান্তর অরণ্য পেরিয়ে চলতেই থাকত সে, ফিরত না। কিন্তু সুভদ্র তাঁকে বেঁধে রেখেছে। বার বার তাকে ফিরে আসতে হয়। বাড়িতে আছে তিনজন চাকর, একটি বুড়ী ঝি, আর তাদের ছেলেপিলেরা। সুভদ্রবাবুর আপন লোক কেউ নেই। আগে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। রিটায়ার করেছেন অনেক দিন। শ্যামলীর মৃত্যুর পর পাগলামি দেখা দিয়েছে নানারকম। রোজ সকালে উঠে লেখেন। ওই লেখাটাই এখন তাঁর মনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর আর সব বিষয়ে ভুল হয়। কিন্তু লেখার টেবিলে এসে বসতে ভুল হয় না কখনও। সকালে এসেই বসেন ওখানে। তারপর আর উঠতে চান না। মহুয়াকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাঁকে। তিনি যে খাতাটায় লেখেন, সে খাতার নামকরণ করেছেন 'মেঘ'। নানারকম লেখা লেখেন তাতে। এই লেখা থেকেই সুভদ্রবাবুর মনের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু সবটা স্পষ্ট হয় না। মিসেস পূর্ণেন্দু কেন জানি না তাঁর মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন; কিভাবে করেছেন, তা ওঁর খাতাটা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। পূর্ণেন্দুবাবুর প্রকাণ্ড হলদে বাড়িটা ওঁর চোখের সামনে অহরহ দাঁড়িয়ে আছে, তার বিরাট ভগ্ন অস্তিত্ব নিয়ে। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না—শেষ ভাড়াটেরা দুবছর আগে উঠে গেছে। ভয় পেয়ে উঠে গেছে নাকি। পূর্ণেন্দুবাবু অপুত্রক ছিলেন, তাঁর এক ভাগ্নে তাঁর উত্তরাধিকারী। তিনি থাকেন মাদ্রাজে। বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছেন অনেকদিন থেকে। দাম চাইছেন এক লাখ টাকা। খদ্দের জোটেনি। বাড়িটা সুভদ্রবাবুর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ সকালে এসে ওরই দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। ওই বাড়ি থেকেই মিসেস পূর্ণেন্দু নানারূপে আবির্ভূত হন তাঁর মনে, নিত্যনতুন রূপ লাভ করেন তাঁর কল্পনায়, লিপির কারাগারে বন্দিনী হয়ে থাকেন কখনও সুস্পষ্ট মাধুর্যে, কখনও অস্পষ্ট হেঁয়ালীতে।

'মেঘ' থেকে উদ্ধৃত করছি কিছু কিছু।

"সমাজে বাস করতে হলে মানুষের সঙ্গে বাস করতে হয়। নিরাপদে বাস করবার জন্যেই মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছিল একদিন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষই প্রচ্ছন্ন শ্বাপদ হয়ে উঠেছে। ভদ্রতার ছদ্মবেশ পরে থাকে, সুবিধে পেলেই পেছন থেকে কামড়ে দেয়। বেদ-উপনিষদ কোরান-বাইবেল শুনিয়েও ওদের সংশোধন করা যাচ্ছে না। সাহিত্যকেও ওরা পশুত্বের রঙ্গমঞ্চ করে ফেলেছে। বকুল-ফুলের গন্ধ মেখে ফুরফুরে হাওয়াটি কাল যখন এল, তখন তাকে তাই বললাম—দেখ মিসেস পূর্ণেন্দু, তোমার ছদ্মবেশটি মন্দ হয়নি। তুমি লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে সুবাস বিতরণ করছ। ভালোই তো। ভদ্রতা করছ—খুব ভালো কথা। কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিই তোমাকে। মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর, কিন্তু খুব গভীর-ভাবে কারো সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করো না। তুমি তো জানই সমুদ্রের তলাতেও

ডুবো-পাহাড় থাকে। তুমি পূর্ণেন্দুকে সমুদ্র ভেবেছিলে, কিন্তু তার ভিতরে যে পাহাড়টা ছিল, তার ধাক্কায় তোমার জাহাজের তলা ফেঁসে গেল। কিন্তু তুমি···এর পরই আশ্চর্য কাণ্ড হলো একটা। হাওয়াটা থেমে গেল। মনে হলো সে চলে গেল হঠাৎ, কোথা গেল, আবার আসবে কি—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঁ করে বোলতা ঢুকল একটা, আর তার পেছনে একটা ভীমরুল। কোনটা মিসেস পূর্ণেন্দু? কোনটা ইসমাইল? স্বর্ণকান্তি বোলতাটাকেই মিসেস পূর্ণেন্দু বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভীমরুলটাই আমার ভুল ভেঙে দিল। হেসে উঠল। বলল—চেয়ে দেখ ভালো করে, আমিই মিসেস পূর্ণেন্দু। মিসেস পূর্ণেন্দুর বিলিতী নাম কি ছিল? মেরী? রুবি? জেন? রিটা? আনন্দে উচ্ছ্বসিত একটা নীলকণ্ঠ পাখি কর্কশ অট্টহাস্যে ভরিয়ে দিল আকাশটাকে। সে যেন হাসতে হাসতে আমাকে বলে গেল, আসল কথাটা তুমি খুলে বলছ না কেন? তোমার ধারণা, মহুয়াই পূর্বজন্মে মিসেস পূর্ণেন্দু ছিল। মিসেস পূর্ণেন্দুকে তুমি দেখনি, কিন্তু তাকে ভালোবেসেছ তার গল্প শুনে। তাই মহুয়ার বেশে সে এসেছে তোমার কাছে। এ কথাটা বলছ না কেন স্পষ্ট করে? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম নীলকণ্ঠ পাখিটা উড়ে উড়ে ওই কথাটাই বলছে কেবল, আর তার সঙ্গে দুলছে কচি বাঁশের ডগাগুলো। মিত্তিরদের বাগানে ছোট একটা বাঁশঝাড় আছে। তার কয়েকটা ডগা দেখা যায় আমার বারান্দা থেকে। নীল আকাশের পটভূমিকায় তাদের দোলন প্রায় দেখতে পাই। আজ মনে হলো, তারা শুধু দুলছে না, হাসছেও।”

আর একটা লেখা।

“গন্ধরাজ গাছটার কাছে লতিয়েছে একটা কুমড়ো গাছ। কুমড়ো গাছ গাছ নয় তবু আমরা ওকে লতা না বলে গাছ বলি, কারণ লতা হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যে একটা পুরুষালী ভাব আছে, আইভিলতা বা তরুলতার মধ্যে যা নেই। গন্ধরাজ গাছটার চারদিকে নিজেকে ছড়িয়েছে কুমড়ো গাছটা। তারস্বরে যেন বিজ্ঞাপিত করছে নিজেকে। অনেক ফুল ফোটাচ্ছে, জালিও হয়েছে অনেক। কিন্তু জালিগুলো পচে যাচ্ছে। কেন? পাতাগুলো প্রাণরসে টলমল, ডাঁটাগুলো বেশ মোটা মোটা, ফুলও বেশ চমৎকার—ফলগুলো পচে যাচ্ছে কেন তাহলে। একটা থিয়োরি খাড়া করেছি। আমার মনে হচ্ছে কুমড়োগাছটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে (Inferiority Complex) ভুগছে। ও যদিও গন্ধরাজ গাছটাকে নানাভাবে বেষ্টন করেবিব্রত করেছে, কিন্তু ও মনে মনে জানে গন্ধরাজ ওর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এই হিংসার বিষ সঞ্চারিত হচ্ছে ওর সারা দেহে। তাই ওর ফলগুলো মরে যাচ্ছে। কি বলো? প্রশ্নটা করে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম পাশেই বুঝি মিসেস পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ছোট্ট একটা ধুতরো গাছে সাদা ধুতরো ফুটেছে একটা। তার পাশের ডালেই ছোট্ট সবুজ কচি একটি ধুতরো ফল। সেই ধুতরো ফলটির উপর ভর করে স্বচ্ছ সরু রেশমের সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে। সেটা যে মাকড়সার জাল তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। সেটা বেয়ে মহুয়ার মন যে নেমে এসে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়বে তা-ও আমার কল্পনাতীত ছিল। মহুয়ার মন অনেকটা জোনাকির মতো। টিপটিপ করে জ্বলে আর নেবে, দিনের বেলাতেও তার আলো দেখা

যায়, একটু করে অন্ধকার সর্বদাই ঘিরে আছে তার মনকে, তারই পটভূমিকায় তার মনের আলো জ্বলে। সেই মহুয়ার মন আলো টিপটিপ করতে করতে নেমে এল মাকড়শার জাল বেয়ে। বলল—মানুষদেরই হিংসে থাকে। গাছেদের থাকে না। যে-সব মানুষ জীবন-যুদ্ধে হেরে গেছে তারাই মক্ষিকা হয়, মধুপ হতে পারে না। কুমড়ো গাছকে তুমি অতটা হীন ভেবো না। কুমড়ো গাছ যোদ্ধা, সে ওই গন্ধরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, শুধু গন্ধরাজের সঙ্গে না, আশপাশের সকলের সঙ্গে। ওই যে সব গোছা গোছা গাছ রয়েছে, ওই যে মাথায় ছোট্ট বেগুনী ফুল নিয়ে চওড়া-পাতা লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলো, ওই যে ও-পাশে পুটুসফুলের ঝাড়টা, এই ধুতরো গাছটা, সকলের সঙ্গে নীরবে যুদ্ধ করছে এই কুমড়োগাছ। একে তুমি তোমার বন্ধু হরেন লাহিড়ীর সঙ্গে তুলনা করছ কেন! তোমার বন্ধুর সান্নিধ্যে এলে মনে হয় কোনও সিনেমা ল্যাভেটরিতে বা কারও অপরিষ্কৃত খাটা-পায়খানায় ঢুকে পড়েছি। কুমড়োগাছের কাছে এসে কি তা মনে হয়? ওর ফল পচে যাচ্ছে, তার কারণ এমন কোনও রোগের শত্রু এসে হানা দিয়েছে, যার সঙ্গে ও পেরে উঠছে না। কিন্তু তা নিয়ে ওর হাহাকার নেই। ও নিজের পচা ফল নিয়ে কোনও প্রদর্শনীও খোলেনি, কারও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেনি। ওর ফল যে পচে যাচ্ছে, এ খবর তোমরাই বার করেছ খুঁজে খুঁজে, নিজেদের স্বার্থের জন্য।"

মহুয়ার মনের আলোটা হঠাৎ যেন দপ দপ করে জ্বলতে লাগল। মনে হলো চটেছে।

হেসে উত্তর দিলাম—'গভীর রাতে উশ্রী নদীর ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে জ্যোৎস্না যে গান গায়, সেই গানের আভাস তোমার গলায় পাব আশা করে বসে আছি। তুমি এ কি ওকালতি-সুরে কথা বইলে। তোমাকে যে মূর্তিমতী কবিতারূপে মনে করে বসে আছি আমি!'

কবিতা-বেলুনে আলপিনের খোঁচা লাগল। মহুয়া সশরীরে এসে হাজির।

"এবার ওঠ না দাদু—আড়াইটে যে বেজে গেল। কখন নাইবে?"

"আজ না-ই বা নাইলুম—"

"তিন দিন নাওনি। আজ তোমাকে নাইতেই হবে। তোমার জন্যে ভালো ফুলেল তেল আনিয়েছি আজকে···"

"তাই নাকি? তা হলে উঠছি; কিন্তু একটি শর্ত আছে—"

"কি—"

"ফুলেল তেল আমি মাথায় মাখব না, পিঠে মাখব—"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। একটা ঝাড়লণ্ঠন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

"বেশ, বেশ, পিঠেই মাখিয়ে দেব। তুমি ওঠ এখন—"

উঠতে হলো।

"টিউ।"

হলদে পাখির ডাক। ডাকটাতে একটু ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হলো যেন। দুষ্টু পাখি। যদি ওকে কখনও ধরতে পারি, ওর সর্বাঙ্গে ফুলেল তেল মাখিয়ে দেব।

"ফুলেল তেল কতখানি কিনেছিস?"

"বড় এক বোতল। কেন?"

"মনে করছি হলদে পাখিটাকেও মাখিয়ে দেব—"

"ও পাখিকে ধরবে কি করে?"

"ধরেছি অনেক দিন আগে। নাম রেখেছি মহুয়া—"

আবার একটা ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এই ধরনের লেখা থাকে তাঁর খাতায়, যার নাম দিয়েছেন তিনি 'মেঘ'।

সেদিন তিনি অনেকক্ষণ খাতা খুলে বসে রইলেন, কিন্তু কোনও লেখা মাথায় এল না। আকাশে তুলোর মতো মেঘেরা ভেসে ভেসে চলে গেল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। নতুন একদল পালক মেঘ এল কোন এক অজানা সুপর্ণের খবর নিয়ে। সুভদ্রবাবুর মাথায় কিংবা খাতায় কেউ এল না অনেকক্ষণ। তারপর এল। হঠাৎ এল। সুভদ্রবাবু লিখলেন।

"সকালে যে মেঘের দল আকাশে ছিল তাদের চেহারা ছিল চাপ চাপ তুলোর মতো। তাদের দেখে মনে পড়েছিল রহমন ধুনকরকে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন রহমন ধুনকর এসে আমাদের বাড়িতে তুলো ধুনে লেপ তোশক তৈরি করত শীতের একটু আগে। ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ—তুলো ধোনার শব্দটা এখনও কানে বাজছে। আমি আকাশে কান পেতে ছিলাম, আশা করছিলাম, ওই তুলোর মতো মেঘগুলোকেও রহমন ধুনকর এসে ধুনে দেবে বুঝি, ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ শব্দটা আবার শোনা যাবে। কিন্তু গেল না। তার পরেই ওই হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম মিসেস পূর্ণেন্দু কাঁদছে। তার এ কি চেহারা! মেমসাহেব নয়, শ্যামলী কিশোরী। মনে হলো, তার কান্না যেন কথা কইছে। আমি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে গিয়ে নিজেকে মূর্ত করবার চেষ্টা করলাম তার পাশে, কিন্তু পারলাম না, আমার ভাষা-জ্ঞান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম তার কান্নার ভাষাকে, তা'ও পারলাম না। শেষকালে আমার এই না-পারাটাকেই ভেলা করে তার দিকে ভেসে যেতে চেষ্টা করলাম সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে, যে সমুদ্রের নাম নেই, কোন বিশেষণ দিয়ে যার নিদারুণ ভয়াবহতা বর্ণনা করা যায় না, যে সমুদ্রে অসহায় দুরাকাঙ্ক্ষীরা ডুবে মরে চিরকাল, যে সমুদ্রের পার আছে, কিন্তু তবুও যা অপার। এই সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে যখন ভাসছি তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম শামলীর মা রহস্যকে। দেখতে পেলাম তার কনে চন্দন-আঁকা মুখটা—যা বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিলাম চল্লিশ বছর আগে। এই চল্লিশ বছরে কত রঙের আলো পড়েছে ওই মুখের উপরে, কত রঙের পরদা দুলেছে ওই মুখের সামনে, কিন্তু আশ্চর্য, একটুও বদলায়নি সে মুখশ্রী। সেই সন্নত দৃষ্টি, অধরের সেই ভাষাময়ী ব্যঞ্জনা, সলজ্জ নীরবতার সেই আশ্চর্য মহিমা অবিকল তেমনি আছে। আমি সবিস্ময়ে দেখছি, এমন সময়ে আমাকে আরও বিস্মিত করে সে চোখ তুলে চাইল আমার দিকে। আশ্চর্য, যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একবারও সে এমনভাবে তাকায়নি। এ দৃষ্টিকে বর্ণনা করবার ভাষা নেই আমার। একসঙ্গে অনেক কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, হলদে পাখির 'টিউ' ডাকের সঙ্গে যেন সাদৃশ্য আছে এর। এক ঝাঁক টিয়ে এসে বসল আর উড়ে গেল ইউক্যালিপ্টাস গাছটার মগডাল থেকে। এ দেখে মগডালের সাদা ফুলের গোছাটায় যে অবাক ভঙ্গী জাগল তার সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। আর

সবচেয়ে সাদৃশ্য আছে আমাদের সেই অনিশ্চিত মনোভাবের সঙ্গে, যখন আমরা কিছু না বুঝেও সায় দিয়ে বলি—হ্যাঁ, তা তো বটেই। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে ওই দৃষ্টির সাদৃশ্য আছে, তবু এই তিনটি উপমার সাহায্যে ওর স্বরূপ বোঝানো যাবে না। এইসব ভাবছি এমন সময় এক কাণ্ড হলো। আদালতে যেমন কাঠগড়া থাকে তেমনি একটা কাঠগড়ার ছবি ফুটে উঠল আকাশে আর সেই কাঠগড়ার উপর সেই দৃষ্টি মূর্ত হলো স্ফুরিতাধরা যুবতীরূপে। তার হাতে একটা লাল রুমাল। মনের 'সুইচ'টা হঠাৎ অকেজো হয়ে গেল যেন। আলো নিবে গেল। আমার অন্তরতম সত্তার প্রত্যক্ষ প্রদেশ থেকে কে যেন সভয়ে বলে উঠল—লাল রুমালটা ছিল তা জানি, ও যে ওর রহস্য নামের মর্যাদা রেখেছে তা-ও আমার অজানা নয়—কিন্তু ওসব আর দেখতে চাই না, শুনতে চাই না, পরদা ফেলে দাও, পরদা ফেলে দাও। মনে হলো কোন এক অজানা প্রেক্ষাগৃহ থেকে হাততালি দিচ্ছে অসংখ্য দর্শক। তীক্ষ্ম কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—আংকোর, আংকোর। তারপর সব নিস্তব্ধ।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহুয়া এল—"দাদু খাবে চল, আড়াইটে বেজে গেছে—ওঠ, আর দেরি নয়—"

"তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

"কলেজ থেকে আসছি—আমি আজ না খেয়েই কলেজ গিয়েছিলাম। চল, এক সঙ্গেই খাব আজ।"

"চল।"

কোনও আপত্তি না করেই উঠে পড়লেন সুভদ্র। তারপর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন ব্যাপারটা। "এ কি, তুই এই ভেলভেটের কোট গায়ে দিয়ে কলেজ করিস নাকি?"

মহুয়া যে ব্রাউন রঙের বেঁটে কোটটা গায়ে দিয়েছিল সেটা ভেলভেটিনের। আর সত্যিই চমৎকার সেটা। তাতে হাত বুলিয়ে সুভদ্র বললেন—"এত শৌখিন জামা গায়ে দিয়ে আমাদের কালে কলেজে যাওয়া যেত না। তোর ছাত্রেরা কিছু বলে না?"

"আজকাল ছাত্র বলে কিছু নেই। যাদের আমি পড়াই তাদের মধ্যে কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, কেউ স্তাবক।"

"এমন চমৎকার কোটটা তুই কবে কিনলি?"

"তুমিই তো কিনে দিয়েছিলে গতবার আমার জন্মদিনে। এত ভুলো তুমি—"

"কাল, না পরশু, না তার আগের দিন—ঠিক মনে পড়ছে না, তোকে একটা রামধনু রঙের শাড়িও দিয়েছিলাম, তাতে বিদ্যুতের পাড় বসানো। তোকে রোজ এত জিনিস দিই যে, সত্যিই মনে থাকে না কিছু। বিধাতা উজাড় করে গ্রহনক্ষত্র ঢেলে দিয়েছেন আকাশের বুকে, কোনটা কবে দিয়েছেন, তা তাঁর মনে আছে কি?"

"ইস্—"

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মহুয়া হাসিমুখে।

তার হাসিমুখ দেখে যেন ভরসা পেলেন সুভদ্র।

সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন—"কাল রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

একটু অবাক হবার চেষ্টা করল মহুয়া।

"কাল তুমি ব্রোমাইড খাওনি?"

"খেয়েছিলাম। কাজ হলো না। চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। তুমি যাওয়ার আগে আমার বোজা চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে খানিকক্ষণ। তা-ও টের পেয়েছিলাম। তারপর খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল, হাস্নুহানার গন্ধও ঢুকল এক ঝলক, সাঁওতালী বাঁশীর সুরও শোনা গেল দূরে, বুঝলাম তুমি চলে গেলে। কোথায় গিয়েছিলে বলো তো?"

"যদি বলি তেপান্তরের মাঠে। বিশ্বাস করবে?"

"করব। তুমি যাওয়ার পরমুহূর্তেই পক্ষিরাজটা এসেছিল যে। তাতে আমি সওয়ার হয়েছিলাম। দেখলাম মহুয়া আলেয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তেপান্তরের মাঠে।"

"ইস্!"

আবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মহুয়া হাসিমুখে।

দুই

তিরিশ বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক।

কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে তিনতলা একটি বাড়ির মির্জাপুর স্ট্রীটের দিকের ঘরটিতে বসে একটি যুবক তন্ময় চিত্তে সবুজ মরক্কো দিয়ে বাঁধানো টেনিসনের গ্রন্থাবলী পড়ছিলেন। পিছন থেকে এক ফালি সূর্যালোক ঢুকেছিল ঘরে। চশমার সোনার ফ্রেমে প্রতিফলিত হয়ে সে আলো বইয়ের পাতায় অদ্ভুতরকম ছবি আঁকছিল একটা। মনে হচ্ছিল, ছোট্ট একটা সোনার হরিণ যেন নেচে বেড়াচ্ছে। মাথাটা একটু নাড়ালেই ছুটোছুটি করছে সেটা পাতার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত। 'লেডি অব দি শ্যালট' পড়ছিলেন যুবকটি। লিলি ফুল, উইলো আর অ্যাসপেন গাছ, চারিদিকে সোনার ফসল, প্রকাণ্ড নদীর স্বচ্ছ জলধারা আর সেই বিরাট দুর্গ, যে দুর্গে একাকিনী থাকেন সুন্দরী লেডি অব শ্যালট—মুগ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন যুবকটি। চলে গিয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে Camelot-এ, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কল্পনা-নেত্রে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন সেই সুপ্রাচীন ব্রিটিশ বীরকে, যিনি Saxonদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেদিনকার খবরের কাগজটা টেবিলে পড়ে ছিল, তাতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক খবর ছিল, কিন্তু সেদিকে কৌতূহল ছিল না তাঁর। Idylls of the king নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ ওই সোনার হরিণটা এসে অন্যমনস্ক করে দিল তাঁকে। তিনি একটা খেলা পেয়ে গেলেন যেন। মাথাটা একটু নাড়ালেই ছুটে পালাচ্ছে হরিণটা। লেডি অব শ্যালট থেকে সহসা তিনি চলে গেলেন লেডি অব রামায়ণের কাছে। মনে পড়ে গেল সীতার কথা। এই সোনার হরিণের জন্যেই বিপদে পড়েছিলেন তিনি। যুবকটিও পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন যে, আর আধ ঘণ্টা পরেই 'নি' আসবে। এসেই টেনিসনের সম্বন্ধে লেখাটা চাইবে—কিন্তু কিছু লেখবার আগে যে পড়াটা দরকার তাই তো হয়নি এখনও—সোনার হরিণটা এসে সব গোলমাল করে দিল। সুভদ্র সেন ঠিক করলেন—যুবকই সেই সুভদ্র সেন, যে সুভদ্র সেন চিরতরে হারিয়ে

গেছে, যার সঙ্গে এখনকার সুভদ্র সেনের কিছুমাত্র মিল নেই (ফুলের সঙ্গে ফলের মিল থাকে কখনও ?)—সুভদ্র সেন হঠাৎ ঠিক করলেন কবিতা লিখে ফেলবেন একটা। ফাউনটেন পেন বার করলেন পকেট থেকে। তারপর টেবিল থেকে একটা ছোট খাতা তুলে ভাবতে লাগলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। একটা ভাব মনে এল। ভাবলেন, লেখবার আগে আর একবার দেখে নেওয়া যাক হরিণটাকে। চোখ খুলে দেখলেন হরিণ নেই, পালিয়ে গেছে। সূর্য সরে গেছে আকাশ থেকে। চশমার ফ্রেমে আর আলোর রেখা পড়ছে না। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবকে সৃষ্টির একটা মহাসত্য বলে মনে হলো সুভদ্র সেনের। মহাশূন্যে প্রতি মুহূর্তে হয়তো কত জ্যোতিষ্কের জন্ম ও বিলয় হচ্ছে এইরকম। হয়তো···হঠাৎ মনে হলো 'নি'-ও কি হারিয়ে যাবে ? ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর লিখে ফেললেন কবিতাটা।

টেনিসনের কাব্যকুঞ্জে
হঠাৎ এসেছিল সোনার হরিণ
আকাশ থেকে।
ছুটোছুটি করে বেড়াল খানিকক্ষণ ;
মনে হলো তেষ্টায় ছটফট করছে,
মনে হলো খুঁজছে সীতাকে।
উঁচু-পর্দায়-বাঁধা
ওগো সুর-সপ্তকের নিখাদ,
ওগো 'নি'
তুমিই কি তার তেষ্টার জল
তুমিই কি তার সীতা
তা ভালো করে বোঝবার আগেই
সে চলে গেল।
আকাশেই চলে গেল সম্ভবত।
কোন আকাশে ?
আকাশ তো একটা নয়
তুমিও একটা আকাশ তো
সে আকাশে সূর্যচন্দ্রনক্ষত্র নেই
আছে ফানুস
নানা রঙের ফানুস
কে জানে
ওই সোনার হরিণটা
ফানুস হয়েই উড়ছে সেখানে হয়তো।

এর পরেই 'নি' এল সশরীরে। ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি। দেহের কোন অঙ্গেই রূপ নেই। বাদামী রং, কাঠি-কাঠি হাত পা, ছোট চোখ, বড় দাঁত, নাকটা খাঁদা—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ অপরূপ শ্রী—যা অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। মুগ্ধ হতেই হবে। একাধিক লোক হয়েছে। ওর প্রথম প্রণয়ী ওর নাম রেখেছিল 'ফড়িং'। 'ফড়িং'-এর মতোই অপ্রত্যাশিতভাবে লাফ দিয়ে

ও পালিয়ে এসেছে তার কাছ থেকে। ওর আসল নাম নাকি কৈবল্যদায়িনী। ওর দ্বিতীয় প্রণয়ী সেটাকে নাকি ছোট করে নিয়েছিল—'কই'। 'কই'-এর কাঁটার ঘায়ে অতিষ্ঠ হতে হয়েছিল নাকি ভদ্রলোককে। বহু কিংবদন্তী, নানা ইতিহাস আছে ওর সম্বন্ধে। সুভদ্র সেনের সঙ্গে তার পরিচয় কিভাবে হয়েছিল তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর বন্ধু সৌরেন মিত্তির। সুভদ্র সেন যে জবাব দিয়েছিলেন তা অবিশ্বাস্য। বলেছিলেন—"ও হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়েছিল আমার সামনে—"

"কিরকম? কোথা থেকে আবির্ভূত হলো?"

"আকাশ থেকে। সবুজ একটা প্যারাস্যুট থেকে নামল আমার সামনে। হাতে লাল রুমাল ছিল একটা। টকটকে লাল। আর ওর সমস্ত সত্তা কাঁপছিল চড়া নিখাদের মীড়ে মীড়ে!"

সৌরেন মিত্তির হেসে বলেছিলেন—"আমি কিন্তু ও মেয়েকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি একটা পার্কে। পাশে একটা মদের বোতলও ছিল—"

সুভদ্র সেন হাসিমুখে চেয়ে ছিলেন বন্ধুর দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন—"তুমি হয়তো ওর দেহটাকে দেখেছ, ওকে দেখনি। নি-কে দেখা যায় না, নি-কে অনুভব করতে হয়—"

সেই নি সশরীরে উপস্থিত হলো এসে।

"লেখাটা এখনও হয়নি কিন্তু। আশ্চর্য একটা সোনার হরিণ—"

"লেখার আর দরকার নেই। পড়াশোনা খতম হয়ে গেল। এক্‌স্‌পেলড (expelled) ফ্রম দি কলেজ।"

ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে হেসে উঠল নি। হাসতে হাসতে বেঁকে গেল। তারপর হঠাৎ থেমে সুভদ্রর কাছে এসে তার থুঁতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল—"ফেলে দাও টেনিসন। তোমার গীটারটা নিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথা যাবে? বটানিকাল গার্ডেন?"

"বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে ও জায়গা চল না নতুন জায়গা খুঁজে বার করি একটা। ঘন বনের ধারে ছোট্ট একটু ফাঁকা মতন। পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে নদী বইছে। দূরে নীল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেইখানে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তুমি গীটার বাজাবে, আর আমি নাচব আমার এই লাল রুমালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমার নাচ দেখে বন থেকে বেরিয়ে আসবে হরিণ, আর তোমার গীটার শুনে বেরিয়ে আসবে বিরাট শঙ্খচূড় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ফণা তুলে শুনবে তোমার ভৈরবী, যে ভৈরবীতে কোমল 'নি' লাগে…"

আবার হাসি ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে।

"তারপর?"

"তারপর নদী বেয়ে ভেসে আসবে ময়ূরপঙ্খী। আর ময়ূরপঙ্খী থেকে নেমে আসবে অদ্ভুত পোশাক-পরা ইটালিয়ান নাবিক একটি। তার পোশাক আর টুপি, তার ছুঁচলো দাড়ি, আর চোখেয় দৃষ্টি থেকে তুমি বুঝতে পারবে লোকটা জলদস্যু। কিন্তু আমার মনে হবে, কী মিষ্টি ওর মুখের হাসি। আমাকে দেখে একমুখ হেসে, টুপিটি খুলে ঘুরিয়ে এমনভাবে অভিবাদন করবে সে যে, আমি মুগ্ধ হয়ে যাব। সে বলবে—হ্যাঁ, তার কথা বেশ বুঝতে পারব আমি, যদিও আমি ইটালিয়ান ভাষা জানি

না—তবু বুঝতে পারব। সে বলবে—"সিনিয়রিন্যা (Signorina), আমার অকপট অভিনন্দন গ্রহণ করুন। মহামান্য সীজার ক্যালিগুলার বংশধর সিনিয়োর‍্যা (Signora), আলফাবীটা আপনার নাচের খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন এই ময়ূরপঙ্খী। আসুন—এই বলে সে একটু ঝুঁকে দু' হাত প্রসারিত করে অভ্যর্থনা করবে আমাকে। তার ওই হাসি দেখে আমি পা বাড়াতে যাব—এমন সময়—"

থেমে গেল 'নি'—তার চোখে চিকমিক করতে লাগল দুষ্টু হাসির ঝিলিমিলি আলো।

"তারপর ?"

আবাব সেই ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে হাসি।

"তারপর যা হলো তা আশ্চর্য কাণ্ড—miracle—রূপকথা—নানা কাব্যের কোয়ালিশন। তুমি বলে উঠবে—না, তুমি যাবে না। হঠাৎ তোমার গীটার হয়ে যাবে তলোয়ার আর হাতের টুপি হয়ে যাবে কাট্‌লাস (Cutlass), মানে নাবিকদের হাতে যে তলোয়ার থাকে তাই। যুদ্ধ বেধে যাবে তোমাদের। ওই শঙ্খচূড় সাপটা নাগবংশীয় বীর রূপ ধারণ করে তোমার পিছনে পাঁয়তারা কষতে থাকবে। আর সেই হরিণটা আমাকে কানে কানে বলবে—এই সুযোগ, আমার পিঠে চড় এবার। আমি বিস্মিত হব। জিজ্ঞেস করব, কে তুমি? সে বলবে—আমি গ্রীক বন্য-দেবতা প্যান। ওরা যুদ্ধ করুক, চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই। কোথায় নিয়ে যাবে, জিজ্ঞেস করব আমি। সে বলবে, প্রথমে নিয়ে যাব লঙ্কায়, তারপরে ট্রয়ে। মুচকি হেসে উঠে বসব তার পিঠে আমি। আর সে ছুটতে থাকবে···তারপর হঠাৎ দেখব, প্রকাণ্ড একটা মেঘের উপর চড়ে ভেসে যাচ্ছি, প্যান আর হরিণ নেই, মানুষ হয়ে গেছে, কন্দর্পকান্তি যুবক, বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরেছে। তারপর সে আমার কানে কানে বলবে—ওই দেখ, তোমার জন্যে কি কাণ্ড হচ্ছে। দেখতে পাব—বিরাট যুদ্ধ হচ্ছে। রাম, রাবণ, অ্যাগামেমনন, ভীম, অর্জুন, অ্যাজাক্‌স্‌ একিলিস, কর্ণ, দ্রোণ, প্যারিস, ভীষ্ম সবাই যুদ্ধ করছে আমার জন্য। প্যান আমার কানে কানে বলছে—তুমি কখনও সীতা, কখনও দ্রৌপদী, কখনও হেলেন—"

আবার সে হাসতে লাগল ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে। ক্রমাগত হাসতে লাগল। ক্রমশ সে হাসি রোদনে পরিণত হলো। সে বলতে লাগল—"হবে না, হবে না, হবে না, আমি জানি এসব কিছুই হবে না—সেই বোসের কেবিনে গিয়ে নড়বড়ে ময়লা রেক্সিন-মোড়া টেবিলে বসে ধারে জোলো চা খেতে হবে ফাটা পেয়ালায়—"

নি কাঁদতে লাগল হু হু করে।

কতক্ষণ কেঁদেছিল তা সুভদ্র সেনের মনে নেই। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন নি নেই, চলে গেছে। পড়ে আছে সেই লাল রুমালটা, মনে হচ্ছিল এক ঝলক রক্ত যেন।

সুভদ্র সেন কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিলেন সেটা। বাক্সের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন, ভেবেছিলেন 'নি' ফিরে এসে চাইবে। 'নি' আর ফিরে আসেনি। অনেকদিন পরে এই চিঠিখানা এসেছিল।

সুভদ্র,

আমি এখন মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর ভাসছি। ঝড় উঠেছে। জাহাজটা দুলছে।

সামনে টেবিলের উপর দুলছে শ্যামপেনের বোতলটা। ওপাশে চেয়ারে বসে দুলছে তোমার বন্ধু সৌরেন মিত্তির। তাকেই বিয়ে করেছি। সেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। সমুদ্রের নাম অ্যাটলান্টিক—যার বাংলা তোমরা করেছ অতলান্তিক—আর জাহাজের নাম পেগেসাস (Pegasus)—গ্রীক পুরাণের পাখাওলা সেই ঘোড়া—যা নক্ষত্ররূপে এখনও আকাশে উজ্জ্বল—যার বাংলা নাম করতে পার পক্ষিরাজ বা উচ্চৈঃশ্রবা। হঠাৎ তোমাকে চিঠি লিখছি কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। তুমি উত্তর দেবে না জানি, উত্তরটা আমার অজানা তা-ও নয়, তবু প্রশ্ন করছি, তুমি কি তোমার 'নি'কে—আসলে সে স্বৈরিণী—তোমার জীবন-সঙ্গিনী করতে পারতে? আমি জানি পারতে না। আমি যে তোমার সঙ্গে মিশতাম এটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন তুমি বেশ বিব্রত বোধ করতে আমি লক্ষ করেছিলাম। তোমার শখ ছিল, লোভ ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। সৌরেন কিন্তু দুর্দান্ত। সে সমস্ত ত্যাগ করে আমাকে নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে পেরেছে। কিন্তু তবু—। এইখানেই শেষ করি…।

এই 'তবু'র উপর সুভদ্র সেন অনেক তাজমহল, অনেক পিরামিড, অনেক ইফেল টাওয়ার বানিয়েছেন। একে একে সেগুলো মূর্ত হয়েছে, কিছুক্ষণ থেকেছে, আবার বিলীন হয়ে গেছে। সেদিন ওই 'তবু'টা অজন্তার গুহার রূপ ধারণ করেছিল, আর সেই গুহার ভিতর সুভদ্র সেন দেখেছিলেন সেই বিখ্যাত ভিখারিনীকে—'নি'ই যেন সেই ভিখারিনী—নি-ই যেন আকুল উৎসুক নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু নি আর ফেরেনি সশরীরে। অশরীরিণীরূপে কিন্তু এখনও সে ঘোরাফেরা করে সুভদ্র সেনের মানস-লোকে।

অতীতের যবনিকা একটু সরিয়ে দেখে নেওয়া গেল বটে সেকালের সুভদ্র সেনকে, একজন প্রেমিক লোকের দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু আসল লোকটিকে দেখা গেল না। অর্থাৎ সে লোকটির দেখা পাওয়া গেল না, যে লোকটি রূপকথালোকে বাস করে। বাস করে বলছি বটে, কিন্তু সে বাস করে না কোথাও, সে সঞ্চরণ করে বেড়ায়। অনেক 'নি'র সঙ্গে দেখা হয় তার, কোথাও কিন্তু বাঁধা পড়ে না। অনেক স্থাবরকে জঙ্গম করেছে সে, অনেক জঙ্গমকে স্থাবর, কিন্তু বাঁধা পড়ে না কোথাও। সুভদ্র সেনের দেহটা জরার কারায় মাঝে মাঝে বন্দী-যন্ত্রণা ভোগ করে, মন কিন্তু সদা-উড়ন্ত। কত দেশের অরণ্য পর্বত সাগর আকাশ যে পার হয় তার ঠিক নেই। সত্যিই একটা পাখির মতন, সে পাখি কখনও হাঁস, কখনও ঈগল, কখনও আবার নাম-না-জানা ঝড়ের পাখি। বহু দিন আগে কাহিনীর যে টুকরোটি তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—সেই কাহিনী, সেই মিসেস পূর্ণেন্দুর কাহিনী—আর কাহিনীমাত্র নেই তাঁর কাছে, তা তাঁর কাছে সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসেস পূর্ণেন্দুকে তিনি নানা ভাবে সৃষ্টি করছেন প্রত্যহ। ডাক্তাররা বলেন, ওইটেই পাগলামির লক্ষণ। কিন্তু মহুয়ার ধারণা অন্যরকম। তার ধারণা, দাদু প্রেমে পড়েছে। কার প্রেমে তা সে ঠিক জানে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—তখন মুচকি হাসি ফুটে ওঠে তাঁর পুরু সাঁওতালী ঠোঁটে।

তিন

সুভদ্রা সেন লিখছিলেন ঃ

"সময়টা কাল হতে পারে, হাজার বছর আগেও হতে পারে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ, এ ঘটনা কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা হবার দাবী রাখে না, এর গায়ে তারিখের কোনও লেবেল লাগানো প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। জায়গাটা পাহাড়ে। কাছে দূরে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। কেন জানি না মনে হচ্ছিল সুইজারল্যাণ্ড। আমার ঠিক সামনে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উপরে উঠে গিয়েছিল, তার দু'পাশের ঝোপে থোকো থোকো বেগুনী ফুলের শোভা দেখে আমার উঠোনের শিম্বি-নগরকে মনে পড়ল। সত্যি, আশ্চর্য কাণ্ড হলো একটা। অনেকদিন আগে আমার উঠোনে একটা শিম গাছ লাগিয়েছিলাম। সেই শিমগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দু'দিন পরে যা হয়ে দাঁড়াল তা বিস্ময়কর। ছোটখাটো মাচার সীমাকে অগ্রাহ্য করে সে উদ্দাম হয়ে উঠল। নতুন বাঁশ, পুরোনো ডালপালা, এমন কি লোহার জাল দিয়েও রোখা গেল না তাকে। সে দেওয়ালের মাথায় উঠে আকাশের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ঢলঢলে ঘন-সবুজ পাতা দিয়ে একটা সবুজ নগরই পত্তন করে ফেলল দেখতে দেখতে। বাধ্য হয়ে নাম দিতে হলো সে নগরের শিম্বি-নগর। সে নগরে টুনটুনি, চড়াই, বুলবুলি ছাড়াও দরজী পাখিদের অবাধ যাতায়াত, বাসও করছে কেউ কেউ। ফড়িং, প্রজাপতি কাঠবিড়ালীরা ক্রমাগত ঢুকছে বেরুচ্ছে। আর ফুটেছে অজস্র বেগুনী রঙের ফুল। অজস্র। শিমও ফলেছে অনেক, হনুমানরা মাঝে মাঝে এসে লুটপাট করে খেয়ে যায়— তবু অনেক থাকে। হঠাৎ দেখলাম সেই শিম্বি-নগরটা যেন হন হন করে উঠছে ওই পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে। স্ফুরিতাধরা বলিষ্ঠা মানবী-মূর্তি তার। সবুজ শাড়ি, গাছকোমর-বাঁধা, মাথার খোঁপায় বেগুনী ফুলের থোপনা গোঁজা। সে ওই ঝোপ-গুলোর কাছে গিয়ে বলছে শুনলাম—আমার ফুল তোমরা চুরি করেছ কেন। ঝোপের গাছরা অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মৃদু হাওয়ায় দুলছে শুধু, কোনও উত্তর দিচ্ছে না। আমি ভাবলাম ওর পিছু পিছু উঠে গিয়ে ওকে থামাই। আমার উঠোনের শিম্বি-নগর বিদেশে এসে দুটো ফুলের জন্য এমন ঝগড়া করছে, এতে আমারই যেন লজ্জা করতে লাগল—কিন্তু আমাকে যেতে হলো না। মানে, আমার ভুল বুঝতে পারলাম। দেখলাম, ও মানবীতে রূপান্তরিত শিম্বি-নগর নয় ; ও সত্যিই একজন মানবী, এই পাহাড়টারই মালকাইন সম্ভবত। যে তার ফুল চুরি করছিল, সে দেখলাম ছুটে পালাচ্ছে বন-বাদাড় ভেঙে। মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা পাখি। বার্ড অব প্যারাডাইস—ছবি দেখেছিলাম বলে চিনতে পারলাম। পিঠের দিক থেকে বেগুনী পালকের প্রপাত নেমেছে যেন, মুখে বেগুনী ফুলের পাপড়ি। খাচ্ছে আর মুচকি হাসছেও যেন।

"দুষ্টু কোথাকার—"

তাড়া করে গেল মেয়েটি। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দুজনেই অবাক হয়ে গেলাম। মিসেস পূর্ণেন্দুকে এমনভাবে এখানে দেখব আশা করিনি।

"একি মিসেস পূর্ণেন্দু, আপনি এখানে—"

ওমা, আপনি ! আজকাল এখানেই তো থাকি। এই পাহাড়গুলো ইজারা নিয়েছি—"

"কেন ?"

"স্বপ্নের চাষ করি এখানে। ওই দেখুন না, একটা স্বপ্ন পাখি হয়ে গেছে। আমার স্বপ্নের ফুলগুলো খেয়ে ফেলছে—একটা স্বপ্ন আর একটা স্বপ্নকে খেয়ে ফেলছে—আশ্চর্য, নয় ? স্বপ্নরাও হিংস্র হতে পারে এ কখনও ভাবিনি !"

মিসেস পূর্ণেন্দুর অজ্ঞতা দেখে হঠাৎ আমার একটু মজা লাগল। আমিও এতক্ষণ মিসেস পূর্ণেন্দুর মতোই অজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা আলোর রেখা এসে উড়িয়ে দিল আমার অজ্ঞতার কুয়াশাটাকে। আমি জ্ঞানলাভ করে মিসেস পূর্ণেন্দুকে অনুকম্পা করতে লাগলাম।

"আপনি ও পাখিটাকে চিনতে পারেননি দেখছি।"

"ওটা তো বার্ড অব প্যারাডাইস—ওর ছবি কে না দেখেছে ?

"কিন্তু ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে শকুনি, তাকে আপনি দেখতে পাননি।"

"শকুনি ?"

"হ্যাঁ, মিস্টার পূর্ণেন্দু !"

"ছি, ছি, পূর্ণেন্দুকে আপনি শকুনি বলছেন। তাকে তো আপনি চিনতেন না—"

"না, সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি—"

"কি শুনেছেন ?"

"অনেক কিছু। সেসব শুনে আর কি করবেন ! আমি কেবল একটা ব্যাপারে তাঁর শকুনি-পরিচয় পেয়েছিলাম। আপনি যে জীবন্ত একথা তিনি মানতে চাননি। তিনি আপনাকে মড়া ভেবেছিলেন, এবং নিজে মড়াটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবেন ঠিক করেছিলেন—"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিসেস পূর্ণেন্দু। আমি বললাম—"তারপর আপনি হঠাৎ দেখিয়ে দিলেন যে, আপনিও জীবন্ত। আপনি কিংবা ইসমাইল কেউ ঠিক আইনস্টাইন নন, তবু আপনারা প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রেমেরও একটা ফোর্থ ডাইমেনসন আছে—যা সদা-জীবন্ত, সদা-পরিবর্তনশীল। সেই সদা পরিবর্তনশীল ফোর্থ ডাইমেনসন অদৃশ্য স্রোতে কবে আপনাকে এখানে ভাসিয়ে এনেছিল, কবে থেকে আপনি এই পাহাড়ী দেশে স্বপ্নের চাষ করছেন, কবে মনুষ্যরূপী শকুনি মিস্টার পূর্ণেন্দু বার্ড অব প্যারাডাইসের ছদ্মবেশে আপনার স্বপ্নের দেশে প্রবেশ করেছে এসব খবর কোথাও বিজ্ঞাপিত হয়নি। তবু বলব হয়েছে, তা না হলে আমি জানলাম কি করে। আমি কি করে এলাম এখানে।"

মিসেস পূর্ণেন্দু কিশোরীর মতো ঘাড় নেড়ে দুষ্টুমি মাখানো হাসি হেসে বললেন—"জানি না। জানতে চাইও না—আর একটা কথা জানি কিন্তু—"

আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড হলো।

যিনি বলিষ্ঠা মানবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনি সত্যিই কিশোরী হয়ে গেলেন দেখতে দেখতে। ঘাড় বেঁকিয়ে অপাঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি যে আসবেন তা আর একজন জানতে পেরেছে, কাল থেকে কাঁচকলা আর উচ্ছে খুঁজছে সে, পেয়েছে কিনা জানি না—"

মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ল না। মনে হতে লাগল অন্ধকারে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, নূপুরও বাজছে, কিন্তু তার সঙ্গে কলকল-ধ্বনি, একটা নদী বইছে কি? দেখতে পাচ্ছি না, কেবল মনে হচ্ছে অনেক দূরে, অনে—ক দূরে। নদীর ওপার থেকে ডাকছে যেন কে—এসো, এসো। তবু মনে পড়ল না।

"রহস্য, রহস্য গো, আপনার বউ। সে-ও এখানে আছে যে—আপনি সেকালে সুক্তো ভালবাসতেন—তাই রান্না করছে সে আপনার জন্যে—"

হেসে লুটিয়ে পড়ল কিশোরীটি, তার সবুজ শাড়ির আঁচল উড়তে লাগল হাসির হাওয়ায়।

"রহস্য আছে এখানে?—কোথা আছে?"

"ওই যে—ওই যে—ওই যে—ওই বাড়িটায়—কাঁচকলা, উচ্ছে, বাড়ি, রান্নাঘর সব পেয়েছে সে—"

হাসি, হাসি, হাসি, ক্রমাগত হাসি, হাসির তুফান উঠল একটা। পাহাড়গুলো সব উড়ে গেল, রইল শুধু সেই হাস্যপরা কিশোরীটির ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হাতটা।

"ওই যে—ওই বাড়িটায়—"

তারপর হাতটাও মিলিয়ে গেল। মনে পড়ল 'নি' এইরকম ফোয়ারা-হাসি হাসত। হঠাৎ বাড়িটা দেখতে পেলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে। ওটা তো পূর্ণেন্দুবাবুর সেই হলদে বাড়িটা, আমার পাশের বাড়ি, হলদে রঙের উপর কালো কালো কাজলির দাগ, সবই সেই, তবু সেটা দেখে আশ্চর্য হলাম। বাড়িটা আমার কাছে সরে এসেছে, বেশ খানিকটা সরে এসেছে। একটা জানলা দিয়ে ভিতরের ঘরের একটা দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে একটা কপাট। কপাটটা ফাঁকা করে সে মুখ বাড়িয়ে চাইল আমার দিকে—হাসি-ভরা চোখ—হ্যাঁ, রহস্যই—তবু যেন রহস্য নয়। নানা-রকম গন্ধ যেন এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করছে ওর মুখের চারদিকে—মুখের ওপর ছায়া ফেলেনি—গন্ধের ছায়া পড়ে না—কিন্তু তবু মুখটাকে একটু যেন বদলে দিয়েছে—আমার স্থূল বুদ্ধির গজকাঠি দিয়ে পরিবর্তনটা মাপবার চেষ্টা করছি, পারছি না, কেবলই পারছি না, এই রকম যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ আমি হারিয়ে গেলাম। চারিদিকে সমুদ্র—উত্তাল তরঙ্গ উঠছে আর পড়ছে—হঠাৎ এক মৎস্যনারী এসে সাঁতার কাটতে লাগল আমার পাশে। বললে — আমাকে চিনতে পার? পারলাম না। সে তখন বললে—আমি এককালে ছিলাম রোহিতানী। আমার 'তা' স্বপ্নের ডিমের উপর বসে আছে—কবে থেকে, এখন আমি তাহীনা রোহিণী। তোমার নি কিন্তু আছে আমাকে জড়িয়ে। আকাশের চন্দ্রের আমি প্রেয়সী আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আমি নায়িকা। তোমরা—এ যুগের লেখকরা—আমার নাগাল পাওনি—নাগাল পেয়েছ যোনির, যে যোনি তোমাদের বাবা-মায়ের ছিল, ছেলেমেয়েদের আছে, ছাগল-কুকুর, পোকা-মাকড়, কার নেই? তাই নিয়ে ঘাঁটছ তোমরা—নায়িকার দেখা পাওনি, প্রেয়সীর তো নয়ই। সরে যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। ইন্দ্রধনুসন্নিভ তার পুচ্ছ আন্দোলন করে অন্তর্ধান করল সে সেই নীলসাগরের জলে, যার উপর পূর্ণিমার চাঁদ আলো ফেলে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে মনে হলো।

আমি আরও হারিয়ে গেলাম।

তারপর আবার দেখলাম—হলদে বাড়িটা সত্যিই অনেক কাছে সরে এসেছে।

আমার বাড়ির দেওয়ালে ঠেকেছে তার দেওয়াল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর কানে কানে কে যেন বললে—কথাটা কাউকে বলো না যেন। কে বললে। অতীত নিশ্চয়ই নয়, অতীতকে কবি কত সেধেছেন—কথা কও, কথা কও। সে তো কোন কথা বলেনি। কত ঐতিহাসিক অনুমানের জাল ফেলেছেন হারিয়ে-যাওয়া কথা-মুক্তাদের বিস্মৃতির সমুদ্র থেকে তোলবার জন্য। পারেননি, কত ভূতত্ত্ববিদ্‌ তার প্রস্তরকঠিন ঔদাসীন্যকে ফাটাবার চেষ্টা করেছে গাঁইতি-শাবল-ডিনামাইট দিয়ে—কিছু জানা গেছে কি? যায়নি। যায়নি, যায়নি, যায়নি—কিছু জানা যায়নি—কিছু জানা যায়নি। 'নি'—'নি'—'নি'।"

সুভদ্রবাবু চোখ তুলে চাইলেন। দেখলেন, এরিয়েলের বাঁশের ডগায় বসে দোয়েল সুরের জাল বুনে চলেছে, নি সুরটা নানাভাবে লীলায়িত হচ্ছে। হলদে বাড়ির দেওয়ালটা আরও অনেক এগিয়ে এসেছে। এরিয়েলের বাঁশটাও। দোয়েলের সাদায়-কালোয় পালকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সাদা আর কালো, আলো আর অন্ধকার, দিন আর রাত্রি, কাক আর বক মিতালি করেছে যেন ওর সর্বাঙ্গে। 'কথাটা কাউকে বলো না যেন'—আবার কে যেন বললে কানে কানে! সুভদ্র সেন দেখলেন—ঠিক দেখলেন নয়, নিজের চোখকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি—মনে হলো অনুভব করলেন—সামনে ছায়াময়ী কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না অথচ যেন দেখা যাচ্ছে একটা আবছা হাসি। সেই হাসি থেকেই যেন নিঃশব্দ ভাষায় আবার বিচ্ছুরিত হলো—আমিই বলেছি ও কথা। আমি বর্তমান নই, অতীত নই, আমি ভবিষ্যৎ। অমৃতের প্রতি আমার লোভ, কিন্তু অমৃত আমি পাইনি, অমৃতের কাছাকাছি আসতেই কেটে দিয়েছে আমাকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, বলেছে আমি নাকি দৈত্য! বার বার আমি হয়ে গেছি রাহু। ক্রমাগত গ্রাস করেছি চন্দ্রসূর্যকে কিন্তু হজম করতে পারিনি। ওরা যদি সর্বদাই আমাকে কেটে ফেলবার জন্যে উদ্যত না হতো তা হলে হয়তো আমি অন্যরকম হতাম। তা হলে হয়তো আমার ফুরফুরে হাওয়া বেদনার ঝড়ে পরিণত হতো না. তা হলে হয়তো আমার ছায়ার ভীতি প্রেমের বাহুবন্ধনে পরিণত হতো, তা হলে আমি রাহু হতাম না। আমার অর্ধেকটা অমর, অর্ধেকটা সাপ। আমি ওই সাপকেও অমর করব এই আমার পণ। কিন্তু একথা জানতে পারলেই ওরা বাধা দেবে, ছুটে আসবে বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র নিয়ে। তাই বলছি, কথাটা বলো না যেন কাউকে। কোন কথাটা গোপন রাখতে হবে? ভাবতে লাগলেন সুভদ্র সেন। তারপর দেখতে পেলেন সামনের বাড়ির দেওয়ালটা হাসছে। হাসির রং থাকে নাকি! এ হাসির কিন্তু রং আছে। হলদে রং, তার উপর কালোর ডোরা। হাসি, না বাঘ? অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সুভদ্র সেন।

চার

অন্ধকারের ভিতর সুরের ঝড় উঠেছে। বীণা, বেণু, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো বাজছে, আর বাজছে চেলো, ম্যাণ্ডোলিন, তার সঙ্গে ঢোল-মৃদঙ্গ, মাঝে মাঝে সানাইয়ের সরু সুর আর খঞ্জনীর খন্‌খন্‌ আওয়াজ, অনেক দূরে গর্জন করছে ভেঁপু আর রামশিঙে। ঢাকের গমগমে শব্দে অন্ধকার গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে মাঝে মাছে আবার ডুগি-তবলার চটুল বোলে চঞ্চল হয়ে উঠছে। সবগুলো যেন কিসের দোলায় দুলছে, হাসির না কান্নার, তা ঠিক করতে পারছে না মহুয়া। সে কেবল ছুটছে ওই অন্ধকারের মধ্যে। সব সময়ে ছুটছে না। মাঝে মাঝে থামছে। থেমে পিছু ফিরে দেখছে সে আসছে কি না। কে সে? মিস্টার চ্যাটার্জি? মোহিত সোম? মঙ্গলময়? তার দাদু? নিতান্ত ছেলেমানুষ বাবুল বোস? না, কেউ নয়। কাউকে চিনতে পারছে না সে। দেখছে কেবল কতকগুলো চাহনি···সব চাহনির একই ভাষা···। বাজনা থেমে গেল হঠাৎ। সানাইটা কেবল বাজতে লাগল। তারপর তুমুল উলুধ্বনি। খানিকটা অন্ধকার আলো হয়ে গেল। ওগুলো কি পড়ছে? খই? না ফুল? পুষ্পবৃষ্টি নাকি। অজস্র ফুলে ছেয়ে গেল চারিদিক। তারপর এল একটা মোটরকার। পদ্মফুলে মোড়া। মোটর থেকে যে নামল তার মাথায় বরের টোপর। মুখটা কিন্তু দেখা গেল না। ঝনঝন করে বেজে উঠল অ্যালার্ম ঘড়িটা। মহুয়া ঘুমোয়নি। জেগে শুয়েছিল। উঠে বসল। অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। কাঁটায় কাঁটায় দুটো। রাত দুটো। উঠে পড়ল বিছানা থেকে। নিঃশব্দে আলমারি খুলে রঙীন শাড়ি বার করল। আর তার সঙ্গে বার করল ছন্দ মিলিয়ে জামা ওড়না আর দুল। নিঃশব্দে পরল সেগুলি। তারপর রবার-সোল জুতো পরে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছিটকিনির শব্দ হলো খুট করে। সুভদ্র সেনের ঘরের দিকে চেয়ে দেখল একবার। ঘর অন্ধকার। সুভদ্র সেন চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। ঘুমুচ্ছিলেন না। ব্রোমাইডে সেদিনও কাজ হয়নি। ছিটকিনির শব্দে তাঁর বোজা চোখ খুলে গেল। তিনি এতক্ষণ চোখ বুজে হলদে বাড়িটা দেখছিলেন, ভাবছিলেন, ওটা অত কাছে সরে এসেছে কেন। খোলা চোখে দেখলেন, মিসেস পূর্ণেন্দু— তন্বী শ্যামা রূপসী মিসেস পূর্ণেন্দু—অন্ধকারের অজানায় পাড়ি দিচ্ছে। অভিসারে? হঠাৎ মহুয়ার মুখটা ভেসে উঠল। সে মুচকি হেসে চুপি চুপি বলল—না, অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের তেপান্তর পার হচ্ছে নাকি মহুয়া? যাবে তুমি ওর সঙ্গে? প্রশ্নটা জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দুলতে লাগল সুভদ্র সেনের চোখের সামনে। দ্বিধার দোলায় দুলতে লাগলেন সুভদ্র সেন। ওই প্রশ্নটার পিঠে চড়ে যদি বেরিয়ে পড়েন (স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে প্রশ্ন যে-কোনও মুহূর্তে পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে যেতে পারে তা তিনি জানেন), তাতে লাভ হবে কি? মহুয়া আলেয়া হয়ে গেছে এ তো তিনি আগেই দেখেছেন। এক রঙের আলেয়া নয়, লাল, নীল সবুজ, হলুদ চার রঙের চারটি পরী একে একে হাসিমুখে উঁকি দিয়ে গেল তাঁর মনের বাতায়নে। লাল পরী বললে, আমি মহুয়া। নীল বললে, আমি নয় কেন? সবুজ কিছু বললে না, হাসিমুখে

চেয়ে রইল খালি। হেসে কুটিকুটি হলো হলদে পরীটা—সে বললে, কি আশ্চর্য, আমাকে চিনতে পারছ না, দাদু? বেড সুইচ টিপে ঘরে আলো জ্বাললেন সুভদ্র সেন। সামনেই দেখতে পেলেন সদ্য বিধবা শ্যামলীর ফোটোটা। দেখতে পেলেন তার চোখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি। শুনতে পেলেন শ্যামলীর সেই কথাগুলো, 'ওকে একটু দেখো বাবা, ও বড় দুরন্ত, বড় খেয়ালী।' দেখো? তিনি তো আগেও দেখেছেন এখনও দেখছেন—কিন্তু শ্যামলীর চোখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কেন? তার দৃষ্টি সহসা যেন সুভদ্র সেনের চোখে ফুটে উঠল। তিনি দেখলেন একটা বাঘ যেন হরিণকে দেখছে। এ কোন হরিণ? অনেক দিন আগে একটা সোনার হরিণকে দেখেছিলেন। টেনিসনের কাব্যকুঞ্জে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। আলোর হরিণ আলোর দেশে চলে গেছে; নি চলে গেছে সুরের সুরলোকে। একটা জটিল প্রশ্ন জাগল মনে হঠাৎ। আলোর অভাবই তো অন্ধকার, তাহলে অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে, অন্ধকার মানে নি-আলো। ওর মধ্যে নি-ও আছে তাহলে। তাহলে···সবটা গোলমাল হয়ে গেল, জলটা ঘুলিয়ে উঠল, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব, সংশয়ের সঙ্গে প্রত্যয়, দেখার সঙ্গে না-দেখা ঘুরপাক খেতে লাগল। সুভদ্র সেন অনুভব করলেন, ইলেকট্রিক আলোতে সত্যকে দেখা যাবে না। সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। দেখলেন হলদে বাড়ির সামনের দেওয়ালটা তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জানলাসুদ্ধ; জানলায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন। পিঠের উপর বেণী দুলছে। চিনতে পারলেন তাকে। তবু জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

"আমাকে তো চেনো। তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

"তোমার মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"আগে তো আমার বেণীটাকেই বেশী চিনতে।"

পা পিছলে গেলে বা জুয়াচুরি ধরা পড়ে গেলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সুভদ্র সেন মনে মনে। একটু আশ্চর্যও হলেন। ওর চুলও তো—।

"তুমি একটু ফিরে দাঁড়াও না। তোমার মুখটাও দেখি—"

"মুখ তো দেখানো যাবে না। মুখ যে পোড়া।"

সুভদ্র সেন জানতেন, এই উত্তর পাবেন।

"কিন্তু চুলটাও তো পুড়েছিল। বেণীটা তাহলে—"

"বেণী নেই, ওটা তুমি দেখছ, কারণ ওটা তোমার কল্পনায় অমর হয়ে আছে—"

"মুখটাও কি নেই?"

"না। সতী মেয়েদের মুখ কারও কল্পনায় আজকাল অমর হয়ে থাকে না। অমর হয়ে থাকে এইসব—"

বাঁ হাতটা তুলে সে লাল রুমালটা দেখাল। সুভদ্র সেন দেখতে পেলেন, বাঁ হাতের অনামিকায় পান্নার আংটিটাও জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ মনে পড়ল রহস্য প্রথম যেদিন আংটিটা পরেছিল কি অপরূপ হাসিই না ফুটেছিল তার মুখে। সে মুখ আর দেখা যাবে না? কল্পনাতেও না? হঠাৎ মিসেস পূর্ণেন্দু বেরিয়ে এলেন হলদে বাড়ির দেওয়াল ভেদ করে। বললেন—"আপনার কল্পনার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

লাল বনেট আর সবুজ-গাউন-পরা মিসেস পূর্ণেন্দু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

সুইচ টিপে আবার আলো জ্বাললেন সুভদ্র সেন। গত বছরের ক্যালেন্ডারটা চোখে পড়ল। লক্ষ্মীর ছবি। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাটা মনে হলো মুচকি মুচকি হাসছে। আগে গম্ভীর হয়ে থাকত। পেঁচাটাও আজ মহুয়াকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে নাকি? তারপর হঠাৎ মনে হলো, মিসেস পূর্ণেন্দুও বোধ হয় ওরই খোঁজে বেরিয়ে গেল। তাই কি? ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে রইলেন সুভদ্র। তারপরই সবুজ গঙ্গাফড়িংটা লাফিয়ে ঢুকল জানলা দিয়ে। বাতির শেডের উপর বসে এক পা তুলে চেয়ে রইল সুভদ্রর দিকে। সুভদ্র ভাবলেন, এও নিশ্চয় মহুয়ার খবরই এনেছে। তারপরই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফড়িংটা। সুভদ্র সেনের মনটাও বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে গঙ্গাফড়িং-এর পিঠে সওয়ার হয়ে। দেহটা বসে রইল।

মহুয়া যখন রাস্তায় নেমেছিল, তখন নীরব নিথর ছিল সব। মিসেস পূর্ণেন্দুর বাড়ির পূর্ব দিকে যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে গঙ্গার ধারে গেছে, সে রাস্তায় গেল না মহুয়া। গঙ্গায় যদি নৌকো থাকত আর সে নৌকোয় থাকত যদি মাঝি, যে মাঝি সাগরের খবর রাখে, তাহলে হয়তো যেত। সাগরেই যেতে চায় সে। কিন্তু সুযোগ পায় না। মহুয়া জানে সুযোগ সে পাবেও না। সে জানে তাকে হেঁটেই যেতে হবে, হেঁটেই অতিক্রম করতে হবে প্রান্তর, অরণ্য, পর্বত, মরুভূমি। সে বেরিয়ে দেখল চারদিক নীরব নিথর। ঝিঁঝি পোকাও ডাকছে না। দূরে একটা ছোট্ট ঝোপের ধারে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। মাঠের মাঝে ঝোপটা। সেই দিকেইচলল মহুয়া। রোজ যায়। কিন্তু কখনও পেঁছিতে পারে না। ঝোপটা সরে সরে যায় ক্রমাগত। সে জানে পেঁছিতে পারলে দেখা যাবে—হয় মিস্টার চ্যাটার্জি, না হয় মোহিত সোম, না হয় মঙ্গলময়, না হয় দাদু (সেই দাদু, যার তেড়ি-কাটা ফোটোটা টাঙানো আছে তার শোবার ঘরে), কেউ না কেউ নিশ্চয় বসে আছে সেখানে। কিন্তু মহুয়া পেঁছিতে পারে না। চলতে চলতে তাকে ঘিরে কখনও বাজনা বাজে, কখনও বাজে না। ঝোপের ধারের আলো কখনও উজ্জ্বল হয়, কখনও হয় না। টিপ টিপ করে আলো জ্বেলে জোনাকিরা ওড়ে আশেপাশে। সুভদ্র সেন দেখতে পেলে বলতেন—ওর মনই জোনাকি হয়ে উঠেছে। চুলও উড়ছে। উড়ছে বাদুড়ের দল। উড়ছে স্বপ্ন আর কল্পনা। এর পর যা ঘটল, তাও কি কল্পনা? কার নিঃশ্বাস যেন গায়ে লাগল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মহুয়া। আজ তার চলার ছন্দে পিয়ানো বাজছিল; হঠাৎ থেমে গেল সেটাও।

দেখল, তার পাশে দীর্ঘকান্তি কে যেন দাঁড়িয়েছে এসে। চোখ মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে শুধু অদ্ভুত একটা ফুলের গন্ধ। বকুল? রজনীগন্ধা? হাস্নুহানা? না, এ গন্ধ সে চেনে না। মনে হলো—পিয়াল? পিয়াল ফুলের গন্ধ থাকলে এইরকম হতো হয়তো। একথা কেন মনে হলো, তাও জানে না মহুয়া। পিয়াল ফুলের গন্ধ আছে কিনা তাও জানে না।

"কে আপনি?"

"তুমি তো মহুয়া।"

"হ্যাঁ।"

"মহুয়া গাছের তলায় তোমার জন্ম হয়েছিল বলে তোমার নাম মহুয়া—তাই না?"

"হ্যাঁ—"

"আমার নাম শালিম। শাল গাছের তলায় জন্ম হয়েছিল আমার। লিবাং বনে এখনও আছে সেই শাল গাছ। আর আছে সেই তিরি নদী, যার জলে শাল গাছটার ছায়া পড়ে, যে ছায়ার সঙ্গে খেলা করে মেঘের ছায়া আর রামধনুর রং, যে নদীর জলে সকালে আসে উষা বিকেলে সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নার সঙ্গে যার মিতালি, অন্ধকারের বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায় না যে, রূপান্তরিত হয় স্বপ্নে। এর সঙ্গে তুমিও আছ মহুয়া—"

"আমি?"

"হ্যাঁ তুমি। তুমি তো শহরের নও। তুমি বনের। বন এখনও তোমায় ডাকে। শুনতে পাও না?"

"না—"

"কান পেতে শোন—"

একটা আকুল মর্মর ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল অন্ধকার। অভিভূত হয়ে পড়ল মহুয়া। এ মর্মর ধ্বনি তো সে শুনেছে আগে। কেবল অন্ধকার মাঠে নয়, তার রক্তের মাঝখানে।

"শুনলে?"

"শুনলাম। কিন্তু ওর মানে বুঝতে পারি না।"

"তোমার ভাষায় অনুবাদ করে দিলে হয়তো বুঝবে। বলো তো করে দিই। কবিতায় করব কিন্তু—সুরে বলব—"

"বলো—"

শালিম গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

তোমারি পথের পানে
চেয়ে থাকি সাঁঝ বিহানে
তবু তো পাই না দেখা
গহিনা আঁধার রাতে
জেগে থাকি তাহার সাথে
একা একা
তবু তো পাই না দেখা।
ওগো মনে পড়ছে না কি
পিয়াল বনে দোয়েল পাখী
সুরের রাখী
বেঁধেছিল তোমার প্রাণে
সে রাখী ছিঁড়ল কবে
কে-ই বা জানে।
ছিঁড়ল কেন ছিড়ল কবে
কিসের টানে
পাই না দিশা ও মহুয়া।
বুঝি না কোনই মানে।

গান থেমে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। দু'জনের মাঝখান দিয়ে যা প্রবাহিত হতে লাগল তা নিঃশব্দ সময়ের স্রোত নয়, তা গুঞ্জন-বহুল ছন্দ-ধারা, তা অস্ফুটের ফোটার বাসনা, তা অপ্রকাশের প্রকাশ হবার আকুতি। অস্পষ্ট কি একটা যেন স্পষ্ট হতে চাইছে মনে হলো। মহুয়া বলল—"আমি কিছু বুঝতে পারছি না—"

"না পারাটাই স্বাভাবিক। তোমার ইহজন্ম আর পূর্বজন্মের মাঝখানে যে পরদাটা দুলছে তা দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করা যায় না। কেবল অনুভূতি দিয়ে আর কল্পনা দিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে তা ভেদ করেছি, অনেক যুগ যুগান্তরে লীন হয়ে গেছে, আমার ভাষাকে তোমার ভাষা করতে আরও কত দিন কত রাত্রি লেগেছে—তবু নিজেকে স্পষ্ট করতে পারছি না, অন্ধকার এখনও জড়িয়ে আছে আমাকে—শালিমকে, তোমার সেই পূর্বজন্মের শালিমকে দেখতে পাচ্ছ না তুমি—আমার ব্যক্তি-সত্তাটাকে স্পষ্ট করতে পারিনি এখনও, কিন্তু তুমি যদি সময় দাও পারব—আমার আশার টানেই তুমি রোজ রাত্রে বেরিয়ে আসো তা আমি জানি—"

মহুয়া বলল—"না, আমি বেরিয়ে আসি ব্রাহ্ম মুহূর্তের মোহে অভিভূত হয়ে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত আমাকে রোজ ডাক দেয়। বলে—বাইরে এস, বাইরে এস, বাইরে এস। তারই ডাকে চলে আসি আমি।"

"ব্রাহ্ম মুহূর্তের খবর কে দিয়েছিল তোমায়?"

"মঙ্গলময়—"

"কে সে?"

"আমার সহকর্মী অধ্যাপক একজন। সে বলেছিল ব্রাহ্ম মুহূর্তেই জীবন-দেবতার দেখা পাওয়া যাবে। তাই আমি রোজ—"

হঠাৎ শালিমের দেহটা একটু বেঁকে গেল। মনে হলো একটা ধনুকও মূর্ত হলো তার সামনে। তারপর—বং—। একটা কালো তীর ছুটে চলে গেল।

"আমি আবার আসব, আবার আসব, বার বার আসব—" শালিম অন্তর্ধান করল।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া। সহসা তার স্তব্ধতাকে চিরে ডাক দিয়ে চলে গেল একটা রাত-জাগা পাখি—মিচচে—মিচচে—মিচচে। মহুয়ার মনে হলো মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। শালিম? আবার আসবে? বার বার আসবে? তারপর সে আবিষ্কার করল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বেশী দূর যায়নি। পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেছে, তারই একটু দূরে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝোপটা নেই, আলোটাও নেই। তারপর রোজ যা হয়, সে দিনও হলো, মনে পড়ল দাদু এখনও হয়তো ঘুমোননি। নিশ্চয়ই জেগে এ-পাশ ও-পাশ করছেন। কে যেন তাকে ঘুরিয়ে দিল বাড়ির দিকে। সুভদ্র সেন চুম্বকের মতো টানতে লাগলেন তাকে। তারপর একটা হিমের আবর্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাকে ঘিরে, হতাশার আবর্ত। ব্রাহ্ম মুহূর্তে সে রোজ যাত্রা করে, কিন্তু কোথাও পৌঁছতে পারে না কেন। কেন এ ব্যর্থতা! যে ঐশ্বর্য অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে, যে ঐশ্বর্যের সন্ধান কত লোক পেয়েছে, সে পাবে না কেন।

"সে ঐশ্বর্য নেই—" কে বলেছিল? মনে নেই, কিন্তু কোথায় পড়েছিল? তারই স্মৃতি যেন কথা কয়ে উঠল।

"নেই?"

"না—"

"কে আপনি—"

"আমি হারুন অল রশিদের পুত্র অল মামুন। আমি ঐশ্বর্য পাব বলে বিদীর্ণ করেছিলাম পিরামিডকে। কিছু পাইনি—"

যে বইয়ে ঘটনাটা পড়েছিল সেই বইয়ের নাম মনে পড়ল না, মলাটটা কেবল মূর্ত হয়ে উঠল মানসপটে। তারপর সেইটেই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখল, সুভদ্র সেন আলো জ্বেলে ঘরের মাঝখানে একটা হাত একটু তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হলো যেন কার সঙ্গে কথা কইছিলেন। মহুয়াকে দেখে যেন একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন।

"তুমি কি মঙ্গলময়ের কাছে গিয়েছিলে?"

"না। কেন?"

"এখুনি খবর পেলাম যে, মঙ্গলময় অসুস্থ—"

"বাজে খবর শুনেছ। কে বললে?"

"মিসেস পূর্ণেন্দু। তিনিও একটু আগে বেরিয়েছিলেন—"

"মিসেস পূর্ণেন্দু!"

হেসে উঠল মহুয়া, আবার ভেঙে পড়ল একটা ঝাড়লণ্ঠন। কেঁপে উঠল রাতের অন্ধকার।

"ব্রোমাইড খেয়েছ?"

"খেয়েছি। কাজ হয়নি—"

"তাহলে শোও—। আমি তোমার মাথায় অডিকোলন দিয়ে একটু হাওয়া করি—"

"করবি? সত্যি করবি?"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। মনে হলো যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

"মিসেস পূর্ণেন্দু কিন্তু মিথ্যে নয়। তুই আসার একটু আগে এসে খবরটা দিলেন আমাকে। তুই আসার সঙ্গে সঙ্গে তোর মধ্যে মিলিয়ে গেলেন যেন। মাঝে মাঝে আমার কি সন্দেহ হয় জানিস?"

"বাজে না বকে তুমি শুয়ে পড় তো—"

শুয়ে পড়ল সুভদ্র সেন।

তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠল মহুয়া—"ওটা কি! ওটা কি! শালগাছ এখানে এল কি করে?"

সুভদ্র সেন বললেন—"ওটা তো পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ির দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ের কালো দাগ ওটা, গাছের মতো দেখাচ্ছে—"

"দেওয়াল? দেওয়াল এখানে আসবে কি করে!"

ফিসফিস করে সুভদ্র সেন বললেন—"রোজই এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে—"

মহুয়া চেয়ে রইল দীর্ঘ শাল গাছটার দিকে। এরই তলায় কি শালিম জন্মেছিল?

পাঁচ

সুভদ্র সেন লেখার টেবিলে এসে বসেছিলেন। যথারীতি চেয়েছিলেন হলদে বাড়িটার দিকে। টেবিলের উপর খোলা ছিল সেই খাতাটা যার নাম 'মেঘ'। 'মেঘ'-এর প্রথম কয়েকটি পাতায় নানা ছাঁদের অক্ষরে 'মেঘ' 'মেঘ' 'মেঘ' লেখা ছিল খালি, কয়েকটা পাতা সাদাও ছিল। যখন মাথায় কিছু আসত না, তখন মাঝে মাঝে নানা অক্ষরে 'মেঘ' শব্দটাকেই লিখতেন তিনি। সেদিন কিন্তু তাও লিখছিলেন না। চেয়েছিলেন—হলদে বাড়িটার দিকে। হ্যাঁ, বাড়িটা সরে গেছে। কাছে এসেছিল, সরে গেছে। শুধু তাই নয়, অভিমানও করেছে। লিখতে আরম্ভ করলেন—

"হলদে বাড়িটা অভিমানই করেছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। কাল রাত্রে মহুয়া আমার মাথায় অডিকোলন দিয়ে ঝুঁকে যখন বাতাস করছিল, যখন আমি চোখ খোলবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আঙুল দিয়ে আমার চোখ বুজিয়ে দিয়ে যখন বলছিল—আবার তুমি দুষ্টুমি করছ দাদু—তখন তার চোখের ভিতর দিয়ে আমি আর একজনের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিলাম—মিসেস পূর্ণেন্দুর। সে যেন বাঘিনীর মতো চেয়েছিল। মহুয়ার চোখের ভিতর দিয়েই সে দেখছিল আমাকে। আজ দেখছি বাড়িটা সরে গেছে। অভিমান—হ্যাঁ, অভিমানই করেছে বাড়িটা। আর একটা অভিমানের ছবি মনে পড়ছে। অনেক দিন আগে আমি সিংঘিবাগানে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। চারতলা বাড়ি। সে বাড়ির ছাদের উপর সারি সারি জলের ট্যাংক বসানো থাকত। একটা ট্যাংকের তলাটা ছ্যাঁদা ছিল, জল পড়ত ঝর ঝর করে। মনে হতো ছোট্ট একটা ঝরনা যেন। তার তলায় ছোট ছোট পাখিরা এসে স্নান করত রোজ মহানন্দে। ট্যাংকটা ভাবত এটা বুঝি তারই কৃতিত্ব। একটা খুশীর আভা ফুটে উঠত তার সর্বাঙ্গে। তারপর একদিন মিস্ত্রি এল—সারিয়ে দিলে ট্যাংকটা। ঝরনা লোপ পেয়ে গেল (নায়াগ্রাও এমনি করে হয়তো একদিন লোপ পাবে!) চড়াইরা শালিকরা আর স্নান করতে আসে না। কিছুদিন পরে আর একটা ট্যাংকের তলায় ছ্যাঁদা হলো। সেখানে আবার ঝরনা ঝরতে লাগল। সেখানেও আবার এল স্নানার্থী চড়াই-শালিকের দল। তখন ওই প্রথম ট্যাংকটার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঈর্ষা বিচ্ছুরিত হতো। অভিমান ভরে সে চাইত ওই পাখিগুলোর দিকে। পাখিরা বুঝত না, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম। হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে আজ সেই ট্যাংকটার কথা মনে পড়ছে। মিসেস পূর্ণেন্দুর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত সেই হাতটার কথাও মনে পড়ছে। বলেছিল, রহস্যও নাকি ওখানে আছে। রহস্যকে ঘিরে যে রহস্য সেটাও আছে কি? শিশ্বি-নগর থেকে একটা কাঠবেড়ালী বেরিয়ে অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছে কেন। রহস্যটার কথা ও জানে না কি! ওর চোখে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে, যেন রহস্যটা ওর কাছ থেকে আমি ছিনিয়ে কেড়ে নেব। টপ করে লুকিয়ে পড়ল আবার। কা কা করে দুটো কাক উড়ে গেল ঈশান কোণ লক্ষ করে। এ সবের অর্থ কি? এর অর্থ, রহস্য আছে—চিরকাল থাকবে। রহস্যটাকে ঘিরে যে রহস্য তা-ও থাকবে চিরকাল। তার রং বদলাবে খালি, চেহারাও বদলাবে!

তার ফোটো তুলে কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যাবে না তাকে কোনদিন। চুল পুড়ে গিয়েছিল সেটাও সত্য। কাল তার যে বেণীরূপ দেখলাম তা-ও তো মিথ্যে নয়। রহস্য কাল তার মুখ দেখাতে চায়নি, যে ওজুহাত দেখাল আমি জানি সেটা ঠিক নয়। তাঁর মুখ পুড়েছিল কিন্তু তার পোড়ামুখ আর নেই, আবার নূতন মুখ হয়েছে তার। কিন্তু সে মুখ দেখাতে চায় না। লাল রুমালটা দেখাল খালি। অভিমান। দুর্জয় অভিমান। মনে পড়ল বাল্যসঙ্গিনী টিপুকে। প্রায়ই তার সঙ্গে ঝগড়া হতো। প্রায়ই সে থুতনির উপর বুড়ো আঙুল তিনবার ঘষে মাথা নেড়ে নেড়ে বলত—তোর সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি। তারপর ঝাঁকড়া-চুল-ভরা মাথা নেড়ে ছুটে চলে যেত। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারত না দূরে। একটু পরেই আবার এসে আমার কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করত। আমি ছুটে গিয়ে তখন ধরে ফেলতুম তাকে। তার মুখের কাছে মুখ এনে বলতাম—বলো তো ভাই—ডাব। সে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলত—ডাব। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতুম—তোর সঙ্গে ভাব। আর ভাব হয়ে যেত। আজকাল অত সহজে হয় না। আজকাল সব যেন কেমন—"

লেখা থামিয়ে চুপ করে বসে রইলেন সুভদ্র সেন। এর পর কি লিখবেন, কি লিখলে তাঁর মনের ভাবটা ঠিক ফুটবে তা তিনি ভেবে পেলেন না। মনে হলো বাস্তব-কল্পনা-ভাব-অভাব-প্রেম-অপ্রেম সমস্ত জট পাকিয়ে গেছে যেন। অনড় করে দিয়েছে তাঁর মনকে। পরস্পরবিরোধী দুটো উপমা মনে জাগল। একবার মনে হলো লোহার জ্যাকেট পরে একটা লোহার ঘরে বন্দী হয়ে আছেন তিনি। তারপর মনে হলো, না, বিরাট একটা তাসের প্রাসাদের মাঝখানে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে তাঁকে। একটু নড়লেই সব হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। খানিকক্ষণ বসে রইলেন অন্যমনস্ক হয়ে। তারপর সাদা পাতায় 'মেঘ' কথাটাকে লিখতে লাগলেন। 'মে'-টাকে লিখলেন খুব বড় অক্ষরে। তার পেটের পুঁটুলিটার উপর দুটো চোখ আঁকলেন। অদ্ভুত দেখাতে লাগল। তারপর 'ঘ'টা লিখলেন খুব ছোট করে। মনে হতে লাগল 'ঘ' যেন 'ম'-য়ের কাঁধের উপর উঠে বসেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন লেখাটার দিকে। মুচকি হাসির আভা ফুটল ঠোঁটে, কবিতাও জাগল মনে।

'ঘ'-এর ভারে ক্ষুব্ধ 'ম' আর্তনাদ ছাড়ে।
দ্বীপের সেই বৃদ্ধ যেন সিন্দাবাদ-ঘাড়ে।···

ভাবছিলেন আরও খানিকটা লিখবেন, মনে হচ্ছিল কল্পনার আবীরে মেঘ যেন রাঙা হয়ে উঠছে। কিন্তু হলো না। শব্দের আবীর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, সুরের আবীর। মহুয়া ডাক দিল।

"দাদু, আঙুরের পায়েস হয়ে গেছে। তুমি এসো—"

আবীরে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন সুভদ্র সেন। অতীত থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটা রঙের দিন। বহু পিচকিরির মুখ থেকে ছুটে এল রঙের ফোয়ারা, একটা শাড়ির চওড়া লাল পাড় আর একটা এলোমেলো আবীর-রাঙা বেণীও চকিতে এল আর মিলিয়ে গেল। তারপর উচ্চকণ্ঠের এক বলিষ্ঠ হাসি—'ধরেছি, ধরেছি—এইবার ?' ইন্দ্রের হাসি। 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে'—চীৎকার করছে অহল্যা। ইন্দ্র-অহল্যা ? না, শেখর-রহস্য ? না—না—না—না—মানব না একথা। মানব না, মানব না, মানব না। সুভদ্র সেনের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল। শেষ হয়ে গেল

রঙের খেলা। সন্দেহের কালো জগদ্দল পাথরটা এর পর মূর্ত হলো সামনে। দু'হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলেন সেটাকে সুভদ্র সেন। না, না, মানব না, কিছুতেই মানব না তোমাকে। সরে যাও—সরে যাও। অজানা প্রেক্ষাগৃহে আবার হাততালি দিয়ে উঠল অসংখ্য লোক। কে যেন আবার তীক্ষ্নকণ্ঠে চীৎকার করছে, আংকোর—আংকোর—আংকোর—।

"আচ্ছা দাদু—কি কাণ্ড তোমার—মঙ্গলময় তোমার জন্যে বসে আছে যে—চল—চল—"

"ও, মঙ্গলময় এসেছে বুঝি। তাই আঙুরের পায়েস। বুঝেছি—"

"মঙ্গলময় মোটেই পায়েস ভালোবাসে না—"

"মঙ্গলময় কি ভালোবাসে, কাকে ভালোবাসে সব জানি। কতটুকু বাসে তা-ও অজানা নয়। কিন্তু আমি এ টা কথা ভাবছি—"

"কি ভাবছ—"

"গাঁদা ফুলের মালা হয়তো বাঁশের ডগায় মানাতো। কিন্তু ভায়োলেট ফুলের গোছা কি মানাবে, লোকটা বড্ড বেশী লম্বা। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিসনি—"

"আমি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি। ওঠ তুমি।"

মহুয়ার কণ্ঠে ধমকের সুর ফুটে উঠল। সুভদ্র সেনের মনে হলো ধমক নয়, গমক।

"সত্যি বলছিস ?"

কাঙালের মতো চাইলেন তার দিকে।

"কি করছ দাদু, ওঠ না—"

হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে মহুয়া।

সুভদ্র সেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন হলদে বাড়িটার দিকে। দেখতে পেলেন দোতলার জানলা ফাঁক করে কে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি সে দিকে চাইতেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার কে যেন তাঁর কানে কানে বলে গেল, "কথাটা কাউকে যেন বলো না—"। দেওয়াল ঘেঁষে যে করবী গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তাতে একটা সাড়া জাগল কি ? করবী ফুলগুলো পরস্পরের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে কেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হলো। একেবারে অন্য কথা।

"পায়েসে কোকোর ফ্লেভার দিয়েছিস তো!"

"দিয়েছি। মঙ্গলময় খেজুর গুড়ের ফ্লেভার পছন্দ করে। কিন্তু তোমাকে তো চিনি, কোকোই দিয়েছি—"

"আমাকে ভালবাসিস তাহলে ?"

মহুয়া নাক-মুখ কুঁচকে চাইলে তাঁর দিকে। তার নীচের পুরু কালো ঠোঁটটা দেখে একটা নূতন উপমা মনে হলো সুভদ্র সেনের। টুসটুসে পাকা কালো জাম যেন। ঠিক এই সময় একটা খঞ্জন পাখি এসে বসল সামনের দেওয়ালে। তার পুচ্ছ আন্দোলনের ছন্দে সুভদ্র সেনের ভবিষ্যৎ যেন কাঁপতে লাগল।

খেতে বসে কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর। পায়েসে তো কোকোর ফ্লেভার নেই ; এ তো খেজুরে গুড়ের পায়েস। মঙ্গলময় কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—বাঃ কোকোর ফ্লেভার তো চমৎকার হয়েছে। আগে কখনও খাইনি। মহুয়া মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

ছয়

আমরা সর্বদা কত কথা বলছি কত লোকে। কথার হরির লুঠ দিতে দিতে চলেছি যেন আমরা সারাজীবন। কোন কথা কাকে বললাম, কখন বললাম, কেন বললাম, তা আমাদের মনে থাকে না। গাছ অজস্র বীজ ছড়িয়ে দেয়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। কোন বীজ কোথায় অংকুরিত হলো তার সে খবর রাখে না। মঙ্গলময়ই একদিন মহুয়াকে ব্রাহ্মমুহূর্তের কথা বলেছিল। বলেছিল, "পরম সত্য ভিড়ের মধ্যেও আছে, নির্জনতার মধ্যেও আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাকে চেনা যায় না, অনেক ছদ্মবেশী সত্য তাকে আড়াল করে থাকে। কিন্তু নির্জনতার মধ্যে ভিড়ের গোলমাল নেই। তুমি যদি নিজের ছদ্মবেশটা খুলতে পার তাহলেই পরম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারবে।"

"পরম সত্য কি"—প্রশ্ন করেছিল মহুয়া।

"সেটা তো তুমিই জান, দেখলেই চিনতে পারবে।"

"তাই না কি—"

স্বপ্ন নেমে এসেছিল মহুয়ার চোখে।

"কিন্তু নির্জনতা কোথায় পাব ?"

"তার জন্যে শ্মশানে, অরণ্যে বা পাহাড়ে যেতে হবে না। তা তোমার শোবার ঘরেই পাবে ব্রাহ্মমুহূর্তে। রাত দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত নির্জনতা রোজ তোমার অপেক্ষায় বসে থাকে। সে সময় উঠতে পারলেই পাবে"—কথাটা মঙ্গলময় শেষ করতে পারেনি। কারণ ঠিক সেই সময়ই ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল সে ক্লাসে। তারপর ভুলে গিয়েছিল সব। মহুয়ার তখন ক্লাস ছিল না, সে একা বসেছিল কমন-রুমে। সাগর-পারে অজানা দেশের খবর পেয়ে কলম্বাসের মনে যে রঙিন উত্তেজনা জেগেছিল, ভাস্কো-ডা-গামা যে উত্তেজনা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা মহাসমুদ্রে, সেই ধরনের উত্তেজনার 'ডায়নামো' হয়ে সেদিন বসেছিল মহুয়া। ঠিক সেই সময় সেদিন মোহিত সোম এসেছিল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি। মহুয়ার ছাত্র। এসে কুণ্ঠিত মুখে বলেছিল—"মহুয়াদি, আজও একটা কবিতা লিখে এনেছি। একটু দেখে দেবেন ? সময় হবে কি ?"

"দাও—"

হাত বাড়িয়ে কবিতাটা নিয়েছিল মহুয়া। পড়বার আগেই সে জানত কি লেখা আছে ওতে। জানত ওর কবিতায় অনন্যতা নেই, ছন্দ নেই, কিন্তু যা আছে তা-ও তুচ্ছ করবার মতো নয়। আছে পূজা, আছে অর্ঘ্য। মোহিত সোম তার পূজারী। তার পূজায় কোনও ফাঁকি নেই। সেদিন কিন্তু সে যে কবিতাটি লিখে এনেছিল তার গোড়াটা পড়েই চমকে উঠেছিল মহুয়া।

নির্জন নিঃশব্দতা মোর মনে কহে কথা
অবাঙ্‌ময়ী হলো বাগ্‌দেবী,
নির্দল হলো শতদল

অন্ধকার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে দেখি
আলো-হংস করে ঝলমল…

রোমাঞ্চিত হয়ে বসেছিল সে খানিকক্ষণ। হয়তো তার বাহ্যজ্ঞান—যে জ্ঞানের জোরে আমরা লৌকিকতা করি—লোপ পেয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। কারণ সে যখন বলল, 'চমৎকার হয়েছে' তখন মোহিত সেখানে ছিল না। অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল সে। চলে গিয়েছিল, কিন্তু নির্জনতার খবরটা রেখে গিয়েছিল। নির্জনতার মোহ দুর্নিবার আকর্ষণে সেই দিন থেকেই টেনেছিল তাকে। সেইদিন রাত্রেই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিল সে। সেই দিনই তার মনে পড়েছিল যে, পাশের বাড়ির শরীর-সর্বস্ব মিস্টার চ্যাটার্জি—যাঁর মনোযোগের গুলতি থেকে প্রায়ই দু' একটা গুলি আঘাত করে মহুয়াকে এসে—কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁর উপর মহুয়া রাগ করতে পারেনি —(অমন একটা বলিষ্ঠ সুপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টির নীরব অথচ মুখর, প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্ট, পাশব অথচ লোভনীয় নিবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনি মহুয়া, সত্যিই পারেনি, এ জন্য নিজেকে সে ধিক্কার দিয়েছে, তবু পারেনি) —এই মিস্টার চ্যাটার্জিও তাকে নির্জনতার কথা বলেছিলেন একদিন। বলেছিলেন —"চলুন না মহুয়া দেবী, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। কি যে রোজ কলেজ থেকে ফিরে ঘুচ করে ঘরে ঢুকে পড়েন—।" অবাক মহুয়া প্রশ্ন করেছিল—"কোথা যাবেন ?" "মাঠে যাই চলুন। নির্জনে আপনাকে দুটো কথা বলব।" মহুয়া যায়নি। না, মহুয়া বাইরে কোনরকম প্রশ্রয় দেয়নি তাঁকে। কিন্তু মন থেকেও মুছে ফেলতে পারেনি। অনিন্দ্যকান্তি পশুটা মাঝে মাঝে সত্যিই প্রলুব্ধ করে তাকে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিস্টার চ্যাটার্জিও নির্জনতার কথা বলেছিলেন একদিন।

প্রথম যেদিন অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠেছিল, প্রথম যেদিন ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল মহুয়া, সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে আগে অ্যালার্মটি বন্ধ করে দিয়েছিল সে, মনে হয়েছিল ঘড়িটা খুনী, নির্জনতাকে খুন করছে সে। ঘড়ির শব্দ যখন থেমে গেল তখন নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর শুনতে পেল নির্জনতার ডাক। "আমি বাইরে আছি, বাইরে এসো। এসো অন্ধকারের সুনিশ্চয়তার মধ্যে, এসো তারা-ভরা আকাশের তলায়।" প্রথম দিনই বেরিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল ওই আঁকাবাঁকা পথটা—যেটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীর ঘাটের দিকে। সেই দিনই দেখতে পেয়েছিল দূরের মাঠে সেই ঝোপটা, আর তার পাশে একটু আলো। কিন্তু সেখানে সে আজও পৌঁছতে পারেনি। মনে হয় যেন জন্ম-জন্মান্তর হাঁটছে কিন্তু পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু শালিম ? শালিমের জন্যে সে তো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ও যে একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল সে দিন।

নিজের চারদিকে কংক্রীটের দেওয়াল তুলেছে মহুয়া। কারাগারে বন্দী করেছে নিজেকে। মঙ্গলময়ের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। আমল দেয়নি মোহিত সোমকে। সেদিন মিস্টার চ্যাটার্জি ছোট্ট একটু শিস দিয়েছিলেন, সেদিকে ফিরে তাকায়নি। অ্যালার্ম দেয়নি ঘড়িতে। সুভদ্র সেন রসিকতা করেছিলেন—"তোর নাম মহুয়া না হয়ে মোয়া হলে বেশী মানাত। তুই মিষ্টি কিন্তু মোয়ার মতো শক্ত। দাঁত বসাতে পারছি না। মহুয়ার কোমলতা তোর নেই।" কোন জবাব দেয়নি সে। কংক্রীটের

দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। একনায়কত্বের কঠিন আইন জারি করেছিল নিজের উপর। সেকালের যে বিবেক মরেও মরে না, সেই বিবেক হঠাৎ ডিকটেটার হয়ে উঠেছিল তার জীবনে। ঠিক করেছিল স্বপ্নকে আর সে প্রশ্রয় দেবে না। সেকালের আদর্শকে মেনে নিয়ে ভালোভাবে চলবে সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল মহুয়া। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেয়নি, তবু ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটো। বাইরে থম থম করছে নীরব নির্জনতা। কি একটা নিশ্চল যেন সচল হবার চেষ্টা করছে।

"এসো, এসো, বাইরে এসো। তোমার জন্য কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি। আমাকে এসে আবিষ্কার কর তুমি। তোমার আলো এসে আমার অন্ধকারে-ঢাকা পদ্মকে প্রস্ফুটিত করুক। এসো, এসো, এসো—"

মহুয়া আর থাকতে পারল না। বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে দেখল শালিম দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার আকাশের নীচে গাঢ়তর অন্ধকারের স্তম্ভ যেন একটা।

মহুয়া যখন তার পাশে এসে দাঁড়াল তখনও স্তম্ভ স্তম্ভিত হয়েই রইল। কোন কথা বলল না। কিন্তু তারপর যা হলো তা যেন সত্যি নয়। গল্প।

তিরি নদী বইছে। বিরাট নদী। কালো জলে অসংখ্য ঢেউ। ছোট ছোট ঢেউ। রোমাঞ্চিত হয়ে আছে তিরি, কেন কে জানে। মনে হলো অকারণেই। রোমাঞ্চিত হওয়াই যেন ওর স্বভাব। দুই তীরে শাল গাছের গভীর জঙ্গল। লেবাং বন। বনে একটা মর্মর ধ্বনি কাঁপছে। হঠাৎ বোঝা গেল তিরি নদী রোমাঞ্চিত কেন। প্রকাণ্ড একটা বাঘ সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছে। তার পিছনে ভেসে উঠেছে একটা কুমীর। বাঘ প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে, কিন্তু তিরি নদী প্রকাণ্ড, তাড়াতাড়ি পার হওয়া যাবে না। কুমীর নিঃশব্দ সুনিশ্চিত গতিতে অনুসরণ করছে তার শিকারকে। সে জানে ধরবেই ওকে, যদি না—। কিন্তু সেই 'যদি না'-টাই হয়ে গেল। শাল গাছের ফাঁকে দেখা গেল ঝাঁকড়া-চুলো মেয়েটাকে, সে বাঘ আর কুমীরের দিকে চেয়েই তরতর করে উঠে গেল একটা শাল গাছে। একটু পরেই একটা তীক্ষ্ম চীৎকার বিদীর্ণ করে দিল নৈশ অন্ধকারকে। কুমীর আর বাঘ দুটোই যেন তাদের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল এই চীৎকার শুনে। একটু পরেই শালবনের ভিতর থেকে বেরুল শিরস্ত্রাণধারী অসংখ্য বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রত্যেকেরই হাতে তীর-ধনুক। ধারা-বর্ষণের মতো অসংখ্য তীর বর্ষিত হতে লাগল বাঘ আর কুমীরের উপর। গর্জন করে উঠল বাঘটা। জলের তলায় আত্মগোপন করল কুমীর। তীরের ধারা-বর্ষণ সমানে চলতে লাগল তবু। আবার সেই গগন-ভেদী চীৎকার শোনা গেল, তারপর ঝপাং করে একটা শব্দ। তীরের ধারা-বর্ষণ থেমে গেল, জ্বলে উঠল অসংখ্য মশাল। মশালের আলোয় দেখা গেল, মরা বাঘটা ভাসছে, আর সেটাকে ধরে ভাসছে সেই মেয়েটা। তার একটা হাত জলে ডোবানো। একটু পরেই সে তীরে উঠল। কয়েকটি পুরুষ এগিয়ে এসে টেনে তুলল বাঘটাকে। দেখা গেল, মেয়েটির যে হাতটা জলে-ডোবানো ছিল সেই হাতে সে ধরে আছে কুমীরের ল্যাজটা। কুমীরটাকে ডাঙায় টেনে তুলল সে। তখনও মরেনি সেটা। বিরাট হাঁ করে তেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত মশাল তার মুখে পুরে দিলে একজন।

আরও অনেক লোক বেরুল শালবনের ভিতর থেকে। তারা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল কুমীরটাকে আর বাঘটাকে। তখন মেয়েটা হাসিমুখে হাত তুলে দেখাল। যে হাত দিয়ে সে কুমীরের ল্যাজটা ধরেছিল, দেখা গেল, সেটা রক্তাক্ত। অনেকগুলো মাথা ঝুঁকে এগিয়ে এল, প্রত্যেকের কপালে রক্ত মাখিয়ে দিতে লাগল মেয়েটা। তারপর উঠল একটা তুমুল জয়ধ্বনি। মিলিয়ে গেল তিরি নদী, মিলিয়ে গেল লেবাং বন। কেবল লেবাং বনের মর্মর ধ্বনিতে কাঁপতে লাগল নিবিড় অন্ধকার। ক্রমশ তাও থেমে গেল।

মহুয়ার মনে হলো, 'স্বপ্ন দেখলাম না কি!' সামনের আকাশে জ্বল জ্বল করছিল শুকতারা। সেই অজানা ফুলের গন্ধটা—যা তার পিয়াল ফুলের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল সেদিন—আবার ভেসে এল কোথা থেকে। বলে গেল, 'তুমি অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলে, তাই শালিম চলে গেছে। বলে গেছে, আবার আসবে, বার বার আসবে।'

মহুয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ঘন অন্ধকারের যে স্তম্ভটা তার পাশে মূর্ত হয়েছিল, সেটা আর নেই। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ সে দূরের মাঠটা দেখতে পেল আবার। দেখল সেখানে সেই ঝোপটাও রয়েছে। তার আড়ালে আলোও জ্বলছে একটা। কিসের ঝোপ? কিসের আলো? এ প্রশ্ন বার বার জেগেছে তার মনে। উত্তরও পেয়েছে—সেইটেই তো দেখতে হবে। আবার চলতে লাগল মহুয়া। চলতেই লাগল। ক্রমাগত চলতে লাগল। আশপাশে উড়তে লাগল জোনাকির দল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। শুকতারা নেই। একটা কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল সেটা। কিন্তু এ কথাটা মানতে চাইল না তার মন। তার মনে হলো ওই জোনাকিগুলোই শুকতারা। শুকতারাই নেমে এসেছে তার কাছে। অসংখ্য জোনাকি হয়ে তাকে পথ দেখাচ্ছে। পথ—হ্যাঁ পথ—তারই স্বপ্ন-সত্তা যেন—বিস্তৃত হয়ে আছে পথরূপে—তার প্রান্তে একটা ঝোপ, ঝোপের পাশে একটু আলো—সেটাকে ঘিরে আছে অন্ধকার আর কুয়াশার অনিশ্চয়তা। ওখানে কি সে পৌঁছতে পারবে? কিন্তু পৌঁছতে হবেই যে।

মহুয়া দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগল।

"মহুয়াদি, আমার হাতটা একটু ধর। বড্ড ভয় করছে—"

সেই বাচ্চা ছেলে বাবুলটা তার সঙ্গ নিয়েছে নাকি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মহুয়া—কেউ নেই। কিন্তু চলা বন্ধ হয়ে গেল তার। মনে হলো রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড যে খাদটা আছে, সেখানে পড়ে গেল না তো ছেলেটা। ফিরে এল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে খাদটার পাশে। অনেকদিন আগে ওই খাদটার ভিতর একটা ভাঙা লাল কাচের টুকরো দেখেছিল সে দিনের বেলায়। তাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত একটা লাল রঙের ফোয়ারা উঠেছিল আকাশের দিকে। এই অন্ধকারে সেই ফোয়ারাটা আবার দেখতে পেল মহুয়া। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। কোন আগ্নেয়গিরির আগুন ওটা? কোন রক্তের ফোয়ারা? বাবুলের সঙ্গে কি ওর···তীক্ষ্ন শব্দে চীৎকার করে উড়ে গেল একটা পেঁচা। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তন্দ্রা, সুর কেটে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অন্ধকারের মোহ। ভয় ভাবনা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভিড় করে এল নির্জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে। সে হঠাৎ

আবিষ্কার করল, সে এক পা-ও চলেনি। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝাঁক জোনাকি কেবল তাকে ঘিরে উৎসবে মেতেছে। অন্ধকার তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে। যে স্বপ্নের লীলা-উল্লাসে সে এতক্ষণ দুলছিল, যাকে গতি বলে ভুল করছিল, তা বাইরে নেই। হঠাৎ তার শীত করতে লাগল। গরমের কাপড় পরে আসেনি। ফিরতে হলো বাড়ির দিকে। সেই আঁকাবাঁকা পথটি আবার দেখতে পেল, গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেছে। সাপের মতো। কিন্তু সাপ নয়। পথ। স্বপ্ন-সরণি নয়, সত্যিকার বাস্তব পথ, ওই পথ গঙ্গার ঘাটের দিকে গেছে। প্রত্যহ কত লোক ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। কেউ যায় স্নান করতে, কেউ যায় পার হতে। খেয়া-পারাপারের নৌকোও আছে ওখানে একটা। কিন্তু সাগরের সন্ধানে কেউ যায় কি ওখানে? মহুয়ার মনে হলো, গঙ্গাই তো সাগরে মিশেছে—এ সম্বন্ধে কেউ কি সচেতন? হঠাৎ মনে হলো, তাঁর নদীর খবর কি গঙ্গা জানে? লেবাং বনের? সেই গন্ধটা—যাকে তার পিয়াল ফুলের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল—সেই গন্ধটা ভেসে এল আবার। বলল—জানে জানে। গঙ্গা সব জানে।

একসঙ্গে ডেকে উঠল অনেকগুলো পাখি। রাত্রির শেষ যামে ঘুম ভেঙেছে তাদের।

সাত

হলদে বাড়িটা কাছে সরে এসে আবার দূরে চলে গেল কেন, এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সুভদ্র সেন সেদিন ছাতের আলসের উপর দু'টি মোহনচূড়া পাখির দিকে প্রত্যাশা ভরে চেয়ে ছিলেন, যেন তারাই সমাধান করে দেবে এই শক্ত সমস্যাটার। মোহনচূড়া পাখির ইংরেজী নাম হুপো, তাদের মাথার চূড়াটি জাপানী পাখার মতো খুলে যায়, উপ্-উপ্-উপ্ করে তারা কথা কয় মাথা নেড়ে নেড়ে, হরিণ আর জেব্রার রং তাদের গায়ে, লম্বা কালো ঠোঁট গাঁইতির মতো, চোখ দু'টি যেন ছোট ছোট কালো মুক্তো। আলসের উপর কত ভঙ্গীতেই তারা প্রেম নিবেদন করছে পরস্পরকে। খুব কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, মাথার চূড়াটি বার বার খুলছে আর বন্ধ করছে। নিজেদের নিয়েই মত্ত ওরা। সুভদ্র সেনের সমস্যা ওরা কি করে সমাধান করবে এ যাঁরা ভাবছেন তাঁরা সুভদ্র সেনের কল্পনার দৌড়ের খবর রাখেন না। মোহনচূড়ার ঠোঁট দেখে তাঁর মনে পড়ল রমেন সিংঘিকে। ওই ঠোঁটের মতন নাক ছিল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ছেয়ে পঙ্গপাল এসে ছেয়ে ফেলল তাঁর চেতনার দিগন্ত। মনে পড়ল অসহযোগ আন্দোলনের কথা। তিনিও অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একদিন ওই রমেন সিংঘির পাল্লায় পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন একদিন! এখন মহাত্মা গান্ধী কত দূরে সরে গেছেন। যারা খুব কাছে আসে, তারাই দূরে সরে যায়—এই বোধ হয় নিয়ম। সুভদ্র সেন দেখলেন, মোহনচূড়া পাখি দুটো দূরে সরে গেছে

কিন্তু পরস্পরের দিকে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে চলেছে—উপ্-উপ্-উপ্, উপ্-উপ্-উপ্। সুভদ্র সেন চাইলেন হলদে বাড়িটার দিকে। ওটাও কিছু বলছে নাকি তাঁকে? বলছে নিশ্চয়, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল শেখর চাটুজ্যেকে। রহস্যের সমবয়সী ছিল সে। সে-ও কলেজ ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে। রমেন সিংঘির আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেস বটে, কিন্তু নিজেই নেতা হয়ে উঠেছিলেন পরে। তখন একটা স্কুলে মাস্টারি করতেন। চাকরি ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। কাজ ছিল মদের দোকানে পিকেটিং করা, আর বিলিতী কাপড় পোড়ানো। সহকারী ছিল শেখর চাটুজ্যে···পঙ্গপাল···পঙ্গপাল···পঙ্গপাল···ধোঁয়া···ইনকিলাব জিন্দাবাদ··· মহাত্মা গান্ধীর জয়···অম্বর গুপ্ত···উকিল অম্বর গুপ্ত—বন্ধু ছিল তাঁর—বন্ধু? হ্যাঁ, পরিচিত লোককেই তো বন্ধু বলে মনে করি আমরা।—বন্ধু? হা-হা-হা, মনের ভিতর অট্টহাস্য করে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু। সুভদ্র সেন হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন—উপ্ উপ্ উপ্—ডেকে চলেছে মোহনচূড়া দুটো—তার সঙ্গে দুলছে হলদে বাড়ির খোলা জানলার কপাট একটা। হাওয়া নেই তবু দুলছে। সুভদ্র সেন বুঝলেন, হলদে বাড়িটা তাঁর সঙ্গে কথা কইছে—তার কথা উপ্ উপ্ উপ্ নয়, তার কথা ওই কপাটের দোলন। অনেকক্ষণ প্রত্যাশা ভরে দেখতে লাগলেন—দুলছে, কেবলই দুলছে কপাটটা। তারপর বুঝতে পারলেন। রহস্যও তো একদিন দুলেছিল সন্দেহ-দোলায়, যখন অম্বর গুপ্ত বলেছিল—তোমার বউকেও নামাও এই আন্দোলনে। জওহরলাল নেহরুর মা, বউ এই আন্দোলনে নেমেছেন। বাসন্তী দেবী নেমেছেন— তুমিই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? আমার বউ নেই, থাকলে তাকেও নামাতাম আমি। আবার তাঁর মনের মধ্যে শোনা গেল মিসেস পূর্ণেন্দুর অট্টহাসি। তারপর একটি মেয়ের পিছন দিকটা দেখতে পেলেন তিনি। খদ্দরের শাড়ি পরে হাতে একটা খদ্দরের থলি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল। মিসেস পূর্ণেন্দু? না রহস্য? দুজনেই তো খদ্দরের শাড়ি পরেছিল। মিস্টার পূর্ণেন্দুই ছিল মিসেস পূর্ণেন্দুর খদ্দরের শাড়ি, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল তাকে। আর রহস্য তো সত্যিকার খদ্দর পরেছিল, তার পরতে খুব কষ্ট হতো, তবু তাঁর অনুরোধে (অনুরোধে, না হুকুমে?) পরেছিল সে খুব মোটা একটা খদ্দরের শাড়ি, বাদামী রঙের শাড়িটা, লালপাড়। একটুও মানায়নি। তবু পরেছিল আর তবু ওই পোশাকই মুগ্ধ করেছিল অনেককে·· তিনি যেন দেখতে পেলেন ওই শাড়িটা পরে রহস্য মদের দোকানে পিকেটিং করছে, শেখর চাটুজ্যে তার পেছনে রয়েছে। তাঁর বন্ধু অম্বর গুপ্ত জেলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন রোজ·· হ্যাঁ, তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন অম্বরই রোজ আসত তাঁর কাছে—শহরের সব খবর কুড়িয়ে আনত। তার একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ—'তোমার বউই দেশের অন্ধকার দূর করবে। দশ দিক আলো করে বেড়াচ্ছে···।' উপ্ উপ্ উপ্—উপ্ উপ্ উপ্—শব্দের এক বিচিত্র জাল বুনে চলেছে মোহনচূড়া দুটো। দূরে একটা বাবলাগাছকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্বর্ণলতা, তাতে পড়েছে মেঘ চাপা সূর্যের কিরণ, মনে হচ্ছে বিরাট একটা সোনালী ব্যাঙের ছাতা যেন ছত্রপতি হতে চাইছে। তারপর? তারপর? তারপর? কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না সুভদ্র সেন। ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ-এর পর আবার ঢেউ, তারপর আবার। সব একরকম।

হঠাৎ খাতাটা বার করে লিখলেন ঃ কোন কিছুর সমাধান কখনও হয়নি, কখনও হবে না। বিধাতা তাঁর বিরাট রহস্যলোকে অসংখ্য রহস্যই সৃষ্টি করেছেন কেবল। সে রহস্য যখন রূপান্তরিত হয় তখন তাকে সমাধান বলব না, আর একটা রহস্য বলব। সমাধান হলেই তো খেলা শেষ হয়ে গেল। বিধাতা খেলা শেষ করতে চান না। তাই কোনও প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন না। তাঁর পর্বত, তাঁর আকাশ, সমুদ্র নির্বাক। ভাবটা যেন, আমি উত্তর দেব কেন, উত্তরটা তুমিই আন্দাজ কর। আন্দাজ? কোটি কোটি বছরের আন্দাজ পাষাণে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, উদ্ভাশিত হয়ে আছে আকাশের লক্ষ লক্ষ সূর্য-নক্ষত্রে, লক্ষ লক্ষ লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ অক্ষরের কারাগারে, কিন্তু—। সহসা সেই বেণীটা—যে বেণীটা পুড়েও পোড়েনি···। সেইটে দেখতে পেলেন যেন সহসা। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা হারিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এল আবার নূতন রূপে।

"দাদু, কফি খাবে? আমি খাচ্ছি—"

"খাবো—খাবো—"

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন সুভদ্র সেন। হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। হেঁট হয়ে তুলতে গিয়ে দেখলেন তাঁর টেবিলের পায়াতে অদ্ভুত সুন্দর সবুজ ছোট্ট একটি প্রজাপতি চুপ করে বসে আছে। এত গোলমালেও বিচলিত হয়নি। তপস্যা করছে নাকি। কি প্রগাঢ় তপস্যা। মহুয়ার ডাকেও বিচলিত হয় না। 'দশ দিক আলো করে বেড়াচ্ছে'—অম্বর গুপ্তর কথাটা আবার শুনতে পেলেন, আবার দেখতে পেলেন তার মুখের ব্যঙ্গ-কুঞ্চিত মুচকি হাসিটা। হঠাৎ মনে হলো পুরাকালের শূলে-দেওয়া শাস্তিটা যদি এখনও প্রচলিত থাকত আর আমি যদি বিচারক হতাম, অম্বর গুপ্তকে আমি শূলে দিতাম। তারপর মনে পড়ল তা অসম্ভব হতো, কারণ অম্বর গুপ্ত মারা গেছেন কয়েক বছর আগে।

"দাদু এসো-না, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

ছোট্ট প্রজাপতিটার এইবার তপোভঙ্গ হলো। হঠাৎ উড়ল সেটা। সুভদ্র সেন দেখতে পেলেন তার ডানার নীচের দিকটা আশ্চর্য লাল। এই আশ্চর্য লাল রংটাকে এতক্ষণ সবুজের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল ও। 'তোমার রহস্যও কি রাখেনি?' মিসেস পূর্ণেন্দু বলে গেলেন কানে কানে ফিসফিস করে। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন সুভদ্র সেন। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। মহুয়া নিজেই চলে আসছে। হাতে একটা ট্রে আর তার উপর কফির সরঞ্জাম।

"নাও—"

"কফি তো আনলি, কি ফি নিবি—"

"বত্রিশ টাকা।"

"তার মানে। তুই টাকায় ফি নিবি। তুই যে এত বড় বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী তা তো জানতাম না।"

"আমি নেব না। নেবে ডাক্তার বোস। তাঁকে আমি 'কল' দিয়েছি। মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ব্রোমাইড মিকশ্চার খেয়ে তোমার কিছু হচ্ছে না। পাগলামি আরও দিন দিন বাড়ছে যেন। আমারও কি যেন হয়েছে, ঠিক রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যায় রোজ। তারপর আর বিছানায় থাকতে পারি না, বাইরে চলে যেতে হয়। তাই ডাক্তার বোসকে ডেকেছি। উনি একজন মেন্টাল ডিজিজ স্পেশ্যালিস্ট।"

"সর্বনাশ। কিন্তু এই সর্বনাশের মধ্যেও একটু আনন্দের সুর বাজিয়েছিস তুই।"

"সেটা আবার কি?"

"আমার নৌকোয় নিজেকেও তুলেছিস—"

তারপর দু'হাত তুলে মোটা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলেন—

"ডাক্তার বোস করবে কি আর এসে
ভেসে ভেসে
এক নৌকোয় আমরা দু'জন যাব
জনম-জনমান্তরের দেশে।"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। ভেঙে পড়ল একটা ঝাড়লণ্ঠন।

"তোমার কবিতা দেখছি আরও জড়বাদী। বত্রিশ টাকার উল্লেখ শুনেই পট করে বেরিয়ে এল।"

"একটা কথা জানিস? অধিকাংশ কবিরা আর লেখকরা পয়সার জন্যে লেখেন—"

"জানি বই কি।"

"সত্যি ডাক্তার ডেকেছিস?"

"আমার মাথা হয়তো একটু খারাপ হয়েছে, কিন্তু অতটা খারাপ হয়নি। তবে ষোল টাকা খরচ করেছি। তাঁর চেম্বারে গিয়েছিলাম। তোমার কথা, আমার কথা, সব বললাম। তিনি একটা বিদ্ঘুটে নাম বললেন—স্কিজোফ্রেনিয়া। বললেন, এই মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে।"

"তুই কি বললি?"

"আমি একটু মুচকি হেসে চলে এলাম। তবে তোমার কবিতার 'ওই জনম-জনমান্তরের দেশে' লাইনটা শুনে মনে হচ্ছে, আমার জনম-জনমান্তরের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে কে একজন যেন আসতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে—জানি না এটা আমার মাথা-খারাপের লক্ষণ কিনা।"

"কে লোক?"

"শালিম।"

"সে আবার কে।"

"লিবাং বনে শালগাছের তলায় জন্ম হয়েছিল তার। আমার যেমন হয়েছিল মহুয়াগাছের তলায়। এই সূত্রে সে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করেছে।"

"কখন আসে সে?"

"আমি যখন রাত দুটোয় উঠে বেরিয়ে পড়ি, তখন মাঠে তার সঙ্গে দেখা হয়—"

"ডাক্তার না ডেকে ওঝা ডাক। তুই কোন ভূত-টুতের পাল্লায় পড়েছিস।"

"কিন্তু আমার ভয় করেনি এক দিনও।"

"ওইটে তো আরও ভয়ের কথা।"

"আমি যখন রোজ রাত দুটোর সময় বেরিয়ে যাই, তখন তুমি বুঝতে পার?"

"রোজ। তুই তো আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাস—"

"তোমার বুকের উপর দিয়ে।"

"হ্যাঁ। বাইরের অন্ধকারে আমার সমস্ত বুকটা যে পাতা থাকে।"

"তার মানে!"

"মনে হয় পৃথিবীতে যত অমানিশীথিনী এসেছিল তারা কেউ মরেনি, আমার বুকের ভিতর তারা বাসা বেঁধেছে। দিনের বেলা তারা ছোট্ট হয়ে গুটি পাকিয়ে থাকে, কিন্তু রাত্রে অন্ধকারে নামলে তারাও সব বেরিয়ে আসে, আর বাইরের অন্ধকারে মিশে যায়। তখন আমার ভিতরের অন্ধকার আর বাইরের অন্ধকার হয়ে যায় একাকার। অন্ধকারের বিরাট একটা অতলান্তিক সমুদ্র আর সেই সমুদ্রের উপর অন্ধকার জাহাজে দুলতে থাকে 'নি'—"

"নি?"

"হ্যাঁ, সুরসপ্তকের নিখাদ।"

"কফিটা খাও। মনে হচ্ছে শিজোফ্রেনিয়াই হয়েছে তোমার। কেমন হয়েছে কফি?"

"বলব না।"

"কেন?"

"অনির্বচনীয়কে 'চমৎকার' বা 'খাসা' বলে খেলো করতে পারব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, কফির কাপটা বড় ছোট।"

"আর এক কাপ নাও না। পটে আরও কফি আছে।"

মহুয়া আরও খানিকটা কফি ঢেলে দিলে তাঁকে।

"বেশী খেও না। এমনিতেই তো তোমার ঘুম হয় না।"

"অমনিতেও হবে না। ঘুম বোধ হয় ডিউটি ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেই ঘুমুচ্ছে। জানিস? ঘুম নামে একটা জায়গা আছে। পৃথিবীর যত ঘুম বোধ হয় সেইখানেই ঘুমুচ্ছে। তোরও তো রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ দুটোর সময় বেরিয়ে পড়িস।"

"তুমি তো আমাকে বারণ করনি এক দিনও—"

"না। আমার মতে মর্নিং ওয়াক করা ভালো।"

"মর্নিং ওয়াক ওকে বলো তুমি?"

"ইংরেজী মতে রাত বারোটার পরই মর্নিং হয়। আমাদের মতে ব্রাহ্মমুহূর্তে। সেই সময় অন্ধকার-নিমজ্জিত সমস্ত পৃথিবী দম বন্ধ করে একাগ্র চিত্তে আলোকে ডাকে। সে ডাক শোনা যায় না, তা অনুভব করতে হয়। করেছিস কোন দিন?"

"করেছি। রোজই করি। কিন্তু সেটা কি রকম তা যেন জানতে চেও না।"

"একটুও বলবি না! আভাসে একটু?"

"শুধু বলতে পারি, দূরে একটা মাঠে ছোট্ট একটা ঝোপ দেখা যায় আর তার পাশে একটু আলো। মাঝে মাঝে শালিম দেখা দেয়। আর মনে হয় হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি, ক্রমাগতই হেঁটে চলেছি, কিন্তু ওই ঝোপটার কাছে কিছুতেই পৌঁছতে পারছি না।"

"কোথায় সে ঝোপ?"

"দিনের বেলায় দেখেছি সে মাঠও নেই, ঝোপও নেই।"

"বুঝেছি—"

"কি বুঝেছ?"

"শিজোফ্রেনিয়া।"

পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। দেখা গেল চিঠির ভিতর একটা ফোটো রয়েছে। সুভদ্র যেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে পড়তে লাগলেন চিঠিখানা। তারপর খামে চিঠিখানা পুরে যখন চাইলেন মহুয়ার দিকে, তখন তাঁর দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

"কার চিঠি দাদু?"

"নাম দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করতে চাই না। নামটা মনেও নেই। চিঠিতেও ও তো নিজের নামের উল্লেখ করেনি। সুতরাং আপাতত ওকে অনামিকা বললে ক্ষতি নেই। চিঠিতে ও এমন একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে, যা আমি ভুলিনি, তাই তাকে চিনতে পারছি, যদিও নামের দ্বারা চিহ্নিত করতে পারছি না। নামটা আত্মগোপন করে আছে। যাক, নামেতে কি এসে যায়। ঘটনাটা কিন্তু ভারি ভালো। এরকম ভালো ভালো ঘটনার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় একটা চানাচুরওলা স্কুলে এসে চানাচুর ফেরি করত। চানাচুর নয়, যেন অমৃত। ওরকম চানাচুর আর খাইনি কখনও। তারও নামটা ভুলে গেছি। চেহারাটা মনে আছে। রাজপুত্রের মতো। গায়ে পা পর্যন্ত লম্বা ঝুল-ওলা একটা পাঞ্জাবি, মাথায় গোলাপী রঙের পাগড়ি, চোখে নীল চশমা, আর পায়ে নূপুর, রূপকথালোকের জীব। আমাদের স্কুলে আসত মাঝে মাঝে। এ মেয়েটিও রূপকথালোকের, অনেক দিন আগে এসেছিল। রোজ সকালে আমার পায়ে এসে এক আঁজলা ফুল দিত। কোনও দিন যুঁই, কোনও দিন বকুল, কোনও দিন চাঁপা, কোনও দিন বেলি। সেই কথাটাই লিখেছে চিঠিতে। আর লিখেছে, ও কিছু দিন পরে তেহরান চলে যাচ্ছে। ওর এখানকার বাড়িটা খালি পড়ে থাকবে। লিখেছে, আমি গিয়ে ওর বাড়িতে কিছু দিন যদি থাকি তা হলে ও কৃতার্থ হবে। কলকাতার একটা ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে খবর দিলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাবি? চল না, সামনেই তো তোর পুজোর ছুটি।"

"মেয়েটি নিজের ফোটো পাঠিয়েছে নাকি।"

"না। অত বেরসিক সে নয়—"

"তবে কিসের ফোটো ওটা?"

"ওর বাড়ির।"

"দেখি।"

ফোটোখানা দেখেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মহুয়া। এ যে তিরি নদীর ধারে লেবাং বন। এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীটা, আর নদীর ওপারে ঘন বন। নদীর এপারে একটি পাহাড়, পাহাড়ের উপর তাজমহলের মতো বাড়ি। পাহাড়ের তলা থেকে সিঁড়ির সারি উঠে গেছে বাড়ি পর্যন্ত।

"জায়গাটা কোথা দাদু?"

"জানি না। যদি যেতে চাও কলকাতার এই ঠিকানায় খবর দিতে পারি—"

"মেয়েটি কি তোমার ছাত্রী ছিল?"

"দেখ্, ওসব খবর জানতে চাসনে। সে কুমারী ছিল, না সধবা ছিল, না বিধবা ছিল, ছাত্রী ছিল, না ছাত্রীর মাসীমা ছিল—এসব খবর অবান্তর। যেটা আসল খবর সেটা গোড়াতেই বলেছি—"

"চিঠিটা পড়তে পারি ?"

"আপত্তি নেই। কিন্তু পারবি কি ?"

চিঠিটা খুলে মহুয়া দেখল, যে ভাষায় সেটা লেখা সে ভাষা তার জানা নেই

"উর্দুতে লেখা নাকি ?"

"না, ফার্সিতে।"

আট

মহুয়া যেন নিজের ডায়রিতে লিখছে—

এর পর ফাঁক। অনেকখানি ফাঁক। দৃষ্টি কোথাও আটকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দিগন্তও নেই যেন। আকাশ কোথাও নামেনি। সোজা চলে গেছে। হাওয়া বইছে। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ায় কিসের যেন ইঙ্গিত। আর একটা মিষ্টি গন্ধ। দূর্বাদলশ্যাম বিরাট একটা প্রান্তরের মাঝে একা বসে আছি। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি। কার ? তা জানি না। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে হয়তো, তারই অপেক্ষায় বসে আছি। অপেক্ষা করাটাই জীবনের একমাত্র কাজ, অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না সেটা। হাওয়াটা হঠাৎ আমাকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল। মনে হলো ইঙ্গিতটা অর্থময় হয়ে উঠছে। গন্ধটা তীব্রতর হলো। উন্মুখ হয়ে উঠল আমার মন। প্রশ্ন করলাম—কে তুমি, কিছু বলবে আমাকে ? নাচের বেগ বেড়ে গেল, গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ কল্পনাকে চিনতে পারলাম। বুঝলাম, সে আজ কথা কইবে না। তার ইঙ্গিতময় গন্ধভরা নৃত্য দিয়ে সে কেবল আকুল করে তুলবে। আজ এই তার খেয়াল।

তারপর দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম। রূপকথালোকের সেই পথটাকে। পথ নয়, যেন জ্যোৎস্নায় ফালি, চিকচিক করছে বিরাট একটা কালো নদীর উপর। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন সুভদ্র সেন আর মহুয়া। চলেছেন সেই তাজমহলের মতো বাড়িটার দিকে, যা সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, অনেক সিঁড়ি পার হয়ে পেঁছতে হয় সেখানে, যে পাহাড়ের ধার দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী, যে নদীর ওপারে একটা বিরাট বন। আর তাদের পিছু পিছু চলেছে পূর্ণেন্দুবাবুর সেই প্রকাণ্ড পুরোনো হলদে বাড়িটা, হলদে বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আছে নীল-নয়না একটি মেয়ে। তার মুখে মৃদু হাসি, চোখে দুষ্টুমি-ভরা চাহনি, সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে। মিসেস পূর্ণেন্দু। আর একটা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ফরসা সুন্দরী মেয়ে, তার মাথায় লম্বা বেণী, তার চোখ কুচকুচে কালো, তার হাতে টকটকে লাল রুমাল। শুধু সুন্দরী নয়, অপূর্ব-সুন্দরী। অম্বর গুপ্তের ভাষায় 'দশ দিক আলো-করা' সুন্দরী। রহস্য কিন্তু হাসছে না। বড় বেশী গম্ভীর। আর এই সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করে বাজছে একটি মাত্র চড়া সুর—নি। সে সুর দেখা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, তবু বাজছে। পিছনে ভেসে ভেসে চলেছে এক দল রঙীন মেঘ। তার কোনটাতে আছে মঙ্গলময়, কোনটাতে মোহিত

সোম, কোনটাতে মিস্টার চ্যাটার্জি। আর সবার শেষে ছায়ার মতো আসছে শালিম।

দিলদরিয়ায় বান ডেকেছে হঠাৎ।

সুভদ্র সেন ভাবছেন—

কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না।

চারিদিকে মনে হচ্ছে নীল আর কালো মখমল মোড়া। দূরে একটা টিট্টিভ পাখি কোথায় যেন ডাকছে, কাকে যেন প্রশ্ন করে চলেছে ইংরেজীতে—ডিড্ হি ডু ইট্? ডিড্ হি ডু ইট্? ডিড্ হি ডু ইট্? এই তীক্ষ্ম প্রশ্নের পটভূমিকায় ঝঙ্কৃত হচ্ছে ঝিল্লিধ্বনি। রাত্রির নীরবতা তবু নষ্ট হয়নি। সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন?

সুভদ্র সেন বসে আছেন সিঁড়ির উপর। কয়েক ধাপ নীচে মহুয়াও বসে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তাজমহলের মতো বাড়িটা আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তিলকের মতো। তার চার পাশে ঝলমল করছে কালপুরুষের নক্ষত্রগুলো। আর্দ্রা আর বাণরাজ কিছু বলছে কি আলোর ইশারায়?

সুভদ্র সেন বললেন—"এত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। এ যে অনেক সিঁড়ি—"

"আমার কেমন মনে হচ্ছে ওখানে আমরা পেঁছিতে পারব না।"

"পেঁছিতেই হবে।..."

"যে ঝোপটার উদ্দেশ্যে প্রতি রাত্রে হাঁটি, যার কাছে কোনও দিন পেঁছিতে পারিনি, সেটাও দেখছি ওই বাড়িটার পাশে রয়েছে। তাই মনে হচ্ছে ওখানে পেঁছিতে পারব না।"

"পেঁছিতে হবেই। তোমার জীবনের জট তোমাকেই ছাড়াতে হবে।"

"জট মানে?"

"কৌতূহল। অবশ্য ভাগ্য ভালো হলে বীরেন্দ্র বা রমজু এসে তোমাকে আড়োয়ারি মাছ খাইয়ে দিতে পারে। কিন্তু সব সময়ে তারা আসে না, তাদের উপর নির্ভর করে বসেও থাকা যায় না—"

"বীরেন্দ্রই বা কে, রমজুই বা কে?"

"তোকে আমি বলিনি গল্পটা? আশ্চর্য তো! আমার ধারণা আমার সব গল্পই তোকে একাধিকবার বলেছি। যৌবনে আমার স্বভাব ছিল গঙ্গার ধারে গিয়ে বসা। তখন আমি একটা গুজব শুনেছিলাম যে, মিসেস পূর্ণেন্দু নাকি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন অনেক সময় বায়না ধরে, অকারণে ঘ্যানঘ্যান করে, আমার কল্পনা তেমনি আমার মনে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল—চলো তুমি গঙ্গার ধারে। ওখানে যখন সন্ধ্যার আলো গঙ্গার জলে পড়বে তখন সেই আলো সাঁতরে মিসেস পূর্ণেন্দু দেখা দেবে তোমাকে—সদ্যস্নানসিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকর-লিপ্ত। তখন গঙ্গার চেহারাও ছিল সিন্ধুর মতোই। তাই বসতাম গিয়ে রোজ গঙ্গার ধারে। একদিন দেখলাম গঙ্গার জলে শিহরণ তুলে কি যেন ভেসে আসছে আমার দিকে। কাছে আসতেও বুঝতে পারলাম না কি ওটা। পরে জানতে পারলাম এক ঝাঁক আড়োয়ারি মাছ। একটা ছোঁড়া সেখানে ছিল, সে-ই আমাকে জ্ঞানদান করল।

সে এও বললে, সাধারণ জালে ওই মাছ ধরা পড়ে না। রমজু জেলের কাছে একরকম জাল আছে, সেই জালে ওই মাছ ধরা পড়ে। রমজু জেলে খেয়ালী লোক, কখনও থাকে মুংগেরে, কখনও ভাগলপুরে, আবার কখনও চলে যায় তার শ্বশুরবাড়ি তালঝারি। সে ব্যবসায়ী জেলে নয়, শৌখিন মৎস্যশিকারী। রোজই দেখতে পাই গঙ্গার জলের উপর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আড়োয়ারি মাছের ঝাঁক। তাদের দেহটা দেখা যায় না, দেখা যায় চোখগুলো। মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো, মিসেস পুর্ণেন্দুই বুঝি সহস্র-চক্ষু মেলে খুঁজছে আমাকে। তারপর বন্ধু বীরেন এল হঠাৎ একদিন। দেখি সে-ও গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে বন্দুক। কে যেন তাকে খবর দিয়েছে, গঙ্গায় আজকাল চখা এসেছে। চখার দেখা না পেয়ে আমার দেখা পেয়ে গেল সে। আমি তাকে দেখিয়ে দিলাম আড়োয়ারি মাছের ঝাঁককে। বললাম—ওরাই হয়তো ছদ্মবেশী চখা। আজকাল সবাই তো ছদ্মবেশী। মাছের ঝাঁকের উদ্দেশে দড়াম দড়াম করে বন্দুক চালিয়ে বসল বীরেন্দ্র। অনেক ছররা যেন ছিনিমিনি খেলে গেল গঙ্গার জলের উপর। একটু পরেই দেখা গেল অনেকগুলো মাছ ভেসে উঠছে। সেই ছোঁড়াটা—যে আমার কাছে ঘুরঘুর করত, যার কাছে আড়োয়ারি মাছের খবর পেয়েছিলাম—সে লাফিয়ে পড়ল জলে এবং উলঙ্গ হয়ে নিজের কাপড় দিয়ে ছেঁকে অনেকগুলো মাছ তুলে ফেলল। ওরকম সুস্বাদু মাছ অনেক দিন খাইনি। রমজুও একদিন খাইয়েছিল, কিন্তু রমজু বা বীরেন সব সময় আসে না। দৈব অনুগ্রহ করলে আসে। আর একটা কথা না বললেও গল্পটা সব বলা হবে না। আড়োয়ারি মাছের ঝাল খেতে খেতে মনে হয়েছিল, মিসেস পুর্ণেন্দু যদি সত্যি নদী সাঁতরে আসত তা হলে এর চেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারত না—"

"তুমি প্রায়ই মিসেস পুর্ণেন্দুর কথা বলো, তাঁর যেসব গল্প তোমার কাছে শুনেছি তার কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই কিন্তু—"

"কালীর সঙ্গে দুর্গার বা সরস্বতীর কোন মিল আছে কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেরই আলাদা চেহারা, তেত্রিশ কোটি দেবতার তেত্রিশ কোটি রূপ—অথচ প্রত্যেকেই নাকি পরম ব্রহ্ম, উপনিষদে যাকে নিরাকার, নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্বিকার বলেছে। মিসেস পুর্ণেন্দুও সেইরকম—একটা আইডিয়া মাত্র—বিদ্রোহের একটা প্রতীক। আমার কল্পনা তাকে নানা রঙে নানা ঢঙে সাজিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কি জানিস, নিজেকে তবু আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না, অর্থাৎ সত্যি কথাটা বলতে বাধছে, সত্যি কথাটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি অথচ বলতে পারছি না।"

এই বলে খানিকক্ষণ চুপ করে গেলেন সুভদ্র সেন। তারপর বললেন—"এইটেই বোধ হয় সত্যের লক্ষণ। সত্যকে অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করতে গেলেই তার চেহারা যায় বদলে।"

মহুয়া কোন উত্তর দিল না। সে সবিস্ময়ে নীচের সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে ছিল। মঙ্গলময় আসছে, তার পিছু পিছু মিস্টার চ্যাটার্জি, স্কুলের ছেলে বাবলুটাও লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে, ও যা মনে মনে বলছে তাও যেন মহুয়া শুনতে পেল—'মহুয়াদি, তুমি অত উপরে নাগালের বাইরে চলে গেলে কেন, আমি যে আর সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না।' তারপর হঠাৎ নজর পড়ল আকাশের দিকে। চাঁদের ঠিক নীচেই একটা সোনালী মেঘ ভাসছে। তার উপর রয়েছে মোহিত সোম। কবিতা

আবৃত্তি করছে, কবিতাটাও যেন শুনতে পেল মহুয়া—সিঁড়ি ভেঙে তোমার কাছে যাব না। গেলে পরেও জানি তোমায় পাব না। যেটাকে এতক্ষণ ঝিল্লিধ্বনি মনে হচ্ছিল সেটা যে মোহিত সোমের কণ্ঠস্বর তা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি বলে আরও বিস্মিত হলো মহুয়া। মনে হলো মোহিত সোমকে কতটুকু চিনি আমি। মাঠের মাঝখানে ছায়া-স্তম্ভের মতো শালিমও দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন প্রতীক্ষা করছে। সে যেন জানে, মহুয়া তারই কাছে আসবে। নীরবতা দিয়ে যে রূপকথার জাল বুনে চলেছে, সে জালটা যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

"মনে নেই কি মহুয়া, যেদিন দস্যু শার্দুল সর্দার তোমাকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল, তোমাকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেছিল তারপর তোমাকে নাচতে বাধ্য করেছিল আর একদল উলঙ্গিনী ধর্ষিতার সঙ্গে, সেদিন তোমার আর্ত ক্রন্দনে এবং উদ্দাম নৃত্যে ঝড় উঠেছিল লেবাং বনে, যেদিন তিরি নদীর উত্তাল তরঙ্গমালায় জেগেছিল ক্ষুব্ধ গর্জন, আকাশে বিসর্পিত হয়েছিল বিদ্যুতের অগ্নিরেখা, যাদের আহ্বানে উত্তেজিত হয়ে আমি এসেছিলাম আমার হস্তিযূথ নিয়ে, আমার দলের সেরা হাতি পর্বত শুঁড়ে করে তুলে তোমাকে বসিয়ে দিয়েছিল আমার পাশে—এসব কি মনে পড়ছে না তোমার মহুয়া···"

মহুয়া মনে মনেই উত্তর দিল—"পড়ছে, কিন্তু আমি অসহায়। বর্তমানের দুর্গে নূতন কারাগারে বন্দিনী হয়ে আছি, অতীতে ফিরে যাব কি করে?"

তারপরই চমকে উঠল মহুয়া। লেবাং বনে হাতির ডাক শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্র সেনও যেন তার কথারই উত্তর দিলেন—"যাওয়া যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে যেতে হবে—"

"অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব?"

"আমি কি কিছু বললাম নাকি?"—বিস্মিত সুভদ্র সেন প্রশ্ন করলেন।

"বললে তো—"

"তোমাকে বলিনি। রহস্যকে বলেছি। তোমার দিদিমা ওই হলদে বাড়িটার জানলায় দাঁড়িয়ে আমাকে বলছে, আমার কাছে কি ফিরে আসা যায় না? আমি তারই কথার উত্তর দিচ্ছিলাম মনে মনে। সেটা যে কথায় বলে ফেলেছি তা খেয়াল ছিল না। তা এক হিসেবে ভালই হয়েছে, আমার অনেক দিন থেকেই ধারণা, রহস্য তোমার ভিতরই আত্মগোপন করে আছে।"

"ইস—"

তারপরই সুরের তুবড়ি ছুটিয়ে ডেকে উঠল পাপিয়াটা—চোখ গেল, চোখ গেল।

ভেঙে গেল দিবাস্বপ্ন। লুপ্ত হয়ে গেল সব। প্রখর দিবালোকে আবার ফিরে এল তারা। খালি কফির কাপের সামনে বসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দু'জনেই।

মহুয়া হেসে বললে—"আমি মনে মনে সত্যিই চলে গিয়েছিলাম তোমার ওই আরব্য-উপন্যাসের বাড়িতে—"

"আমিও। মনে মনে অনেক সিঁড়ি ভেঙেছি—"

"আমিও।"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া।

সেনের উদ্ভট কল্পনা আমরা। ঝগড়া না করে এসো আমরা নাচি, ভদ্রলোক তা হলে হয়তো আনন্দ পাবেন একটু। সবিতাকে ভুলতে পারবেন খানিকক্ষণের জন্য।

রহস্য। আমি কখনও নাচ শিখিনি, তবু নাচব। কিন্তু তার আগে বিচার চাই। জজ সাহেবকে ডাকো, অম্বর গুপ্তকে ডাকো, আর ডাকো শেখরকে।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। আমি যদি জজ হই তোমার আপত্তি আছে?

রহস্য। কিছুমাত্র না। কিন্তু সুবিচার চাই। আগে অম্বর গুপ্তকে ডাকুন।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো অম্বর গুপ্ত।

রহস্য। এইবার ওঁকে জিজ্ঞেস করুন আমার স্বামীর সঙ্গে উনি যখন জেলে দেখা করতে যেতেন, কি বলতেন আমার সম্বন্ধে—

আলখাল্লা-পরা লোকটা। (অম্বর গুপ্তর দিকে চেয়ে) প্রশ্ন তো শুনলেন। এবার উত্তর দিন। সত্য কথা বলবেন।

অম্বর গুপ্ত। রহস্য দেবী আর শেখর সেন একসঙ্গে বাজারে পিকেটিং করতেন—এ নিয়ে সুভদ্র সেনের বন্ধুরা নানারকম টিটকারি দিতেন, অনেক অশ্রাব্য ইঙ্গিতও করতেন। তাই আমি সুভদ্র সেনকে গিয়ে বলেছিলাম, তোমার বউকে নিয়ে নানারকম গুজব উঠছে, তুমি তোমার বউকে মানা করে দাও আর যেন ও পিকেটিং করতে না বেরোয়।

রহস্য। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন উনিই আমার স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা তোমার বউকেও আন্দোলনে নামাও। তা হলে সবাই তোমাকে বাহবা বাহবা করবে।

অম্বর গুপ্ত। দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভাবিনি যে, উনি শেখর সেনের সঙ্গে অমন বিশ্রীরকম মাখামাখি করবেন।

রহস্য। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন উনি নিজেই মাখামাখি করবার জন্যে আমার পিছনে রোজ ছুটোছুটি করতেন কি না।

অম্বর গুপ্ত চুপ করে রইলেন।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। (ধমকের সুরে) জবাব দিন।

অম্বর গুপ্ত। রহস্য দেবী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সবাই ব্যগ্র হতেন, আমিও হতাম, কিন্তু ওঁর সঙ্গে মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিলাম একথা আমি অস্বীকার করছি।

রহস্য। উনি যে আমাকে তিনখানা লম্বা চিঠি লিখেছিলেন, সে কথাও কি উনি অস্বীকার করছেন? সে চিঠিগুলো যদিও কাউকে দেখাইনি, কিন্তু সেগুলো আমার বাক্সে আছে এখনও।

অম্বর গুপ্ত। দেখাননি কেন?

রহস্য। আমার স্বামীকেই দেখাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। আপনার কথায় বিশ্বাস করে আমার স্বামী যখন কুৎসিতভাবে শেখর চাটুজ্যের সঙ্গে আমার সম্মান জড়াতে ইতস্তত করলেন না, যখন উনি ভুলে গেলেন যে, ওঁরই কথায় আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আন্দোলনে নেমেছিলাম ওঁর মান রক্ষা করবার জন্যে, তখন ওই কাদা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে প্রবৃত্তি হলো না।

অম্বর গুপ্ত। (আলখাল্লা-পরা লোকটাকে) ওঁকে জিজ্ঞেস করুন শেখর চাটুজ্যের সম্বন্ধে ওঁর কি কোন দুর্বলতা ছিল না?

রহস্য। ছিল। কিন্তু সে দুর্বলতা কি রকম তা শেখর চাটুজ্যে নিজেই এসে বলুক—ডাকুন তাকে।

ডাকতে হলো না, নিজেই এল শেখর চাটুজ্যে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, উসকো-খুসকো-চুল সুশ্রী যুবক একটি।

শেখর চাটুজ্যে। (কোন প্রশ্ন করবার আগেই) ওঁকে আমি মা বলতাম। উনি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু যেদিন শুনলাম—ওফ—

দু'হাতে মুখ ঢেকে বেরিয়ে গেল শেখর চাটুজ্যে। তারপর দেখা গেল একটা আড়কাঠা থেকে ঝুলছে তার দেহটা। গলায় দড়ি দিয়েছে শেখর সেন।

রহস্য। মরবার আগে শেখর আমাকে ওই চিঠিটা লিখেছিল—

আঙুল তুলে সে আকাশের দিকে দেখাল। আগুনের অক্ষরে জ্বলজ্বল করে উঠল এই কথাগুলো—'মা, এ পাপ-পৃথিবী ছেড়ে চললাম। প্রণাম।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু। "পাপ, পাপ, পাপ, পাপ বা-প রে বাপ!"

আলখাল্লা-পরা লোকটা। অম্বর গুপ্তর চিঠিগুলো দেখাতে পার?

রহস্য। সেগুলো মর্ত্যের এলাকায়, আমার তোরঙ্গের মধ্যে আছে। সেগুলো আমার নাগালের বাইরে এখন। দেখাতে পারব না।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। তোমার হাতের ওই লাল রুমালটা কার?

রহস্য। এটা আমার স্বামীর বাক্সে ছিল, একটা সুগন্ধি খামের ভিতর। খামের উপর লেখা ছিল 'নি'। শেখরের চিঠিটা আর এই রুমালটা আমি সঙ্গে এনেছিলাম।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। আমার বিচারে তুমি দোষী।

রহস্য। দোষী?

আলখাল্লা-পরা লোকটা। হ্যাঁ, খুনের দায়ে।

রহস্য। কাকে খুন করেছি আমি?

আলখাল্লা-পরা লোকটা। নিজেকে।

আবার হো হো করে হেসে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু।

মিসেস পূর্ণেন্দু। ওরে বাউল, নিজেকে কি খুন করা যায়? থাকবার বাসাটা বদলানো যায়, পুরোনো কাপড়টা ছাড়া যায়, নিজেকে খুন করা যায় না। আমরা কেউ মরিনি, কেবল বদলেছি। তুই ছিলি ভাঙা একটা বাড়ি, হয়েছিস বাউল। আর আমরা নাচি, সুভদ্র সেন দেখুক। যে সবিতা-ঘাস ওর নাগালের বাইরে তাই খাওয়ার জন্য ওর মন-গরু জিব বাড়াচ্ছে, সে গরুকে অন্যমনস্ক করতে হবে। আমরা থাকতে ও অন্যের কথা ভাববে কেন, আমরা ভাবতে দেবই বা কেন?

রহস্য। (অভিমান ভরে) কিন্তু আমার সুবিচার না হলে আমি নাচব না।

আলখাল্লা-পরা বাউলটা এর পর অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎ দু' হাত তুলে কবিতা আবৃত্তি করল একটা।

ওগো নারী, করিও না রোষ
সদাই নিষ্পাপ তুমি সদাই নির্দোষ
আনন্দ-দায়িনী, মনোলোভা
যা করিবে পাবে তাই শোভা

অম্বর গুপ্ত। (মুচকি হেসে) আমি তবে চললাম। (প্রস্থান)

বাউল নাচ শুরু করে দিল।

মিসেস পূর্ণেন্দু। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাজনা আসুক। নি ম্যাণ্ডোলিন বাজাবে। নি—নি—নি, শিগগির এসো—।

নি বেরিয়ে এল। আগুনের শিখা যেন সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। মুখ দেখা যায় না। টকটকে লাল ওড়নায় সব ঢাকা। বেজে উঠল ম্যাণ্ডোলিন। শুরু হয়ে গেল নাচ। আগুনের শিখাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে নাচতে লাগল ম্যাণ্ডোলিনের তালে তালে। তারপর ছড়িয়ে পড়ল আগুন। ঘিরে ধরল রহস্যকে। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেটা, নাচের ভঙ্গিতেই জ্বলতে লাগল।

সুভদ্র সেনের একটা ছবির কথা মনে পড়ল, সীতার অগ্নিপরীক্ষা। চারিদিকে অগ্নিশিখা, তার মাঝখানে ধ্যানমগ্না সীতা হাত জোড় করে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আর একটা কথা মনে হলো সুভদ্র সেনের। সীতাকে পোড়াবার সময় কি তার শাড়িতে কেরোসিন তেল ঢালা হয়েছিল? ধোঁয়ায় ভরে গেল চারিদিক। আকাশ কালো হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না। তবু উদ্দাম নাচের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ঝড় উঠল। বিরাট ঝড়। ধোঁয়াকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক টুকরো ধোঁয়া কিন্তু উড়ল না। লম্বা কালো একটা টুকরো দুলতে লাগল আকাশ-পটে।

"ওই তো রহস্যের বেণী, বেণীটা পোড়েনি, বেণীটা পোড়েনি—"

চীৎকার করে উঠলেন সুভদ্র সেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নীলকণ্ঠ। সুভদ্র সেন দেখলেন, একটা নয়, হলদে বাড়ির আলসেতে চারটে নীলকণ্ঠ। একটা চীৎকার করতে করতে আকাশে উড়ে গেল, তারপর সোঁ করে নেমে এল। নীল রঙের বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল যেন। সুভদ্র সেন দেখলেন বেণীটা এখনও আকাশে ঝুলছে। সেইটেকে ঘিরেই নীলকণ্ঠটা যেন মাতামাতি করছে।

হঠাৎ সুভদ্র সেন উঠে দাঁড়িয়ে অনুনয়ভরা কণ্ঠে বললেন—"রহস্য, একবার ফিরে দাঁড়াও, তোমাকে দেখি, আমি জানি তুমি বেঁচে আছ—"

বেণী অন্তর্হিত হলো।

হলদে বাড়ির জানলায় দেখা গেল মিসেস পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। তার পিছনে মনে হলো রহস্য দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে 'নি'।

দশ

সেদিনও মহুয়া অন্ধকারে হাঁটছিল, রাত দুটোর পর। ঘড়িতে অ্যাল্যার্ম দিতে হয়নি, আপনিই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাঁটছিল, কিন্তু এগোচ্ছিল না। গঙ্গার ঘাটের দিকে যে পথটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে। কল্পনা করছিল। কল্পনাতেই হাঁটছিল সে।

হঠাৎ মুখ তুলে সে অবাক হয়ে গেল। ঝোপটা নেই। আড়াল ঘুচে গেছে।

মুক্ত প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সুভদ্র সেন, মঙ্গলময়, মোহিত সোম, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল—সবাইকে তার ভাল লাগে। কিন্তু পুরোপুরি লাগে না। তার ভালো-লাগার জ্যোৎস্না কাউকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেনি। সবারই গায়ে খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার। দূরে দাঁড়িয়ে আছে শালিম। কোন সুদূর পূর্বজন্মের, কোন বিস্মৃতি আদিম সমাজের প্রণয়ী ও? কোন মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এল সজীব হয়ে? তার সঙ্গে সত্যি কি কোন যোগ ছিল মহুয়ার? এখন কি যোগ হওয়া সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল যেন অনেক। দূরে অনেকগুলো মিল থেকে যেন বাঁশি বেজে উঠল। চীৎকার করে উঠল মহুয়া। সুভদ্র সেন, মঙ্গলময়, মোহিত সোম, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল, শালিম—সবাই যেন কাছাকাছি সরে এসে মিলে যাচ্ছে, তাদের গা থেকে অন্ধকারের টুকরোগুলো খসে পড়েছে, থাকছে শুধু আলোকিত অংশগুলো, সেগুলো সব এক হয়ে গেল। যোগফল যা হলো তা অপূর্ব আশ্চর্য, জ্যোতির্ময় এক পুরুষ। অতীত ও বর্তমান মিলে নিখুঁত ভবিষ্যৎ আবির্ভূত হলো। হাসিমুখে এগিয়ে আসতে লাগল মহুয়ার দিকে। শাঁখ বাজছে, মিলের বাঁশিগুলো বাজছে, চাঁদের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। মহুয়ার হঠাৎ ভয় হলো—সে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—না, না, তুমি এস না। তুমি নিখুঁত, তুমি ভয়ঙ্কর, তুমি স্বপ্নের মহাকাশচারী, আলিঙ্গনে তোমাকে বাঁধা যাবে না। তুমি এস না, এস না, এস না।

তবু কিন্তু সে আসতে লাগল।

মহুয়া বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। কিছুদূরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সে আসছে, একবারও থামেনি। অনিবার্য গতিতে এগিয়ে আসছে সে। তার ভয় করছে কেন, বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল কিন্তু ভয় ঘুচল না। তার মনে হলো, আমি তো নিখুঁত নই, আমার মধ্যেই যে অনেক পঙ্ক, অনেক গ্লানি, আমি ওর সহচরী হবার যোগ্য কি? ও যে নির্মল, ও যে সুন্দর, ও যে পবিত্র···ছুটতে লাগল মহুয়া। বাড়ির থেকে বেশী দূরে সে যায়নি, কিন্তু তবু মনে হলো বাড়ি পৌঁছতে পারছে না সে। বাড়িটাও যেন নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন পৌঁছল তখন শুনতে পেল সুভদ্র সেন চীৎকার করছেন—"রহস্য, রহস্য, তুমি ফিরে দাঁড়াও; আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ, সেইখানেই তুমি আমাকে, আমার স্বরূপকে, দেখতে পাবে। ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও—দোহাই তোমার, একবার ফিরে দাঁড়াও, শোন, আমার কথা শোন—"

ঠিক এই সময়েই প্রচণ্ড গর্জন করে বিরাট এরোপ্লেনটা নেমে এল। বিরাট একটা ফড়িংয়ের মতো থামল এসে তাদের বাড়ির সামনে। তার সর্বাঙ্গে স্বর্ণদ্যুতি। মানব-মনীষার শেষ কীর্তি যেন। মানুষের মতো কথা কইল সে।

"তোমার ডাক শুনে আমি নেমে এসেছি মহাকাশ থেকে। তুমি যা চাইছ তা এখানে নেই। তোমাদের কবি বহুকাল আগে বলে গেছেন—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। সেইখানে চল যাই—উঠে এস—"

সুভদ্র সেন বেরিয়ে এলেন।

"কে তুমি ? মিসেস পূর্ণেন্দু ? রহস্য ? নি ? না, মহুয়া ?"

"আমি মহাকাশের মহাভৃঙ্গ। যেখানে শাশ্বত আলোর কমল ফুটে আছে সেইখানেই আমি বিহার করি। তুমি যাদের কথা বললে তারা সবাই সেখানে আছে—অথচ নেই। সেই আছে-অথচ-নেই-লোকের দ্বিধার কম্পনকে আলোকিত করছে আলোর কমল। হয়তো সে দ্বিধা একদিন বিশ্বাসে পরিণত হবে। কিন্তু এখনও হয়নি। মানুষের সব জ্ঞান এখনও অজ্ঞান-ভ্রূণে নিহিত। জানার সব নদী বার বার অজানা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সে সমুদ্রের কূলকিনারা এখনও পাওয়া যায়নি। আলোর কমল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে খালি। এস, নিজের চোখেই দেখবে সব।"

সুভদ্র সেন এরোপ্লেনে উঠে বসলেন। বিরাট গর্জন করে প্লেন উড়ে গেল। ভনভন ভনভন ভনভন—কোটি কোটি ভ্রমর যেন চীৎকার করতে করতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মহুয়া।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন সুভদ্র সেন। তিনি ভিতরে যেন ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। দু' হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন মহুয়াকে, যেন সে ছোট একটা শিশু। সুভদ্র সেন নিজেও জানতেন না যে, তাঁর গায়ে এখনও এত শক্তি আছে। শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অদ্ভুত একটা আনন্দ হলো তাঁর। নিজেকে হঠাৎ যেন ফিরে পেলেন। এতদিন কোন মিথ্যা স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে তিনি দুর্বল রোগী ভাবছিলেন ? এই তো মহুয়াকে একটা পালকের মতো কুড়িয়ে নিলেন। তাকে দু' বাহুর উপর তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। মহুয়ার মাথায় এলো-খোঁপা করা ছিল। সেটা আরও এলিয়ে পড়ল। অজস্র কালো চুলের প্রপাত নামল তাঁর বাহু বেয়ে। এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল মহুয়ার বুকের কাপড়ও। কিন্তু এসব সুভদ্র সেনের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। যে শিশু-মহুয়াকে একদা তিনি মহুয়া গাছের তলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, মনে পড়ল তাকে। যে মহুয়াকে শ্যামলী মানুষ করেছিল নিজের মেয়ের মতো, মনে পড়ল তাকে। যে মহুয়াকে দোলায় দোল দিতেন তিনি, মনে পড়ল তাকে। সেই ছোট্ট শিশুটা যেন এই অসংবৃত-বাসা বিস্রস্ত-কেশা পীবর-স্তনী যুবতীকে আড়াল করে ফেলল নিমেষে, ফিক করে হাসল তাঁর দিকে চেয়ে, ফোকলা দাঁতের মিষ্টি হাসি, যা তাঁকে বহুকাল আগে অভিভূত করত, সেই হাসিটাই তিনি যেন দেখতে পেলেন আবার, নীচের মাড়িতে ছোট ছোট আলোচালের মতো দুটি দাঁতও। হঠাৎ লক্ষ করলেন মহুয়ার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন তাকে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। একটু পরে চোখ খুলল মহুয়া। সবিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বলল—"দাদু, ফিরে এলে কখন ?"

"আমি কোথাও তো যাইনি।"

"হ্যাঁ, গেছলে তো। আকাশ থেকে যে সোনার এরোপ্লেনটা নেমে এসেছিল তাতে করে—"

"সোনার এরোপ্লেন ?"

"হ্যাঁ, সে বললে, আমি মহাকাশের মহাভৃঙ্গ, আলোর কমল যেখানে ফুটেছে,

সেইখানে আমি বিহার করি, আরও সব কি বললে ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি তার সঙ্গে চলে গেলে…”

আবার চোখ বুজল মহুয়া। অনেকক্ষণ বুজেই রইল। ভ্রূকুঞ্চিত করে হাওয়া করতে লাগলেন সুভদ্র সেন। মহুয়া কথা কইল আবার।

“সে-ও এসেছিল—”

“কে?”

“যোগফল। তোমাদের সকলের যোগফল। কিন্তু সে এত সুন্দর, এত চমৎকার, এত নিখুঁত যে, আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম। সে এখনও বোধ হয় আসছে আমার দিকে, চিরকাল বোধহয় আসবে”।

“Stop that nonsense.”

হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন সুভদ্র সেন। নিজের স্বর শুনে নিজেই চমকে উঠলেন তিনি। অতীতের বাস্তববাদী বলিষ্ঠ সুভদ্র সেন সহসা আবির্ভূত হলেন যেন স্বপ্নের খোলস ছিঁড়ে। যে সুভদ্র সেন একদা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছিলেন, জেলে অনশন করেছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদে, যে সুভদ্র সেন ছাত্রজীবনে গুণ্ডার সঙ্গে লড়েছিলেন একটি অপহৃতা বালিকাকে উদ্ধার করবার জন্যে, যে সুভদ্র সেন রূঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন রহস্যাকে, ‘তুমি আর শেখরের সঙ্গে মিশবে না’—সেই সুভদ্র সেন অতীতের ভগ্নস্তূপ থেকে যেন বেরিয়ে এলেন সতেজ সবুজ চারার মতো।

“আমাকে তুমি বকছ দাদু?”

মহুয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল।

সুভদ্র সেন লক্ষ্য করলেন তার নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে।

“বেশী বকবক করো না। ঘুমোও—”

মহুয়া চুপ করে রইল।

তারপর আবার শুরু করল—“আমি—”

“—একটি কথা বলো না। চুপ কর। আমরা আর এখানে থাকব না।”

“কোথা যাবে—”

“কোথা তা জানি না। কিন্তু এই ভূতুড়ে পরিবেশ ছেড়ে চলে যাব। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে—”

মহুয়া সবিস্ময়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

“কোথায়?”

“ওপারে। এপারে আর ভালো লাগছে না।”

এরোপ্লেন বলছিল—“হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।”

“চুপ কর।”

বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন সুভদ্র সেন।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

সসীম বাস্তবলোক ও অসীম স্বপ্নলোকের সঙ্গমস্থলে এবার আমাদের কাহিনী চলে গেল। বাস্তবলোকের সীমানা সিমেন্ট-কংক্রিটের একটি চওড়া বারান্দা। বাস্তবলোক থেকে কয়েকটি সিঁড়ি উঠে এসে বারান্দার দক্ষিণ দিকে শেষ হয়েছে। এই সিঁড়িগুলি দিয়ে নিম্নস্থ মর্ত্যলোক থেকে বাস্তবলোকের সীমান্ত-বারান্দায় পৌঁছানো যায়। বারান্দাটির মাঝখানে একটি বড় দরজা। সেই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্বপ্নলোকের আভাস। প্রথমেই মনে হবে একটা নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র বুঝি অসীমে গিয়ে দিশাহারা হয়েছে। কিন্তু খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেই ভুল ভাঙবে। বোঝা যাবে ওটা নীল সমুদ্র নয়, ওটা পটভূমিকা মাত্র! ওই পটভূমিকায় মাঝে মাঝে সমুদ্র যে মূর্ত না হতে পারে তা নয়, সব রকম স্বপ্নই রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ওই অসীমের পটভূমিকায়। এখন শুধু পটভূমিকাটা দেখা যাচ্ছে। মর্ত্যে যে সব স্বপ্ন বন্দী হয়ে থাকে মুক্তি পেলে তারাও এইখানে আসে ওই সিঁড়িগুলো বেয়ে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল প্রতিহারীর পোশাক-পরা একটি লোক বারান্দার উপর উঠে এসেছেন। তাঁর বগলে দুটি খাতা রয়েছে। ইনি বাস্তবলোক ও স্বপ্নলোকের মধ্যে সেতুর কাজ করেন। এঁর নামও সেতু। ইনি এসেই পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন।

"মর্ত্যলোকে শ্রীযুক্ত সুভদ্র সেন এবং শ্রীমতী মহুয়া দেবী মারা গেছেন। তাঁদের মৃত্যু রহস্যময়। তাঁদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ডাক্তাররা ঠিক করতে পারেননি। সকালে দেখা গেল শ্রীমতী মহুয়া বিছানায় এবং শ্রীযুক্ত সুভদ্র সেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। এঁদের দুজনের মস্তিষ্ককোটরে অনেকগুলি স্বপ্ন বন্দী অবস্থায় ছিল। তারা এবার ছাড়া পেয়েছে। মর্ত্যের শাসনকর্তাদের মতে এ স্বপ্নগুলি বিপজ্জনক। তাই তাদের স্বপ্নলোকে চালান করে দিয়েছেন তাঁরা। স্বপ্নরা নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের অনুমতি পেলেই তাঁরা উপরে উঠে আসবেন।"

দেখা গেল নীল পটভূমিকায় একটি রূপালী স্রোতস্বিনী মূর্ত হয়েছে। তার উপর সোনালী পানসি বাইতে বাইতে আসছেন একটি তরুণ যুবক। তার গায়ে রামধনু রঙের পোশাক। মাথায় সবুজ শিরস্ত্রাণ। দেখতে দেখতে পানসি এসে ভিড়ল দরজার সামনে। তরুণ যুবক কংক্রিটের বারান্দার উপর উঠে এসে অভিবাদন করলেন মর্ত্যের সেতুকে। বললেন—"আমাদের দেশে কোনও স্বপ্নই বিপজ্জনক নয়। স্বপ্ন হলেই আমরা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নেব আমাদের দেশে। কিন্তু সেটা মেকী হলে চলবে না।"

সেতু। কোনটা আসল কোনটা মেকী তা যাচাই করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

তরুণ যুবক। আমাদেরও ছিল না। সম্প্রতি মহাকাল আমাদের সহায় হয়েছেন। বলেছেন তিনি নিজে এসে নির্বাচন করে দেবেন। তাঁর কিন্তু একটি কঠোর শর্ত আছে।

সেতু। কি সেটা?

তরুণ যুবক। মেকী স্বপ্নদের তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন। এই শর্তে কি ওঁরা রাজী আছেন?

সেতু। ও'দের রাজী থাকা না থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ও'দের আমরা ফিরিয়েও নিতে চাই না। ও'দের নিয়ে আপনারা যা খুশী করতে পারেন।

তরুণ যুবক। ও'দের কোন পরিচয় আপনি দেবেন না?

সেতু। ও'দের পরিচয় তো আমি জানি না। সুভদ্রবাবুর ঘরে এই খাতাটা পাওয়া গেছে। খাতাটার উপরে লেখা আছে 'মেঘ'। শ্রীমতী মহুয়ারও একটা ডায়েরি পেয়েছি আমরা। সেই দুটো এনেছি। এ দুটোতে ওই স্বপ্নদের কিছু খবর পাবেন। এই নিন। আমি চললাম।

(তরুণ যুবকের হাতে খাতা দুটি দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তরুণ যুবক বাধা দিলেন।)

তরুণ যুবক। শুনুন। আমার মনে হয় মহাকালের শর্তের কথাটা ও'দের আগে থাকতে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

সেতু। তাতে লাভ কি হবে? ওদের মধ্যে ভয় পেয়ে কেউ যদি আসতে না চায় তাদের তো আমরা ফিরিয়ে নেব না। বাস্তবলোক থেকে ওদের দূর করে দেওয়া হয়েছে, গেট বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা শুনলে ওরা কেবল হইচই করবে।

তরুণ যুবক। তবু বলুন, সব জেনেশুনে মহাকালের সম্মুখীন হওয়াই ভালো।

সেতু। কিন্তু ওরা যদি না আসতে চায়, সি'ড়ির নীচে দাঁড়িয়ে যদি হল্লা করে—

তরুণ যুবক। তা করুক। ওরা স্বেচ্ছায় না এলে ওদের অভ্যর্থনা করব কি করে? স্বপ্নলোকে স্বেচ্ছায় আসতে হবে।

সেতু। বেশ।

(সেতু চলে গেলেন। একটু পরেই সি'ড়ির নীচে গোলমাল শোনা গেল। দু'একজন আর্তনাদ করে উঠলেন মনে হলো। তরুণ যুবক অপেক্ষা করে রইলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দরজার দিকে চেয়ে কাকে যেন বললেন—'ওদের বসবার জায়গা করে দাও। অলঙ্কৃত আসন নিয়ে এস কয়েকটা। আর স্ফটিকের সেই বৃহৎ পাত্রটিও আন।' সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে অপরূপ বেশে সজ্জিত কয়েকজন কিঙ্কর-কিঙ্করী প্রবেশ করল। আসন পাতা হলো। স্ফটিকের সুদৃশ্য একটি পান-পাত্রও এক ধারে রেখে চলে গেল তারা। পান-পাত্রটি বেশ বড়। একটি মানুষ অনায়াসে তার ভিতর ঢুকে যেতে পারে। কিঙ্কর-কিঙ্করীরা চলে যাওয়ার পর তরুণ যুবকটি পান-পাত্রের দিকে এগিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল।)

তরুণ যুবক। (পান-পাত্রকে) আপনার স্বরূপ প্রকাশ করুন। আপনি সুস্থ আছেন তো? মহাকালের বিচার-সভা এখনি বসবে।

(শ্বেত স্ফটিকের পান-পাত্রটি দেখতে দেখতে রক্তবর্ণ ধারণ করল। মনে হলো তার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল। তরুণ যুবক করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে আগুনের দীপ্তি নিবে এল ক্রমশ। স্ফটিক পাত্র শুভ্র রূপ ফিরে এল আবার। তরুণ যুবক তখন দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন—'নন্দী ভৃঙ্গী! এবার তোমরা এসো।' নীল পটভূমিকার উপর দুটি বিরাট দৈত্য আবির্ভূত হয়ে এগিয়ে এল দরজার কাছে।)

তরুণ যুবক। তোমরা দু'জনে বাস্তবলোকের ওই সি'ড়ির দু'পাশে স্তম্ভের আকারে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে মায়াজাল প্রসারিত কর।

(সিঁড়ির দু'পাশে নন্দী-ভৃঙ্গী কষ্টিপাথরের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের দু'জনের মাঝখানে প্রসারিত হলো সবুজ আলোর জাফরি দিয়ে তৈরী একটি সুদৃশ্য গেট।)

তরুণ যুবক। (গেটের দিকে চেয়ে) আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল)

আসতে দিও না—

(গেট বন্ধ হয়ে গেল)

ঠিক আছে।

(এরপর প্রবেশ করলেন স্বপ্নলোকের কোটাল। সুকান্তি, সুবেশ, রুচিবান লোক। তাঁর হাতে একটি সুন্দর সাঁড়াশি রয়েছে।)

তরুণ যুবক। আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কোটাল। তাই তো আসতে হলো। আপনার ভাবা মানেই আহ্বান। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েছি। মহাকালও পেয়েছেন। তিনি কিন্তু সশরীরে সব সময়ে এখানে উপস্থিত থাকবেন না। নেপথ্যে থাকবেন। আড়াল থেকেই সব শুনবেন বললেন। শুনে তারপর নির্দেশ দেবেন আমাকে। আমিও মশাই আড়ালে থাকতে চাই। কারও সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষে আসবার প্রবৃত্তি নেই। আমার হয়ে এই সাঁড়াশিটি কাজ করবে। এটিকে এই দরজার পাশে লাগিয়ে দিচ্ছি। মহাকাল যাকে ধ্বংস করতে বলবেন, এই সাঁড়াশি তাকে ধরে ওই স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দেবে। ওর মধ্যে যে অগ্নি আর জারক রস আছে, বাকি কাজটা তারাই করবে।

তরুণ যুবক। ওটি তো বড় ছোট মনে হচ্ছে।

কোটাল। প্রয়োজন মতো ও নিজের শরীরকে বড় করতে পারবে। বাঁকাতেও পারবে। এ অদ্ভুত সাঁড়াশি।

তরুণ যুবক। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য তো। কোথায় পেলেন এটি?

কোটাল। এটিও একটি স্বপ্ন। ভবিষ্যতে রাজনীতি যা হবে তারই স্বপ্ন। এ আমার সৃষ্টি। অনুমতি করেন তো লাগিয়ে দিই ওই দরজার পাশে।

তরুণ যুবক। দিন।

(কোটাল সাঁড়াশিটিকে দরজার উপর লাগিয়ে দিলেন।)

কোটাল। এইবার এই সুতোটি বেঁধে দিতে হবে এর গায়ে।

তরুণ যুবক। সুতো?

কোটাল। হ্যাঁ—এটিকে ধরে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে এই সুতোর ভিতর দিয়ে, চালিত করবে সাঁড়াশিকে। আচ্ছা, দেখাচ্ছি।

(কোটাল একটি রঙীন সুতো বেঁধে দিলেন সাঁড়াশির গায়ে। সুতোটি বেশ লম্বা। সেটি ঝুলতে লাগল সাঁড়াশি থেকে। তারপর তিনি সুতোটি ডান হাতে ধরে বললেন—'লম্বা হও।' সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশি লম্বা হয়ে গেল, যখন বললেন—'ডান দিকে বেঁক—ডান দিকে বেঁকল, যখন বললেন—বাঁ দিকে বেঁক—বাঁ দিকে বেঁকল। সুতোটি ছেড়ে দিতেই সাঁড়াশি আবার পূর্ববৎ ছোট হয়ে দরজার উপর লেগে রইল।)

তরুণ যুবক। বাঃ, বেশ চমৎকার তো। আপনি তা হলে বাইরে থাকছেন?

কোটাল। হ্যাঁ। এই সুতোটি ধরে থাকব কেবল। মহাকালের আদেশ

আপনারা শুনতে পাবেন। তাঁর আদেশ অনুসারে আমার সাঁড়াশি কাজ করবে।

(রঙীন সুতোটি ধরে তিনি বাইরে চলে গেলেন। তরুণ যুবক একটি আসনে বসে খাতা দুটি উলটে উলটে দেখতে লাগলেন। একটু পরে গেটের কাছে মঙ্গলময়কে দেখা গেল। তিনি গেট ঠেলতে লাগলেন, গেট খুলল না।)

তরুণ যুবক। আপনি স্বেচ্ছায় আসছেন তো ?

মঙ্গলময়। হ্যাঁ।

তরুণ যুবক। সব শুনেছেন ?

মঙ্গলময়। শুনেছি।

তরুণ যুবক। (গেটের দিকে চেয়ে) নন্দী-ভৃঙ্গী, ওঁকে আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল। মঙ্গলময় এসে প্রবেশ করলেন।)

তরুণ যুবক। আসুন, বসুন। (একটি আসন দেখিয়ে দিলেন।)

মঙ্গলময়। (উপবেশনান্তে) আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?

তরুণ যুবক। আমার বিশেষ কোন পরিচয় নেই। আমি স্বপ্নলোকের অধিবাসী।
আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্বপ্নমহেশ্বর আজ আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি কে ?

মঙ্গলময়। আমিও স্বপ্ন। মহুয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি অধ্যাপক মঙ্গলময়ের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখতেন আমি সেই স্বপ্ন।

তরুণ যুবক। আপনার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু আছে কি ?

মঙ্গলময়। অভিনবত্ব ? আমার মধ্যে ? মনে হয় না আছে। আমি মহুয়া দেবীর মনের কামনা মাত্র। পুরুষকে ঘিরে নারীর যে কামনা চিরকাল পুষ্পিত হয়েছে আমি তার চেয়ে বেশী কিছু নই। অভিনবত্বের দাবী আমি করব কি করে ?

তরুণ যুবক। স্বপ্নলোকে এসেছেন কেন ?

মঙ্গলময়। আমি তো আসতে চাইনি। দেখলাম বাস্তবলোকে আমার স্থান নেই। তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে স্থান পেলে—

(দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশিটি লম্বা হয়ে মঙ্গলময়ের গলা চেপে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল, তারপর নিক্ষেপ করল স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর। স্ফটিক পাত্রটি রক্তবর্ণ ধারণ করল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর তার শুভ্রতা আবার ফিরে এল। তরুণ যুবক আবার খাতা দুটিতে মন দিলেন। একটু পরে গেটে মিস্টার চ্যাটার্জিকে দেখা গেল। বলিষ্ঠ কমনীয়-কান্তি চ্যাটার্জি এসে হাঁক দিলেন—কপাট খুলুন। পা দিয়ে লাথি মারলেন গেটে।)

স্তম্ভরূপী নন্দী। (স-হুঙ্কারে) ভদ্র হোন।

স্তম্ভরূপী ভৃঙ্গী। (ধমক দিয়ে) কি চান আপনি ?

মিস্টার চ্যাটার্জি। ভিতরে ঢুকতে চাই।

ভৃঙ্গী। লাথি মারবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে ?

নন্দী। যা করেছেন তার জন্যে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

(মিস্টার চ্যাটার্জি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপর হাতের আস্তিন গুটিয়ে চোখ পাকিয়ে একটু তেরিয়া ভঙ্গীতে চাইলেন নন্দীর দিকে।)

মিস্টার চ্যাটার্জি। যদি না করি কি করবেন ?

নন্দী। ছাতু করে ফেলব।

(তরুণ যুবক এতক্ষণে সচেতন হলেন, আর একজন এসেছে। সুভদ্র সেনের 'মেঘ' তাঁকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।)

তরুণ যুবক। কি হয়েছে ?

ভৃঙ্গী। লোকটি অভদ্র। মায়াজালে লাথি মেরেছে।

তরুণ যুবক। (মিস্টার চ্যাটার্জিকে) আপনারা এক হিসাবে উদ্বাস্তু। তাই আপনাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করব না। আপনি কি স্বেচ্ছায় এখানে আসতে চান ? সব শুনেছেন তো ?

মিস্টার চ্যাটার্জি। সব শুনেছি, ওসব ভয় আমার নেই। আমি মুষ্টিযোদ্ধা।

তরুণ যুবক। আসুন, ভিতরে আসুন। ওঁকে আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল। মিস্টার চ্যাটার্জি প্রবেশ করলেন।)

ওই আসনে বসুন। বসে আপনার পরিচয়টা দিন।

(মিস্টার চ্যাটার্জি উপবেশন করলেন। গোঁফে তা দিলেন একবার।)

মিস্টার চ্যাটার্জি। আমার পরিচয় ? আমার নানারকম পরিচয় আছে। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আমি কুমারী মহুয়া দেবীর ফ্যান্সি বয়। তিনি অনেক দিন আগেই মনে মনে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, আমাকে ঘিরে অনেক আরতি করেছে তাঁর মন।

তরুণ যুবক। সংক্ষেপে আপনি তাঁর স্বপ্ন ?

মিস্টার চ্যাটার্জি। স্বপ্ন কিনা তা জানি না। কারণ আমার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া আবছা-আবছা কিছু নেই। আমি স্ট্রেট, আমি সলিড, আমি মাসকিউলার, অর্থাৎ আমি ক্লীব নই, সবল সুস্থ। হয়তো আমার এই পৌরুষই শ্রীমতী মহুয়ার মনে স্বপ্ন জাগিয়েছে—হ্যাঁ, স্বপ্নই বলতে পারেন তাকে—কিন্তু আসলে তা—

(মিস্টার চ্যাটার্জি থেমে গেলেন)

তরুণ যুবক। শেষ করুন কথাটা।

মিস্টার চ্যাটার্জি। (মরিয়া হয়ে) কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। আসলে তা কাম। ডিজায়ার, লিবিডো।

(দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সাঁড়াশি লম্বা হয়ে এগিয়ে এল, চ্যাটার্জির গলা ধরে তাকে শূন্যে তুলে স্ফটিক-পাত্রে নিক্ষেপ করল। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল স্ফটিকের পাত্র। মিস্টার চ্যাটার্জি নিঃশেষ হয়ে গেলেন। তরুণ যুবক আবার খাতা দুটিতে মন দিলেন। একটু পরেই সিঁড়ির ওপার থেকে কান্না ভেসে এল।)

তরুণ যুবক। কে কাঁদছে ?

নন্দী। একটি বালক আর একটি যুবক। ওরা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে।

তরুণ যুবক। কে ওরা, কি নাম ওদের ?

(শালিমকে গেটের কাছে দেখা গেল। সে গেটের ওপার থেকেই কথা কইল।)

শালিম। আমাকে ভুলে যাওনি আশা করি। আমি তো স্বপ্নলোকের পুরাতন অধিবাসী।

তরুণ যুবক। হ্যাঁ, তোমাকে তো চিনি; তুমি পূর্বজন্মের স্বপ্ন। তুমি বাস্তবলোকে কোথায় গিয়েছিলে?

শালিম। মহুয়ার অবচেতনলোকে।

তরুণ যুবক। ফিরে আসবে এখানে?

শালিম। কোথায় আর যাবো!

তরুণ যুবক। এসো। (নন্দী-ভৃঙ্গীকে) ওকে আসতে দাও।

(শালিম প্রবেশ করল।)

তরুণ যুবক। নীচে কাঁদছে কে?

শালিম। বাবুল, মোহিত সোম।

তরুণ যুবক। কে ওরা?

শালিম। মহুয়ার দুর্বলতা।

তরুণ যুবক। ওরা যদি এমনভাবে কাঁদে তা হলে তো—

শালিম। কুয়াশার স্বপ্নকে ডাকো। সে ওদের অবলুপ্ত করে দিক।

তরুণ যুবক। তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও তা হলে—দাঁড়াও।

(নেপথ্যের দিকে চেয়ে) মহাকাল, ইনি স্বপ্নলোকের পুরাতন অধিবাসী একজন। এঁকে প্রবেশ করবার অনুমতি দিচ্ছি।

(দ্বারপথে মহাকালের আদেশ ভেসে এল—'দাও।' শালিম ভিতরে চলে গেল। একটু পরে কুয়াশার স্বপ্ন প্রবেশ করল। তুহিনশুভ্র বোরখায় ঢাকা নারী-মূর্তি। মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে চলে গেল গেট পার হয়ে। বাবুল আর মোহিত সোমের কান্না ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে থেমে গেল। তরুণ যুবক আবার খাতায় মনোনিবেশ করলেন। একটু পরেই মিসেস পূর্ণেন্দু এসে দাঁড়ালেন গেটের কাছে। খাঁটি মেমসাহেব। নীল চোখ, কটা চুল 'বব' করে ছাঁটা, গায়ের রং লাল, ঘাঘরা-পরা। পায়ে হাই-হিল জুতো।)

মিসেস পূর্ণেন্দু। ভিতরে আসতে পারি?

(তরুণ যুবক উঠে গেলেন)

তরুণ যুবক। কে আপনি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। আমি মিসেস পূর্ণেন্দু রায়।

তরুণ যুবক। আপনি স্বপ্ন?

মিসেস পূর্ণেন্দু। সুভদ্র সেন বলে এক পাগল অধ্যাপক আমাকে নিয়ে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন। আমাকে তিনি দেখেননি কখনও, আমার গল্প শুনেছিলেন নানারকম। লোকটি কবি, নানারকম রং চড়িয়ে আমার নানা ছবি এঁকেছিলেন তিনি মনে মনে। প্রথম যে ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি আমি। আসল মিসেস রায় মরণের অন্ধকারে কবে হারিয়ে গেছে। আমি সুভদ্র সেনের স্বপ্ন, প্রথম স্বপ্ন।

তরুণ যুবক। আপনি স্বপ্নলোকে আসতে চান?

মিসেস পূর্ণেন্দু। তা ছাড়া আর কোথায় যাব!

তরুণ যুবক। সব শুনেছেন তো ?

মিসেস পূর্ণেন্দু। শুনেছি আমাকে যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তা হলে আমাকে নিঃশেষ করে দেবেন—এই তো ? আমার যিনি স্রষ্টা সেই সুভদ্র সেনও যখন নিঃশেষ হয়ে গেছেন, তখন আমারও নিঃশেষ হতে আপত্তি নেই।

তরুণ যুবক। আসুন তা হলে। ওই আসনে বসুন—

(মিসেস পূর্ণেন্দু একটি আসনে এসে বসলেন।)

আপনাকে দু'-একটি প্রশ্ন করতে পারি ?

মিসেস পূর্ণেন্দু। করুন।

তরুণ যুবক। আপনি যখন স্বপ্ন ছিলেন না, তখন কি ছিলেন আপনি ?

মিসেস পূর্ণেন্দু। প্রথমে আমি ছিলাম লণ্ডন শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নাম ছিল মার্থা গ্রীন। একটা চায়ের দোকানে চাকরি করতাম। সেইখানেই মিস্টার রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বড়লোকের ছেলে ছিলেন, প্রবল যৌবন ছিল তাঁর। আমি ছিলাম হ্যাংলা গরীবের মেয়ে, তাঁর সহচরী হয়ে গেলাম মাসখানেকের মধ্যে। তারপর যা যা ঘটল তা অশ্রাব্য। বলতে চাই না। ভালোর মধ্যে শুধু এই, শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করতে পেরেছিলাম। বিয়ে করে যখন ভারতবর্ষে এলাম তখন তাঁর স্বরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠল আমার কাছে। দেখলাম তিনি একটা বর্বর কামুক। একদিন একটা মেথরানীর সঙ্গে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। আমিও ছাড়লাম না, প্রতিশোধ নিলাম। আমাদের একটা বাবুর্চি ছিল তার সঙ্গে জুটে গেলাম আমি—

(দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সাঁড়াশি এগিয়ে এসে ধরল মিসেস পূর্ণেন্দুকে—তারপর নিক্ষেপ করল তাকে স্ফটিক পান-পাত্রে। আগুন জ্বলে উঠল তার ভিতর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেটের প্রান্তে দেখা গেল 'নি' এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে টকটকে লাল শাড়ি। মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা। চোখে মুখে অপরূপ হাসি।)

নি। (সহাস্যে) আমাকেও শেষ করে দিন, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন ?

তরুণ যুবক। কে আপনি ?

নি। আমি সুভদ্র সেনের নি।

তরুণ যুবক। আসুন ভিতরে। ওঁকে আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল। নি এসে ঢুকল। ঢুকে বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ফটিক পান-পাত্রটার দিকে চেয়ে রইল।)

নি। ওটা কি ?

তরুণ যুবক। স্ফটিক পান-পাত্র।

নি। পানীয় আছে নাকি কিছু ?

(এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল)

ওরে বাবা! নীলমতন কি রয়েছে খানিকটা। খুব গরম। কড়া মদ নাকি ? কি মদ বলুন না! নীল রঙের মদ তো কখনও দেখিনি।

তরুণ যুবক। আমি ঠিক জানি না। আপনার পরিচয় কি বলুন ?

নি। আমার পরিচয়? দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি নি। আমি নারী, আমি মোহিনী। আমি জীবনকে উপভোগ করেছি—এই আমার পরিচয়। আইনের দেওয়াল বার বার ডিঙিয়ে গেছি কল্পনার প্রেরণায়। অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছি, এই আমার পরিচয়।

তরুণ যুবক। আপনি কি স্বপ্নলোকে আসতে চান?

নি। না, বাস্তব নিয়ে আমার কারবার। বাস্তবলোকে আর ফিরে যাওয়া যায় না?

তরুণ যুবক। স্বপ্নলোক আর বাস্তবলোকের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল আছে একটা। সেটা লঙ্ঘন করবেন কি করে?

নি। (মুচকি হেসে) অনেক দেওয়াল তো লঙ্ঘন করেছি। আপনি কি স্বপ্ন?

তরুণ যুবক। হ্যাঁ।

নি। আপনার স্পর্শ পেলে আমি হয়তো অসাধ্যসাধন করতে পারব। আপনি তো সুন্দরও দেখছি। একটু সাহায্য করুন।

তরুণ যুবক। (সবিস্ময়ে) আমি সাহায্য করব? কিরকম সাহায্য—

(নি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে তরুণ যুবকের সামনে দাঁড়াল মুখ তুলে।)

নি। আমাকে আদর করুন একটু।

(বিস্মিত তরুণ যুবক কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে এগিয়ে এলেন। তারপর তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত রাখলেন।)

না—ওরকম নয়—এই রকম—

(সহসা তাকে জাপটে ধরে চুম্বন করল আবেগভরে। এর পর আশ্চর্য কাণ্ড হলো একটা। নি রূপান্তরিত হয়ে গেল একটা রঙীন আলেয়ায়। ভাসতে ভাসতে চলে গেল গেটের দিকে—তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

বাস্তবলোকেই ফিরে চললাম। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর এবার পার হতে পারব।

(গেট পার হয়ে উড়ে গেল সে। তরুণ যুবক অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় দ্বারপথে স্বয়ং মহাকাল প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু পবনদেব। পবনদেবের হাতে ছোট্ট একটি থলি। মহাকাল এসে স্মিতমুখে লজ্জিত তরুণ যুবকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মহাকালের চেহারা ধপধপে সাদা। মনে হয় দেহ বুঝি মর্মর-গঠিত।)

মহাকাল (অপ্রস্তুত তরুণ যুবকের দিকে চেয়ে।) খুব বেশী লজ্জিত হয়ো না। আমিও মদনবাণে জর্জরিত হয়েছিলাম একবার। মদনকে কিন্তু রেহাই দিইনি। তোমার রঙীন আলেয়াকেও দিইনি। পবন, কোথায় ছাইগুলো?

পবন। (সসম্ভ্রমে) এই যে। সব এই থলিতে সংগ্রহ করে এনেছি—

মহাকাল। ফেলে দাও ওটা ওই পান-পাত্রের মধ্যে। ফেলে দিয়ে তুমি চলে যাও নিজের কাজে।

(পবন থলিটি স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দিতেই সেটি আগের মতো অগ্নিদীপ্ত হয়ে উঠল, তারপর আবার ধারণ করল পূর্বমূর্তি। পবনদেব চলে গেলেন।)

তরুণ যুবক। আমি যে এ কাজের অযোগ্য তা তো প্রমাণিত হয়ে গেল। আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমিও যাই।

মহাকাল। নির্বিকারভাবে) যাও।

(তরুণ যুবক চলে গেলেন।)

মহাকাল। (নন্দী-ভৃঙ্গীর দিকে চেয়ে) আর কেউ আছে নাকি নীচে? থাকে তো পাঠিয়ে দাও।

নন্দী। একটি মেয়ে আছে কেবল।

মহাকাল। পাঠিয়ে দাও তাকে।

(রহস্য প্রবেশ করল। তার সর্বাঙ্গ পোড়া। হাতে সেই লাল রুমালটি রয়েছে। পিঠের দিকে লম্বা বেণীটা দুলছে। সেটা পোড়েনি। সে এসে ভক্তিভরে মহাকালকে প্রণাম করল।)

মহাকাল। কে তুমি?

রহস্য। আমি সুভদ্র সেনের ধর্মপত্নী রহস্য সেন।

মহাকাল। তোমার সর্বাঙ্গ পোড়া কেন?

রহস্য। আমি সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম।

মহাকাল। কেন?

রহস্য। স্বামীর উপর অভিমান করে। তিনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু কাজটা ভাল করিনি। অনুতাপ হচ্ছে এখন।

মহাকাল। অনুতাপ হচ্ছে কেন? স্বামী ভালো লোক ছিলেন?

(রহস্য চুপ করে রইল।)

উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রহস্য। আমি পতি-নিন্দা করব না।

মহাকাল। পতিকে তুমি ভালবাসতে? ভক্তি করতে?

(রহস্য আবার চুপ করে গেল।)

উত্তর দাও।

রহস্য। আমি তাঁকে ভালবাসতে পারিনি। ভক্তি করতেও পারিনি। এটা আমার অক্ষমতা। আমি নিজের রুচি ও পছন্দের ছাঁচে তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে ঢোকাতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছি। তাই আমার এত কষ্ট। তাই আমাকে পুড়ে মরতে হলো। আমি এতদিনে বুঝেছি কাউকে বিচার করবার অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকেই নিজের মতো নিজের স্বভাব অনুযায়ী বিকশিত হয়। আমার ফরমাশে কেউ আমার মতো হবে এটা প্রত্যাশা করা অন্যায়।

মহাকাল। স্বামীর যথেচ্ছাচারকে তাহলে সহ্য করা উচিত—এই তোমার মত?

রহস্য। এখন তো তাই মনে হচ্ছে। দেবতাদের যথেচ্ছাচার, অদৃষ্টের অত্যাচার, সবই তো মুখ বুজে সহ্য করি, স্বামীর বেলায় প্রতিবাদ করে লাভ কি। কোন লাভ হয় না। স্বামীকে ত্যাগ করে এলে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

মহাকাল। তুমি তোমার স্বামীর কাছে আবার ফিরে যেতে চাও?

রহস্য। যেতে চাইলেও তো পারব না। তিনি তো নেই।

মহাকাল। কি করবে তা হলে?

রহস্য। আমি স্বামীরই স্বপ্ন দেখতে চাই।

মহাকাল। কি রকম স্বপ্ন দেখবে? তোমার কথাবার্তা থেকে যতদূর মনে হচ্ছে তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন না। তাঁকে নিয়ে কি রকম স্বপ্ন দেখবে তুমি?

রহস্য। দেবতাদেরও নানা দোষ, নানা দুর্বলতার কথা পুরাণে পড়েছি, নানা ছবিতে নানা মূর্তিতে তাঁদের নানা রকম চেহারা দেখেছি, একটার সঙ্গে আর-একটার মিল নেই। কিন্তু তবু তাঁদের সম্বন্ধে স্বপ্ন বদলায়নি।

মহাকাল। কোন দেবতার স্বপ্ন দেখ তুমি?

রহস্য। শিবের। ছেলেবেলা থেকে শিবপুজো করেছি। এখনও রোজ শিবের স্তোত্র পাঠ করি, শিব হয়তো শুনতে পান না। কিন্তু আমি—স্বপ্ন দেখি।

মহাকাল। শিবের সম্বন্ধে তোমার স্বপ্নটা কি ধরনের?

রহস্য। তা তো বলতে পারব না। ছেলেবেলায় এক বুড়ো শিবের মন্দিরে পুজো দিতাম। সেখানে শিব শুধু একখানা পাথর, সেই পাথরকেই দয়াময় মনে করতাম। তারপর শিবের নানারকম ছবি দেখেছি। আমার স্বপ্নও বার বার বদলে গেছে। শেষে একবার হিমালয়ে বেড়াতে গেলাম, তখন মনে হলো হিমালয়ই শিব। হিমালয়ের যে-সব চূড়া আকাশে উঠে গেছে, যা সাদা বরফ দিয়ে ঢাকা, আমার স্বপ্ন এখন সেইসব চূড়াকে ঘিরে মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। জানি না আমার এ সব স্বপ্ন হয়তো মিথ্যে, আসল শিব হয়তো অন্যরকম। কিন্তু ওই স্বপ্ন দেখেই আমি সুখ পাই। স্বামীর সম্বন্ধেও ওইরকম স্বপ্ন দেখতে চাই আমি, স্বামীকে বিচার করতে চাই না, তাঁর স্বপ্ন দেখতে চাই। (সহসা সানুনয়ে) আপনি তার সুবিধে করে দেবেন একটু?

মহাকাল। এর জন্যে নরকে যেতে রাজী আছ?

রহস্য। আছি। আমি পাপী, আমার তো নরকে যাওয়াই উচিত।

মহাকাল। নরকে কিন্তু নিদারুণ কষ্ট। সে কষ্টের মধ্যে কি তুমি তোমার স্বামীর স্বপ্ন দেখতে পারবে?

রহস্য। চেষ্টা করব। চেষ্টা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন।

মহাকাল। তুমি হাতে ওই লাল রুমালটা নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কার রুমাল ওটা? তোমার স্বামীর?

রহস্য। বোধ হয় আমার স্বামীর কোন প্রণয়িনীর। স্বামীর বাক্সে রুমালটা পেয়েছিলাম। ছোঁয়া মাত্রই কিন্তু রুমালটা আমার হাতে সেঁটে গেছে। পরশুরামের হাতে যেমন কুড়ুল আটকে গিয়েছিল অনেকটা তেমনি। আমার ঈর্ষার আঠাই সম্ভবত রুমালটাকে আটকে রেখেছে। (সানুনয়ে) এটা খুলে নিতেন পারেন?

মহাকাল। এদিকে একটু সরে এস।

(রহস্য সরে আসতেই মহাকাল অনায়াসে তার হাত থেকে রুমালটি খুলে নিলেন। মহাকালের স্পর্শে কিন্তু রহস্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। একটা বিপ্লব ঘটে গেল যেন তার সর্বাঙ্গে।)

রহস্য। কে—কে—কে—আপনি?

(মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মহাকাল তাকে তুলে একটি আসনে শুইয়ে দিলেন। তারপর যা করলেন তা অদ্ভুত। প্রণাম করলেন তাকে। অনেকক্ষণ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর ইঙ্গিতে নন্দীকে ডাকলেন। নন্দী কাছে এলে বললেন—এঁকে সসম্মানে পার্বতীর কাছে নিয়ে যাও। নন্দী তাকে কাঁধে করে

তুলে নিয়ে গেল। মহাকাল লাল রুমালটি স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে ধ্বংস করে ফেললেন সেটিকে। তারপরই আর্ত হাহাকার আর অট্টহাসির অদ্ভুত অশরীরী একটা রূপ ভেসে এল গেটের ওপার থেকে।)

মহাকাল। ভৃঙ্গী, আর কেউ আছে নাকি নীচে?

ভৃঙ্গী। কেউ নেই। বাস্তবলোক থেকে ভেসে আসছে ওই চীৎকার।

অশরীরী চীৎকার। আমি সবিতা, আমি এখনও মরিনি, আমি এখনও তেহেরানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, পণ্য করেছি দেহকে, সঞ্চয় করেছি অনেক অর্থ, হয়েছে অনেক যশ, পেয়েছি অনেক অর্ঘ্য—কিন্তু তবু তৃপ্তি নেই। সুভদ্র সেন, কোথা তুমি, কোথা তুমি—কোথা তুমি, আমার কথা তোমাকে বলতে পারিনি কখনও—

(মহাকাল ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন—হঠাৎ চীৎকারটা থেমে গেল।)

ভৃঙ্গী। চীৎকার থেমে গেল।

মহাকাল। বজ্রাঘাতে এখনই মারা গেল মেয়েটি। ওর কষ্টের অবসান করে দিলাম।

(দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'কোটাল, কোটাল'। কোটাল প্রবেশ করলেন এসে।)

তেহেরানের রাস্তায় নীল শাড়ি পরা সাবিতা এখনি বজ্রাঘাতে মারা গেছে, তাকে তোমার ওই সাঁড়াশি কি আনতে পারবে এখানে?

কোটাল। নিশ্চয় পারবে।

মহাকাল। নিয়ে এস তাহলে। এনে ওই স্ফটিক পাত্রে নিক্ষেপ কর—সবাই একসঙ্গেই থাক।

(কোটাল অন্তর্ধান করলেন। সাঁড়াশি প্রলম্বিত হয়ে গেট পার হয়ে চলে গেল বাস্তবলোকের দিকে। পরক্ষণেই ফিরে এল সবিতাকে নিয়ে। সবিতার মৃত দেহটা শূন্যে ঝুলছে। মানুষ নয়, নীল শাড়িপরা একটা ঘুমন্ত পুতুল যেন। স্ফটিক পান-পাত্র তাকে গ্রাস করে ফেলল নিমেষে। আগুন জ্বলল, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব। দাঁড়িয়ে রইল স্ফটিকের পান-পাত্র স্ফটিক-শুভ্র শোভায়। এর পর প্রবেশ করলেন তরুণ যুবক। তাঁর হাতে সেই দু-খানা খাতা।)

তরুণ যুবক। এই খাতা দুটোর মধ্যেও কিছু কিছু স্বপ্নের আভাস আছে। পড়ে শোনাব আপনাকে?

মহাকাল। শোনাও।

তরুণ যুবক। প্রথমে মহুয়ার ডায়েরি থেকে পড়ছি কিছু—

মহাকাল। পড়।

তরুণ যুবক। (পড়তে লাগলেন) চারিদিকে এত ভিড়, তবু যেন মনে হয় একা আছি। আমার অন্তরতম সত্তা কাঁদছে। প্রগতির যুগে অনেক রকম অসুখের প্রতিকার আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এ কান্না থামাবার উপায় আবিষ্কার করেছে কি? ধর্ম? সে তো কুসংস্কার, মিথ্যে স্তোকবাক্যে নিজেকে সম্মোহিত করা। সাহিত্য? সাহিত্য কল্পনার কুসুম-কানন। কত রকম ফুল ফুটেছে, তাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে ভালো লাগে, কিন্তু বরাবর নয়। খানিকক্ষণ পরেই অন্তরের চিরন্তন

হাহাকার উদ্বেল হয়ে ওঠে আবার, মনে হয় আমি নিঃসঙ্গ, আমি একা। দাদু, মঙ্গলময়, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল, মোহিত সোম, সালিম সবাই ভালো, অথচ সবাই খারাপ। দু-মুখো মূর্তির মতো। মুখের আধখানা সুন্দর, আধখানা কুৎসিত, খানিকটা প্রদীপ্ত, খানিকটা অন্ধকার—

মহাকাল। থাক—আর পড়তে হবে না। আর একটাতে কি আছে, পড়—

তরুণ যুবক। নানারকম লিখেছেন ভদ্রলোক। খাতাটার নাম 'মেঘ'। প্রথম পাতাতেই একটা ধাঁধা এবং তার উত্তর। কে চটে গেলে আর আসে না? উত্তর—ঘুম।

এরপর একটা কবিতা—

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুর্গি
চড়াই শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ সমাজের এই নবশাখেরা
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ-ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখিদের করে দেবে ঠাণ্ডা।
ময়ূর, ফটিক জল, দোয়েল, হলদে পাখি,
মার্কিনে যাবে বলে খুঁজিতেছে ভিসা নাকি—
তিতির বটের দল
সবার নয়নে জল
খঞ্জন টিট্টিভ
ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ
থিরথিরা ছোট পাখি
কাঁপে শুধু থাকি থাকি
কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া
চোখ গেল চোখ গেল ডেকে ওঠে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুল কুল
শুধু কাঠঠোকরার শোনা যায় ঝঙ্কার
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও।
মাঝে মাঝে চুপে চুপে ডাকে—বউ কথা কও।
দরজী বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

এর পর ছোট একটু গদ্য—

আমরা কিছু জানি না এইটেই সবচেয়ে বড় সত্যি কথা। এক হিসেবে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনাও। জ্ঞানই মানুষকে অসুখী করে, অশান্ত করে। আমাদের কল্পনা নানারকম স্বপ্ন সৃষ্টি করে আমাদের মুগ্ধ করে রাখে খানিকক্ষণ। ভঙ্গুর সে স্বপ্ন ভেঙে যায়, আর একটা স্বপ্ন জেগে ওঠে। এই ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্নের নিত্য পরিবর্তনশীল

স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। শেষে গিয়ে যে মহাকাল-সাগরে আমরা মিশব তার স্বরূপ আমরা জানি না। না জেনে ভালই আছি। জানলে হয়তো ভয় পেতাম।

তারপর আর একটা কবিতা—

কেন জানি না মনে হচ্ছে
অনন্ত আকাশ-পথে চলেছে
পালকির সফর।
সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র
পাখি, ঘুড়ি, ধুলি, ধোঁয়া, গন্ধ—
সব পালকি।
প্রত্যেকেরই মাঝে
আছে বর, আছে বধূ
আর আছে সেই মধু
যার নাম প্রত্যাশা।
সবাই প্রত্যাশা করে আছে।
তাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে
যে বেয়ারারা
তারাও পালকি চড়ছে মনে মনে
বাইরে তা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু,
মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে
তাদের আর্তনাদ শুধু—
হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো।
তারা ছুটছে—কেবল ছুটছে—
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে—
গা দিয়ে ঝরছে ঘাম
ঘাম—ঘাম—কালঘাম।
চলেছে পালকির সারি
অগুনতি, অসংখ্য।

এর পর আছে—

মহাকাল। আর পড়তে হবে না। খাতা দুটো ফেলে দাও ওই পান-পাত্রের ভিতর। ওদের মধ্যে যে স্বপ্ন অমর তা মরবে না—

(তরুণ যুবক খাতা দুটি পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দিলেন। আগের মতোই প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সেটি খানিকক্ষণের জন্য। তারপর আবার পূর্ববৎ হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে এল পান-পাত্রের ভিতর থেকে, স্বপ্নলোকের দরজা দিয়ে উড়ে চলে গেল।)

মহাকাল। ওরা মরবে না। আর কেউ নেই তো ?

ভৃঙ্গী। না।

মহাকাল। এবার তাহলে পান-পাত্রটাকে সরিয়ে নিয়ে এস। আর খবর দাও অসম্ভব-সম্ভব-কারিণী কোন মহাবিদ্যাকে—

(তরুণ যুবক চলে গেলেন। ভৃঙ্গী বিরাট পান-পাত্রটিকে মহাকালের সামনে স্থাপিত করে গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটি রূপসী যুবতী প্রবেশ করলেন।)

মহাকাল। ও, ষোড়শী এসেছ? এই পান-পাত্রটিকে ছোট করে দাও, এতে যা আছে তা পান করব।

ষোড়শী। কি আছে এতে?

মহাকাল। বিষ।

(ষোড়শী পান-পাত্রটিকে স্পর্শ করতেই সেটি ছোট স্বচ্ছ একটি পান-পাত্রে রূপান্তরিত হলো। দেখা গেল তাতে নীল বিষ টলমল করছে।)

ষোড়শী। আবার বিষ পান করবেন?

মহাকাল। করতে হবে। এই আমার নিয়তি—

পানপাত্রটি তুলে সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন। তাঁর ঈষৎ নীল দুগ্ধ-ধবল কণ্ঠ আবার ঘোর নীল হয়ে গেল। ষোড়শী ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর চলে গেলেন ধীরে ধীরে। ভৃঙ্গী নীরবে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেম মহাকালের দিকে।)

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

তারপর অনেক অনেক দিন কেটে গেছে।

পূর্ণেন্দুবাবুর হলদে বাড়িটা ইঁটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ইঁটও আর দেখা যায় না। তার উপর গজিয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের গাছ অধিকাংশই অচেনা, চেনা শুধু তাদের সবুজ সতেজ প্রকাশটুকু। চেনা গাছ যে একেবারে নেই, তা-ও নয়। আকন্দ, ধুতুরা, বাঘ-নখ, নিম-অশ্বত্থের চারা, শিশু বট, ডুমুর গাছ, আসশ্যাওড়া। আর দু'পাশে দুটো দেবদারু গাছ—একটা খুব বড়, আর একটা তার চেয়ে ছোট, ভগ্নস্তূপের দু'ধারে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে এরা। সকলেরই সবুজ সতেজ প্রাণবন্ত উর্ধ্বমুখী প্রকাশ। পোকামাকড় পতঙ্গ প্রজাপতি টিকটিকি-গিরগিটিও আছে অনেক। সাপও আছে। আর আছে পাখিরা। সেই পাখিরাই, যারা সুভদ্র সেনকে ভোলাত একদিন। চড়াই শালিক টুনটুনি বুলবুলি নীলকণ্ঠ ফিঙে ল্যাজঝোলা হলদে পাখি দরজী ঘুঘু মোহনচূড়া বসন্ত-বউরি স্যাকরা পাখি চোর পাখি—সবাই আছে। মাঝে মাঝে ধনেশ পাখিও এসে বসে দেবদারু গাছে। লতাও আছে নানারকম। বিছুটি তেলাকুচা পুনর্নবা গুলঞ্চ নাম-না-জানা আরও কতরকম লতা। তাদের কতরকম ফুল, কতরকম ফল, কতরকম গন্ধ, কত অভিব্যক্তি চতুর্দিকে। নেই কেবল পূর্ণেন্দুবাবুর হলদে বাড়িটা। সুভদ্র সেন আর মহুয়াকেও কেউ মনে করে রাখেনি। সুভদ্র সেনের পুরাতন চাকর মারা গেছে অনেক দিন। তার একমাত্র পৌত্র কলকাতায় রিকশা টানে। সে সুভদ্রবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি। মানুষের ইতিহাসে সমাজের ইতিহাসে সুভদ্র সেন আর মহুয়া কোথাও নেই। মানুষের স্মৃতি

সহজেই অবলুপ্ত হয় বিস্মৃতির অন্ধকারে। তবু কিন্তু মনে হয় ওই বাড়িটার ভগ্নস্তূপ এখনও ভোলেনি ওদের।

গভীর রাত্রে যখন জোনাকিরা আলোকোৎসব করে দেবদারু গাছ দুটিকে ঘিরে, তখন ছোট দেবদারু গাছ থেকে শঙ্কিত কণ্ঠে কে যেন ডাক দেয়—'দাদু'। বড় গাছটা চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর দ্বিধাভরে সেও সাড়া দেয়—'কি'। সব চুপচাপ হয়ে যায় আবার। অসংখ্য জোনাকি জ্বলতে থাকে নীরবে। অনেকক্ষণ পরে আবার শোনা যায় ভীরু সশঙ্কিত ডাক—দাদু। অনেকক্ষণ পরে বড় দেবদারু আবার দ্বিধাভরে উত্তর দেয়—কি।

অনেকে হয়তো বলবেন রাত-জাগা পাখি ওরা। কিন্তু—।

রৌরব

নূতন ভাড়া-করা দোতলার ফ্ল্যাটের জানলায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অমা। চেয়েছিল পার্কটার দিকে। ল্যাম্প-পোস্ট, তালগাছ আর নানা রঙের বাড়ির দিকে চেয়েছিল সে। আর চেয়েছিল পার্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তাটার দিকে। ওই রাস্তা দিয়েই তার স্বামী চন্দ্রভূষণ আসবে। সে ইণ্টারভিউ দিতে গেছে চাকরির জন্য। দশটার আগেই বেরিয়ে গেছে দু'খানা বিস্কুট আর চা খেয়ে। দুটো বেজে গেল, এখনও সে এল না। তবে কি···। না, ইণ্টারভিউ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো বোঝা যাবে না সে চাকরিটা পাবে কি না। খবরটা পরে আসবে, বেশ কিছুদিন পরে। তবে? আসছে না কেন এখনও? অমাও না খেয়ে বসে আছে এখনও তার জন্যে। কুকারটা খোলেনি এখনও। কুকারেই রেঁধে খায় আজকাল তারা। দিনে ভাতে-ভাত আর রাত্রে পাঁউরুটি আর আলুভাজা। চাঁদুর প্রতিজ্ঞা, যতদিন না চাকরি পাব ততদিন মাছ-মাংস-দুধ কিনব না। পয়সা যে একেবারে নেই তা নয়। অমা তো গান-বাজনা শিখিয়ে মাসে দুশো, টাকা রোজগার করে। চাঁদু বলেছে—ইচ্ছে করলে তুমি তোমার জন্য মাছ-মাংস কিনতে পার, কিন্তু আমি যতদিন না রোজগার করছি ততদিন আমি নিরামিষ খাব। একগুঁয়ে চাঁদুর মুখটা মনে পড়ল অমার। সত্যিই ভারি একগুঁয়ে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে সে ত্যাগ করেছে তাকে বিয়ে করবার জন্য। প্রথম পরিচয়ের ছবিটাও ফুটে উঠল তার মনে। অমা তখন কলেজ থেকে ফিরছিল। দাঁড়িয়েছিল ট্রামের জন্য। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা নুব্জদেহ বুড়ি রাস্তা পার হতে গিয়ে পড়েছে একটা চলন্ত ট্রামের সামনে আর ওদিক থেকে আসছে একটা ছুটন্ত ট্যাক্সি। বুড়িকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিল অমা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে। বাঁচাতে পেরেছিল বুড়িকে। বুড়ির হাঁটুর কাছটা ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল খুব। ট্রামটা থেমে গিয়েছিল, ট্যাক্সিটাও। চারিদিকে লোকের ভিড়। অমারও কাপড়টা ছিঁড়ে গিয়েছিল ট্যাক্সিটার ভাঙা মাডগার্ডের খোঁচায়। ট্যাক্সিতে ছিল চাঁদু। সে নেমে এসে বলল—'চলুন, ওকে হাসপাতালে পেঁছে দিই। আপনিও আসুন।' হাসপাতালে পেঁছে দেখা গেল বুড়ির বেশি লাগেনি। 'ফার্স্ট-এড' দিয়ে ছেড়ে দিলেন তাঁরা বুড়িকে। বুড়ি বললে—'আমি হাঁটতে পারছি না। যাব কি করে।' 'কোথায় থাক তুমি'—জিজ্ঞেস করেছিল চাঁদু। 'চিৎপুরে থাকি আমি'। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছিল চাঁদু। আর একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলে সে। বুড়িকে বলল—'চল তোমাকে পেঁছে দিই। আপনিও আসবেন কি? আসুন না।' অমা গিয়েছিল। দেখা গেল বুড়ি এক বড়লোকের গাড়ি-বারান্দার নীচে থাকে। ভিক্ষে করে খায়। তাকে নামিয়ে দেবার পর বুড়ি আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল—'আমার পা খোঁড়া হয়ে গেল, এখন আমি কি করে ভিক্ষে করে বেড়াব বাবু।' চাঁদু ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল—'আর একটি টাকা আমার কাছে আছে। সেইটেই নাও তুমি। পরে এসে তোমার আবার খোঁজ করব।' তারপর অমার দিকে ফিরে বলল—'আমাকে তো হেঁটে ফিরতে হবে। পয়সা ফুরিয়ে গেছে। আপনি কোথায় যাবেন?' অমা বলেছিল, আমি শ্যামবাজারে থাকি। আমার কাছে টাকা আছে কয়েকটা, একটা ট্যাক্সিই ডাকুন আবার। আপনি কোথায় থাকেন? 'বউবাজারের

একটা মেসে', হেসে উত্তর দিয়েছিল চাঁদু। 'এক জায়গায় ট্যুশনি করতে গিয়েছিলাম। আমার ছাত্রটি বড়লোক, সে আমাকে মোটর পাঠিয়ে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়। আজ মোটর খারাপ ছিল বলে ট্যাক্সি করে দিয়েছিল। তারপর দেখুন কি কাণ্ড। অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

প্রথম দিনের সাক্ষাতের এই চিত্রটা ফুটে উঠল অমার মনে। সেইদিনই কি সে ভালোবেসেছিল তাকে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। তাকে ভালো লেগেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কত লোককেই তো তার ভালো লেগেছে জীবনে, তাদের কি বিয়ে করেছে সে? না, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অনেক আলো, অনেক অন্ধকার, অনেক স্বপ্ন, অনেক ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটেছে সেই প্রথম দেখার উপর। দ্বিতীয় দেখা অনেকদিন পরে ঘটেছিল। কফি হাউসে। দেখা হওয়ামাত্রই সে নমস্কার করে এগিয়ে এসেছিল। পাশের খালি চেয়ারটায় বসে হেসে বলেছিল, 'যাক, আবার আপনার নাগাল পেয়ে গেলাম। সেদিন যখন আপনি আমাকে পেঁছে দিয়ে চলে গেলেন তখন আপনার ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আর বোধ হয় দেখা হবে না। যাক, আবার আপনার নাগাল পেয়ে গেলাম। এখন আপনার ঠিকানাটা বলুন দেখি।'

"আমার ঠিকানা চাইছেন কেন?"

"যদি দরকার হয় যাব আপনার কাছে।"

"আমার কাছে যাওয়ার কি দরকার হতে পারে তা তো বুঝতে পারছি না।"

"হয়তো দরকার হবে না। তবু ভালো লোকের ঠিকানা টুকে রাখা ভালো। যদি কোনদিন যুগপৎ ট্রাম আর ট্যাক্সির মাঝখানে পড়ে যাই, স্মরণ করব আপনাকে।"

"আমি কিন্তু ভালো লোক নই। লোক চেনা কি অত সোজা?"

"মোটেই সোজা নয়, খুব শক্ত। আপনি কিন্তু সেদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আপনার আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছিল।"

অমা হাসিমুখে বসেছিল, কোনও উত্তর দেয়নি।

চাঁদু নিজেই বলেছিল, "আমি কিন্তু এই সময় রোজ এখানে আসি, আর মেসে ফিরি রাত ন'টার সময়।"

নিজের পকেট-বুকে তার ঠিকানাটা টুকে নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—"আপনার নামটা তো জানি না, বলুন সেটাও টুকে রাখি।"

"অমা রায়।"

"অমা? এমন ফরসা মেয়ের নাম অমা কে রেখেছিল!"

"বাবা।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবার কথা মনে পড়েছিল তার হঠাৎ। সেই মুহূর্তেই ঠিকও করেছিল, বাবার সম্বন্ধে আর কিছু সে বলবে না।

"আমার নাম নিশ্চয়ই জানেন না—জানবার কথাও নয়। অখ্যাত লোক আমি। আমার নাম চন্দ্রভূষণ। চাঁদু বলে ডাকে সবাই।"

তারপরে হেসে বলেছিল, "আচ্ছা, উঠি আজ। নমস্কার।"

জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এলোমেলো কত কথাই না মনে হচ্ছিল অমার। সেও তো বাড়ির সকলের অমতে বিয়ে করেছিল চাঁদুকে। মা বলেছিলেন,

'ও ছেলে কি তোর উপযুক্ত? উনি থাকলে ও কি সাহস করে একথা বলতে পারত ও'র সামনে? দেখতেও তো সুন্দর নয়, কাটখোট্টা গোছের চেহারা। নিজের বংশ-পরিচয় দিতে চায় না। বলে, আমার পরিচয় আমিই। এ আবার কেমন কথা!' দাদারও মত ছিল না। দাদা বলেছিলেন, 'ছেলেটি বিদ্বান বটে, ওর বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, আমি ওর জন্যে পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। সে যদি আমাদের অমতে বিয়ে করে তাহলে আমরা খুব দুঃখিত হব। আশা করি আপনাদের আচরণ আমাদের পারিবারিক সুখশান্তির অন্তরায় হবে না।' এ চিঠির উত্তরে আমাকে লিখতে হয়েছে, এ বিয়েতে আমাদের মত নেই। তবে দু'জনেই লেখাপড়া শিখেছে, দু'জনেরই বয়স একুশ বছর হয়ে গেছে, তবে যদি স্বেচ্ছায় কিছু করে সেটাকে আইনত বাধা দেওয়া যাবে না। তবে এটা জেনে রাখুন, আমরা এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্রয় দেব না। আমি অমাকে সে কথা বলে দিয়েছি, আপনার ছেলে আমার কাছে আসেনি। শুনলাম, মায়ের সঙ্গে একদিন দেখা করেছিল, মা-ও মত দেননি।'

অমার মনে পড়ল, সে জোর করেই চাঁদুকে এনেছিল তার মায়ের কাছে। চাঁদু কিন্তু বিয়ের কথা কিছু বলেনি। মা যখন তার পরিচয় জানতে চাইলেন তখন সে বলেছিল, আমার পরিচয় আমিই। এর বেশি জেনে কি করবেন? আমার সঙ্গে আমার বাড়ির লোকেদের শত্রুতা, তাদের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, তাদের পরিচয়ের জৌলুস দিয়ে নিজেকে সাজাতে চাই না।

মা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অমাও হয়েছিল। অমাকেও সে বাড়ির পরিচয় দেয়নি। বলেছিল, আমি বাংলা দেশের মানুষ। এই আমার একমাত্র পরিচয়। আমি বাঙালী, ভারতবাসী।

এই লোককে বিয়ে করেছিল অমা। বিচার-বিবেচনার নিক্তিতে ওজন করে করেনি। হঠাৎ করেছিল একদিন। মনে মনে সে প্রত্যাশা করেছিল অনেকদিন, এ প্রত্যাশার প্রস্তুতিপর্বও চলেছিল অনেকদিন ধরে, কিন্তু মুখে সে বলেনি কিছু। কিন্তু ভালো লাগছিল তার চাঁদুকে। ক্রমশই বেশি করে ভালো লাগছিল। বিশেষ করে ভালো লেগেছিল, যখন তার 'হবি'র কথাটা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল তার কাছে। অনেকদিন আলাপের পরও এ কথাটা জানতে পারেনি অমা। চাঁদু নিজের কথা কখনও কিছু বলে না। সে টুাশনি করে আর মেসে থাকে, এর বেশি কোনও খবর অমা জানত না অনেকদিন। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে রাস্তায়, কফি হাউসে, ট্রামেও হয়েছিল একবার। কিন্তু নিজের কথা সে কিছু বলেনি কোনদিন। একদিন হঠাৎ এসেছিল তাদের বাড়িতে। রবিবার ছিল সেদিন। অমা আশা করেনি যে চাঁদু আসবে। নীচে বসবার ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল, চাঁদু বসে আছে। হেসে বলল, "তোমার বাড়ি দেখতে এলাম। তোমার মা-বাবা কোথায়? আর কে আছেন বাড়িতে? একজন দাদা আছেন বলছিলে না?"

"আমার বাবা তো নেই।"

"ও, জানতাম না তো। মা কোথায়? দাদা কোথায়?"

"দাদা মাকে নিয়ে কালীঘাটে গেছেন।"

"একটু আলাপ করব বলে এসেছিলাম, এ পাড়ায় এসেছিলাম, একটা ফোটোগ্রাফের

দোকানে। হঠাৎ মনে হলো তোমাদের বাড়িটা তো কাছেই। চলে এলাম। আচ্ছা উঠি তাহলে—"

"এসেছেন যখন বসুন না একটু। চা করে দেব ?"

"না। চা আমি খাই না।"

চাঁদুর হাতে বড় একটা ফোটো অ্যালবাম ছিল।

"ফোটো তোলার শখ আছে নাকি ?"

"আমার বন্ধুদের ফোটো তুলে রাখি—"

অ্যালবামটা টেবিলের উপর রেখে একটু হাসল সে।

"বন্ধুদের ফোটো তুলে রাখেন ? আমার সঙ্গে তো বন্ধুত্ব করেছেন, শেষকালে আমার ফোটোও তুলতে চাইবেন না কি !"

"না, না। এ অ্যালবামে যাদের ফোটো আছে, তাদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা তোমার নেই। কিংবা এটাও বলা যায় তোমার সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা এদের নেই।"

"কি রকম ? কাদের ফোটো তুলেছেন ? দেখতে পারি ?"

"দেখ !"

খাতাটা খুলেই চমকে উঠেছিল অমা।

প্রথমেই একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীর ছবি। সভয়ে নির্নিমেষে সে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা তার মনে জেগেছিল সে কথাটা বলবার উপায় ছিল না। সব ছবিগুলি উলটে-পালটে দেখল সে। সব ভিখারীর ছবি। কানা খোঁড়া দরিদ্র জীর্ণ শীর্ণ, বুড়ো-বুড়ি, জোয়ান, কিশোর-কিশোরীর দল।

"এরা আপনার বন্ধু ?"

"এরাই আমার বন্ধু। এটা আমার 'হবি' বলতে পার। লোকে টিকিট সংগ্রহ করে, প্রজাপতি সংগ্রহ করে, আমি এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, এদের ফোটো তুলে রাখি। ইতিহাসও লিখে রাখি এদের—"

অমা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ কিসের যেন একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এমন একটা জগতে গিয়ে হাজির হলো যা সে আগে দেখেনি। গিয়ে কিন্তু চমৎকৃত হয়ে গেল, অভিভূত হয়ে পড়ল।

"আপনি এদের ইতিহাস জানেন ?"

"পুরো জানি না। যে যতটা বলেছে তাই টুকে রেখেছি, সবাই সবটা হয়তো বলেনি। কেউ কেউ মিথ্যে কথাও বলে থাকতে পারে।"

"প্রথমেই ওই যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা রয়েছে—তার নাম কি, তার ইতিহাস জানেন আপনি ?"

"নামটা শ্রীধর। শ্রীধর পাল। সব দিক থেকেই দুর্ভাগা বেচারা। বললে—তার ছেলে মেয়ে কেউ নেই। থাকলে হয়তো রাস্তায় বসতে হতো না।"

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অমা। তার মনে যা হচ্ছিল তা প্রকাশ করে বলবার উপায় ছিল না তার। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকাও অশোভন মনে হচ্ছিল, তাই সে আবার বলল—"আশ্চর্য 'হবি' তো আপনার। ভিখারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেড়ান ?"

"একটু যদি ভেবে দেখ তাহলে আশ্চর্য হবে না। ওরা অবশ্য লেবেল-মারা ভিখারী। ওদের দেখলেই চিনতে পারা যায়, ওরা নিজেদের পরিচয় কোনও ছদ্মবেশ দিয়ে ঢেকে রাখে না। কিন্তু আমরা কি ভিখারী নই? এমন কি যাঁরা আমাদের শাসনকর্তা তাঁরাও তো ভোট ভিক্ষে করে বেড়ান! আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেরই মুখোশের তলায় অনুগ্রহপ্রার্থী ভিক্ষুকদের দেখতে পাও না তুমি? আমরা সবাই তো ভিক্ষুক। আমাদের মহাপুরুষরাও অনেকে ভিক্ষুক। এমন কি আমাদের মহাদেবও।—এই ভিক্ষুকদের দলে সব রকম মানুষ আছে। কিন্তু সবাইকে দেখে ভিক্ষুক বলে চেনা যায় না। যাদের চেনা যায় আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করি। খুব বাজে 'হবি' বলে মনে হচ্ছে কি? এতে একটা লাভ হয়েছে সেটা তো দেখতে পাচ্ছি—"

"কি লাভ!"

"তোমার সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্ব। তুমি যদি সেদিন ওই বুড়ি ভিখারীটাকে বাঁচাবার জন্যে না ঝাঁপিয়ে পড়তে তাহলে তোমার নাগালই পেতাম না আমি। তোমার দেখা পেলেও তোমার সঙ্গে কথা কইতাম না। কত মেয়ের সঙ্গেই তো রোজ দেখা হয়। যাক, এখন উঠি। আর একদিন আসা যাবে। তোমার মা আর দাদার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে।"

"আপনি আপনার ভিখারীদের ইতিহাসটা আমাকে পড়তে দেবেন?"

"দেব। কিন্তু একটি শর্তে।"

"কি বলুন।"

" 'আপনি'র ভব্য পরদাটা সরিয়ে ফেলতে হবে। 'তুমি' বলবে আমাকে এখন থেকে।"

অমা মৃদু হেসে ঘাড় হেঁট করল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখ তুলে বললে, "বেশ তাই হবে"—তারপর—নিজের অজ্ঞাতসারেই সম্ভবত—পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল তার মুখের দিকে। অতি কুৎসিত কদাকার মুখ। আদিম অসভ্য মানুষদের মুখের মতো। রং শুধু কালো নয়, মাঝে মাঝে নীলচে হয়ে গেছে। বিশেষত গালের দু'পাশে আর ঠোঁটের নীচে। চোখের দৃষ্টি—সমুৎসুক। মনে হলো একটু হাসির ছোপও যেন লেগেছে তাতে। অমার মনে হলো, অপূর্ব। অমা রূপসী, কিন্তু সে-ও মুগ্ধ হয়ে গেল। যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষ প্রকৃত রূপকে আবিষ্কার করে সে দৃষ্টি চোখে থাকে না, থাকে মনের ভিতর, বিবেকের কষ্টিপাথরে তার যাচাই হয়।

"ইতিহাসের খাতাটা কবে পাব?"

"দিয়ে যাব একদিন।"

"তোমার ওই অ্যালবামে কি সব ভিখারীদের ফোটোই তোলা আছে!"

"না। সকলের ফোটো তুলতে পারিনি। সুযোগ হয়নি, তাছাড়া ফোটো তুলতে পয়সাও তো খরচ হয়। আমি যা রোজগার করি তাতে কুলোয় না।"

"তুমি ট্যুশনি ছাড়া আর কিছু কর না?"

"করবার সুযোগ পাইনি। আমার ডিগ্রি আছে, কিন্তু এ দেশে শুধু ডিগ্রি থাকলেই চাকরি হয় না। হলেও সে চাকরি টেকে না। পিছনে মুরুব্বি থাকা চাই।

আমার তো তা নেই। আমি কাউকে খোশামোদ করতে পারি না। টাকা দিয়ে শুনেছি বশ করা যায় অনেককে। কিন্তু আমার তত টাকাও নেই। থাকলেও অবশ্য ওপথে আমি যেতাম না। তাই ক্রমাগত ইণ্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি, আর বিজ্ঞাপন হাতড়াচ্ছি। এখন কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে পড়াই, তাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় কোনক্রমে।"

"তোমার বাবা—"

"না, আমার বাড়ির খবর কিছু বলব না। পরে জানতে পারবে হয়তো। হয়তো বলছি এই জন্যে যে, তোমার সংগে আমার সম্পর্কটা এখনও তেমন দানা বাঁধেনি। কেমিস্ট্রির ভাষাতে বললে বলতে হয় অ্যামরফাস্ স্টেজে (amorphous stage) আছে, ক্রিস্ট্যালাইজড (crystallised) হয়নি। যদি হয় তখন সবই জানতে পারবে। আজ চললুম। আমার খাতাটা দিয়ে যাব একদিন। ভিখারীদের কাহিনী পড়ে মজা পাবে অনেক। সেদিন তুমি যাকে বাঁচিয়েছিলে তার নাম থুতনি। বুড়ি বেশ রসিক। ও যা বলেছে লিখে রেখেছি। খাতাটা দিয়ে যাব, পড়ে দেখো।—এখন চললুম।"

সেদিনও অমা জানতে পারেনি যে, প্রত্যেক ভিখারীকে সে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য দেয়। না, চাঁদুর সম্বন্ধে বিয়ের আগে বিশেষ কিছুই জানত না সে।

অমা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। সন্ধ্যাবেলায় তাকে গান শেখাতে যেতে হবে। চোখ বুজে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। ঘুম কিন্তু এল না। একটু পরে উঠে পড়ল আবার। আবার দাঁড়াল জানলায় গিয়ে। হঠাৎ নজর পড়ল, তার বাড়ির সামনে যে পোড়ো সবুজ জায়গাটা আছে তাতে এক জোড়া ঘুঘু চরছে। অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নেই, আপন মনে চরছে। আর একটু দূরে এক জোড়া শালিক। অমার মনে হলো, ওদের কোনও সমস্যা নেই, যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট।

এমন সময় দূরে দেখা গেল চাঁদুকে। মোটরে করে আসছে। তার সঙ্গে আর একজন কে যেন। ভদ্রলোকের মাথার চুল ধবধবে সাদা।

অমা ছুটে নীচে নেমে গেল।

"এত দেরি হলো যে?"

"এঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যে কারখানায় আমি চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম সেখানে ইনি একজন ডিরেকটার। তোমার বাবার বন্ধু একজন।"

অমা প্রণাম করে বললে, "আসুন—"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক বললেন, "বাবাকে তোমার মনে আছে?"

"আছে।"

"উনি যখন চলে যান তখন তোমার বয়স কত ছিল?"

"বারো—"

"ও, তাহলে তো ভালো করেই মনে থাকবার কথা।"

অমার বুকের ভিতরটা দুরদুর করে উঠল। চাঁদুকে বাবার কথা সব বলে দিয়েছেন নাকি ভদ্রলোক।

"আপনাকে আমি কিন্তু চিনতে পারছি না—"

"আমি তোমার বাবার সহপাঠী। স্কুল-কলেজে একসংগে পড়েছি। ওকালতিও

একসঙ্গে পাস করেছি। কিন্তু ও যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করল, তখন আমার তেমন প্র্যাকটিশ জমল না। ও কিন্তু তরতরিয়ে উঠে গেল। আমি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা ধরলুম। ব্যবসাসূত্রে প্রায়ই এদেশে-ওদেশে যেতে হতো। তবু মাঝে মাঝে গেছি তোমাদের বাড়ি। তোমার বাবাও এসেছে আমার আপিসে। শেষ যেবার এসেছিল সেটা বোধ হয় ন'বছর আগে। আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে একদিন। তোমাদের বাড়িতে গিয়ে খবর পেয়েছিলাম তোমার দাদার কাছে যে, তুমি চন্দ্রভূষণবাবুকে বিয়ে করেছ। আমাদের আপিসে আজ শুনলুম, আমাদের নূতন ম্যানেজার পোস্টের জন্য যে ক'জন প্রার্থী আছেন তার মধ্যে আছেন একজন চন্দ্রভূষণ মৌলিক। ইন্টারভিউ হয়ে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম চন্দ্রভূষণবাবুকে—আপনি কি অমাকে বিয়ে করেছেন? যখন তিনি হ্যাঁ বললেন তখন ভারি আনন্দ হলো। কৌতূহলও হলো একটু। ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাবার পর চন্দ্রভূষণবাবুকে বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। তারপর আপিসের কাজকর্ম সেরে চলে এলাম ওঁর সঙ্গে। উনিই আমাদের আপিসের ম্যানেজার হবেন ঠিক করে ফেলেছি আমরা। খুব খুশী হয়েছি আমি এতে। উনি তিনটে ইয়োরোপীয় ভাষা জানেন, এতে আমাদের খুব সুবিধে হবে। আর বিশেষ আনন্দিত হয়েছি, উনি আমার বন্ধু বিষ্ণুর জামাই বলে।..."

"আপনার নামটি কি?"—অমা সোৎসুকে জানতে চাইল।

"আমার নাম সিদ্ধেশ্বর মিত্র। বিষ্ণু আমায় সিধে বলে ডাকত।"

অমাদের ফ্ল্যাটে দু'টি মাত্র ঘর। বিছানাতেই এসে বসলেন সিদ্ধেশ্বর মিত্র। দু'টি চেয়ার ছিল বসবার ঘরে। শোবার ঘরেই ঢুকেছিলেন সিধুবাবু।

"আপনি ও-ঘরে চলুন।"

বসবার ঘরে নিয়ে গেল তাঁকে অমা।

"এইখানে বসুন। আপনার জন্যে চা করে দিই—"

তারপর চাঁদুর দিকে চেয়ে বলল—"তুমি কিছু খেয়েছ কি। কিছু খেয়ে যাওনি তো?"

"আমি সন্ধ্যার পরই খাব। আমাকে একটু চা দাও এখন।"

অমা বেরিয়ে গেল।

"আপনি মাত্র দুটো রুম নিয়েই থাকেন?"

"আপাতত তাই আছি। আমাদের দু'জনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট, তবে আপনারা যদি চাকরিটা আমাকে দেন, আপিস থেকে একটু দূর হবে। বাসে করে যেতে অন্তত—"

"'বাসে' করে আপনাকে যেতে হবে না। আমাদের আপিসের গাড়ি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে। ম্যানেজারের ব্যবহারের জন্যে আমাদের আলাদা একটা গাড়ি আছে। আপনাকে আর একটি প্রস্তাব দিতে পারি। আমাদের ম্যানেজার হেমবাবু যে বাড়িতে থাকতেন সেটি খালি পড়ে আছে তাঁর মৃত্যুর পর। আমরাই ভাড়া দিচ্ছি এখন, কারণ আপিস থেকেই বাড়িটি নেওয়া হয়েছিল তাঁর জন্যে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন সেই বাড়িতে যেতে পারেন—"

"তাঁর পরিবারবর্গ কোথায় আছেন?"

"তিনি অবিবাহিত লোক ছিলেন। আগে অধ্যাপনা করতেন, পরে কিছুদিন রাজনীতিও করেছিলেন। তারপর আমাদের আপিসের ম্যানেজার হয়েছিলেন। যেমন বিদ্বান তেমনি সচ্চরিত্র লোক ছিলেন তিনি। আপনার শ্বশুরের সঙ্গেও আলাপ ছিল তাঁর। আপনিও ওঁর খালি বাড়িটাতেও যেতে পারেন। এ ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত?"

"মাসে দেড়শ' টাকা।"

"ওটার ভাড়া দিই আমরা মাসে একশ' টাকা। অনেকদিন আগে থেকে নেওয়া ছিল, এখন ওর ভাড়া তিনশ' টাকার কম হবে না। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনি আমার বাল্যবন্ধু বিষ্ণুর মেয়ে অমাকে বিয়ে করেছেন। বিষ্ণু একজন নামজাদা অ্যাডভোকেট ছিল। এই শহরে তার খান-কয়েক বাড়ি আছে। ব্যাংকে নগদ টাকাও আছে অনেক। আপনি তার জামাই। আপনি কি—"

"না, আমি আমার শ্বশুরবাড়ির কোনও দাক্ষিণ্য লাভ করিনি। তাঁদের অমতেই আমি অমাকে বিয়ে করেছিলাম। ওঁরা কেউ বিয়েতে যোগ দেননি। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল আমাদের।"

"ও, তাই নাকি!"

এই সময় অমা এসে প্রবেশ করল।

"আপনারা আসুন। চা দিয়েছি—"

দুটি 'রুম' ছাড়াও ছোট যে 'ডাইনিং স্পেস'টি ছিল সেখানে ছোট টেবিলও ছিল একটি। তারই উপর খাবার দিয়েছিল অমা।

২

অমার বাবা শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় নানা সময়ে নানা লোককে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলি পড়লে তাঁর চরিত্রের যে চেহারাটা আমরা দেখতে পাব তা অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ চেহারা নয়। তীক্ষ্নবুদ্ধি-সম্পন্ন আইনজীবীর প্রতিভার ছাপ এ চিঠিগুলিতে নেই, এগুলির আবেদন নিতান্তই মানবিক। সব চিঠিগুলিই ন'বছর আগে লেখা। ন'বছর ধরে তাঁর আর কোনও চিঠি কেউ পায়নি। ন'বছর ধরে তাঁর কোনও খবরও কেউ জানে না। তিনি একদা হঠাৎ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কেন নিরুদ্দেশ হয়েছেন তা তাঁর চিঠি থেকেই বোঝা যাবে। ন'বছর কিন্তু তাঁর কোনও খবর চেষ্টা করেও পাওয়া যায় নি।

প্রথম চিঠিটা লিখেছিলেন তাঁর স্ত্রী অতসীবরণীকে, অমার মাকে ঃ

সবুজ বনের সাকী। এই সম্বোধন করেই বোধহয় তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম। এখন আমাদের বন আর সবুজ নেই, সংসারের ঝড়ে-ঝাপটায় ধূসর হয়ে গেছে। ওমর খৈয়ামের সাকী তাঁর কাব্যের স্বপ্নলোকে চিরযৌবনা হয়ে আছেন। সংসারের সাকী কিন্তু চিরযৌবনা থাকতে পারে না, তুমি এখন ঠাকুমা হয়েছ, তোমার চুল পেকেছে,

দাঁতও পড়েছে, মুখে জরার চিহ্নও দেখা দিয়েছে, তোমাকে আর সাকী বলা শোভা পায় না। প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলো কত শীঘ্র এল আর চলে গেল। এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি যেন চোখের সামনে দিয়ে এল আর মিলিয়ে গেল শূন্যে। নববধূ হয়ে তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমার কানে ছোট ছোট দু'টি হীরের দুল দুলত—সে দু'টি এখনও কি আছে তোমার কাছে? সেই নীলাম্বরী শাড়িটা? তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি, আজ মনে হচ্ছে, একদিন যা সত্য ছিল আজ তা মিথ্যা। আজ মনে হচ্ছে দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা কর্তব্য সবই মূল্যহীন। মূল্যবান শুধু স্বার্থ, মূল্যবান শুধু বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাটা, আমার যা কিছু তাকে আঁকড়ে ধরে থাকাটাই একমাত্র কর্তব্য। এই 'আমার'-এর গণ্ডি কত বড়? বাবা-মা কি সে গণ্ডিতে পড়ে? স্বার্থের সঙ্গে যখন সংঘাত বাধে তখন পিতা-পুত্র তফাত হয়ে যায়। অনেক সময় সেই তফাত হয়ে যাওয়ার আগে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়। আমি সে তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাইলাম না। মানে মানে সরে এলুম। তোমাদের ছেড়ে চলে আসতে আমার যে কষ্ট হয়নি, একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কষ্ট খুবই হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈরাগ্যও এসেছিল মনে। সে বৈরাগ্য আমাকে অনেকটা শক্তি দিয়েছে। সে আমাকে শিখিয়েছে, একা পৃথিবীতে এসেছিলে, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে এতদিন কি সুখ পেলে? দিনকতক একা থেকেই দেখ না, কেমন লাগে। ভালই লাগছে। যে কোনও ত্যাগের সঙ্গে খানিকটা সুখ জড়িয়ে থাকে। শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকীকে ত্যাগ করেছিলেন তখনও তাঁর মনে একটা সান্ত্বনা নিশ্চয়ই ছিল যে, যে দুঃখ তিনি ভোগ করেছেন তা কর্তব্য পালনের জন্য। আমিও কর্তব্য পালনের জন্যই তোমাদের ছেড়ে এসেছি। কিন্তু আমি নির্বিকার হতে পারিনি এখনও। তোমাদের জন্যে মন কেমন করছে। বিশেষ করে তোমার জন্যে, অমার জন্যে আর দাদুর জন্যে। নীলু যেদিন দাদুকে আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে বলল—তুমি আর ওকে কোলে নিও না, সৌম্যেন বার বার মানা করে গেছে, তবু তুমি শোন না কেন। আমি কোনও দিনই তাকে ইচ্ছা করে কোলে নিইনি, আমি বসলেই সে আমার কোলে এসে চড়ত, আমার গলা জড়িয়ে ধরত। তাকে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু নীলুকে কোনও কথা আমি বলিনি। কিন্তু সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। শেষকালে দেখলাম তুমিও আমাকে ছুঁতে ইতস্তত করছ। বাড়ির ঝি আমার কাপড় কাচতে চাইছে না। অমাও কেমন যেন ভয়ে ভয়ে সরে সরে থাকতে চায়। নিজের বাড়িতেই আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেছি। তোমরা জান, আমি চিকিৎসার কোন ত্রুটি করিনি, বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, তাঁরা সবাই বলেছিলেন সারবে, কিন্তু অনেক দেরি হবে। তাতে আমি বিচলিত হইনি। আমি বিচলিত হলাম তোমাদের ব্যবহারে। আমার পিঠে একটা লাল দাগ হয়েছে, ডাক্তাররা সেটা কুষ্ঠ বলে সন্দেহ করছে, এইজন্য তোমরা আমাকে অস্পৃশ্য বোধে ঘৃণা করছ এটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। মনে হলো সংসার তো অনেকদিন ভোগ করলুম, বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় অনেকদিন আগেই হয়েছে, তোমাদের মনে সর্বদা আতঙ্কের হেতু হয়ে তোমাদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে আর তো সুখী হতে পারব না। সুতরাং চলে যাওয়াই ভালো। নীলু যা রোজগার করে তাতে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন ভাল করেই চলে যাবে।

তুমি যাতে হাত-খরচের জন্যে মাসে দু'শ' টাকা করে পাও তার ব্যবস্থা আমি করে করে এসেছি। আমার ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে তোমার কাছে টাকা যাবে। অমার পড়াশোনার জন্যেও প্রতি মাসে একশ' টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সে টাকাও তোমার কাছে যাবে। অমার বিয়ের জন্যে ২৫,০০০ টাকার 'ফিক্সড্ ডিপোজিট' করে এসেছি। অমা যদি তোমার নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করে তাহলে ওই টাকা তাকে যৌতুকস্বরূপ দিও। আর সে যদি স্বেচ্ছায় নিজের মতে বিয়ে করে তাহলে তাকে কিছু দেবে কিনা, তা তুমিই ঠিক কোরো। আমার জন্যে ভেবো না—এ মিথ্যা উপদেশ তোমাকে দেব না। আমার জন্যে যদি ভাবো তাহলে আমি খুশী হব। একটা কথা মনে রাখলে অনর্থক ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবে। পৃথিবী বিরাট। যে কোনও মানুষই সেখানে নিজের স্থান করে নিতে পারে। তাছাড়া টাকা থাকলে অনেক সুখ সুবিধা সেবা কেনা যায়। সে টাকা আপাতত আমার আছে। সুতরাং চালিয়ে নিতে পারব। আমাকে খুঁজে তোমরা ব্যতিব্যস্ত 'হয়ো না। কারণ আমি আর ফিরব না বলেই বেরিয়েছি। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

কোনও চিঠিতেই তাঁর ঠিকানা বা তারিখ থাকত না। বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মিত্রকেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানিতে রেজেস্ট্রি আপিস সংক্রান্ত যে কথার উল্লেখ আছে তার তাৎপর্য পরে স্পষ্ট হয়েছিল।

চিঠিখানি এই ঃ

ভাই সিধু,

প্রায় দু'শো মাইল দূরে বসে তোকে চিঠি লিখছি। একটা নাটকীয় কান্ড করে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, এ খবর আশা করি এতদিনে পেয়েছিস। হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের শ্লোকগুলি সত্য। আগে অনেকবার পড়েছি ওগুলি, কিন্তু ঠিক এভাবে উপলব্ধি করিনি। আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, কিন্তু উপলব্ধি করি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে, অর্থাৎ ঘা খেয়ে। ঘা খেয়েছি ভাই। নিদারুণ ঘা। আমরা সেকেলে লোক, একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, আমার এক পিসতুতো ভাই আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছিল। তার যখন বসন্ত রোগ হলো তখন তাকে আমরা বাড়ি থেকে দূর করে দিইনি, কিংবা তাকে অস্পৃশ্য করেও রাখিনি। আমার মা তার বিছানায় বসে তাকে সেবা করেছেন, তার জন্যে মানত করেছেন, পূজা করেছেন। তাকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত একথা আমাদের কারও মনে জাগেনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমাদের আচরণ হয়তো ঠিক হয়নি, আত্মরক্ষা করে ওকে হাসপাতালে পাঠালেই হয়তো ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত হতো। কিন্তু আমরা তা পারিনি, পারিনি বলেই কিন্তু আমি গর্ববোধ করি। আমার ওই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মা, যিনি তার বিছানায় বসে তাকে সেবা করতেন আর আকুলভাবে মা শীতলার কৃপাভিক্ষা করতেন, তাঁকে আমি দেবী বলে শ্রদ্ধা করি। আমার একটা দুরারোগ্য কুৎসিত ব্যাধি হয়েছে বলে সেই বংশেরই ছেলে, আমার নিজেরই ছেলে, আমার কোল থেকে আমার নাতিকে নামিয়ে নিয়ে বললে—তুমি আর বাড়িতে থেকো না, হাসপাতালে যাও। আমার ছেলেকে আমি যতদূর সম্ভব শিক্ষিত

করবার চেষ্টা করেছি, সে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিলেত-ফেরত অধ্যাপক—কিন্তু সেদিন অনুভব করলাম, যে শিক্ষা সে পেয়েছে তাতে তার মনুষ্যত্ব গঠিত হয়নি, সে বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে একটা ডিগ্রি পেয়েছে মাত্র, ডিগ্রির জোরে চাকরিও পেয়েছে একটা, কিন্তু সে হৃদয়হীন স্বার্থপর পশু হয়ে গেছে। যে দেশে শিবি, দাতা কর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী শ্রদ্ধা সহকারে সকলে স্মরণ করে অভিভূত হয়ে পড়েন, সে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, সে জড়বাদী জীব হয়ে গেছে। আমিও যদি ওর মতো বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী হতাম তাহলে বলতে পারতাম—এটা আমার স্বোপার্জিত টাকায় তৈরি বাড়ি, এ-বাড়িতে আমিই আমরণ থাকব, তোমার যদি এখানে থাকতে ইচ্ছা না হয় অন্যত্র চলে যেতে পার। কিন্তু আমি তা বলতে পারিনি, নিজেই চলে এসেছি। কারণ আমি সেকেলে আদর্শে বিশ্বাসী।

যাক ওসব কথা। আসবার আগে যে পাগলামি কাণ্ডটা করে এসেছি, যার সাক্ষী তুমি এবং আমার আর এক উকিল বন্ধু, সেটা আশা করি তুমি যত্ন করে রেখে দিয়েছ। রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে রেজিস্ট্রারের সামনেও আমি ওই ব্যাপার করেছি। দু' জায়গায় থাকাই ভালো। আমি এখন দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াব, ফেরবার ইচ্ছে নেই। এতদিন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছিলাম, এখন চললাম অচেনা লোকেদের মধ্যে। দেখা যাক কি পাই তাদের কাছে—ভালবাসা জেনো।

প্রিয় নানকুবাবু,

আপনার সঙ্গে ট্রেনে সেদিন আলাপ হয়ে কি যে ভালো লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সেদিন একটা কথাই আমার মনে স্পষ্ট হলো, দেশের নাম-করা যে বড়লোকদের আমরা চিনি, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করবার সুযোগ আমাদের হয়নি, সুযোগ পেলে তাঁদের সম্বন্ধে ঠিক কি মনে হতো তা বলতে পারব না, কারণ বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে অনেক লোককে যত বড় মনে হয়, কাছে গেলে দেখা যায় তারা ঠিক ততটা বড় নয়, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই নীচ কিংবা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমার জীবনে এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ খুব বেশি নেই আমাদের সমাজে। থাকলে এ দুর্দশা হতো না আমাদের। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সেদিন বুঝলাম যে, যাদের আমরা চিনি না, যাদের নাম কখনও শুনিনি এমন লোকের মধ্যেও অসাধারণ ভদ্রলোক আছেন, তাই এত দুর্দশা সত্ত্বেও আমরা একেবারে রসাতলে তলিয়ে যাইনি। আমি বুড়ো মানুষ সেদিন স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতে বেশ চোট পেয়েছিলাম, আমাদের পাশের ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে একজন বড়লোকও নেমেছিলেন, সঙ্গে প্যাণ্ট-পরা দুটি যুবক এবং আধুনিকা সাজে সজ্জিতা একটি মেয়েও ছিলেন, আমি পড়ে গেলাম তাঁরা দেখলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না। এগিয়ে এলেন আপনি। আরও যাঁরা দু'চারজন এলেন, তাঁদের আমরা 'ছোটলোক' বলি। আপনি শুধু এগিয়েই এলেন না, আপনি যখন শুনলেন আমি এলাহাবাদেই নামব এবং একটা হোটেলে গিয়ে থাকব, তখন আপনি 'হাঁ' 'হাঁ' করে উঠলেন। বললেন, হোটেলে যাবেন কেন, আমার বাড়ি চলুন, আমার বাড়ির পাশেই ডাক্তার বিশ্বাস থাকেন, তিনি আগে পরীক্ষা করে দেখুন,

আপনার হাড়-টাড় ভেঙেছে কিনা, পা-টাও ছড়ে গেছে, কনুই ছড়ে গেছে, এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি কখনও। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম আপনার ভদ্রতায়। আপনার বাড়ি গিয়ে দেখলাম আপনি ছাপোষা মধ্যবিত্ত লোক। আপনার বাইরের ঘরটা আপনার ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর। কিন্তু সেই ঘরেই আপনি খাট পেতে বিছানা করে দিলেন আমায়। ডাক্তার বিশ্বাস এসে আমাকে দেখলেন, বললেন, হাড়-টাড় কিছু ভাঙেনি। ইনজেক্শন দিলেন, ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। যখন ফি দিতে গেলুম, বললেন—নানকুবাবুর বাড়িতে আমি ফি নিই না। আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন নানকুবাবুই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। ও'রই সহায়তায় আমার প্র্যাকটিশ গড়ে উঠেছে এ পাড়ায়। ক্রমশ জানতে পারলাম আপনি ধনী-লোক নন, চাকুরিও করেন না, বাজারে একটা ছোটখাটো দোকান আছে আপনার—কাটা কাপড়ের দোকান। কিন্তু বাঙালী অবাঙালী সকলের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার আসন আপনি অধিকার করে আছেন তা মোটেই ছোটখাটো নয়। আপনার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা আমার যে সেবা-যত্ন করেছেন তা ঠিক যেন নিজের লোকের মতো। আপনার স্ত্রীকে আমার পুত্রবধূর আসনে বসিয়ে, আপনার ছেলেমেয়েদের আমার নিজের নাতিনাতনী মনে করে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমি নিজের পরিচয় আপনাকে দিইনি, কিন্তু যখন শুনলাম, আপনি একটি দুষ্টলোকের চক্রান্তে একটা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, তখন আমাকে বলতে হলো যে, আমি একজন অ্যাডভোকেট। আপনার উকিলের সঙ্গে দেখা করে আমি যে পরামর্শ দিয়ে এসেছি তদনুসারে চললে আপনি মকদ্দমায় জিতবেন বলেই মনে করি। আমার আর কোনও পরিচয় আপনাদের দিইনি, কারণ সেটা অবান্তর। যে পরিচয়ে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেইটেই এখন আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি অসমর্থ লোক, পথ চলতে গিয়ে পড়ে যাই। আর আপনার পরিচয় আপনি সেই পড়ে-যাওয়া লোকটাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি বিদেশী পথিক, দৈবাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনার স্নিগ্ধ সৌজন্যের গঙ্গাধারায় অবগাহন করে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেছি। জীবনে এটা আমার মস্ত প্রাপ্তি একটা। আমি বউমার জন্যে আর নাতিনাতনীদের জন্যে সামান্য কিছু উপহার পাঠালাম। দিল্লীর একটা দোকান থেকে পার্শেলটা যাবে আপনার কাছে। গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। দিল্লীর দোকানদারকে আমি যে নাম বলেছি তা আমার প্রকৃত নাম নয়, নিজেকে গোপনই রাখলাম আপনার কাছে। কারণ প্রকাশ্যে জানাবার মতো আমার জীবনে কিছু নেই। আমি বৃদ্ধ লোক, আপনাকে আশীর্বাদ করছি যে এই অধঃপতিত যুগে আমাদের দেশের শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখবার শক্তি যেন আপনার অটুট থাকে। ইতি।—

আপনাদের একান্ত আত্মীয় বিদেশী পথিক।

প্রিয় যতীনবাবু,

সেদিন আপনার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ করে সুখী হয়েছিলাম খুব। আসবার সময় আপনার ঠিকানাটা চেয়ে নিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে ওই বিষয়ে আর একটু আলোচনা

করব বলে। সেদিন আলোচনাটা খুব জমেছিল, কিন্তু শেষ হয়নি। আপনাকে নেমে পড়তে হলো। স্টেশনে দেখলাম অনেক লোক এসেছেন আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। আমি যদিও পলিটিক্সের লোক নই, কিন্তু পলিটিক্স সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞও নই। আমাদের বার লাইব্রেরিতে ও নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অনেক আলোচনা অনেক তর্কাতর্কি হতো। এই পলিটিক্সের নানা চেহারা আমরা দেখেছি। ওই পলিটিক্স করতে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পথের ভিখারী হয়ে গেলেন, আবার ওই একই পলিটিক্সের জোরে আমাদের মক্কেলবিহীন আর একজন উকিল (নামটা আর করব না) গাড়ি করলেন, বাড়ি করলেন, ছেলেদের ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করে দিলেন, বিয়ে দিলেন কুৎসিত মেয়েদের ভালো ভালো পাত্রের সঙ্গে। পলিটিক্স পথের মতো, ওই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রী যেতে পারে, আবার চোর ডাকাতও যেতে পারে। আমার যখন জন্ম হয়েছিল, তখন দেশে ইংরেজ শাসন। একটা কথা বলতে পারি, সে সময় আমাদের যে সুখশান্তি ছিল এখন আর তা নেই। একটা কথা তখন শুনতে পেতাম, ইংরেজরা নাকি এদেশ থেকে টাকা শোষণ করে নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? এখন কি শোষণ বন্ধ হয়েছে? হয়নি। বিলাতী জিনিস কেনবার জন্যে আমরা উদ্বাহু হয়ে আছি সর্বদা। এদেশে মোটর প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ভিতরের মাল অধিকাংশই বিলাতী। যেটুকু দেশী সেটুকু খারাপ। আমাদের অধিকাংশ ইনডাষ্ট্রিতেই তাই। আমরা বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যন্ত্রোপকরণ কিনছি, ভিক্ষা করছি, এবং না পেলে মান-অভিমানও করছি। শোষণ ঠিক চলছে। স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মতলববাজ পলিটিসিয়ানরা নিজেরা গুছিয়ে নিয়েছেন, দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে, তিমির গাঢ়তর হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যদের হাতেই ইংরেজ স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন, দেশকে দু'টুকরো করে। স্বাধীনতা পেয়ে তাঁদেরই বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। হিন্দু বাঙালীদের কিছু সুবিধা হয়নি, বাঙালী মুসলমানরাও নানা অশান্তির মধ্যে আছেন। আগে দেশে কয়েকটা গভর্নর আর আই. সি. এস. অফিসার দেশকে সুশাসনে রাখতে পারতেন। এখন অজস্র মিনিস্টার, অজস্র অফিসার, অজস্র দফতর—সর্বত্রই কিন্তু অব্যবস্থা। মহাত্মা গান্ধী আমাদের অনেক ধর্মের বুলি শুনিয়েছিলেন, আমাদের ধর্ম-প্রবণতা একটু বেশি, ধর্ম-কথা শুনলেই আমরা বেসামাল হয়ে পড়ি। মহাত্মাজীর ধর্ম-কথাই ভারতের জনসাধারণকে উদ্বেলিত করেছিল, যেমন করেছিল শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচার ষোড়শ শতাব্দীতে। শ্রীচৈতন্য কিন্তু ধর্মের সঙ্গে পলিটিক্স করেননি। মহাত্মাজী কিন্তু করেছিলেন। কালের নিকষে যাচাই করে এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর রাজনীতি—যা ইংরেজদের সঙ্গে আপসনীতিরই নামান্তর—আমাদের দেশের স্বাধীনতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যরা তাঁর উচ্চ ধর্মনীতিকে অনুসরণ করেননি, কংগ্রেসের বিঘোষিত আদর্শকে পদদলিত করে তাঁরা স্বচ্ছন্দে করেছিলেন দেশ ভাগ, সে দেশ ভাগের সময় মহাত্মাজী আমরণ অনশন করার ভয় দেখিয়ে প্রতিবাদ করেননি, যা তিনি অনেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেকবার করেছিলেন তার আগে। দেশ ভাগের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে মহাত্মাজীর অহিংসা-ধর্ম প্রচার সত্ত্বেও দেশে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তার একটি মাত্র অর্থই আমাদের মনে জাগরূক আছে—মহাত্মাজীর

অহিংসার বাণী আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেনি। অহিংসার বাণী এদেশে নূতন কিছু নয়, বুদ্ধদেবের আমল থেকে আমরা তা শুনে আসছি, এ বাণীর দ্বারা দু' চার জন লোক হয়তো উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু ইতিহাস বলে, বেশির ভাগ লোকই হননি। পশুত্বের নানা নৃত্য আমাদের দেশের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে হয়ে গেছে। ধর্মের মুখোশ পরে নানা ভেকধারী পিশাচকে আমরা আগেও দেখেছি, এখনও দেখতে পাচ্ছি। রাজনীতির দাবাখেলায় ধর্মকে একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু ধর্ম দেশের সমস্ত লোককে মহাপুরুষ করে তুলবে এ আশা দুরাশা। ধর্মের মূল কথা পরার্থপরতা, ত্যাগ। রাজনীতির মূলকথা স্বার্থ-পরতা এবং জবর-দখল। ও দুইয়ের নিবিড় মিলন কখনও ঘটতে পারে না। রাজনীতির দাবাখেলায় যে জিন্না সাহেবের কাছে মহাত্মাজী হেরে গেছেন তা আজ আর বুদ্ধিমান লোকের কাছে অস্পষ্ট নেই। মহাত্মাজীর ধর্মপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে চতুর ইংরেজ আমাদের দেশের সামগ্রিক চেতনাকে, আমাদের স্বাধীনতার আদর্শকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে আমাদের দেশে ও সমাজে যে বীজ বপন করে দিয়ে গেছে তার ভয়ংকর চেহারা ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে। আমাদের স্বাদেশিকতা লোপ পেয়েছে, আমরা মনে-প্রাণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দাস হয়েছি, এদেশ থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা বিদেশে গিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন হয়েও বাস করে কৃতার্থ বোধ করছে এবং তাদের বাপ-মায়েরা তা নিয়ে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন সগর্বে। আমাদের সাহিত্যে রাজনীতিতে পোশাক-পরিচ্ছদে, সামাজিকতায় আহারে-বিহারে সর্বত্রই এই দাস মনোভাব। বিদেশী সভ্যতা থেকে ভালো জিনিস আহরণ করা নিন্দনীয় নয়, যেটা নিন্দনীয় সেটা হচ্ছে আত্মসুখের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পরানুকরণ। স্বাধীনতার পর আমরা এত বেশি স্বার্থপর এবং এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি, এত বেশি ধর্মহীন জড়বাদের উপাসক হয়ে পড়েছি যে, টাকাই এখন আমাদের সভ্যতা-ভব্যতার চালক হয়েছে। এদেশে মহাত্মাজীর আদর্শ যে কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হয়েছে তা মনে হয় না। আপনি বললেন আপনি যে রাজনৈতিক দলের হয়ে লড়ছেন তার লক্ষ্য দেশের দুর্দশা মোচন করা। কিন্তু দেশ মানসিক দুর্দশার যে স্তরে পৌঁছে গেছে তার থেকে তাকে টেনে তোলার কথা নিশ্চয়ই আপনি ভাবছেন না। দেশ বদলাক তাতে তত ক্ষতি নেই, পোশাকে পরিচ্ছদে, চিন্তায়, সাহিত্যে তারা বিলিতী, ফরাসী, মার্কিন, চীনে, জাপানী যা খুশি হোক, কিন্তু তারা যদি মনুষ্যত্ববিবর্জিত ঘোর স্বার্থপর, কামুক, অর্থগৃধ্নু পশু হয়ে যায় তাহলে আমাদের এ স্বাধীনতা কত দিন টিকবে? যে-কোনও বড় স্বাধীন দেশের খবর নিয়ে দেখবেন, সেখানে হঠাৎ গেলে হয়তো মনে হবে একটা চোখে-খোঁচা-মারা বেলেল্লাগিরি, যথেচ্ছাচার অবাধ মেলামেশা আপনার ভদ্রতাবোধকে ক্ষুণ্ণ করছে। কিন্তু খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন ওদেশে নমস্য শ্রদ্ধেয় মানুষের সংখ্যাও অনেক, তাই তাঁরা জগতের মানব-সমাজের নেতৃত্ব করছেন। এ রকম মানুষ ব্রিটেনে আছে, ফ্রান্সে আছে, আমেরিকায় আছে, রাশিয়াতে আছে, চীনে আছে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যা-বত্তায়, মনুষ্যত্বে, স্বদেশের বিশিষ্ট মর্যাদায় জ্যোতিষ্কের মতো দেদীপ্যমান। আমরা ওদের ভালো গুণগুলো নিতে পারিনি, সে রকম গুণ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্রে পরিস্ফুট করবার কোনও ব্যবস্থা নেই এখানে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা

তোতাপাখীর মতো কতকগুলো নোটবই মুখস্থ করে লেখাপড়া শেখে, পরের নকলে পোশাক পরে সভ্য হয়, পরের নকলে আলাপ করে, ঘোর স্বার্থপর হয় আর দাসখত লিখে দেয় টাকার কাছে। আপনি অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করবেন বললেন, তাই এই কথাগুলো লিখলাম। মানুষ নিয়েই দেশ, তাদের যদি উন্নতি না করতে পারেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকবে না। নদীতে ড্যাম করে, কৃষকদের সার বিতরণ করে, স্কুল-কলেজের বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে, ফ্যাক্টরি খুলে কিছুই হবে না, শেষ পর্যন্ত যদি না দেশে মানুষ তৈরি করতে পারেন। ওইটেই প্রথম এবং প্রধান কাজ। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি পেশাদার পলিটিসিয়ান নন, আপনি সত্যিই দেশের উন্নতি-কামী সংস্কারক। আপনার পার্টি যদি গদিতে বসে তাহলে আমার অনুরোধ, দেশের ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো তৈরি করুন। দেশে আর মানুষ নেই। এবার আমার নিজের কথা বলি, তাহলেই বুঝবেন একথা কেন বলছি। আধুনিক মাপকাঠিতে আমার ছেলে একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, এদেশে এবং বিদেশে অনেক ডিগ্রির মালা পেয়েছে, ভালো চাকরিও করে। বেশ চলছিল, কিন্তু গোলমাল বাধাল যখন স্বার্থের সংঘাত বাধল। আমার পিঠে একদিন 'প্যাচ' (patch) হলো একটা। ডাক্তার বললেন—ওটা কুষ্ঠ। ব্যস, তার পরই জাগল সমস্যা। আমারই বাড়িতে সকলেই আমাকে অস্পৃশ্য করে দিল। আমার খাওয়ার জন্য আলাদা এক সেট বাসন এল, বিছানাপত্র এল। আমার স্ত্রী পর্যন্ত আমাকে ছুঁতে দ্বিধা বোধ করতে লাগলেন। পারতপক্ষে স্পর্শ করতেন না আমাকে। আমার কাপড় কাচবার জন্য আলাদা একটা মেথরানী বাহাল হলো, সে 'ডেটল' বালতিতে ঢেলে আমার কাপড় কাচতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হলো আমার নাতিকে (পৌত্রকে) নিয়ে। সে তো বৈজ্ঞানিক নয়, যে দাদুর কোলে সে বরাবর চড়েছে, কাঁধ ধরে দুলেছে, তার কোলে সে এখন চড়তে পাবে না কেন, তার বিছানায় উঠে হুড়োমুড়ি করতে বাধা কি—এসব তার মাথায় ঢোকেনি। সে সকলের মানা অগ্রাহ্য করে প্রায়ই ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার কোলে, দুলত আমার পিঠ ধরে। কারও মানা শুনত না সে। ছেলেটা ভারি দুরন্ত আর আমার বড্ড ন্যাওটা। আর আমার ছোট মেয়েটাও শুনত না কারও কথা। আমার বিছানায় এসে বসত। একদিন বলেছিল—বাবা, মেথরানীকে ছাড়িয়ে দাও, আমিই তোমার কাপড় জামা কেচে দেব। আমার গামছাটা ও নিজেই কাচত। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল একদিন এবং আমার জীবনের পটভূমিকা বদলে গেল। অমা (আমার ছোট মেয়ে) বসেছিল আমার বিছানার উপর আর নাতিটা বসেছিল আমার কোলে। হঠাৎ আমার বড় ছেলে এসে তুলে নিল আমার নাতিকে আমার কোল থেকে। আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার উচিত হাসপাতালে গিয়ে থাকা। আপনি একে আর কোলে নেবেন না। অমা, উঠে যা এখান থেকে—। আমার মনে হলো কে যেন আমার গালে ঠাস করে চড় মারল একটা। বজ্রাহতবৎ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেলাম বাইরে। বাড়ির কাছে একটা পার্ক ছিল। একটা খালি বেঞ্চে গিয়ে বসে ভাবলাম অনেকক্ষণ। মনে হলো আমার আর সংসারে থাকার কোনও মানে হয় না—পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ—এ কথা আমাদেরই শাস্ত্রে আছে। আমার বিদ্বান ছেলে যা বলেছে তা যুক্তিযুক্ত, তার স্বপক্ষে বিজ্ঞান আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে হলো—বিজ্ঞান আছে, কিন্তু হৃদয় নেই। মানব-সভ্যতায় হৃদয় বড়

না বিজ্ঞান বড়—এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া শক্ত। যন্ত্রসভ্যতা মানুষকেও হৃদয়হীন যন্ত্র করে তুলছে একথা ভাবতে কিন্তু ভালো লাগে না,—আমি হৃদয়হীন হতে পারিনি কিন্তু (হয়তো আমি সেকেলে অসভ্য)—যদিও ওই বাড়িটা আমার স্বোপার্জিত অর্থে তৈরি—তবু ওই বাড়ি ওদেরই ছেড়ে দিয়ে এসেছি আমি। ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে পথে, ট্রেনে ট্রেনে অচেনা লোকদের মাঝখানে। হয়তো 'ইনফেকশন' ছড়াচ্ছি। কিন্তু কোনও উপায় নেই। ভদ্রভাবে থাকব এমন কোনও কুষ্ঠ হাসপাতাল খুঁজে পাইনি এখনও। আপনারা যদি এবার জিততে পারেন কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটা ভদ্র হাসপাতালের ব্যবস্থা করবেন। যে দু'একটি কুষ্ঠাশ্রম দেখেছি তাতে থাকা সম্ভব নয়।

আপনাকে অনেক ব্যক্তিগত কথা লিখে ফেললাম কিছু মনে করবেন না। শুধু এই ভরসায় লিখলাম, আপনি যে দেশের নেতা হতে যাচ্ছেন আমিও সেদেশের একটা মানুষ, আমার সমস্যাও দেশের একটা বড় সমস্যা। এ দেশ থেকে যাতে অস্পৃশ্যতা উঠে যায় তার জন্যে আপনারা আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীরা যে অস্পৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এর কি কোনও প্রতিকার নেই? একটা জিনিস মনে হওয়াতে কিন্তু ভারি আনন্দ হলো। যেখানে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি, সেটা একটা খোলা প্ল্যাটফর্ম। আমাকে ঘিরে ফুরফুর করে হাওয়া বইছে, রোদ পড়েছে আমার সর্বাঙ্গে। ওরা কেউ অস্পৃশ্য বলে আমার কাছ থেকে সরে যায়নি। ওরাই পরমাত্মীয়। চিঠি লম্বা হয়ে গেল। আর নয়, নমস্কার গ্রহণ করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি বিজয়ী হোন, দেশের দুঃখ দূর করুন। ইতি—

আপনার ট্রেনের সহযাত্রী

শ্রীচরণেষু,

আপনারা কি জাত, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় না ছোট, এসব খবর জানিনা, তবু 'শ্রীচরণেষু' লিখলাম কারণ আপনার উপর সত্যিকার শ্রদ্ধা হয়েছে আমার। আপনাকে দেখে আমার মাকে মনে পড়েছে। আপনার মতোই আমার মা লেখাপড়া তেমন কিছু জানতেন না, শুধু বাংলাটা পড়তে পারতেন, রামায়ণ পড়তেন বিকেলে বসে। খবরের কাগজ নয়। তিনি দেশ-বিদেশের খবর রাখতেন না, খবর রাখতেন নিজের সংসারের আর পাড়াপড়শীদের। বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের ধাত, স্বাস্থ্য, মেজাজ, কে কি খেতে ভালবাসে সব তিনি জানতেন। টোটকা নানারকম ওষুধও জানতেন তিনি। শিউলিপাতার রস, তুলসী পাতার রস, কালমেঘের রস, চিরেতা ভেজানো, গাঁদাল পাতার ঝোল—কত রকম ওষুধই না খাওয়াতেন আমাদের। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের হাতেই খাইয়ে দিতেন রোজ দু'বেলা। ছোঁয়াছুঁয়ির খুব বিচার ছিল। গঙ্গাজল ছিটিয়ে বেড়াতেন চারিদিকে। কিন্তু কারও উপর ঘৃণা ছিল না তাঁর। বাগদি, ডোম, মেথরদের ছুঁতেন না যদিও সংস্কার বশে, কিন্তু তাদের স্নেহ করতেন, তাদের ডেকে খাবার দিতেন, কাপড় জামাও দিতেন। তাদের কারও অসুখ-বিসুখ করলে তাদের বাড়িও যেতেন

দেখেছি, ফিরে এসে স্নান করতেন, মাথায় গঙ্গাজল ছিটোতেন, কিন্তু তাদের হিতৈষী ছিলেন তিনি। অস্পৃশ্যতাটাই বড় ছিল না তাঁর কাছে, ধর্মটাই বড় ছিল। তাঁর ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হতো। সে ঠাকুরঘরে যদিও লক্ষ্মীজনার্দনেরই পিতলের প্রতিমা ছিল, কিন্তু আরও অনেক ঠাকুরের ছবি টাঙানো থাকত সেখানে। মা ভোরবেলা উঠে স্নান করে পাটের কাপড় পরে যখন ওই ঠাকুরঘরে ঢুকতেন তখন আমাদের কারও ঘুম ভাঙত না। বেলা আটটার সময় ঠাকুরঘর থেকে বেরুতেন মা। আমাদের সকলকে প্রসাদ দিতেন, সকলের মাথায় এবং চারদিকে গঙ্গাজল ছিটোতেন। সেদিন যখন ধর্মশালার ঘরে দেখলুম আপনি বাক্স থেকে ঠাকুরের ছবি বার করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুজোর আয়োজন করছেন তখন আপনাকে দেখে আমার মাকে মনে পড়ল। আপনার ইচ্ছে হলো ফুল দিয়ে পুজো করেন, ধর্মশালার চাকরটাকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু সে বলল তার এখন ফুরসত নেই, ফুল কিনতে বাজারে যেতে পারবে না। আপনার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল, চাকর মুখের উপর উত্তর দেবে এতে বোধ হয় আপনি অভ্যস্ত নন। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমি ফুল এনে দিচ্ছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি জুতোটা খুলে খালি পায়েই বেরিয়ে গেলাম। ফুলও নিয়ে এলাম একটু পরে। আপনি ফুলগুলোর উপরও গঙ্গাজল ছিটোলেন। তারপর ভক্তিভরে পুজো করলেন অনেকক্ষণ ধরে। সে পুজো শেষ করে আপনি যখন আমার মাথায় ফুল-বিল্বপত্র ঠেকাতে এলেন তখন আমি আপনাকে বললাম—মা, আমাকে ছোঁবেন না।—কেন, তুমি কোন জাত? জিজ্ঞেস করলেন আপনি। বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার এমন একটা ব্যাধি হয়েছে যে আমি অস্পৃশ্য হয়ে গেছি।—কেন, কি হয়েছে তোমার? জিজ্ঞেস করলেন আবার, সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন—অসুখ হলে মানুষ অস্পৃশ্য হয়ে যায় নাকি! কি অসুখ? তখন সব খুলে বললাম আপনাকে। তারপর আপনি যা করলেন তা আমার বাড়ির লোকেরাও করেনি কখনও। আপনি আমার পিঠের সেই দাগটার উপর পুজোর ফুল বুলিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন—রোজ ঠাকুরের পায়ের ফুল-বিল্বপত্র এখানে বুলিয়ে দিও, ভাল হয়ে যাবে। আপনার সে স্নেহস্পর্শ আজও লেগে আছে আমার গায়ে। আপনি তার পরদিনই চলে গেলেন। আপনার ঠিকানাটি চাইলাম। আপনি আপনার ছেলের ঠিকানা দিলেন। আপনার নাম কি তা আমি জানি না। আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি কয়েকদিন। কারণ নিজের হাতে নিজের পিঠের মাঝখানে ফুল-বেলপাতা বোলানো যায় না। একটি ছোঁড়া চাকর বাহাল করেছিলাম। তাকে দিয়েই রোজ ঠাকুরবাড়ি থেকে ফুল আনিয়ে ও জায়গাটায় বোলাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোঁড়াটার কেমন যেন সন্দেহ হলো দিন কয়েক পরে। আমাকে বললে—আমাদের পাশেই এক ছোকরা ডাক্তারবাবু থাকেন, তাকে দিয়ে চিকিৎসা করালে আপনি সেরে যাবেন। গেলাম সে ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি ছোঁড়াটার সামনেই বললেন—এ তো আপনার কুষ্ঠ হয়েছে মশাই। তারপর যেসব ওষুধ আর ইনজেকশনের ফিরিস্তি দিল সেসব ফিরিস্তি আমার আগের ডাক্তারও আমাকে দিয়েছিল। ছোঁড়াটা কিন্তু তারপর থেকে অন্তর্ধান করেছে। এখানে ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি একটি নাকফোলা মেয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়। বোধহয় তারও কুষ্ঠ হয়েছে। তাকে একদিন ডেকে সব কথা বলেছি। সে

বলেছে আমার পিঠে ঠাকুরবাড়ির ফুল-বেলপাতা বুলিয়ে দেবে। নিজের নাকে আর হাতেও বোলাবে। এখন তাই চলছে। দেখি এই ভাবে কতদিন চলে। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি আমার মা। যদি কোনদিন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে আপনার ঠিকানায় হাজির হতে পারি, আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে আসব। ইতি—

প্রণত

আপনার হতভাগ্য পুত্র।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি লেখক মানুষ, বললেন অনেকগুলো বই আপনি লিখেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার নাম আমি আগে শুনিনি। আমিও বাংলা ভাষার বই পেলেই পড়ি, কয়েকটি সাপ্তাহিক মাসিকেরও নিয়মিত পাঠক আমি। কিন্তু আপনার নাম আমার চোখে পড়েছে বলে আমার মনে পড়ল না। আপনার সঙ্গে ট্রেনে বসে সাহিত্য-আলোচনা করে অনেক জ্ঞান লাভ করলাম কিন্তু সেদিন। আপনি অনেক দেশের সাহিত্য পড়েছেন, অনেক দেশের রাজনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আপনার প্রচুর জ্ঞান। আপনি যে একজন অনাদৃত এবং উপেক্ষিত 'জিনিয়াস' একথাও আপনার ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ পেল। আপনাকে দেখে কষ্ট হলো। আমিও একজন অনাদৃত এবং উপেক্ষিত লোক, কিন্তু আমি 'জিনিয়াস' নই। আমার যেটা কর্মক্ষেত্র ছিল সেখানে আমি নাম করেছি, আমার কর্মের বিনিময়ে টাকাও রোজগার করেছি—অনেক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের লোকের কাছে ঘা খেয়ে আমাকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। আমার দেহে একটা কুৎসিত দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে বলে আমার নিতান্ত আপনজনের কাছেও আমি আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছি, তারা আমাকে স্পর্শ করতেও ভয় পাচ্ছে। তাদের আমি দোষ দিতে পারি না। আমি ভাবছিলাম আপনার প্রতিভার গায়েও ওইরকম লেপ্রসির প্যাচ হয়নি তো? তাই কি লোকে আপনার কাছে যেতে চাইছে না! শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যখন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওঁকে আপন লোক বলে চিনেছিলাম। আপনাকে চিনতে এত দেরি হচ্ছে কেন? ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। খুব ছেলেবেলায় আমি একটা মিশনারি মেমসাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। মেমসাহেবের নিখুঁত ব্যবহার, পরিষ্কার পোশাক, মার্জিত রুচি, প্রচুর বিদ্যা এ সবই ছিল, কিন্তু তবু তাঁকে আমরা আপনজন ভাবতে পারিনি। আপনজন ছিল আমাদের মনুদি, যিনি ওই স্কুলে চাকরানীর কাজ করতেন। আমরা মেমসাহেবের চেয়ে তাঁকে ভালবাসতাম বেশি। আপনার লেখার ভাষায় ভাবে জৌলুসে তেমনি হয়তো এমন একটা কিছু আছে যাতে আমরা আপনাকে আপন ভাবতে পাচ্ছি না। কিংবা হয়তো এমন একটা কিছু আছে যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই অনেকে শ্রেয়ঃ মনে করছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমি আপনার বই একখানা কিনে পড়েছি। পড়ে দেখলাম আপনি অনেক জায়গায় নিজের বিদ্যে ফলাবার চেষ্টা করেছেন, অনেক জায়গায় অকারণে যৌন প্রসঙ্গ, রাজনীতি প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন, আর সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগল, আপনি এদেশের সকলের পিঠ-চাপড়ে একটা অভিভাবকী সবজান্তা সুরে

কথা বলেছেন, ফলে আপনার বইটি পড়লে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে না, রাগ হয়। আপনাকে অকারণে এই কটু কথাগুলো লিখতাম না হয়তো, আপনার বই কিনেও হয়তো পড়বার উৎসাহ হতো না আমার, কিন্তু আপনি সেদিন ট্রেনে আমার সঙ্গিনীর লাল নাকটা দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে আমার গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। আপনি বলেছিলেন—আ মোলো এ কুঠে মাগীটা কোথা থেকে উঠে এল আবার! তুমি অন্য গাড়িতে গিয়ে বস। তখন আমাকে বলতে হলো—ও আমার বোন, আমার সঙ্গেই নামবে। ওদের জন্যে আলাদা ট্রেনের বন্দোবস্ত তো গভর্নমেণ্ট করেনি। তখন আপনিই আমাকে নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান-গর্ভ নানাকথা বলে শেষে বললেন, আজকাল মুশকিল কি জানেন, আজকালকার লোকের সিভিক সেন্স নেই।—আপনার কি আছে? অনবরত সিগারেট খাচ্ছিলেন আপনি চারদিকে ধোঁয়া উড়িয়ে আর চারদিকে ছাই ছড়িয়ে। প্রায়ই বগলটা যে ভাবে চুলকাচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল ওখানে আপনার দাদ বা কোনও চর্মরোগ আছে। গাড়ির সব প্যাসেঞ্জারদের যদি ডাক্তারদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তবে ট্রেনে চড়তে দেওয়ার নিয়ম থাকত তাহলে কি এর সুরাহা হতো? হয়তো অনেক ঘুষখোর ডাক্তারদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে আমরা সার্টিফিকেট যোগাড় করতাম, কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করতাম বিক্ষোভ করে। মোটকথা, শেষ পর্যন্ত সুস্থ-অসুস্থ সবাইকে পাশাপাশি যেতে হতো। আমরা বরাবরই তাই গিয়েছি। পরের অসুখকে আমরা সহ্য করেছি। অসুস্থ হয়েছে বলে তাকে অপমান করিনি। যারা করেছে তাদের অসভ্য বলেছি। আপনি আপনার লেখায় বক্তৃতায় নিজেকে সুসভ্য সুশিক্ষিত বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি, কারণ আমরা শ্রদ্ধেয়কেই সত্যিকার শ্রদ্ধা করি, বাধ্য হয়ে অনেক সময় অশ্রদ্ধেয়কেও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হই, মানে বাইরে শ্রদ্ধা দেখাবার ভান করি, কিন্তু সে শ্রদ্ধা আন্তরিক নয়, তা টেকে না। আপনি যদি দেশের লোকের মনে প্রকৃত শ্রদ্ধার আসন পেতে চান তাহলে সত্যিই শ্রদ্ধেয় হতে হবে আপনাকে। নমস্কার। ইতি—

আপনার ট্রেনের সহযাত্রী।

পুনশ্চ। আপনি ভাবছেন আপনার ঠিকানা যোগাড় করলাম কি করে। যোগাড় করলাম আপনার প্রকাশকের কাছ থেকে। নমস্কার। ইতি

কল্যাণীয় বীরু,

তুমি আমাকে যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় আজ দশটা টাকা পাঠালুম তোমাকে। সেদিন তুমি যখন আমার পকেটে হাত দিয়ে আমার মানি ব্যাগটা তুলে নেবার চেষ্টা করেছিলে ভিড়ের মধ্যে, তখন আমি তোমার হাতটা ধরে ফেলেছিলাম। ধরে শুধু বলেছিলাম—আমার সঙ্গে চল। যদি সেই ভিড়ের মধ্যে হৈ চৈ করে উঠতাম তাহলে সবাই তোমাকে মারধোর করত। পুলিশেও দিইনি তোমাকে, যদিও কাছেই একটা কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল। তোমাকে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করব বলে, তোমার মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম কেন তুমি এই হীন-বৃত্তি অবলম্বন করেছ। তুমি বলেছিলে—পেটের দায়ে তুমি একাজ করছ। তোমাদের

নাকি একটা দল আছে, সেই দল তোমাকে প্রতিপালন করে। তুমি বোধহয় জান না আমি একজন উকিল। অনেক জেরা করেছিলাম তোমাকে। জেরা করে করে তোমার জীবনের যে কাহিনী টেনে বার করলাম শেষ পর্যন্ত, তাতে তোমার উপর আর রাগ রইল না, নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হলো। তোমার মা বোন কেন বেশ্যাবৃত্তি করছে, তোমার বাবা কেন গুন্ডা হয়েছে, কেন তোমার সুশিক্ষা হয়নি, কেন তোমাকে মাইনে বাকি পড়ার জন্য স্কুল থেকে চলে আসতে হলো, তুমি রাজনীতির কিছু বোঝ না, যখন যে দল তোমাকে পয়সা দেয় তখনই সে দলের মিছিলে যোগ দিয়ে কেন তুমি শ্লোগান আওড়াও, তুমি ভাল করে খেতে পাও না, পরতে পাও না, অথচ তোমার সিনেমা দেখার দিকে এত ঝোঁক কেন—এই রকম নানা রকম 'কেন' এসে আমাকেই যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে—বললে, যে সমাজের তুমি একজন অংশ সে সমাজই বীরুর অধঃপতনের জন্যে দায়ী। সে দায়িত্ব তুমিও এড়াতে পার না। তাই সেদিন তোমাকে পুলিশে না দিয়ে তোমার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিলাম, ভালো ভাবে থেকো। তোমার ঠিকানা দাও, আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব। সেই ঠিকানাতেই টাকা পাঠালাম আজকে, এই চিঠিও লিখছি। ঠিকানা যদি ঠিক দিয়ে থাক তাহলে আমার চিঠি ও টাকা তোমার পাওয়া উচিত। শুনেছি চোরেরা অনেক সময় নিজেদের নাম ঠিকানা দিতে চায় না। এক একজন চোরের একাধিক নাম থাকে। তাই সন্দেহ হচ্ছে—ঠিক ঠিকানা দিয়েছিলে তো? সেদিন তোমার কাহিনী আমার মনকে স্পর্শ করেছিল বলেই এত কান্ড করলাম। তোমাকে আর একটা কথাও বলছি। তুমি যদি ভদ্রভাবে আমার কাছে থাকো তোমার সমস্ত ভারই আমি নিতে পারি। তবে যে কথা সেদিনও বলেছিলাম সে কথা আজও বলছি, আমি ও আমার বোন 'ছুনি' যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি তা অনেকের চোখে ঘৃণ্য। ডাক্তাররা কিন্তু বলেন এ রোগ এতটা ছোঁয়াচে নয় যতটা ছোঁয়াচে ইনফ্লুয়েঞ্জা। সব জেনেশুনেও তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও আমি তোমার সমস্ত খরচ চালাব। তুমি আমাদের চাকর হবে না, আমরা নিজেরাই আমাদের সব কাজ করে নি, তুমি হবে আমার সহচর। তোমাকে মানুষ করাই আমার লক্ষ্য। যদি তুমি রাজী থাকো গয়ার পোস্ট মাস্টারের কেয়ারে আমাকে চিঠি লিখো। আমি গয়ায় কিছুদিন থাকব। আশীর্বাদ জেনো। ভালো হও, বড় হও, তোমার জীবন থেকে সব মলিনতা ধুয়ে যাক এইটেই আমি কামনা করি। ইতি—

শুভার্থী
বিষ্ণুপদ রায়

ভাই ফটিক,

হঠাৎ সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তুমিও আমাকে এড়াতে চাইছিলে, আমিও তোমাকে এড়াতে চাইছিলাম। কিন্তু এমন মুখোমুখি হয়ে গেলাম যে গা-ঢাকা দেওয়া সম্ভব হলো না। তুমি আমাকে এড়াতে চাইছিলে, কারণ বছর দুই আগে তুমি আমার কাছ থেকে হাজার টাকা ধার নিয়েছিলে, বলেছিলে দু'মাসের মধ্যেই ফেরত দেবে। তুমি আত্মীয়, তোমার কাছ থেকে হ্যান্ড নোট

নেওয়া সঙ্গত মনে করিনি। ভেবেছিলাম সত্যিই তুমি ফেরত দেবে। কিন্তু তুমি তা দাওনি। দু' বছর পেরিয়ে গেছে। শুনেছি তোমার অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। তুমি যে পাঞ্জাবিটা পরেছিলে সেটা বেশ দামী কাপড়ের মনে হলো। সোনার বোতামও ছিল। আমার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাওয়াতে তুমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলে এবং গা-ঢাকা দিতে না পেরে একটু বিপন্ন বোধ করছিলে। আমিও বেশ বিপন্ন বোধ করেছিলাম, কারণ আমিও চেনা লোককে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছি। অবশ্য আমি কারও টাকা মারিনি, আমার কারণটা অন্য ধরনের। সেটা তোমার কাছে বলাও নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। একটি অনুরোধ শুধু করছি, আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছিল এ খবর যেন আমার বাড়িতে তুমি দিও না। অবশ্য টাকা নেওয়ার পর থেকে আমাদের কোনও খবর তুমি নাওনি; আমার অনুরোধ এখনও খবরাখবর কোরো না। আর আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি এবং কেন চলে এসেছি এ খবর তুমি যদি জেনে থাক তাহলে তা নিয়ে বেশি হইচই কোরো না। করে কোনও লাভ হবে না; আমি যা ঠিক করেছি তা করবই। কিন্তু তুমি যদি আবার পরিবার-বর্গকে অকারণে অশান্ত করে তোল তাহলে ওই হাজার টাকার জন্য তোমার নামে আমি নালিশ করব। যদিও তোমার কাছ থেকে আমি হ্যাণ্ডনোট নিইনি কিন্তু তোমাকে একটা চেক দিয়েছিলাম। আমার ব্যাংকই সাক্ষী দেবে, তুমি আমার কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়েছিলে। তোমাকে কোর্টে গিয়ে বলতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে, কেন টাকাটা নিয়েছিলে তুমি। মকদ্দমায় আমি না-ও জিততে পারি, কিন্তু তোমাকে নানা ঝামেলায় ফেলে দিতে পারি আমি। সুতরাং আমার অনুরোধটি রক্ষা কোরো। ইতি—

তোমার পিসেমশাই।

মান্যবরেষু,

পণ্ডিত মশায়, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি সেদিন ঠাকুরবাড়ির চত্বরে বসে সন্ধ্যেবেলায় প্রেম-বিষয়ক যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তা আমিও শুনেছিলাম একধারে বসে। অনেকেরই দেখলাম চোখ দিয়ে জল পড়ছে, অনেকেই 'আহা' 'আহা' করছেন। আপনি বক্তৃতা ভালো দেন, গানও আপনার চমৎকার, গৈরিকধারিণী যে মহিলাটি আপনার পাশে বসেছিলেন তিনিও সুন্দরী। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল তখন, গঙ্গার উপর দিয়ে যে হাওয়া বয়ে আসছিল তা অপূর্ব। প্রেম-বিষয়ক আলোচনা করবার মতোই পরিবেশ ছিল সেদিন। আপনি, আশা করি, ওই ঠিকানাতেই আছেন এবং এখনও প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি সন্ধ্যায় আপনার বক্তৃতার বিষয় প্রেম কি না জানি না। আমি আপনার এক ভক্তের কাছে আপনার নাম, ঠিকানা যোগাড় করেছিলাম। সেই ঠিকানায় এই পত্র লিখছি, জানি না আপনি এ পত্র পাবেন কিনা। এ পত্র লেখার উদ্দেশ্য আপনাকে এই কথা বলা যে, সেদিন যখন আপনি প্রেম-বিষয়ক বক্তৃতা করছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আপনি বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো অলীক কাব্য-কথা আউড়ে যাচ্ছেন। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রেম নেই, আর তা নেই বলেই তাকে ঘিরে আমাদের মনে অনেক স্বপ্ন আছে। সেই স্বপ্নেরই জাবর কাটছি আমরা বহুকাল ধরে। আপনিও সেদিন তাই করছিলেন।

সত্যি কথা হচ্ছে আমরা পশু; আমরা ষড়্‌রিপুর দাস। সেই ষড়্‌রিপুই সহস্ররূপে মূর্ত হয়েছে আমাদের স্বার্থ-ক্লিন্ন জীবনে। কাম আছে, কিন্তু তা প্রেম নয়। সর্বস্ব উজাড়-করা প্রেমের অনেক কাহিনী পড়েছি, কিন্তু দেখিনি কখনও। শ্রীরাধা কবি-কল্পনা। সাধারণত উপন্যাসে নাটকে যেসব প্রেম-কাহিনী পাঠ করি তা কাম-প্রণোদিত জীবলীলা। মানে, অধিকাংশই তাই। ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যাঁরা গৃহত্যাগ করেন, সর্বস্ব ত্যাগ করেন, তাঁদের সংখ্যাও এত কম যে তাঁদের অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন অদ্ভুত লোক বলে মনে হয়। এরকম লোকের কথা ইতিহাসে পড়েছি, চোখে দেখিনি। চোখে যাদের দেখেছি তারা সব স্বার্থপর পশু। এইসব স্বার্থপর পশুদের জন্য যেসব প্রেম-কাহিনী বাজারে নাম করে সেগুলি প্রায়ই নিছক পর্ণোগ্রাফি, কিংবা পর্ণোগ্রাফিঘেঁষা। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কেউ পড়ে না আজকাল। পর্ণোগ্রাফির দিকেই সাধারণ লোকের ঝোঁক বেশি। আপনার সভায় যে ধরনের লোক-সমাগম হয়, লক্ষ্য করলাম, তাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেমের ছটা কারও মুখে নেই। আপনার সভায় কমবয়সী মেয়েদের বেশ ভিড়, আরও লক্ষ্য করলাম আপনার পুরুষশ্রোতারা নির্লজ্জের মতো তাদের দিকে দু'চক্ষু মেলে চেয়ে আছেন। যদিও মাঝে মাঝে কেউ কেউ 'আহা' 'উহু' করছেন কিন্তু সেটা যে আপনার বক্তৃতার সার-মর্ম উপলব্ধি করে তা আমার মনে হলো না। আপনার ওই আধ্যাত্মিক সভাতেও পশুদেরই ভিড় দেখলাম, যে ভিড় চারদিকেই দেখছি—আদালতে, বেশ্যালয়ে, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে, রাজনীতিসভায়, স্কুল-কলেজে, সাহিত্য-প্রগতিতে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে—এক কথায় সর্বত্র। দু-চারজন ভদ্রলোক যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁরাই আজকাল সব চেয়ে বেশি বিব্রত। প্রেম-কীর্তন না করে, পারেন তো আমাদের ওই ভদ্রতাবোধকে আবার উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করুন। কিন্তু বোধহয় তা পারবেন না। স্বয়ং বুদ্ধদেব ওই কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মও শেষে গুহ্য পুজোয় পরিণত হয়েছিল এদেশে। পশুদের ভদ্র করা শক্ত। তবু ওই শক্ত কাজটা করবারই চেষ্টা করতে হবে। আপনি ভালো বক্তা ভালো গায়ক, আপনার চেহারাটিও সুন্দর—আপনি চেষ্টা করুন। নানা কারণে আমার মনটা বিষিয়ে আছে, তাই আমার চিঠির সুরটা যত ভদ্র হওয়া উচিত ছিল হয়তো ততটা হলো না। মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি ক্ষমা করবেন। আগে পশুদের ভদ্র মানুষ করুন তারপর প্রেমের কথা কইবেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। ভদ্রতা আর প্রেম দুটোরই মূল কথা ত্যাগ, পরার্থপরতা। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি বেকার, তাই চিঠি লিখে সময় কাটাই। নানা লোককে লিখি। আপনাকেও লিখলাম। উত্তর চাই না, তাই ঠিকানা দিলাম না। তাছাড়া আমার কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানাও নেই। আমি একজন পথ-চলতি মুসাফির। ইতি

কল্যাণীয়াসু,

আমি সেদিন তোমাদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। কারণ তোমাদের বাড়ির সামনে যে হোটেলটা আছে সেখান থেকে আমি কিছু ভাত তরকারি কিনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম ভাত চড়ানো হয়েছে, একটু পরেই গরম ভাত পাওয়া যাবে। আমি একটা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে গিয়েছিলাম, সেইটে তাদের কাছে দিয়ে দিলাম, বললাম, ওই সামনের বাড়ির বারান্দাতে বসছি, ভাত হলে আমাকে

ডাক দিও। আমার হাতে কয়েকটা রঙিন রবারের বেলুন ছিল। রাস্তার একটা ফেরিওলার কাছে কিনেছিলাম। প্রায়ই কিনি। তারপর সেটা বিলিয়ে দিই ছোট ছেলেমেয়েদের। রাস্তায় এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিলাম কোনও ছোট ছেলে বা মেয়ের দেখা যদি পাই। এমন সময় তোমার ছেলে বেরিয়ে এল কপাট খুলে। তার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও। তোমার ছেলে সরাসরি দাবি করে বসল—ও ফানুসওলা, আমাকে একটা ফানুস দাও। তুমি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দড়াম করে খিল বন্ধ করে দিলে। ছেলেটা কাঁদতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম। ছেলেটার কান্না ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছিল। আমি তখন তোমার দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগলাম। আবার বেরিয়ে এলে তুমি। এসে বললে, বেলুন এখন কিনব না। আমি বললাম, বেলুন বিক্রি করি না আমি। আমি ছোট ছেলেদের বেলুন বিলিয়ে বেড়াই। এগুলো নাও তোমার ছেলের জন্যে। তুমি বললে, না, অমনিতে বিনাপয়সায় আমরা কিছু নিই না। আপনি যান। আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলেটি আবার বাইরে এল। আমি তখন তার হাতে বেলুনগুলি দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। তুমি তখন চীৎকার করে বললে—তুমি দাম নিয়ে যাও। আমি কিন্তু পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছিলাম। একটু পরে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম তোমার কপাট বন্ধ। তোমাদের বাড়ির দরজায় দেখলাম, নিমাইচন্দ্র বসু—এই নামটা লেখা রয়েছে। ইনি তোমার কে হন তা জানি না। তাঁরই নামে তোমাকে চিঠি লিখছি। তোমার নাম আমি জানি না, কিন্তু একটা কথা জানি, তুমি আমার পুত্রবধূর বয়সী, তুমি আমার মা। তাই তোমাকে সাহস করে এই চিঠি লিখছি। দেখ মা, আমি ভালবেসে তোমার ছেলেকে ক'টা বেলুন দিতে গেলাম, কিন্তু তুমি বললে, বিনা পয়সায় আমি কিছু নিই না, তোমাকে দাম নিতে হবে। ভালবাসার দাম দিতে চাও তুমি? কুবেরের মতো ঐশ্বর্য থাকলেও তা কি দিতে পারতে? তোমার ওই উক্তিতে সেদিন যে স্পর্ধা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমার কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি। কারণ এ যুগটাই অন্তঃসারশূন্য স্পর্ধার যুগ, হৃদয়হীনতার যুগ। এ যুগে সবাই সবাইকে দেখাতে চায়—আমিও কারোর চেয়ে কোনও অংশে কম নই। তুমি আমার মেয়েকে যদি পঁচিশ টাকা দামের শাড়ি উপহার দাও, আমিও তৎক্ষণাৎ ঐ দামের শাড়ি তোমার মেয়েকে প্রত্যুপহার দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দেব, আমিও তোমার চেয়ে কম নই। এই স্পর্ধার এবং বাহাদুরির লোফালুফি করে আমরা ফতুর হয়ে যাচ্ছি, তবু থামতে পারছি না। থামতে পারছি না কারণ আমাদের চরিত্রে বিনয় নেই, শ্রদ্ধা নেই, মুক্ত আকাশে পাখা মেলবার মতো ডানা নেই। আমরা ছোট ছোট পিঞ্জরে বন্দী হয়ে আত্ম-আস্ফালন করছি, কিন্তু আসলে যে ছটফট করছি তা বুঝিনি এখনও! ওই ছটফটানির মূল সুরটা অহংকার আর স্বার্থপরতা। সংসারে থাকতে গেলে স্বার্থপর হতেই হয়, স্বার্থপর না হলে সংসার গড়া যায় না, কিন্তু মজা হচ্ছে, ওই স্বার্থপরতা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সোনার সংসার ভেঙে যায়। ওই স্বার্থপরতার দংশনে আমাকে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আমি রাস্তায় বেলুন বিলিয়ে বেড়াচ্ছি কেন জান? কারণ, যে নাতিটিকে ছেড়ে এসেছি তাকে বড় ভালবাসতাম। কোথাও ছোট ছেলে দেখলে তাকে আদর করতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে তাকে কিছু কিনে দিই। তাই তোমার ছেলেকে বেলুনগুলি দিয়েছি। দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। তুমি বলতে পার এও

তো একরকম স্বার্থপরতা। তা অস্বীকার করব না। আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি বটে, কিন্তু নিরাসক্ত সন্ন্যাসী হতে পারিনি। নিরাসক্ত সন্ন্যাসীরাই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হতে পারেন। আসক্তি মানে বন্ধন, এমনকি ভগবানে আসক্তিও বন্ধন। সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই কাম্য তাঁদের। আমি অতটা উঁচুতে উঠতে পারিনি। তবু আমার যে আসক্তি তা নিছক স্বার্থপরতা নয়, ওর মধ্যে একটু পরার্থপরতাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই ওর মধ্যে মাধুর্যও আছে খানিকটা। তোমাকে চিনি না তবু তোমাকে এত কথা লিখলাম, কারণ তোমার ব্যবহারে বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। অত অহঙ্কারী হওয়া ভালো নয়। তুমি মা, তোমাকে দেখে তোমার ছেলেও অহঙ্কারী হবে। দেশকে গড়বার দায়িত্ব তোমারও আছে অনেকখানি একথা ভুলো না। আশীর্বাদ করি সুখী হও। ইতি—

সেদিনকার সেই বেলুনওলা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বরেনবাবু, আপনি সেদিন যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেই ঠিকানাতেই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আশা করি, আপনি কাশী ছেড়ে এখনও চলে যাননি। আমি সেদিন আপনাকে নদীর ধার থেকে আমন্ত্রণ করে আমার বাসায় এনেছিলাম এতে আপনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—আমি যে অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য তা তো আমার মুখ দেখেই বোঝা যায়। এরকম সিংহবদন আর কোনও অসুখে হয় না। আমি নদীর ধারে একা বসেছিলাম। আমাকে দেখলেই লোকের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে তা আমি সহ্য করতে পারি না, তাই দূরে দূরে একা একাই থাকি যতটা সম্ভব। আপনি আমার মতো 'কুঠে'কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন কেন, ভারি আশ্চর্য লাগছে।— আপনার আশ্চর্য লাগত না, যদি তখন বলতাম আমিও 'কুঠে'। কিন্তু তখন বলিনি। ছুনি তখন ভিতরে রান্না করছিল, তাকে আপনি দেখতে পাননি, তাকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারতেন সেও 'কুঠে'। তার ফোলা নাকটা সে-কথা তারস্বরে ঘোষণা করছে। সে আপনাকে ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করেছিল বলে তার নাকটা আপনি দেখতে পাননি। ছুনিকে আমি আমার বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সহোদরা নয়। তার কুষ্ঠ হয়েছে বলেই তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছি। পথ থেকে ডেকে এনে ভগ্নীর আসনে বসিয়েছি তাকে। ওই ব্যাধিটাই আমাদের বন্ধন। আপনাকেও সেদিন আহ্বান করেছিলাম ওই জন্যে। ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের আত্মীয় হতে পারেন। যে বাসাটায় আপনাকে এনেছিলাম সেটা আমি ভাড়া করেছি। আমিও চারিদিকে ঘুরে বেড়াই, মাঝে মাঝে এখানে এসে বিশ্রাম করি। আপনি যদি এখানে থাকতে চান, চলে আসুন। বাসাটা তো আপনি দেখেই গেছেন। যদি চিঠি লেখেন এখানকার পোস্টমাস্টারের কেয়ারে লিখবেন। আমিও আপনার মতো বাড়ি থেকে চলে এসেছি। কেউ আমাকে তাড়িয়ে দেয়নি, নিজেই চলে এসেছি, কারণ ঘৃণা এবং আতঙ্কের পরিবেশে থাকা যায় না। আপনার কাহিনী আমাকে বলেননি, আমি শুনতেও চাই না। আপনার বেদনার কাহিনী আপনার চোখমুখেই লেখা রয়েছে। আমিও ভুক্তভোগী, তাই আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি। সমাজে মেশবার উপায় নেই আমাদের। আমার সঙ্গী কয়েকটা খবরের কাগজ। আর ছুনি। ছুনি কিন্তু বিশেষ

কথা বলে না। ছুনির চিকিৎসা করাচ্ছি। একটু উপকার হয়েছে। আমি কিন্তু ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ব্যাধি যদি বাড়ে বাড়ুক। যে সমাজে অসুস্থ হলে সবাই ঘৃণা করে, ভয় পায়, সে সমাজে সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। মরতে তো হবেই একদিন, এই রোগেই না হয় মরব। ছুনিকে পেয়েছি এটা আমার মহাভাগ্য। আপনিও যদি আসতে চান আসুন। আসবার আগে চিঠি লিখবেন একটা। আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আমি যে নাম এখানে নিয়েছি সেটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম নানা কারণে প্রকাশ করবার ইচ্ছে নেই। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়
রবিদাস ঘোষাল

নন্দরানী,

তোমার পুতুলের জন্যে মখমলের চারটি বালিশ আর বেড্‌কভারের জন্য রঙিন বেনারসী কাপড় পাঠালাম খানিকটা। তোমার খেলাঘরের বর-কনে এবার আশা করি, আরামে শুতে পারবে। ছোট্ট একটা রঙিন খাট আর তোশকও পাঠাচ্ছি। পার্শেলটা তোমার কাছে যখন পেঁছিবে তখন নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে তুমি, হয়তো ভাববে, এ আবার কে! হয়তো খুশীও হবে একটু, যদি হও, তাহলে তোমার খুশীর ঢেউ আমার মনেও এসে লাগবে। তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি জন্মাবার আগেই তোমার ঠাকুরদা মারা গেছেন। তাঁকে তুমি দেখনি, তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তোমার ছেলের বিয়ের জন্য এইসব জিনিস কিনে দিতেন। মনে কর-না আমার হাত দিয়েই তিনি পাঠিয়েছেন এসব। তোমার বাবার সঙ্গে এক ট্রেনে এক কামরায় অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর মুখেই তোমার সব পরিচয় পেয়েছি। তোমার বয়স যদিও পাঁচ বছর কিন্তু তুমি নাকি ভয়ংকর আবদেরে আর জেদী। তোমার বন্ধু থেবির মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে। তুমি নাকি তার কাছ থেকে মখমলের বালিশ আর বেনারসী বেড্‌-কভার চেয়েছিলে। থেবির বাবা গরীব, তিনি বলে দিয়েছেন তিনি দিতে পারবেন না। তখন তুমি তোমার বাবার কাছে দাবি করে বসলে—তবে তুমিই কিনে দাও। তিনিও বললেন, আমিও পারব না কিনে দিতে। এজন্যে তুমি নাকি অনেক কান্নাকাটি করেছ। রাগ করে বিয়ে ভেঙে দিয়েছ শুনলাম। তোমার বাবা যখন এসব বলছিলেন তখন তোমার ঠাকুরদাও অদৃশ্যভাবে শুনেছিলেন সেসব। তিনি যখন নেমে গেলেন তখন তিনি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করে বললেন—আমার নাতনী নন্দরানীকে আপনি জিনিসগুলি পাঠিয়ে দিন। সে ভারি অভিমানিনী। ভাগ্যে তোমার বাবার কাছ থেকে তোমার ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না এই আজগুবি গল্প? তাহলে এক কাজ কর, আমাকেই তোমার আর-এক ঠাকুরদা বলে ভেবে নাও। সেইটেই সহজ হবে, আর তা যদি পার তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। একটা দুঃখ কিন্তু হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার আর হয়তো দেখা হবে না। যদিও দৈবাৎ কখনও হয় তোমাকে চিনতে পারব না। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার জিনিসগুলো পার্শেল করে না পাঠিয়ে নিজে নিয়ে গেলেও তো পারতুম। বিশ্বাস কর, পারতুম না। কেন পারতুম না তা বলা যাবে না। কল্পনায় তোমাকে দেখছি, আদর করছি, কিন্তু কাছে যেতে পারব না। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

তোমার অচেনা ঠাকুরদা।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়,

স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুমে সেদিন আপনার সঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি লিখছি। আপনি একটি বিখ্যাত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, আপনার কলেজের ঠিকানাতেই চিঠি লিখছি। আশা করি, চিঠিটা পাবেন। আমি বেকার লোক, চিঠি লিখেই সময় কাটাই, আপনাকে চিঠি লেখার এইটেই প্রধান কৈফিয়ত। আর একটা কৈফিয়ত, সেদিন যে প্রসঙ্গটা উঠে পড়েছিল সেটার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারিনি। আপনার ট্রেন আসাতে আপনি উঠে পড়লেন। আমার বক্তব্যটা আপনাকে তাই চিঠিতে জানাচ্ছি। আপনি সেদিন বললেন, শক্ত সমর্থ নেতা না এলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। শক্ত সমর্থ নেতা বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই, শক্তি সামর্থ্যের মূর্ত প্রতীক অনেক নেতা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অনেক লম্ফঝম্প করে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারেননি, নিজেরাও ডুবেছেন, দেশকেও ডুবিয়েছেন। স্বাভাবিক নিয়মেই সব সভ্যতার সব সমাজের সব রাজ্যের উত্থান-পতন হয়। আমাদের বর্তমান সভ্যতাও তার ব্যতিক্রম হবে না। বস্তুতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা যে মুষল প্রসব করেছে সেই মুষলই আমাদের শেষে ধ্বংস করবে। এই যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনে যে পাশবিক ক্ষুধা, যে দম্ভ, যে অবিনয় জাগিয়েছে, যে উচ্ছৃংখলতায় আজ আমরা উন্মত্ত হয়েছি, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ধর্ম, দিব্যজ্ঞান। সে ধর্ম সে দিব্যজ্ঞান সহজে পাওয়া যায় না, তার জন্যে অনেক অনেক মূল্য দিতে হয়, সে মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমাদের নেই এখন। দিব্যজ্ঞানের চেয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর জ্ঞান আমাদের কাছে বেশি কাম্য। কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি দিব্যজ্ঞানের বার্তা একদিন আসবে। আসবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মুখ থেকে। এখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দর্পী দুর্যোধনদের রাজত্ব চলেছে। আমার একটা ভয় হয়। শান্তি পর্বে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উপদেশ শোনবার জন্য কিছু লোক বেঁচে ছিলেন, এ যুগের কুরুক্ষেত্র যখন শেষ হবে তখন শান্তির বাণী শোনবার জন্য কোনও মানুষ বেঁচে থাকবে কি? আপনি শিক্ষক। এ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আপনাদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন সেই শান্তি পর্বের উপদেশ উপলব্ধি করবার মতো কয়েকটি লোকও থাকে। এ যুগের যে যন্ত্রণাকে যুগ-যন্ত্রণা বলে এ যুগের লে করা বর্ণনা করেন সে যন্ত্রণাটা কিন্তু রিরংসার আক্ষেপ বা লোভের উন্মত্ততা নয়, সে যন্ত্রণাটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের অবমাননা, আদর্শের লাঞ্ছনা, দৈত্যদের হাতে দেবতাদের দুর্দশা। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল পশুত্বের উল্লাস এবং ভদ্রলোকদের সমূহ বিপদ। ঘরে ঘরে এই পশুত্ব মাথা চাড়া দিয়েছে, আপনারা শিক্ষকরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নন। বস্তুত সকলেরই উপর এই পশুত্বের ছায়া পড়েছে। চারিদিকে চেয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন আমি মিথ্যা বলিনি, স্বার্থপরতাই আজ অধিকাংশ লোকের ধর্ম, পরার্থপরতার চিহ্ন কোথাও নেই। বিজ্ঞানই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বড় বড় শক্তিমান পশুরা অবলুপ্ত হয়েছে, তাদের অবলুপ্তি কিন্তু পশুত্বকে অবলুপ্ত করতে পারেনি, পশুত্ব ক্ষুদ্রকায় হয়েছে কিন্তু বেঁচে আছে এখনও সর্বত্র। শুধু বেঁচে নেই, বিজ্ঞানের সহায়তায় আরও বলীয়ান হয়েছে সে এবং ক্রমশ বলীয়ান হতে থাকবে যতক্ষণ না তার আত্মবিলুপ্তি সম্পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ যতক্ষণ না মহাপ্রলয় আসছে। সেই

মহাপ্রলয়ের পর যদি কেউ বেঁচে থাকে তাহলেই আবার নবসভ্যতা আরম্ভ হবে হয়তো। এইটেই আমার বিশ্বাস, তাই শক্ত সমর্থ নেতার উপযোগিতায় আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। এই কিছুদিন আগেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে পেয়েছি, বিবেকানন্দকে পেয়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি, তাঁরা যা বলেছেন তা আমরা শুনেছি, কিন্তু তাঁদের নির্দেশ কি পালন করেছি আমরা? করিনি। নেতাদের হিতকথা শুনলেই আমাদের পশুত্ব ঘোচে না। পশুত্বকে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখতে পারে লাঠি, পশুত্বকে চিরকালের মতো বিলোপ করতে পারে যে পদ্ধতি সে পদ্ধতি আজও আমরা জানি না। ধর্ম, আত্মসংযম, ভদ্রতা দিয়ে আমরা পশুত্বের মুখে একটা লাগাম লাগাতে পারি, কিন্তু সে লাগামও বার বার ছিঁড়ে যায়। কামনার আগুনে ভোগের ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে চারদিকে, এই বেড়া-আগুনে পুড়ে মরতে হবে সবাইকে। নানা কারণে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে, তাই এই তিক্ত চিঠি লিখলাম আপনাকে, যা বললাম তা হয়তো যুক্তিসহ নয়, কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোনও কিছু ভাবতে পারছি না এখন। একটি ক্ষীণ আশা শুধু আছে যে, মহাপ্রলয়ের পরও দু-চারজন ভালো লোক বেঁচে থাকবেন। সৃষ্টিকর্তা তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবেন। মহাপ্রলয় পৃথিবীতে বার বার এসেছে, কিন্তু পৃথিবী একেবারে মনুষ্যহীন হয়নি। কোনও 'নোয়া' হয়তো কিছু ভালো জিনিসের নমুনা বাঁচিয়ে রাখবেন। আপাতত অসংখ্য অসুখী ধর্মহীন জনতার তর্জন-গর্জন আক্ষেপ-বিক্ষোভ ক্রন্দন-হাহাকার শোনা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

আবোল-তাবোল বকলুম অনেক। ক্ষমা করবেন। ক্ষমা করতে পারবেন—যদি বলি আমার ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। নমস্কার। ইতি—

আপনার সেদিনকার সহযাত্রী।

॥ ৩ ॥

চন্দ্রভূষণ নূতন বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। বেশ বড় বাড়ি। একটা ঘরে চন্দ্রভূষণের লাইব্রেরি। অনেক বই। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, জর্মন—সব ভাষারই বই। এতদিন বইগুলো বাক্সবন্দী হয়ে একটা গুদোম ঘরে পড়েছিল। বড় বাড়িটা পাওয়াতে বইগুলো একত্রে সাজিয়ে রাখতে পেরেছে সে। চাঁদু প্রাইভেট ট্যুশনি ছেড়ে দিয়েছে আজকাল। আপিসের পর আপিসের গাড়িতেই বাড়ি ফেরে। এসে জলখাবার খেয়েই কিন্তু বেরিয়ে পড়ে সে আবার। যায় তার সেই ভিখারী বন্ধুদের কাছে। অমাও তার সঙ্গে যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু অমার রোজ যেতে ভালো লাগে না। ভিখারীরা তাকে তেমন পছন্দ করে না যেন। তার মনে হয় তারা চাঁদুকে খাতির করে স্বার্থের জন্য। চাঁদু তাদের অর্থ সাহায্য করে মাঝে মাঝে। তাদের অসুখ-বিসুখ করলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কাপড় জামা এমনকি থালাবাটিও কিনে দেয়। অমাকে কিন্তু তারা সুচক্ষে দেখে না। তাদের বোধহয় মনে হয় অমা হয়তো চাঁদুকে

তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে একদিন। বিশেষ করে মেয়ে ভিখারীদের চোখে সে যেন ঈর্ষার ঝলক দেখতে পায় একটা। অমাকে তারা শত্রুপক্ষ মনে করে। একটা বুড়ি ভিখারিণী তো স্পষ্টই বলে বসল একদিন—"তুমি বুঝি বাবাঠাকুরের বউ। আমাদের নতুন মা-ঠাকরুণ? কিন্তু সত্যি কথা বলব? মেয়ে দেখলেই ভয় করে মা আমার। আমার নিজের মা, বোন, বউদি, ননদ, সবাই শত্রু ছিল আমার, সবাই গঞ্জনা দিয়েছে আমাকে। এইটেই বুঝেছি মা, মেয়েরাই মেয়েদের সব চেয়ে বড় শত্রু। ওরাই আমাকে রাস্তার ভিকিরি করেছে। তোমাকে দেখে তাই ভয় করছে, আমাদের উপর দয়া রেখো মা, আমরা বড় দুঃখী।" অমা অবশ্য উত্তরে বলেছিল যে, সে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না, চেষ্টা করবে তাদের ভালো করবার জন্যে। কিন্তু তারপর থেকে সে আর ভিখারীদের কাছে যায় না। চাঁদু কিন্তু রোজ যায় তাদের কাছে। নানা জায়গায় থাকে তারা। খিদিরপুর, টালিগঞ্জ, টালা, শ্যামবাজার, চৌরঙ্গী, কত জায়গায় তাদের আড্ডা। ফিরতে কোনও কোনও দিন রাত দশটা হয়ে যায়। উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকে অমা। কিন্তু মুখ ফুটে সে কোনদিন বলতে পারে না, "রোজ রোজ ভিখারীদের দেখতে না-ই বা গেলে। আমার যে একা একা বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে না।" মাঝে মাঝে রাত্রি নটার আগেও ফিরে আসে চাঁদু। এসে বলে—"চল সেকেণ্ড শো'-এ সিনেমা দেখে আসি। ভালো ইংরেজি বই আছে একটা।" তাড়াহুড়ো করে খেয়ে ট্যাক্সি করে সিনেমায় যায় সেদিন তারা। সিনেমা থেকে ফিরে নিজের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে পড়ে চাঁদু। অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনা করে। প্রায় দুটো পর্যন্ত। বিয়ের পর প্রায় এক বছর কেটে গেছে। অমা ক্রমশ যেন বুঝতে পারছে সে চাঁদুর সহধর্মিণী হতে পারেনি। চাঁদু হিমালয়, চাঁদু সমুদ্র, চাঁদু অনেক বড়। তাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, তাকে ভালবেসেছিল, সে যেন হঠাৎ ধস ভেঙে বেগবতী একটা নদীর খরস্রোতে পড়ে ভেসে গিয়েছিল, বাড়ির সকলের অমতে বিয়ে করেছিল তাকে। চাঁদুও ভালবেসেছিল তাকে, চাঁদুও বলেছিল, তোমাকে পেলে সত্যিই আমি খুব খুশী হব। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেনি, চাঁদুর মধ্যে কোনও থিয়েটারি আবেগ লক্ষ্য করেনি সে। যখন সে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে তখনও না। মনে হয় সে যা করছে তা যেন কর্তব্যবোধে করছে। তার বাইরেটা কঠিন পাথরের মতো, মুখটা যেন মুখোশ। অমা সাধারণ মেয়ে, তবু সে আশা করে ওই পাথরের তলায় ঝর্ণাধারাকে আবিষ্কার করবে সে একদিন, ওই মুখোশটা সরিয়ে ফেলে দেখতে পাবে জীবন্ত মুখটাকে। এখনও কিন্তু পারেনি। যেসব অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ আলাপে একজন মানুষকে আর একজন মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এনে দেয় সেরকম আলাপ করতেই চায় না চাঁদু। শাড়ির পাড়, বালিশের ওয়াড়ের ছিট, পর্দার ফ্যাশন, গহনার প্যাটার্ন, আত্মীয়দের নিয়ে মুখরোচক চর্চা, পাড়ার কোনও ছেলের বা মেয়ের কেলেঙ্কারি নিয়ে সরস আলোচনা, সিনেমা অভিনেত্রীদের বয়স কত, যাকে ষোল বল বলে মনে হচ্ছে আসলে সে যে ছেচল্লিশ, সে ক'বার কার কার সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়েছে, কাকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে, কাকে ফেলে পালিয়েছে—এসব আলোচনায় যোগই দিতে চায় না চাঁদু। সমস্ত সকালটা সে ব্যস্ত থাকে লেখা নিয়ে। কি যেন একটা থিসিস লিখছে। ভোরে উঠে নটা পর্যন্ত সে লেখাপড়া নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকে তার লাইব্রেরি ঘরে। অমা সে সময় রান্নাঘরে থাকে। রান্নাঘরেও তার কিছু সময় কাটত

যদি ভোজনরসিক হতো চাঁদু। তার জন্যে নানারকম রান্না করে তৃপ্তি পেত। চাঁদু কিন্তু ভাতে-ভাত, একটু ঘি, দু-একখানা ভাজা এবং একটু দুধ বা দই পেলেই সন্তুষ্ট। সকালে চায়ের সঙ্গে দু-একখানা বিস্কুট আর কিছু ফলমূল, এর বেশি সে আর কিছু খেতে চায় না। পোশাকেও তার কোনও বাবুয়ানি নেই। বাড়িতে সাধারণ কাপড়, বাইরে কোটপ্যান্ট। কোনও দিক দিয়েই অমা চাঁদুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে না, একাত্ম হবার সব দ্বার যেন রুদ্ধ। তাই সে গানের টুইশনিগুলো এখনও ছাড়েনি। ওই নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটে তার। কিন্তু তবু সে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে খুব। বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মুখ নেই। দাদার অমতে, মায়ের অমতে সে চাঁদুকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তাঁরা একবারও আসেননি তার কাছে। মায়ের জন্য খুব মন কেমন করে তার। মায়েরও নিশ্চয় করে। দাদার ভয়েই মা কোনওখবর নিতে পারে না। সে মাকে একখানা চিঠি লিখেছিল, বউদিকেও লিখেছিল, কিন্তু কেউ কোনও উত্তর দেয়নি। তবু সে মাঝে মাঝে ভাবে, দুপুরে একদিন লুকিয়ে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবে। কিন্তু সাহস সংগ্রহ করতে পারে না। বাবার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। তিনি সত্যিই কি আর ফিরবেন না? ন' বছর হয়ে গেল কোনও খবরই তাঁর পাওয়া যায়নি কোথাও। মা একবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে—তুমি ফিরে এস। আমি তোমার সঙ্গে আলাদা বাড়িতে বাস করব। কিন্তু কোনও ফল হয়নি এতে। অমার এখন মনে হয় দাদা বাবাকে ওকথা বলে অন্যায় করেছিলেন। দাদার অবশ্য ভয় হয়েছিল খোকাটার জন্য। বাবার খুব ন্যাওটা ছিল তো সে। সর্বদা তাঁর কোলে বসে থাকত। এই রকম নানা কথা মনে হয় তার। চাঁদুকে কিন্তু সে বাবার কথা বলতে পারেনি। চাঁদুর ধারণা তার বাবা বোধহয় মারা গেছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুকেও সে বলে দিয়েছিল একদিন, তার বাবা যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এবং তিনি যে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন একথা তিনি যেন চাঁদুকে না বলেন। এতে চাঁদুর মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগতে পারে হয়তো। সিদ্ধেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান লোক, তিনি চাঁদুকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি। চাঁদুর নিজেরও কোনও ঔৎসুক্য নেই। নিজের পরিবারের সম্বন্ধেও নির্বিকার সে। এখনও অমা তার পরিবারের সম্বন্ধে কোনও খবর জানে না। বিয়ের আগে সে বলেছিল—আমিই আমার পরিচয়। অন্য কোনও পরিচয় জানতে চেও না। আরও বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হলে জানতে পারবে একদিন হয়তো। কিন্তু এখনও সে জানতে পারেনি কিছু। জিজ্ঞেসও করেনি। অপেক্ষা করে আছে, চাঁদু নিজেই একদিন বলবে। এখনও কিন্তু বলেনি সে। সে নিজের কাজ নিয়েই এত অন্যমনস্ক থাকে যে, সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামায় না। অমা অনুভব করে সে আইনত চাঁদু-রূপ বিরাট প্রাসাদে প্রবেশ করবার অনুমতি পেয়েছে বটে, কিন্তু এখনও সে প্রাসাদের বাইরের ঘরে বসেই দিনযাপন করছে। ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ভিতরে প্রবেশ করবার আগ্রহ তার কম নয়। কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সে প্রবেশ করবে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, স্বামীর কাছে আত্মসম্মানের প্রশ্ন তার মনে জাগছে কেন? তাহলে সে কি স্বামীকে ভালবাসে না? ভালবাসে বই কি, ভালবাসে বলেই তো বিয়ে করেছে তাকে। কিন্তু তবু সে সাহস করে এগিয়ে যেতে পারছে না কেন? কেন জোর করে বন্ধদ্বারে আঘাত হানতে পারছে না? কেন বলতে পারছে না, খুলে

ফেল তোমার মুখোশ, তোমার আসল রূপটা দেখতে চাই। কিন্তু সে কি তার আসল রূপ দেখেনি? কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল তাহলে? কি সে অপূর্ব জ্যোতির্ময় রূপ যা তাকে এখনও মুগ্ধ করে রেখেছে—কিন্তু যাকে সে আটপৌরে কাপড়ের মতো ব্যবহার করতে পারছে না? চাঁদু বহুমূল্য দুর্লভ রত্ন। তাকে চিনেছে বই কি অমা। তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সে আইনত। কিন্তু সত্যি পেয়েছে কি? এই সন্দেহের ছায়া তার মনে জাগে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাকে আমল দিতে চায় না সে। তার ক্ষোভ, চাঁদু কেন তাকে নিয়ে মেতে ওঠেনি, আর সকলের মতো। কেন মশগুল হয়ে যায়নি, কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর কি তা সে ভেবে ঠিক করতে পারে না। তার মনের যখন এই রকম অসহায় অবস্থা তখন একদিন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা।

একটি অপরিচিত যুবককে নিয়ে এল একদিন চাঁদু সন্ধ্যার সময়।

"এ'র সঙ্গে আলাপ কর অমা। বড় ভালো ছেলে।"

অমা নমস্কার করল।

বলল, "এ'র পরিচয় তো জানি না।"

"এর নাম অতুল লাহিড়ী। বিদ্বান ছেলে। আমাদের আপিসে আমার সহকারী। তাছাড়া আমার ইউ বি এস গঠনে মহা উৎসাহী—"

"ইউ বি এস কি?"

"ইউনাইটেড বেগারস্ সোসাইটি ঃ বাংলা নাম, সংযুক্ত ভিক্ষুক সমিতি।"

"সেটা আবার কি!"

অতুল বলল—"আগে খেতে দিন আমাদের। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আপিস থেকে সোজা চলে এসেছি এখানে। আগে খাই তারপর সব বলছি আপনাকে।"

"বসুন, চায়ের জল চড়াতে বলছি।"

একটু পরেই ফিরে এল অমা। চাঁদুকে দেখিয়ে বলল—"ইনি তো কলা আর পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছু খেতে চান না। আপনার জন্যে আরও কিছু করব কি? হালুয়া করি?"

"বাড়িতে যদি ডিম থাকে, ডবল ডিমের ওমলেট করুন। আর যদি না থাকে—হালুয়াই সই।"

"ডিম আছে। করে দিচ্ছি ওমলেট।"

অমা খুব পুলকিত হলো অতুলের খাওয়া দেখে। গোটা চারেক মর্তমান কলা, একটা আপেল, চার টুকরো মাখন-মাখানো পাঁউরুটি, দুটো সন্দেশ এবং ডবল ডিমের ওমলেট সহযোগে সে তিন পেয়ালা চা খেল। চাঁদু তার দিকে চেয়ে হেসে বলল—"অমা তোমাকে পেয়ে খুশী হবে। আমার মতো মিতাহারী লোককে পেয়ে ওর তৃপ্তি হয় না। যে ধরনের ব্রুটকে ফীড্ করে ওরা খুশী হয় আমি সে ধরনের ব্রুট নই তো। আমি কম খাই বলে ও নিজেও কম খায় বাধ্য হয়ে। নিজের জন্যে আলাদা কিছু করে না। এজন্য আমি সঙ্কুচিত হয়ে থাকি। তুমি থাকলে অমা বেশী স্কোপ পাবে। তবে—"

অমা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—"উনি এখানে থাকবেন নাকি!"

"থাকবেন যদি তোমার না আপত্তি থাকে। আমাকে আপিসের কাজে লণ্ডন যেতে হবে, সেখান থেকে জার্মানি, দরকার হলে ফ্রান্সও। তিন চার মাস এখানে থাকব না।

তুমি একা থাকতে পারবে? অতুল এখানে মেসে থাকে, বিয়ে করেনি, নির্ঝঞ্ঝাট লোক। ও এখানে তোমার কাছে থাকতে পারে যদি তুমি আপত্তি না কর। আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।"

অতুল বলল—"ইউ বি এস-এর কাজ করবারও সুবিধা হবে এখানে থাকলে। এ বাড়িটায় জায়গা আছে। রীতিমত একটা আপিস হয়ে গেছে তো—"

ফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে।

চাঁদু উঠে গেল।

"ভিখারীদের নিয়ে অফিস করেছেন?"

"আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত ভিখারীদের নিয়ে একটা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি করতে। মনুষ্যত্বের চরম দুর্দশার ওরাই তো জীবন্ত নিদর্শন। ওরাও এদেশের মানুষ, ওদেরও ভোট আছে, ওদের নাম যদি ভোটার লিস্টে ঢুকিয়ে ওদের একটা পলিটিক্যাল পার্টিতে পরিণত করা যায়, তাহলে ওদের সমস্যা ওরাই সমাধান করে নিতে পারবে। আপনার স্বামী একজন মহৎ লোক, তিনি নিজে ওদের সাহায্য করেন, কিন্তু তাঁর একার সাহায্যে কতটুকু হওয়া সম্ভব? তাই আমিই ও'কে বললাম একদিন, আসুন ওদের নিয়ে একটা পার্টি করা যাক। ওরাই তো সর্বহারা—"

"তা ঠিক।"

এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না অমা। রাজনীতির সে কিছু বোঝে না। বোঝবার চেষ্টাও করল না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে কেবলি ভাবছিল, চাঁদু বিলেত চলে যাচ্ছে আর তার জায়গায় রেখে যাচ্ছে একটি অনিন্দ্যকান্তি বিদ্বান যুবককে? সে একা তার সঙ্গে বাড়িতে থাকবে? চাঁদুর এতে আপত্তি নেই? কি রকম লোক চাঁদু! এই কথাটাই ভাবছিল সে বার বার। সবিস্ময়ে ভাবছিল। চাঁদু ফিরে এসে বলল—"তোমার বউদিদি তোমাকে ফোনে ডাকছেন। ফোনে ও'র সঙ্গে তোমার আলাপ হয় নাকি মাঝে মাঝে!"

"বউদি? না, উনি কখনও তো ফোনে ডাকেননি আমাকে। কি বলছেন?"

"বললেন তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। তুমি যাও, উনি ফোন ধরে আছেন।"

ফোনে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হলো।

"কে, বৌদি? কি খবর? ভালো আছ তো তোমরা? এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে আমাকে!"

রোজই মনে পড়ে ভাই। কিন্তু তোমার দাদার ভয়ে খবর নিতে পারিনি। সকলের অমতে বিয়ে করেছ বলে দাদা তোমার মুখদর্শন করতে চাননি এতদিন, কিন্তু কাল মত বদলাতে হয়েছে। কাল ও'র বন্ধু উকিল শান্তনুবাবু এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা চলবে না, কারণ আইন অনুসারে তুমি বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশের মালিক—"

"কার বিষয়?"

"বাবার বিষয়। বাবার তো কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন' বছর পেরিয়ে গেছে। শান্তনুবাবু বলেছেন আর কয়েক মাস পরে আইনত তোমরা তাঁর বিষয়ের মালিক হতে পার। দশ বছর কোনও খবর পাওয়া না গেলে আইনের চক্ষে তাঁকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হবে। বাবার কোনও উইল নেই। উইল না থাকলে মেয়েরাও

বাবার বিষয়ের সমান অংশ পাবে। তাই উনি বলছিলেন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তুমি আসবে কি?"

"বাবা মারা গেছেন একথা যে ভাবতে পারি না বউদি। আমি বিশ্বাস করি উনি আবার ফিরে আসবেন।"

"কি জানি ভাই, আমিও সেই বিশ্বাস করি। কিন্তু আইন অনুসারে দশ বছর পরে তোমরাই নাকি বিষয়ের মালিক হবে। তুমি কালই এস। কাল রবিবার। সকালের দিকে গাড়ি পাঠিয়ে দেব?"

"দিও। আমার ঠিকানা তোমরা জানলে কি করে?"

"তোমার দাদা তোমার সব খবর নিয়েছেন। তোমার স্বামী যে একজন মস্তবড় ধনীর একমাত্র ছেলে এ খবর আমাদের কাছে গোপন রেখেছিলে কেন!"

সত্যিই এ খবর শুনে অবাক হয়ে গেল অমা। চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত।

"হ্যালো—অমা, কেটে দিলে নাকি!"

"না। একটু অবাক হয়ে গেছি। তুমি যে খবরটা গোপন রেখেছি বললে সে খবর তোমার মুখেই আজ প্রথম শুনলাম। আমি ওঁর সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানি না। কিছু বলেননি আমাকে। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন উনিও ট্যুশনি করতেন, আমিও করতাম, অতি কষ্টে সংসার চলত আমাদের। কিছুদিন হলো একটা ভালো চাকরি পেয়েছেন। বাবার এক বন্ধুই সে আপিসের ডিরেক্টার। যে বাড়িতে আমরা এখন আছি সেটাও আপিসেরই বাড়ি।"

"সব জানি আমরা"—বউদি বলতে লাগলেন—"কিন্তু তুমি যে তোমার স্বামীর কোনও খবর জান না এ কথা তো বিশ্বাস করা শক্ত। নিজের পরিচয় তোমার কাছে দেননি চাঁদুবাবু?"

"না। বলেছিলেন আমিই আমার পরিচয়। আমার পরিচয়েই আমাকে যদি তুমি বিয়ে কর তাহলেই আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমার বংশ কত বড়, আমার টাকা-কড়ি আছে কি না এসব পরিচয় আমি দেব না। আমার যতটুকু পরিচয় পেয়েছ ততটুকুর উপর নির্ভর করেই হয় আমাকে নাও কিংবা নিও না। একথা শুনে প্রথমে আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল লোকটা পাগল নয় তো! কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম ও পাগল নয়, ও অসাধারণ লোক। তারপর আমার মনে পড়ল আমার বন্ধু শিউলির কথা। কত রকম খবর নিয়ে, কুষ্ঠি মিলিয়ে, বংশ পরিচয় খোঁজ করে, ছেলের বিদ্যার বহর আর রোজগার করবার ক্ষমতা মেপে—তার বিয়ে দিয়েছিলেন তার বাবা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিউলি সুখী হলো না। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শিউলি চাকরি করছে এখন। রাস্তায় দেখা হলো একদিন। সবই অদৃষ্ট। খোঁজখবর নিয়ে আমরা কতটুকু জানতে পারি বলো। শেষ পর্যন্ত অজানার গলাতেই মালা দিতে হয়—"

খিলখিল করে হেসে উঠল তার বৌদি।

"ওরে বাবা, তুমি যে কবি হয়ে গেছ দেখছি। তোমার অজানাকে এখনও জানতে পারনি?"

"না ভাই। এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছি। নাগাল পাচ্ছি না। চিনতে পারছি না। এইটুকু শুধু জেনেছি লোকটি ভদ্রলোক—"

"আমি আর একটি খবরও দিতে পারি। ওর বাবা একজন ধনকুবের। থাকেন বোম্বেতে। সেখানে বড় ব্যবসা আছে, কলকাতাতেও অনেক বিষয় আছে, দিল্লীতেও আছে নাকি শুনেছি। চাঁদু ও'র একমাত্র ছেলে। বাবার অমতে বিয়ে করেছে বলে তিনি খুব চটে আছেন। কিন্তু ছেলেকে এখনও ত্যাজ্যপুত্র করেননি শুনেছি আমরা। তোকে দেখলে হয়তো তাঁর রাগ পড়ে যাবে। দিন দশেক পরে তিনি কলকাতায় আসবেন শুনেছি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠবেন। আমার একটা পরামর্শ শুনবি? সেই সময় দেখা কর না তাঁর সঙ্গে!"

"ও বাবা, সে আমি পারব না।"

"না পারবার কি আছে এতে, তুমি তাঁর পুত্রবধূ—"

"আমি নিজের মুখে গিয়ে কি করে বলব সে কথা। বলা যায় নাকি!"

"বেশ, আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

চুপ করে রইল অমা কিছুক্ষণ। তারপর বলল—"তাহলে ও'কে জিজ্ঞেস করি। ও'কে না জানিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

"বেশ। কাল তাহলে কখন গাড়ি পাঠাব?"

"গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। আমার ওই দিকে একটা ট্যুশনি আছে বিকেলের দিকে। সেখান থেকে যাব আমি। দাদাকে বোলো বিকেলের দিকে থাকেন যেন।"

"আচ্ছা, এসো কিন্তু—"

"মা কেমন আছেন? আমার কথা বলেন একবারও?"

"রোজ। তোমার কাছে যেতে চান। আমরাই যেতে দিইনি। ভয় হয়। জামাই কি রকম লোক তা তো জানা নেই।"

"বাবার কথা কেউ বলে না?"

"মুখ ফুটে কেউ বলে না। খোকন বলে মাঝে মাঝে—"

"বলে?"

"বলে, দাদু আবার ফিরে আসবে। দাদুর ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে মাঝে মাঝে একদৃষ্টে।"

"আচ্ছা, আমি যাব কাল।"

অমা ফিরে এসে দেখলে অতুল আর চাঁদু সংযুক্ত ভিক্ষুক সমিতি নিয়েই আলোচনা করছে।

অতুল বলছে—"এর জন্যে খাটতে হবে। সব ভিক্ষুকদের ভোটার করতে হলে তাদের প্রত্যেকের বাসস্থান, নাম এবং পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে। অনেকে হয়তো প্রকৃত পরিচয় দেবে না, কারণ ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেকে ক্রিমিনাল আছে শুনেছি। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সব বড় বড় কাগজগুলোতে আগে আমরা বিজ্ঞাপন দিই। এমনি খবর দিলে অনেক কাগজই হয়তো তা ছাপবে না। বিজ্ঞাপন দিলে ছাপবে। কলকাতা, পাটনা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ আর কেরল—এই ক'টা জায়গায় প্রথমে এ খবরটা বিজ্ঞাপিত করি। দেখা যাক কি রকম সাড়া পাওয়া যায়—"

"আপত্তি নেই আমার এতে—", চাঁদু বলল, "ফাণ্ডে কত টাকা আছে? বিজ্ঞাপন দিতে গেলে একটু বিস্তৃত বিজ্ঞাপন দিতে হবে—"

"টাকা বেশি নেই। তবে টাকার জন্যে কখনও কিছু আটকায় না এ বিশ্বাস আমার

আছে। আপাতত কলকাতার একটা কাগজে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব। সম্পাদক ছাপতে রাজী আছেন। তারপর একটা বিজ্ঞাপনও দেব। আমি কিছু টাকা যোগাড় করেছি।"

"কিছু আমিও দেব। অমা, দেবে কিছু ?"

"আমি ? বেশ, আমিও দেব। তবে আমার সামর্থ্য আর কতটুকু ?"

চাঁদু হেসে বলল—"রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের জন্য সাগর বন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবিড়ালীও সাহায্য করেছিল।"

অমা বলল—"আমি সাহায্য করব যতটুকু পারি, তার কারণ তুমি ওই নিয়ে মেতে আছ। কিন্তু ভিখারীদের নিয়ে পলিটিক্যাল পার্টি করে কি যে লাভ হবে তা আমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি না। দেশে পলিটিক্যাল পার্টি তো অনেক হয়েছে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়ছে খালি, সবাই মন্ত্রী হতে চায়—"

"চাইলেই বা। এই তো জীবন। সবারই যদি মন্ত্রী হবার অধিকার থাকে ওদেরই বা থাকবে না কেন।"

কথাগুলো বলে অতুল হাসিমুখে চেয়ে রইল অমার মুখের দিকে। তারপর বলল—"আপনাকেই আমরা আমাদের পার্টির লীডার করব। হয়তো আপনিই একদিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন—"

"সে শখ নেই আমার। আমার মতে একজন ভিখারীরই পার্টির লীডার হওয়া উচিত। আমি ভিখারী নই।"

"চাঁদুদা'র মতে সবাই ভিখারী।"

"আমি নই। আমার বিশ্বাস আপনার চাঁদুদাও নন।"

চাঁদু মুচকি হাসতে লাগল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হলো না। আবার ফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে। উঠে গেল চাঁদু।

অতুল বলল—"আমি আপনার এখানে থাকব এতে আপনার আপত্তি হবে না তো বউদি ?"

"আমি আপত্তি করব কেন। উনি যা সঙ্গত মনে করবেন তাই হবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি একা থাকতেও আমার কোনও অসুবিধা হবে না। সারাদিন একাই তো থাকি, থিয়োরিটিক্যালি উনি কলকাতায় থাকেন বটে, কিন্তু আমার কাছে আর কতক্ষণ থাকেন বলুন ? বুড়ো চাকর ফকিরা আর ঝি নন্তি ওরাই আমার ভরসা।"

"আমি থাকলে আপনার অসুবিধা হবে না তো কিছু।"

"বাড়িটা তো বড়, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না—"

"রোজ রোজ রান্নার ফরমাস করব কিন্তু।"

"করবেন। তবে, আমি রোজ রাঁধতে পারব না। রাঁধতে জানিও না ভালো। ফকিরা ভালো রাঁধে। যা বলবেন রেঁধে দেবে।"

"আপনি রাঁধেন না ? কি করেন তাহলে—"

"ঘুমুই। ঘুমুতে খুব ভালো লাগে আমার। গানের ট্যুশনিও করি কয়েকটা।"

"আমি যদি এখানে থাকি তাহলে কিন্তু দয়া করতে হবে।"

"তার মানে ?"

"মাঝে মাঝে রেঁধে খাওয়াতে হবে।"

"আমি রাঁধতে জানি না যে!"

"শিখুন। আমি ভালো ভালো রান্নার বই কিনে দেব।"

"উনুনধারে বসে রান্না করতে ভালো লাগে না বলেই আমি রান্না শিখিনি। আমি বাবা মা-র আদুরে মেয়ে ছিলাম তো, তাই রান্নাঘরের ধারে-কাছে ঘেঁষিনি কখনও। দরকারও হয়নি। রান্না শিখে লাভই বা কি হতো! যাঁকে বিয়ে করেছি তিনি মোটেই খাদ্যরসিক নন। অনেক সময় দেখেছি আলুনী তরকারী খেয়ে চলে গেলেন, বললেন না পর্যন্ত যে, তরকারিতে নুন দেওয়া হয়নি। কার জন্যে রান্না শিখব বলুন!"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন, স্বামীই কোনও স্ত্রীলোকের জীবনের সবটা দখল করে বসে থাকেন না। তার জীবনে আরও অনেকে আসবে এবং আসা উচিত। আমাকে কে পেটুক করেছে জানেন? আমার বউদি। এত রকম রান্না তিনি জানতেন—"

"কোথায় থাকেন তিনি!"

"বছরখানেক আগে মারা গেছেন। তাঁকেই খুঁজছি। আশা হয়েছিল হয়তো—"

হুড়মুড় করে এসে পড়ল চাঁদু।

"বেরুতে হবে এক্ষুনি। সিদ্ধেশ্বরবাবু ডাকছেন—"

"চলুন।"

অমা বলল—"ও-ঘরে চল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"গোপনীয় কিছু?"

"হ্যাঁ, একটু গোপনীয়।"

পাশের ঘরে গিয়েই অমা বললে—"বউদি বললেন তোমার বাবা নাকি এখানে আসছেন। বউদি আমাকে নিয়ে যেতে চান তাঁর কাছে। যাব?"

"যাবে কিনা সেটা তুমিই ঠিক কর। একটা কথা শুধু মনে রেখ, তোমাকে বিয়ে করেছি বলে তিনি আমার উপর খুশী নন।"

"তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন এ আশঙ্কা আছে কি?"

"না। তিনি অতিশয় ভদ্রলোক। তুমি গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাঁর মতো ভদ্রলোক আমি খুব বেশি দেখিনি।"

"তবে তোমাদের ঝগড়া কেন!"

"মত ও পথ নিয়ে। তিনি পূব দিকে যেতে চান, আমি যেতে চাই পশ্চিমে। আলাপ করে এস আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এটা জেনে রাখ, আমি কিছুতেই নিজের মত বা পথ বদলাব না। আমার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করো না পারতপক্ষে।"

"তোমার মত বা পথ কি তা তো আমাকে বলনি কোনদিন। কি নিয়ে আলোচনা করব—আমি কিছুই বলব না, শুধু প্রণাম করে আসব তাঁকে।"

"বেশ। আর একটা দরকারি কথা তোমাকে বলবার ছিল। কিন্তু তা এখন বলা যাবে না। চিঠিতে জানাব।"

"কি দরকারি কথা? বাবার সম্বন্ধে?"

"না, আমার সম্বন্ধে। আচ্ছা, চললুম এখন। সিধুবাবু আপিসে বসে আছেন।"

চাঁদু অতুল দু'জনেই চলে গেল।

অমা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মনে হতে লাগল সে যেন একটা অজানা গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরই মনে পড়ল তার বাবাকে। চোখে জল ভরে এল।

৪

অমা ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেল, মা তার বাবার বড় ছবিটার দিকে চেয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ধূপদানী। ধূপের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। অমার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে আসব বলেছিল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মা আর বৌদির জন্যে শাড়ি, আর খোকনের জন্যে কিছু জামার ছিট কিনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। কাগজের বাক্সগুলো বগলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অমা। বাইরের কপাটটা খোলা ছিল কেন? দাদা বৌদি কি দোতলায়? খোকন কোথা? প্রশ্নগুলো পর পর জাগল তার মনে। তারপর মিলিয়ে গেল। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সে-ও। বাবার ছবির দিকে চেয়ে দেখল। বাবা হাসছেন। মা-ও নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ধূপের ধোঁয়া নিঃশব্দে উঠছে ছবিটার দিকে।

"মা!"

ফিরে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে অতসীবরণী।

"কে, অমা!"

অমা গিয়ে প্রণাম করল। কাপড়ের প্যাকেটগুলো রাখল টেবিলের উপর।

"বড্ড রোগা হয়ে গেছিস দেখছি। শরীর ভালো আছে তো!"

"আছে। দাদা বউদি কোথা?"

"ওরা এতক্ষণ তোর অপেক্ষাতেই বসেছিল। একটু আগে বেরিয়ে গেল। তোর জন্যে হোটেল থেকে খাবার আনতে গেছে। বউমা বললে তুই চীনে হোটেলের খাবার ভালবাসিস, নীলু বললে—তাই তবে নিয়ে আসি চল। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে ওরা। তুই বস। আমি ছানার পায়েস রেখেছি তোর জন্যে। চাঁদু এল না?"

"বউদি তো তাঁকে আসতে বলেননি। বললেও আসতেন কিনা সন্দেহ। কাল বিলেতে চলে যাবেন আপিসের কাজে। বড় ব্যস্ত আছেন।"

অমা একটা চেয়ারে বসেছিল। অতসীবরণী ধূপদানীটা ঠাকুরঘরে রেখে এসে তার পিছনে দাঁড়ালেন।

"চাঁদু যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের ফার্মে ম্যানেজার হয়েছেন এখবর সিদ্ধেশ্বরবাবুই দিয়েছিলেন। খুব প্রশংসা করছিলেন তাঁর। অমন ভালো ছেলে জামাই হলো, কিন্তু এমন পোড়া অদৃষ্ট, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ভালো ভাবে হলো না।"

অমা চুপ করে রইল। অতসীবরণী তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললেন—

"সত্যি বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। গালের হাড় দুটো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। হজম-টজম হয় তো—"

"হয়। শরীর আমার ভালো আছে। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। দাদা কেন আমাকে ডেকেছে বলো দিকি—"

"উকিলরা বলছে যে উনি যদি আর দু'-তিন-মাসের মধ্যে না ফেরেন তাহলে আইনত বিষয় তোমরা পেতে পার। দশ বছরের মধ্যে কোনও খবর না পাওয়া গেলে আইন ধরে নেবে যে, উনি আর বেঁচে নেই। তখন ও'র উত্তরাধিকারীরা ও'র বিষয় পাবে। ও'র যখন কোনও উইল নেই, তখন বিষয়ের তিন ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে নীলু, এক ভাগ পাবি তুই, আর এক ভাগ পাব আমি। নীলু এদেশে আর থাকতে চায় না। সে আমেরিকায় নাকি বড় চাকরি পেয়েছে, সেখানেই গিয়ে থাকবে। এখানকার বিষয় বিক্রি করে সেখানেই সে একটা বাড়ি কিনবে বলছে। সে আমাকেও সেখানে নিয়ে যেতে চায়। আমি কিন্তু কোথাও যাব না। এই বাড়িতেই থাকব আমরণ। এইখানেই অপেক্ষা করব তোর বাবার জন্যে। আইন যা-ই বলুক, আমার মন বলছে তিনি আবার ফিরে আসবেন। ওরা যেখানে খুশি যাক, আমি এখানেই গোবিন্দ আর বাতাবির মাকে নিয়ে বেশ থাকতে পারব। গাড়িটাও থাকবে, বীরেন্দ্রই ড্রাইভার থাকবে। আমার ভাগে বিষয়ের যতটা অংশ পড়বে তার থেকে আমার এ খরচ চলে যাবে স্বচ্ছন্দে। আমার এক বিধবা দিদিও আমার কাছে এসে থাকতে চান। তাঁকে আসতে লিখেছি। এখন তোকে নিয়েই সমস্যা। নীলু খবর নিয়েছে তোর শ্বশুর নাকি খুব বড়লোক, চাঁদু তাঁর একমাত্র ছেলে। কিন্তু ছেলের সঙ্গে বনিবনাও নেই। তিনি এখানে নাকি আসবেন। নীলু বলছে তুই যদি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিস তাহলে হয়তো বুড়োর মন গলবে।"

"যদি গলেই তাতে দাদার লাভ কি!"

"দাদা তাহলে তোকে কিছু দাম দিয়ে তোর অংশের বিষয়টি কিনে নেবে। সে বিষয়টিও দাঁও মাফিক বিক্রি করে চলে যাবে আমেরিকা। আমেরিকার এক বন্ধু ওকে নাকি জানিয়েছে, কুড়ি লাখ টাকায় সেখানে নাকি ভালো বাড়ি কিনতে পাওয়া যায়। ও বিষয়ের যে অংশ পাবে তা বেচে কুড়ি লাখ টাকা হবে না। তাই তোর বিষয়টি হাতাতে চাইছে। এইজন্যেই তোকে ডেকেছে। স্বার্থের জন্যে ডেকেছে। ভালবাসার জন্যে নয়। আমি কতবার বলেছি তোকে খবর দিতে। দেয়নি। আমি তোর ঠিকানা জানি, কিন্তু ও রাগারাগি করবে এই ভয়ে তোর কাছে যেতে পারিনি, তোকে চিঠিও লিখতে পারিনি। দিন দশেক আগে ওর আমেরিকার সেই বন্ধুর চিঠি এসেছে, তারপর থেকে সেই উকিল বন্ধুটি আনাগোনা করছে রোজ, ফুসফুস গুজগুজ চলছে ক্রমাগত। তারপর কাল বৌমা বললে আজ তোকে আসতে বলেছে। ঘোর স্বার্থপর ওরা। ঠিক ওর মামার মতো হয়েছে—ঘোর বিষয়ী। ওর জন্যেই তো দেশত্যাগী হয়েছেন উনি—ছেলে নয় শত্রু!"

অতসীবরণী চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অমার মনে হলো মা-ও অভিনয় করছেন। এ কথা মনে হওয়াতে নিজেই লজ্জা পেল সে, মনে হলো, ছি, ছি, কি নীচ হয়ে গেছি আমি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হলো—মা কি তাকে লুকিয়েও একখানা চিঠি লিখতে পারতেন না? দাদাকে না জানিয়েও তিনি কি আমার

সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারতেন না। ঘরে গাড়ি ছিল। এদের অমতে বিয়ে করেছে বলে সবাই তাকে পর করে দিয়েছে এইটেই সত্যি কথা। যে অপমান সে এই এক বছর ধরে ভোগ করেছে তারই ক্ষোভ হঠাৎ যেন ধক ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। অতসীবরণী চোখে আঁচল দিয়েছিলেন বলে অমার চোখের এই অগ্নিদৃষ্টি দেখতে পেলেন না। পেলে ভয় পেয়ে যেতেন। রৌরবের যে আগুন তার মনের নেপথ্যে ধিকিধিক জ্বলছিল, যার খবর সে নিজেও জানত না, সেই আগুন মূর্ত হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে হঠাৎ। বললে—"কে শত্রু, কে মিত্র তা জানি না মা। বিষয়-সম্পত্তি অনেক বলছ? কিন্তু পায়ের নীচে যে মাটি নেই। মাথার উপর আকাশ নেই, হাওয়া নেই, আলো নেই, কিচ্ছু নেই।"

এরপরই কেমন বেখাপ্পা সুরে হেসে উঠল সে। বলল আবার—"না না, আছে, কি আছে জানো? ভিকিরি, ভিকিরি, ভিকিরি। আর বিদ্যে, বিদ্যে, বিদ্যে—আর কাজ, কাজ, কাজ—"

অতসীবরণী মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। অমাও অবাক হয়ে গেল। এসব কি বলছে সে! তারপর খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সামলে নেবার চেষ্টা করলে, কোথাকার ঝোড়ো হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার মনের আবরু। আগে তো এমন হয়নি কখনও। আগে তো সে চুপ করে থাকত। কোথাও তো কিছু আলগা হয়নি কখনও।

"কি বলছিস তুই আবোল-তাবোল—"

মুচকি হেসে অমা বললে—"একটু থিয়েটার করলুম। সবাই তো থিয়েটার করছে। দেখলুম আমি পারি কিনা।"

"থিয়েটার? কে করছে থিয়েটার!"

"সবাই। ভাগ্যে থিয়েটার করছে, সত্যি হলে তো আরও ভয়ঙ্কর হতো।"

"তার মানে!"

"থিয়েটারের দুর্যোধন যদি ওই পোশাক আর পরচুলা পরে সত্যি দুর্যোধন হয়ে ঘরে-দোরে ঘুরে বেড়াত তাহলে কি কাণ্ড হতো বলো দেখি। তাই সবাই থিয়েটার করছে। আমিও একটু করে দেখলাম পারি কিনা—পারি না?"

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল অমা।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

"ওই ওরা এসেছে—গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথা গেলি, খাবারগুলো নামিয়ে আন।

অতসীবরণী নিজেই বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মাথার চুল সব সাদা। তবু তিনি এখনও রূপসী। অমা বাবার ছবিটার দিকে আবার চাইল। বাবা হাসছেন।

প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার পর আসল প্রসঙ্গ পাড়লেন নীলুবাবু। বললেন,। "যেটা সত্যি সেটাকে মানতেই হবে। বাবা আর ফিরবেন না। বাবার বিষয় আমাদেরই ভাগ করে নিতে হবে। বাবার অ্যাকাউণ্টে ব্যাংকেই পনেরো লাখ টাকা আছে। খবর নিয়ে জানলাম, যাবার ঠিক পরেই তিনি ব্যাংক থেকে মাঝে মাঝে টাকা তুলেছেন। সবসুদ্ধ হাজার পঁচিশেক টাকা। কিন্তু গত ন' বছর তিনি কোনও টাকা তোলেননি।

ব্যাংক তার কোনও ঠিকানাও যোগাড় করতে পারেনি। ব্যাংকের টাকা ছাড়া আমাদের তিনখানা বাড়ি আছে। সেগুলোর দাম সবসুদ্ধ দশ লাখ টাকা হবে। আমাদের এই বাড়িটার দাম তিন লাখ টাকা, চৌরঙ্গীর কাছে যে বাড়িটা আছে সেটা ছ' লাখ টাকা আর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িটা এক লাখ টাকা। দালালরা মোটামুটি এই রকম আভাস দিয়েছে। কিছু কম কিছু বেশি অবশ্য হতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, কি ভাবে আমরা সেটা ভাগ করব।"

অমা বলল, "ভাগ না-ই বা করলাম। যেমন আছে থাক না।"

"আমার আপত্তি হতো না, যদি আমি এখানে থাকতাম। কিন্তু আমি এখানে থাকব না। আমি আমেরিকায় চলে যাব।"

"আমেরিকায় যাবে কেন?"

"যাব, কারণ আমি এখানে মিস-ফিট, আমার মতের সঙ্গে এখানকার কারও মত মেলে না। সত্যি কথা বলেছিলাম বলে বাবা রেগে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সবাই মনে করবে আমি একটা ভিলেন। আত্মীয়স্বজন সবার চক্ষেই আমি হেয় হয়ে গেছি। আমি আমেরিকায় একটা চাকরির চেষ্টা করছি। বোধহয় পেয়ে যাব। যদি পাই সেখানেই চলে যাব আমি। সেখানেই থাকব। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলে টাকা চাই। মা বলছেন বাড়ি বেচবেন না, এখানেই থাকবেন তিনি। তোকে ডেকেছি এই জন্যে, তোর অংশটা যদি আমাকে সস্তায় বিক্রি করিস তাহলে আমি আমেরিকায় একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনতে পারি।"

"আমেরিকায় যাবে? সেখানে শুনেছি টাকা ছাড়া এক পা চলা যায় না। টাকার বাটখারায় ওজন করে স্নেহ-ভালবাসাও নাকি বিক্রি হয় সেখানে।"

"এখানেও হয়। এখানে হয় ইতরের মতো, সেখানে হয় ভদ্রভাবে। দু-চারটে নিঃস্বার্থপর ভালো লোক এদেশেও আছে, ওদেশেও আছে। ওদেশে আর একটা জিনিষ আছে যা এদেশে নেই। গুণীকে আদর করে ওরা, সে আদর মৌখিক নয়, সে আদরের অর্থমূল্য অনেক। এখানে গুণীর আদর নেই, পরশ্রীকাতর হিংসুকের দেশ, এখানে গুণীরা আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান বিসর্জন না দিলে সম্মানিত হন না। সম্মানের লেবেল খোশামোদের দাম দিয়ে কিনতে হয়। আমার বিশ্বাস ওদের সেটা হয় না।"

"এতদিন তাহলে যাওনি কেন!"

"যাইনি, কারণ অর্থাভাব। চাকরির চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছি। এখন একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা হয়েছে। শান্তনু বলছে আইনত বাবার বিষয়ও এইবার আমরা পেতে পারি। তুমি যদি তোমার অংশটা—"

"বাবার বিষয় আমি বিক্রি করব না। তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারব না দাদা, আইনজ্ঞানও আমার নেই, কিন্তু আমি জানি ও বিষয়ে আমার অধিকার নেই, কিছু বিষয় যদি আমার ভাগে পড়ে তাহলে তা যেমন আছে তেমনি থাকবে—"

"সে বিষয়ের আয়ও তুমি নেবে না?"

"না। তা ব্যাংকে জমা হবে।"

"আমি যদি ধার চাই?"

"আমার একটা কথা শুনবে দাদা—"

"কি, বল।"

"কোথাও যেও না। যেমন আছ তেমনি থাক। কি হবে ওদেশে গিয়ে। আমাদের খোকন একটা ট্যাস-মার্কা আমেরিকান হয়ে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।"

"দেখ অমা, মানুষ বদলাবেই। বাবার প্রপিতামহ জয়জনার্দন লক্ষ্মীপুরে থাকতেন। তিনি গায়ে জামা দিতেন না, পায়ে জুতো পরতেন না। স্বপাক আহার করতেন, বৃথা মাংস তাঁর বাড়িতে ঢোকেনি কখনও, তাঁর বোন সহমৃতা হয়েছিলেন। তিনি নিজে বিবাহ করেছিলেন তিনটি, বিরাট একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাঁর। টোল ছিল, চাষবাস ছিল, বিরাট খাইয়ে লোক ছিলেন তিনি, প্রত্যহ চার পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতেন—এই লোকের সঙ্গে আমাদের কতটুকু মিল আছে? যে প্রয়োজনের তাড়ায় তাঁরা লক্ষ্মীপুর ছেড়ে প্রথমে ব্যাণ্ডেল, তারপর বর্ধমান, তারপর কলকাতায় এসেছিলেন, সেই প্রয়োজনের তাড়ায় আমাকে কলকাতা ছেড়ে আমেরিকা যেতে হচ্ছে। খোকন হয়তো বদলে যাবে, কিন্তু উপায় কি!"

অমা চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"তুমি যা বলছ তাই হয়তো হয়, কিন্তু ওটাকে বাধা দেওয়ার মধ্যে যে পৌরুষ, যে আত্মসম্মানবোধ আছে তাকেই আমি মনুষ্যত্ব বলি। আমেরিকা যাওয়াটা তুমি যত বড় প্রয়োজন মনে করছ আমার কাছে ওটা তত বড় মনে হচ্ছে না। তুমি—"

"চুপ কর"—ধমকে উঠলেন নীলু হঠাৎ। তারপরই মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। অমার বিষয়টা সস্তায় হস্তগত করতে হবে, ওকে চটালে তো চলবে না।

"এক হিসেবে তুই যা বলছিস তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তুই আমার দিকটা দেখতে পাচ্ছিস না, আমি এদেশে আর থাকতে পারছি না। তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য করিস—"

"আমি কি করে সাহায্য করব দাদা। বাবার বিষয় আমি বিক্রি করব না। আমার ভাগে যে অংশটুকু তোমরা দেবে তাই আমি নেব। কিন্তু আমার কথা শোন দাদা, বিষয় ভাগ কোরো না, যেমন আছে থাক।"

"বিষয় ভাগ হবেই। আইনত যা আমাদের প্রাপ্য তা আমরা নেব না কেন?"

একথা শুনে অমার মনে সেই আগুনটা আবার জ্বলে উঠল—যে আগুনটা ইদানীং প্রায়ই জ্বলে উঠছে তার মনে। মনের অন্ধকারে ছোট ছোট নীল শিখা, আর উত্তাপ…।

"মানুষের তৈরি আইন তো রোজ রোজ বদলায়। ও তো সুবিধাবাদীদের তৈরি আইন। মানুষের মনের ভিতর যে দেবতা আছেন তাঁর আইন কিন্তু বদলায় না। সেই আইনের উপরই সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সে আইনে হাত দিও না দাদা, দোহাই তোমার, সে আইন অনুসারে বিবাগী বাবার বিষয় আমরা নিতে পারি না—"

নীলুবাবু অমার মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে যেন। কি হলো মেয়েটার? আশ্চর্য!

'আচ্ছা থাক থাক, ওসব কথা পরে হবে।"

অমা সেদিন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ সুস্থ ছিল না। তার কথাবার্তা কেমন যেন

এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তার নিজেরই বার বার মনে হচ্ছিল, কি করছি কি বলছি আমি। অথচ নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মা যখন বললেন, "তোর জন্যে ছানার পায়েস করে রেখেছি, খাবি আয়—"

অমা বলে উঠল—"যে দুধের ছানা তোমরা কাটিয়েছ তা খাওয়া যায় না।"

বলেই তার মনে হলো, এ কি বললাম! হিহি করে হেসে উঠল।

৫

চাঁদু বিলেত চলে গেছে।

অতুল আছে এ বাড়িতে। চাঁদু না ফেরা পর্যন্ত থাকবে।

অতুল শুধু যে দেখতে ভালো তা নয়, সব দিক দিয়ে ভালো।

সে এসেই বুঝতে পেরেছিল অমা গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না। ঘনিষ্ঠতা করবার একটুও চেষ্টা করেনি সে। তিনতলায় নিজেকে নিয়েই আছে, নিজের কাজকর্ম নিয়ে। ভিখারী সমিতির অনেক কাজ। একটি মেয়ে আসে অতুলকে সাহায্য করতে। সে-ও নাকি ভিখারীর মেয়ে। চাঁদুরই চেষ্টায় সে নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। চাঁদুই ওর নাম দিয়েছে সবলা। মেয়েটির মুখে হাসি নেই। অমা তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। প্রশ্ন করলে কথার উত্তর দেয়, কিন্তু উত্তরটুকু মাত্র দেয়, তার বেশি না। 'হাঁ' 'না' 'জানি না' 'আচ্ছা'—এই ধরনের উত্তর। মেয়েটির চোখমুখে কি যেন একটা চাপা ভাব আছে যা ঠিক স্পর্ধাও নয়, বিনয়ও নয়, রাগ, বিরাগ বা ঔদাসীন্য নয়, কিন্তু যা অগ্রাহ্য করা শক্ত। তার মুখের ভাবকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়—আমি তোমাদের চিনি, তোমরা আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না, দোহাই তোমাদের।

অতুল একদিন বলেছিল, "মেয়েটি ভারি বুদ্ধিমতী। চাঁদুদা'র ভারি ফেবারিট। চাঁদুদাই চেষ্টা করে ওকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল। খুব ভাল রেজাল্ট করে পাস করেছে। চাঁদুদা ওকে কলেজে পড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু ও বলল—আমি আর পড়ব না। রোজগার করব। আমাদের সমিতিতেই তাই ওকে আপাতত চাকরি দিয়েছি আমরা।"

"ওর বাবা ভিকিরি?"

"ওর মা ভিকিরি। ওর বাপের খবর আমরা জানি না। ওর মা একটি অদ্ভুত চরিত্র, বৌদি। তার নাচ যদি দেখেন মুগ্ধ হয়ে যাবেন। রাস্তায় রাস্তায় নেচে আর গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে। যেখানে নাচ শুরু করে ভিড় জমে যায় সেখানে।"

"বয়স কত?"

কৌতূহল হলো অমার।

"তা জানি না। দেখে মনে হয় সবলার বড় দিদি। নেচে যা রোজগার করে তার থেকে একটি পয়সা খরচ করে না। সব সবলাকে দেয় আর বলে—জমা জমা, একটি পয়সা খরচ করিস না। মাঝে মাঝে লটারির টিকিট কিনিস। টাকা থাকলে নির্ভয়ে থাকবি, লোকে খাতির করবে, সব্বাইকে কলা দেখিয়ে থাকতে পারবি। এই বলে

দু-হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে নেড়ে অদ্ভুত একটা নাচ নাচে। আর তার সঙ্গে গান গায়—টাকা থাকলে বাঁচবি, কলা দেখিয়ে নাচবি। সবলা তার মায়ের রোজগারের টাকা পাস বুকে জমা করে রাখে, আর নিজে ও যা রোজগার করে তা দিয়ে মাকে খাওয়ায়। মদ খাওয়ায়। এই জন্যেই নাকি ও রোজগার করে। আশ্চর্য নয়।"

"ওর নাম সবলা কে দিয়েছে? ওর মা?"

"ওর মা ওর নাম দিয়েছিল সাবু। চাঁদুদা সেটাকে সবলা করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ওই নামের একটা কবিতা আছে—"

অমার মনে পড়ল, ভিখারীদের ইতিহাসে সে সাবু আর তার মায়ের কাহিনী পড়েছিল। হঠাৎ অমার মনের আকাশে বিদ্যুৎ চকমক করে উঠল। হিংসার বিদ্যুৎ। সন্দেহ হলো সবলাকে ভালবাসে নাকি চাঁদু? এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু অদ্ভুত রকম হলো। অতুলকে বলল—"ওবেলা মনে করেছি স্প্যানিশ রাইস করব। আপনি ভালবাসেন তো?"

"খুব, খুব। বৌদি, আপনি যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি—"

"কি কথা!"

"আমার কাছে দুটো রাঁধবার বই আছে। দুটোই খুব ভালো, একটা দিশী রান্নার, আর একটা বিদেশী রান্নার। সে দুটো বই আপনি নেবেন? মাঝে মাঝে নতুন নতুন রান্না এক্সপেরিমেণ্ট করুন না।"

'উনুনধারে বসে আমার রাঁধতে ইচ্ছে করে না। আজ হঠাৎ শখ হলো। আপনার সবলাকে যদি নিমন্ত্রণ করি ও কি খাবে?"

"না বউদি, ওসব ঝামেলা না করাই ভালো। মেয়েটিকে ঠিক বুঝি না। হঠাৎ হয়তো 'না' বলে বসবে। কি দরকার ওসব ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার!"

"ঝঞ্ঝাট আবার কি। আমি নিমন্ত্রণ করব, ও যদি সে নিমন্ত্রণ না নেয়, বুঝব ও অভদ্র। তাহলে ওকে আমার বাড়িতে আর ঢুকতে দেব না।"

"কিন্তু আমাদের আপিসের কাজকর্ম কি করে হবে!"

"সে আপনারা বুঝবেন, কিন্তু অভদ্র কাউকে আমার বাড়িতে ঢুকতে দেব না আমি।"

অমার চোখের দৃষ্টিতে ধকধক করে আগুন জ্বলে উঠল।

সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল অতুল।

অমা বলল—"দেখুন আমি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। বাল্যকালটা কি সুখেই কেটেছিল, তারপর থেকে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। সবাই নিজের প্রিন্সিপল নিয়ে চলতে চায়, প্রত্যেকের আদর্শ বিদঘুটে, প্রত্যেকেই মনে করছে সেই আদর্শ অনুসারে চললেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে, লোকেও ধন্য ধন্য করবে। স্নেহ-ভালবাসা শালীনতা ভদ্রতা এসবের কেউ দাম দেবে না?"

অতুল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। অমার কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন আবোল-তাবোলের মতো শোনাতে লাগল।

ভদ্রমহিলা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এরকম খেপে উঠলেন কেন হঠাৎ!

"বেশ, সবলাকে নিমন্ত্রণ করব আজ। আপনি যে কথাগুলো বললেন তা এক হিসাবে ঠিকই"—তারপর মাথা চুলকে বলল—"কিন্তু দেখুন, মানুষ যখনই সমাজ

সৃষ্টি করেছিল তখনই তাকে সমাজ রক্ষার জন্য নানারকম নিয়মও করতে হয়েছিল। সেই নিয়মগুলোই নানারকম আদর্শে রূপান্তরিত হচ্ছে, উদ্দেশ্য, সমাজেরই সুখ বৃদ্ধি করা।"

"কিন্তু সুখ কই? চারদিকেই তো দেখছি সবাই নিজের আদর্শটাকেই আস্ফালন করছে। বাগানের চারদিকে নানা রকম বেড়া খালি, ফুল কই, মানুষ কই, সবাই যে যন্ত্র হয়ে উঠল—"

"মানুষ আছে বই কি বউদি। আমাকে কি আপনার অমানুষ বলে মনে হচ্ছে? আমি তো কোনও আদর্শ আস্ফালন করিনি আপনার কাছে, আমি আপনার কাছে একটু স্নেহের প্রশ্রয় চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু সাহস করে চাইনি। আপনি বড্ড রাগী।"

"আপনার নিজের লোক কেউ নেই?"

"না। বাবা মা খুব ছেলেবেলায় মারা গেছেন। মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম তাদের গলগ্রহ হয়ে। সেখানে আমার এক মামাতো দাদার স্ত্রী আমার মায়ের মতো ছিলেন। তিনিই আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছিলেন আমার। চুরি পর্যন্ত করেছিলেন আমার জন্যে। ধরা পড়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন। আমি দুর্ভাগা লোক বৌদি। ভগবানের একটি দয়া ছিল আমার উপর, পড়াশোনায় বরাবরই ভালো করেছি। তারই জোরে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু স্নেহ পাইনি কোথাও।"

"বিয়ে করেননি?"

"না। সেখানেও ঘা খেয়েছি বৌদি। একজন বড়লোক তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য পছন্দ করেছিলেন আমাকে। তাঁরও অদ্ভুত প্রিন্সিপল ছিল একটা। বললেন, আমি কুষ্ঠি চাই না। আমি তোমাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই যে তুমি সব দিক দিয়ে সুস্থ কি না। আমিই খরচ করে পরীক্ষা করাব তোমাকে। আমার মেয়ে বিলেতে পড়তে গেছে, মাস দুই পরে ফিরবে। তখন তোমাদের দেখাশোনা হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষাগুলো হয়ে যাক। আমার চেহারা দেখেই হোক বা ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট দেখেই হোক, আমাকে খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পছন্দ হবার আর একটা কারণ বোধহয়, আমার বাবা মা আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। আমাকে ঘরজামাই করবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। আমার সব রকম পরীক্ষা হয়ে গেল। ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দিলেন আমার শরীর নীরোগ এবং আমি একটি পারফেক্টলি হেলদি অ্যানিম্যাল।"

"আপনি এতে রাজী হলেন!"

"বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু হয়েছিলাম। হয়েছিলাম কেন জানেন? যে নীতি বা প্রিন্সিপলের কথা এখুনি বলছিলেন আপনি তা আমার ছিল না। আমি চাইছিলাম ছোট্ট একটি সংসার গড়তে। এরকম যখন একটা সুযোগ জুটে গেল তখন আত্মসম্মান বা ওইরকম একটা কিছুর ওজুহাতে সরে আসতে ইচ্ছা করল না। রাজী হয়ে গেলুম। বরং আমার এই কথাই মনে হলো, ভদ্রলোক যা বলছেন তা খুবই সঙ্গত।"

"তাহলে মেয়ের স্বাস্থ্যও দেখা উচিত। সে কথা বলেছিলেন মেয়ের বাবাকে?"

অতুল হাসিমুখে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

তারপর ঘাড় নেড়ে বললে—"বলবার সাহস পাইনি বৌদি।"

"সাহস না পাবার কি আছে এতে!"

ফিক করে হেসে অতুল বললে—"সত্যি কথা বলব, ভয় হলো পাছে ফসকে যায়। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন বৌদি, সুবিধাবাদী বলুন, যা-ই বলুন, আমার মতো নিঃসঙ্গ ছন্নছাড়া একটা লোক নীড় বাঁধবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল এইটেই সত্যি কথা—আপনার নিশ্চয় খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার উপর, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারি না।"

অমা যদিও মুখে কিছু বলল না, কিন্তু এসব শুনে অতুলকে যেন ভালো লেগে গেল তার। ঘেন্না তো হলোই না, স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল মনটা।

"বিয়ে হলো না কেন?"

"মেয়ে বিলেত থেকে একটি সুরূপ ধনী পাশী যুবককে বিয়ে করে ফিরল। আমার স্টেশনে আর গাড়ি দাঁড়াল না।"

বলেই হো হো করে হেসে উঠল অতুল।

অমা সেদিন স্প্যানিশ রাইসের সঙ্গে সাদা আলুর দমও করল যত্ন করে। সবলা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেনি। সে এল, গোমড়া মুখ করে খেল বসে। অমা জিজ্ঞেস করল, আর কি দেব। কিছু তো খাচ্ছ না। সবলা উত্তর দিল—এসব খাওয়া তো থাই না আমরা, তাই ভালো লাগে না এসব খেতে।"

"কি খেতে ভালো লাগে!"

"পান্তা ভাত, তেল, তার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা—এই তো রোজ খাই।"

অমা হেসে বললে, "বেশ, তাই খাওয়াব তোমাকে একদিন।"

সবলা গোমড়া মুখ করেই বসে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

সহসা অমার মানস-জগতে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন।

পুরোনো দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ল, ভেঙে পড়ল সেকালের বড় বড় সব ইমারত। বেরিয়ে পড়ল সামনে ফাঁকা মাঠ খানিকটা। মাঠও ফাটছে। আর সেই ফাটল দিয়ে বেরুতে লাগল আগুনের শিখা। রৌরবের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে, কিন্তু বুঝতে পারেনি সেটা। তার নাসারান্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল। নির্নিমেষে সে চেয়ে দেখতে লাগল, আগুনের শিখার লালের সঙ্গে নীল কি সুন্দরভাবে মিশেছে। নীলের সঙ্গে লালের কি সুন্দর অথচ ভীষণ সমন্বয়। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল ওরা যেন সর্পশিশু। কিলবিল করে ফাটল দিয়ে বের হতে চাইছে। তারপর? বের হয়ে কি করবে ওরা? সভয়ে চেয়ে রইল অমা।

"বউদি, কি হলো আপনার? অমন করে চেয়ে কি দেখছেন? হাত ধোবেন না?"

অমার চমক ভাঙল। দেখল, সবলা উঠে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

অতুল বলল, "কি চমৎকার যে হয়েছিল আপনার স্প্যানিশ রাইস! আর এত চমৎকার ধপধপে সাদা আলুর দম তো আগে কখনও খাইনি। ওয়াণ্ডারফুল। আপনি তো রান্নায় একজন বড় আর্টিস্ট দেখছি।"

ভাঙা দেওয়ালগুলো আবার খাড়া হয়ে উঠল। ইমারতগুলোও। ঢাকা পড়ে গেল মাঠ। অন্তর্ধান করল আগুন। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল অমা। উঠে হাত

ধুয়ে এল। তার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল অতুলের কাছে। তার নিজের ঘরে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল সে। অতুল যে তাকে আর্টিস্টের সম্মান দিয়েছে এতেই সে ভারি খুশী হয়েছিল মনে মনে। সত্যিই সে আর্টিস্ট, কিন্তু আর্টিস্ট বলে কেউ তাকে সম্মান দেয় না। গান-বাজনাতেও আর্টিস্ট সে, কিন্তু সেখানেও সে সম্মান পায়নি, তার গানের বা বাজনার যে একটা স্বকীয়তা আছে এটা কারও নজরে পড়েনি, তার কদরও কেউ করেনি, সবাই তাকে বাজার দর অনুযায়ী গানের মাস্টার বহাল করেছে। সে আর্টিস্ট বলেই স্পর্শকাতর, তাই তার এত কষ্ট, তাই সে মাঝে মাঝে রৌরবের কাছাকাছি চলে যায়…।

একটু পরেই অতুল শুনতে পেল অমা পিয়ানো বাজাচ্ছে। সুরের একটা ঝড় বইছে যেন। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো সুরের নয়—কান্নার, আর্তনাদের।

৬

অমার শ্বশুর নির্দিষ্ট দিনে এসে পৌঁছলেন এবং হোটেলে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে। তিনি এসেছিলেন একটা ব্যবসার কাজে। বিদেশী কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই উদ্দেশ্য। ভদ্রলোক সব দিক দিয়েই অসাধারণ। পশ্চিমেই বেশির ভাগ কাটিয়েছেন বলে তার চেহারার মধ্যে অবাঙালী-সুলভ একটা রুক্ষতা এবং বলিষ্ঠতা আছে। রং কালো, প্রকাণ্ড কান, প্রকাণ্ড নাক, বলিষ্ঠ চোয়াল, জমকালো একজোড়া পাকা গোঁফ মহিষের শিঙের মতো পাকানো, চক্ষু দুইটি বড় বড়, প্রশান্ত এবং রক্তাভ। পোশাকে কোনও জাঁকজমক নেই। বাড়িতে সাধারণ একটি ফতুয়া পরে থাকেন। খৈনি খান।

উৎকৃষ্ট তামাকপাতা এবং উৎকৃষ্ট চুন নিয়ে একটি ভৃত্য নিকটেই বসে থাকে। ইঙ্গিত করলেই এক খিলি খৈনি হাতের তেলোয় মলে তৈরি করে দেয়। তিনি নিজে সাবান ব্যবহার করেন না, কিন্তু ওই চাকরটির জন্য ভালো সাবানের ব্যবস্থা আছে। তাকে সকালে উঠে খুব ভাল করে সাবানে হাত ধুতে হয়। প্রতিবার খৈনি মলার পরও ধুতে হয়। পীরু তাঁর বড় পেয়ারের চাকর। সে তাঁকে তেলও মাখায় স্নানের আগে অনেকক্ষণ ধরে। তিনি সর্ষের তেল ছাড়া আর কিছু মাখেন না। তেল মাখিয়ে আবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয় পীরুকে। যদিও তাঁর নানা কাজের জন্য কয়েকটি প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে, কিন্তু পীরুই তাঁর আসল প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁর প্রাইভেট ফোন পীরুই ধরে। তিনি নিজে ফোন ধরেন না, কথাবার্তা বলেন না। পীরুর মারফতই সব হয়। অবসর সময়ে তিনি দু'টি কাজ করেন। মহাভারত, রামায়ণ বা ভাগবত পাঠ করেন খুব ভোরে। তারপর লেখেন ঘণ্টাখানেক। তারপর ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল সমাধান করেন। এই জন্যেই তিনি অনেকগুলি কাগজ কেনেন। খবর পড়বার জন্যে নয়। দরকারি খবর সংগ্রহ করবার জন্যে তাঁর আলাদা একজন লোক আছে। আমার শ্বশুর সত্যিই অদ্ভুত অসাধারণ লোক। তাঁর নামটাও অদ্ভুত—টঙ্কনাথ। এ নাম রেখেছিলেন তাঁর বাবার মনিব মহারাজা নারায়ণ।

মহারাজা নারায়ণ বিপ্ল শক্তিশালী জমিদার ছিলেন ইংরেজদের আমলে। তাঁরই ম্যানেজার ছিলেন টঙ্কনাথের বাবা প্রতাপসিন্ধ্। টঙ্কনাথ যখন খ্ব শিশ্—যখন তাঁর নামকরণ হয়নি—তখন একদিন মনিবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে প্রতাপসিন্ধ্। মহারাজা নাকি শিশ্র সামনে একটি ফ্ল এবং একটি মোহর রেখেছিলেন। শিশ্ নাকি ফ্ল না নিয়ে মোহরটিকেই ম্ঠো করে ধরেছিল। মহারাজা হেসে বললেন, তোমার ছেলের জন্যে দ্টো নাম ঠিক করে রেখেছিলাম—প্ষ্পনাথ কিংবা টঙ্কনাথ। তোমার ছেলে তো ফ্ল স্পর্শ করল না, মোহরটাই আঁকড়ে ধরেছে। ওর নাম টঙ্কনাথই থাক। টঙ্কনাথ নামটা পছন্দ হয়নি প্রতাপসিন্ধ্র, তিনি মনিবকে ছেলের নামকরণ করে দিতেও অন্রোধ করেননি। কিন্তু তিনি যখন স্বতঃপ্রব্ত্ত হয়ে করে দিলেন, তখন ওই নামই বহাল রইল। মহারাজা নারায়ণের মতো হিতৈষী মনিবকে অপ্রসন্ন করতে সাহস করলেন না তিনি। সেকালে এইরকম রেওয়াজ ছিল, মানী লোককে হতমান করতে চাইত না কেউ, তাঁদের অসঙ্গত খেয়ালকেও প্রশ্রয় দিত সবাই, বিশেষ করে তাঁর অন্গ্রহলালিত অন্চরব্ন্দ। টঙ্কনাথের বাল্যকালটা মহারাজা নারায়ণের কাছেই কেটেছিল। তিনি যখন মারা যান তখন টঙ্কনাথের বয়স ষোল বছর। তাঁর ছেলে ছিল না, ভাইপো ছিল, তাঁর ভাইপো গৌরবনারায়ণই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজা নারায়ণ টঙ্কনাথকেও বঞ্চিত করেননি। তাঁকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতাপসিন্ধ্ও তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। স্তরাং টঙ্কনাথ প্রথম জীবনেই কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হতে পেরেছিলেন এবং জমিদারি প্রথা অবল্প্ত হবার আগে জোতজমি জমিদারি সব বিক্রি করে সংগ্রহ করেছিলেন আরও কয়েক লাখ টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি অনেক রকম ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। অনেক শহরে বাড়িও কিনেছিলেন তিনি। স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে, একমাত্র ছেলের সঙ্গে বনিবনা নেই।

পীর্ এসে জানালে—"নীল্বাব্ ফোন করছেন।"

"নীল্বাব্ কে!"

"আমাদের খোকাবাব্র শালা। তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন বললেন। বৌমাকে নিয়ে আসতে চান আপনার কাছে।"

"ওসব ঝঞ্ঝাট করে কি হবে? এসে তো ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কাঁদবে, আর সে কান্না থামাতে কিছ্ টাকা গচ্ছা দিতে হবে। আমার অমতে যাকে বিয়ে করেছে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে মানেই ভিতরে কোনও উদ্দেশ্য আছে।"

পীর্ চুপ করে রইল।

"তোমার কি মত? দেখা করব?"

"দেখা করলে ক্ষতি কি। উনি যে খোকাবাব্র স্ত্রী, আপনার প্ত্রবধ্, এতে তো কোনও সন্দেহ নেই। আস্ন না—"

"বেশ, তাহলে তাই বলে দাও। সেই আমেরিকান সাহেব আসবে ক'টায়?"

"তিনটে—"

"তাহলে ওদের পাঁচটায় সময় দাও।"

পৌনে পাঁচটা'র সময় অমাকে নিয়ে নীল্ এসে যখন পেঁছিল তখন টঙ্কনাথের

বিজনেস্‌ সেক্রেটারি মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে দেখা হলো তার। মিস্টার মল্লিক সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে বসালেন তাদের একটা ঘরে।

"বসুন আমি মিস্টার মৌলিককে একবার খবর দিই যে আপনারা এসে গেছেন।"

পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে কথাবার্তা বলতে লাগলেন তিনি।

অমা যদিও তার দাদা-বৌদি আর মায়ের জেদাজেদিতে এসেছিল, কিন্তু সে কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার বার বার মনে হচ্ছিল বড়লোক শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে কি হবে? যে শ্বশুরের পরিচয় তার স্বামী বিয়ের আগে দেননি, বিয়ের পর যে শ্বশুর নিজে থেকে একবারও তার খোঁজ করেননি, বরং তার সম্বন্ধে যাঁর বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট, সেই শ্বশুরের কাছে সে যাচ্ছে কেন? কৃপা ভিক্ষা করতে? তার তো কৃপা ভিক্ষা করবার কোনও দরকার নেই। তবে সে এসেছে কেন? এসেছে দাদা-বৌদি আর মায়ের আগ্রহাতিশয্যে। ওরা ভাবছে তার শ্বশুর যদি তাকে দেখে বিগলিত হন এবং কিছু সম্পত্তি দেন তাহলে অমা হয়তো তার বাবার সম্পত্তির উপর দাবি ছেড়ে দেবে আর সে সম্পত্তিটা নীলুর কাজে লাগবে। এ সবই অমা জানত, আর এর বিরুদ্ধে তার মন গোড়া থেকেই বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু তবু সে এসেছে। এসেছে তার কারণ, সে মা, দাদা আর বৌদির অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি। এইটেই তার দুর্বলতা। চাঁদুকে বিয়েও করেছিল এই জন্য। চাঁদুর আগ্রহাতিশয্যের বানে তার সামান্য আপত্তি ভেসে গিয়েছিল। চাঁদুর মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করে সে মুগ্ধ হয়েছিল তা ঠিক, কিন্তু চাঁদুর আগ্রহাতিশয্যের জন্যই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল সে, বাড়ির লোকেদের মানা শোনেনি। তার মা বা দাদা খুব প্রবলভাবে মানাও করেনি তাকে। চাঁদুকে দেখে তাদের পছন্দ হয়নি। সে যদি সিনেমা-স্টারের মতো সুরূপ হতো তাহলে হয়তো মা আপত্তি করতেন না। দাদার খুব বেশি আপত্তি ছিল না, বোনের বিয়ে প্রায়-নিখরচায় হয়ে যাচ্ছে এতে মনে মনে সে যেন আরাম অনুভব করেছিল একটু। নীলু লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু ঘোর স্বার্থপর সে। অমা তার দাদাকে চেনে। বৌদি কিন্তু অত স্বার্থপর নয়। বৌদিকে ভালবাসে অমা। বিশেষ করে বৌদির অনুরোধেই আসতে হয়েছে তাকে। তার নিজেরও একটু কৌতূহল ছিল। চাঁদুর বাবা লোকটা কি রকম এটা জানবারও লোভ ছিল তার মনে মনে। কিন্তু তবু সে অস্বস্তি ভোগ করছিল। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর রৌরবের অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছিল আবার। সর্বদা মনে হচ্ছিল, এ কোথায় কোন পরিবেশে এসে পড়লাম আমি। কেন এলাম···। সবাই আমাকে নিয়ে এত টানাটানি করছে কেন। আমার মন যে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না। আমি তো কৃপা চাই না কারও কাছে। আমি একটু আনন্দ চাই, ভালবাসা চাই, কারও কাছে ভালবাসার দাবিতে নিঃশেষে সমর্পণ করতে চাই নিজেকে। কিন্তু কোথাও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চাঁদু কতদিন হলো চলে গেছে, এখনও একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি তাকে। চিঠি লিখেছে একটা অতুলকে। ভিখারী সমিতির সম্বন্ধে। বিদেশের ভিখারীদের সঙ্গেও সে নাকি যোগাযোগ করছে। তার সম্বন্ধে একটা কথাও ছিল না সে চিঠিতে। অমার ভয় করছে, মনে হচ্ছে চাঁদুও কি শেষে হারিয়ে যাবে, চলে যাবে তার নাগালের বাইরে, নিজের আদর্শ আর বিদ্যাবত্তার বিরাট লোকে গিয়ে ভুলে যাবে

হয়তো তাকে···এইসব নানা কথা মনে হয় তার আর আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে মনে, বুঝতে পারে না ওটা রৌরব, নরকের আগুন।

নীলুর পাশে নির্বাক হয়ে বসেছিল সে।

এমন সময় মিস্টার মল্লিক এসে প্রবেশ করলেন।

"মিস্টার মৌলিক এখনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু উনি আপনাদের সঙ্গে আলাদা-আলাদা দেখা করতে চান। আগে অমা দেবীকে নিয়ে যেতে বললেন। নীলুবাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। অমা দেবী আসুন—"

অমার প্রথমে একটু ভয় হলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো ভালই হয়েছে। দাদা সামনে থাকলে হয়তো সব কথা সে বলতে পারত না। তখনই আবার মনে হলো, সব কথা? কি কথা বলবে সে? বলবার কথা তো একটাও নেই।

—আসুন—"

মল্লিক মশাইকে অনুসরণ করে অমা ভিতরের একটি ঘরে ঢুকল। সে ঘরটি পার হয়ে আর একটি ঘরের পরদা-ঢাকা দরজার সামনে এসে মল্লিক মশায় বললেন, "পরদা ঠেলে ঢুকে যান আপনি। ওখানে আর কেউ নেই।"

মল্লিক মশাই চলে গেলেন।

অমা ক্ষণকাল পরদার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। ঢুকে অবাক হয়ে গেল সে। দেখল, একটি গোঁফওলা বলিষ্ঠ দরোয়ান একটি চৌকির উপর বসে আছে। পাশে একটি ভালো চেয়ার, তার পাশে একটি টেবিলে অনেক খাবার। অমার প্রথমে সন্দেহ হলো—ইনিই কি তার শ্বশুর?

টংকনাথ সস্নেহে আহ্বান করলেন—"এস মা এস—"

অমা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"এস, বস। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ কেন বলো তো।"

"প্রণাম করতে এসেছি। আর কোনও দরকার নেই। আমার দাদা-বৌদিই খবর দিয়েছিলেন আপনি এখানে এসেছেন, ওঁরা সঙ্গে করে না নিয়ে এলে আমি আসবার সাহস পেতাম না।"

"সাহসের কথা বলছ কেন, তোমার স্বামী কি আমাকে একটা ভয়ংকর জীবরূপে অংকিত করেছেন তোমার কাছে?"

"বিয়ের আগে আপনার কোনও পরিচয়ই আমি পাইনি। আপনার নামও জানতাম না।"

"অজ্ঞাতকুলশীল একটা লোককে বিয়ে করে ফেললে—"

মাথা হেঁট করে রইল অমা। কোনও উত্তর দিল না।

টংকনাথ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে, তারপর বললেন, "আমার ছেলে তো কুৎসিত দেখতে। তোমার মতো রূপসী মেয়ে কি জন্যে বিয়ে করতে গেল তাকে, তা তো আমার মাথায় ঢুকছে না। গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে? গুণ অবশ্য তার নানারকম আছে। আমি তো গুণ্ডা উপাধি দিয়েছি তাকে।"

তবুও অমা মাথা নীচু করে বসেই রইল, কোনও উত্তর দিল না।

"কথা কইবে না তো এসেছ কেন।"

অমা অপ্রতিভ মুখে চোখ তুলে চাইল, তারপর অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, "আমার তো কিছু বলবার নেই।"

"তাহলে খাও। ওই টেবিলের উপর কিছু খাবার আনিয়ে রেখেছি খাও। চা, কফি, কোকো, ওভালটিন, দুধ—কি খাবে, কি খাবে বলো, গরম আনিয়ে দিচ্ছি, এগুলো আগেই এনেছিল পীরু।"

ঘণ্টা টিপলেন টঙ্কনাথ। পীরু এসে দাঁড়াল।

"ওকে গরম কিছু এনে দাও। চা, কফি—কি আনবে?"

অমা হাসিমুখে চুপ করে রইল একটু, তারপর বলল—"এ সময় আমার খাওয়ার অভ্যাস নেই।"

"তবু কিছু খেতে হবে।"

অমা টেবিল থেকে একটি মিষ্টান্ন তুলে নিল শুধু।

"আপনি বলছেন তাই খাচ্ছি, এ সময় আমি খাই না কোনদিন।"

টঙ্কনাথ পীরুকে বললেন—"সেটা কোথা রেখেছিস, নিয়ে আয়।"

পীরু আলমারি থেকে একটি হারের বাক্স বার করে টঙ্কনাথের হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"দেখ তো হারটা পছন্দ হয় কি না। এর চেয়ে ভালো মতিচাঁদ দিতে পারলে না।"

বাক্সটা খুলতেই চকমক করে উঠল একছড়া দামী হীরের হার।

অমা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল, তারপর বলল—"আমাকে দেখতে বলছেন কেন!"

"তোমার জন্যেই তো কিনেছি। এ দেশের রেওয়াজ বউ-এর মুখ প্রথমে দেখতে হলে কিছু উপহার দিতে হয়। শুধু হাতে বউয়ের মুখ দেখতে নেই।"

অমা নত-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর চোখ তুলে বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি কিছু নেব না।"

"নেবে না, কেন?"

"নিতে ইচ্ছে করছে না। আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তো আপনি আমাকে পুত্রবধূরূপে স্বীকার করেননি। আমার একটা খবর পর্যন্ত নেননি আপনি—"

"তাহলে এসেছ কেন আমার কাছে।"

"আমার দাদা-বৌদির অনুরোধে এসেছি, এসেছি আপনাকে প্রণাম করতে। এবার যাই।"

অমা প্রণাম করে চলে যেতে উদ্যত হলো।

"আরে থাম, থাম, থাম। ভারি রাগী লোক দেখছি তো তুমি। বেশ, বেশ হার না নিলে, আলাপ কর একটু। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন। বস। আমার ছেলে আমার মতের বিরুদ্ধে তোমাকে বিয়ে করেছে তা ঠিক, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এটাকে তো অস্বীকার করতে পারি না। বস, তোমার সঙ্গে আলাপ করি একটু।"

অমা আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

"তোমার বাবার নাম কি?"

"শ্রীবিষ্ণুপদ রায়। অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি।"

"ছিলেন বলছ কেন। এখন কি তিনি নেই?"

চুপ করে রইল অমা।

"বেঁচে আছেন তো—"

"ঠিক জানি না। প্রায় দশ বছর আগে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন তিনি। দশ বছর তাঁর কোনও খবর আমরা জানি না।"

"নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন? কেন, হঠাৎ!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে অমা বলল—"তাঁর কুষ্ঠ হয়েছিল তাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তিনি।"

"কুষ্ঠ হলেই বা। বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করালেই পারতেন।"

"দাদার মনে ভয় হলো তাঁর ছোঁয়াচ লেগে বাড়ির অপরেরও হতে পারে। বাবা যেই সে কথা শুনলেন, অমনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।"

"তোমার দাদা কি করেন?"

"প্রফেসারি।"

"ভারি দূরদর্শী বুদ্ধিমান লোক দেখছি। তুমি লেখাপড়া কত দূর শিখেছ?"

"পরীক্ষা অনেকগুলো পাস করেছি, কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ শিখিনি। নোটবই মুখস্থ করে এম-এ পর্যন্ত পাস করেছি, কিন্তু তাকে লেখাপড়া শেখা বলে না। আমাকে মুর্খই মনে করুন। যদি অনুমতি দেন এবার তাহলে উঠি—"

"না না, বস। মুর্খরা নিজেদের পণ্ডিত মনে করে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিতান্ত মুর্খ তুমি নও। সমস্ত দিন কি কর বাড়িতে!"

"রান্নাবান্না করি, ঘরের কাজকর্ম করি। আর ট্যুশনি করি সন্ধ্যার দিকে।"

"কিসের ট্যুশনি?"

"গান-বাজনার।"

"তাই নাকি। কি বাজনা বাজাতে জান!"

"গীটার, সেতার, এস্রাজ, হার্মোনিয়ম আর পিয়ানো—"

"ওরে বাবা, তুমি তো মস্ত গুণী দেখছি। ট্যুশনি কর কেন?

"সবার অমতে বিয়ে করে বাড়ি থেকে যখন চলে আসি তখন ওঁরও ভালো চাকরি ছিল না। দুজনেই ট্যুশনি করতাম। এখন উনি চাকরি পেয়েছেন, ট্যুশনি না করলেও চলে, কিন্তু আমার ছাত্রীরা আমাকে ছাড়তে চায় না।"

"এখন তোমার 'উনি' কি চাকরি করেন?"

"সিদ্ধেশ্বরবাবুর ফার্মের ম্যানেজার হয়েছেন। এখন এখানে নেই। ইয়োরোপে গেছেন ফার্মের কাজে।"

চুপ করে রইলেন টঙ্কনাথ।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ভগবান, রক্ষা কর!"

"ও কথা বললেন কেন?"

"ভগবান কারও অনুরোধ রাখেন না, তিনি নিয়মের অধীন, তবু আমাদের দুর্বলতা আমরা তাঁকে অনুরোধ করি। তাই করে ফেললাম। তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।"

"কেন?"

"না জেনে তুমি একটা পাগলকে বিয়ে করেছ। অদ্ভুত বুদ্ধিমান, অদ্ভুত একগুঁয়ে

অদ্ভুত খেয়ালী, হিতাহিত জ্ঞান নেই। বাঁয়ে রোককে তো বাঁয়ে রোককে, ডানদিকে ফিরেও তাকাবে না।

"আমার সঙ্গে তো কোনও বিষয়েই মিল হলো না। আমার দেওয়া নামটা পর্যন্ত রাখেনি। আমি ওর চন্দ্রভূষণ নাম রাখিনি, চন্দ্রভূষণ তো অতি সাধারণ নাম। আমি ওর নাম রেখেছিলাম নিয়মনাথ। এটাও ভগবানের নাম, কিন্তু কত অরিজিনাল। কিন্তু ও নাম ছেলের পছন্দ হলো না। তখন আই-এস-সি পাস করেছে, আমাকে এসে বললে—বাবা, আমি নিয়মনাথ নাম রাখব না। চন্দ্রভূষণবাবু বলে একজন প্রফেসার আজ বললেন, পশুরাই নিয়মের দাস, মানুষ নয়, মানুষ নিয়ম ভাঙবে, মানবে না। আমার খুব ভালো লেগেছে তাঁর কথা। আমার নাম নিয়মনাথ বদলে চন্দ্রভূষণ করে দাও। ব্যস, সেই যে গোঁ ধরল, বদলে তবে ছাড়লে। এফিডেবিট করে নাম বদলে ফেললে। তাকে বোঝালাম, মানুষ যে নিয়ম ভাঙবার চেষ্টা করে ওটাও একটা নিয়ম, বাঘের গায়ে ডোরা থাকে গন্ধ থাকে, এটা যেমন নিয়ম ওটাও তেমনি। কেউ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। সবাই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। 'আমি নিয়ম ভাঙব' মানুষের এই পাগলামিটা কোনও কোনও মানুষকে সত্যি সত্যি পাগল করে দেয়। তোমার স্বামীটি তেমনি পাগল। দিনকতক জেদ ধরল—আমি গরীবের ভালো ছেলেদের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াব। তার পর জেদ ধরল—আমি কালো মেয়েদের ভালো ঘরে ভালো বরে বিয়ে দেব। বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে গেল আমার। শেষকালে আমি রুখে দাঁড়ালাম। বললাম, দেখ বাবা, জীবন মানেই যুদ্ধ। আর সে যুদ্ধের আসল অস্ত্র টাকা। ধর্মজগতে মা কালী মা দুর্গা শক্তি হতে পারেন, কিন্তু জীবনযুদ্ধে টাকাই শক্তি। সে শক্তির অপব্যয় আমি করতে দেব না। বলল—আমি গরীবের জন্য ব্যাংক করব। সে ব্যাংকে গরীব ছাড়া আর কেউ টাকা রাখতে পারবে না। গরীবদের আমরা সব ব্যাংকের চেয়ে বেশি সুদ দেব, টাকা দাও তুমি। আমি রাজী হলাম না। তখন ও এম-এ পাশ করেছে। সেই থেকে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। একদিন সকালে দেখি বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে—আমি আর আপনার টাকা নেব না। নিজের মতে নিজের পথে চলব। পীরু খোঁজ নিয়ে বার করলে যে, একটা মেসে উঠেছে। সেখানে একটা চিঠি লিখলাম—'দেখ বাবা, হঠকারিতা করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নিজের মতে নিজের পথে চলতে পারবে না। সমাজে থাকতে হলে আপস করে চলতে হবে। আমাদের দেশে যাঁরা নিজের মতে নিজের পথে চলতে চেয়েছেন এবং চলতে পেরেছেন, তাঁরা সবাই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। আর একদল লোক পেরেছেন, তাঁরা বীর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এ কথাটা মিথ্যে নয়। মডার্ন বীর কারা জান? ধনীরা। তারাই নিজের মতে নিজের পথে চলবার ক্ষমতা রাখে। তোমার জন্য সেই ধনই সঞ্চয় করছি আমি। কিন্তু তুমি সেটাকে বাজে ব্যাপারে উড়িয়ে দিতে চাইছ। আমি আপত্তি করেছি তোমারই ভালোর জন্যে। নিজের মতে নিজের পথে যদি চলতে চাও, টাকা জমাও।

'তুমি দিনকতক আগে টাকা খরচ করে অনেক কালো মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছ। তোমার জন্যে আমি সদ্বংশের একটি কৃষ্ণাঙ্গী মেয়ে পছন্দ করে রেখেছি। তোমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করা আমার কর্তব্য। তুমি যদি এ মেয়েকে

বিয়ে কর আমি খুব সুখী হব। আমার বিশ্বাস তোমারও ভালো লাগবে মেয়েটিকে।'

"পীরু চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। মুখে বলে দিয়েছিল, আমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করব। বাবাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ কোরো। এখন দেখছি কালো নয়, বেশ ফরসা টুকটুকে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। তা ভালই করেছে। যদিও আমি তোমাদের বিয়েতে আপত্তি করে তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু এখন তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে। আর ভাল লাগছে বলেই তোমার জন্যে কষ্টও হচ্ছে। কারণ আমি বুঝেছি আমার ছেলেটা পাগল। এখন নাকি ভিখারীদের নিয়ে মেতেছে। কেউ কারও ভালো করতে পারে না, এটা ওর মাথায় ঢুকছে না। আমাদের দেশেই বিদ্যাসাগর এর প্রমাণ হয়ে আছে। রাজনীতিতে যে সব নেতারা গরীবদেব জন্য বক্তৃতায় হাউ হাউ করে কাঁদেন তাঁরা যখন গদিতে চড়েন, তখন দেখা যায় তাঁরা নিজেদের দুঃখই ঘুচিয়েছেন, নিজেদের গাড়ি বাড়ি করেছেন, গরীবরা যেমন ছিল তেমনি আছে। থাকবেই, কারণ ওইটেই নিয়ম। তোমাকেও কষ্ট পেতে হবে, কারণ পাগলের সঙ্গে ঘর করে কেউ সুখী হয় না।"

অমা মাথা নীচু করে টঙ্কনাথের এই লম্বা বক্তৃতা শুনল।

বক্তৃতা শেষ হলে মুখ তুলে মুচকি হাসল একটু।

"হাসছ? তোমার ভয় করছে না?"

"অদৃষ্টে যা আছে তা মেনে নিতেই হবে। আমি এবার উঠি—"

সে আবার প্রণাম করতে গেল।

"থাম, থাম, এত তাড়াতাড়ি কিসের। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। রাগ করবে না তো! তুমি বড্ড ফট করে রেগে যাও দেখছি।"

"কি বলুন—"

"তুমি আমার পরিচয় জান?"

"না। দাদা-বৌদির কাছে শুনেছি আপনি ধনী লোক। আর কিছু জানি না।"

"আমার আর একটা পরিচয় আমি সাহিত্যিক। আমি অনেক বই লিখেছি। কিন্তু একটাও ছাপাইনি। শেয়াল-কুকুরকে জোর করে গোলাপ ফুল শোঁকাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আমি সাহিত্যিক বলেই আমার ভদ্রতাবোধ আছে, রসবোধ আছে। তাই আমার বিবেক বলছে, তোমাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। তুমি না জেনে আমার পাগল ছেলেটাকে বিয়ে করেছ। টাকা দিয়ে এর যতটা প্রতিকার করা সম্ভব তা আমি করতে প্রস্তুত আছি। একটা বাড়ি তোমাকে দেব আর নগদ কিছু টাকা—"

"না, আমি কিছু চাই না।"

প্রণাম করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল অমা। তার মনটা শ্মশানের মতো হয়ে গেল হঠাৎ। চারিদিকে চিতা জ্বলছে। দিগন্ত পর্যন্ত যত দূর দেখা যায় কেবল চিতা, চিতা আর চিতা। লক লক করে আগুনের শিখা জ্বলছে চারদিকে।

অমা চলে আসবার পর নীলুকে ডেকে নিয়ে গেল পীরু।

"আপনি বসুন—"

অমা বসে রইল। কিন্তু তার সারা মন তখন আগুনে ভরে গেছে। রাশি রাশি নোট পুরছে, টাকা পুড়ছে, টাকা পুড়ছে, আর তার সঙ্গে হাসছে কে যেন। খিল খিল করে হাসছে, কিন্তু কে হাসছে দেখা যাচ্ছে না।

নীলু কতক্ষণ টঙ্কনাথের সঙ্গে কথা কয়েছিল তা অমার খেয়াল ছিল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে রৌরবকে প্রত্যক্ষ করছিল, যে রৌরবে খালি আগুন আর ব্যঙ্গের হাসি,, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খালি স্বার্থের, খালি টাকার, খালি আদর্শের, খালি মতবাদের—ভালবাসার নয়। এই ক্ষোভই যেন আগুনের শিখা হয়ে জ্বলছে রৌরবে, একেই পরিহাস করে বিধাতার ব্যঙ্গ হাসি শোনা যাচ্ছে নানা সুরে। চাঁদুর বাবা তাকে ভালবাসবে না, গয়না দিয়ে টাকা দিয়ে বাড়ি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবে, দাদা তার সাহায্যে কিছু টাকা লাভ করবে, মা মনে মনে দাদার পক্ষে, কিন্তু ভণ্ডামি করে তাকে গাল দেবেন অমার মন রাখবার জন্য। এদের অমানুষিক ব্যবহারে বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর বিষয়টা ভাগ করে নেবার জন্য এখন সবাই উৎসুক। চারিদিকে আগুন জ্বলছে, অমা কি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে? এ রৌরবের উত্তাপ কতক্ষণ সে সহ্য করতে পারবে? কিন্তু অমা জানে, তাকে সহ্য করতেই হবে। চাঁদুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে। আবিষ্কার করতে হবে চাঁদুকে। চাঁদুকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বার করতে হবে তাকে। তার অসাধারণত্ব আছে, নূতন ধরনের আদর্শ আছে, কিন্তু তার পিছনে মনুষ্যত্ব আছে কি না, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি, যাদের প্রভায় মনুষ্যজীবন সুন্দর সার্থক আনন্দময়, সেই রত্নগুলি তার অসাধারণত্বের চোখ-ধাঁধানো আবরণের মধ্যে আছে তো? এই প্রশ্নের উত্তর তাকে বার করতে হবে। ভিখারীদের ভাল করা, ভিখারী মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার সবলা নামকরণ করা—এ-সবের মধ্যে অসাধারণত্ব আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু! এই 'কিন্তু'কে কেন্দ্র করেই অমার কৌতূহল আবর্তিত হচ্ছে। আশা করে আছে অজানা চাঁদু যখন জানা হবে, তখন নিবে যাবে রৌরবের আগুন। হঠাৎ মনে হলো, চাঁদু তো কোনদিন তার গান বা বাজনা শুনতে চায়নি, তার রান্না খেয়ে প্রশংসা করেনি। তবে কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সে? তার রূপ? একটা ভিখারিণীকে বাঁচাতে গিয়েছিল বলেই কি সে ভালবেসেছিল তাকে? অতুল তার রান্না খেয়ে মুগ্ধ, তার বাজনা শুনে মুগ্ধ, তার শিল্পী সত্তাকে সে সম্মান দিয়েছে, একটা কুকিং রেঞ্জ কিনে এনেছে সেদিন, তাকে খুশী করবার জন্যে সে সদা ব্যস্ত, কিন্তু চাঁদুকে ঘিরে তার মনে যে স্বপ্ন জাগে, অতুলকে ঘিরে সেরকম স্বপ্ন জাগবে এ কল্পনা করতে ভয় পায় সে। তার কেমন যেন ভয় ভয় করে।

এই ভয়কে কেন্দ্র করে নানা রঙের অগ্নিশিখা মূর্ত হয় তার মনে। মনে হয় সব বুঝি পুড়ে যাবে। সে বোধহয়···আর ভাবতে পারে না।

"চল, এবার বাড়ি চল। চমৎকার লোক তোর শ্বশুর।"

অমা লক্ষ্য করল নীলুর হাতে একটা সুদৃশ্য কার্পেটের ব্যাগ রয়েছে। যখন এসেছিল ব্যাগ তো ছিল না। ব্যাগ কোথা থেকে পেলে? ব্যাগে কি আছে?

"চল। সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি ভদ্রলোকের ব্যবহারে।"

দাদার পিছু পিছু অমা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

বাড়িতে এসে ব্যাগের ভিতর থেকে যে বিড়ালটি বেরুল তা বেশ বড় কাবুলী বিড়াল। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই।

অমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেবল, চোখের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুতে লাগল।

নীলু সোচ্ছ্বাসে বলতে লাগল তার মাকে—"সত্যি মা, আমি একটা প্রত্যাশা করিনি। কী ভালো যে ভদ্রলোক, আর কী উদার তাঁর মন, কল্পনা করতে পারবে না। অমাকে একটা হীরের নেকলেস দিয়েছেন, একটা বাড়ি দিয়েছেন, আর নিজের ব্যাংকে একটা চিঠি দিয়েছেন যাতে অমার নামে এক লাখ টাকার ফিক্স্‌ড্‌ ডিপজিট অ্যাকাউণ্ট খুলে দেওয়া হয় একটা অবিলম্বে। অমা নাকি এসব নিতে চায়নি। তাই আমাকে বললেন, আমার ছেলেটিও পাগল, আপনার বোনটিও তাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, হাজার হোক ও আমার পুত্রবধূ তো। ওর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু ব্যবস্থাটা টাকা দিয়ে করাই সম্ভব। আপনি আমার ব্যাংকে কালই এ চিঠিটা নিয়ে যাবেন। আমি অমার নামে একটা ড্রাফট্‌ দিয়ে দিচ্ছি। আর বৌবাজারে আমার তিনতলা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে, সেইটে ওকে দিয়ে দিচ্ছি। পীরুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে যান। সেখানে একটা দারোয়ান আছে। পীরু গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে কাল। পরে দলিল করে বাড়িটা ওর নামে লিখে দেব। বাড়ির চাবি, ব্যাংকের ড্রাফ্‌ট্‌ আর হারটা একটা ব্যাগে করে দিয়ে দিচ্ছি, আপনি সাবধানে নিয়ে যান। অমা, তুই কি বলে শ্বশুরের মুখের উপর বললি, আমি নেব না!"

নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল অমা। তার চারিদিকে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, খিক খিক হাসি রূপান্তরিত হয়েছিল অট্টহাস্যে। তার মনে হলো এই অট্টহাস্যের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর বোধ হয় কেউ শুনতে পাবে না। তাই অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে—"না না, আমি নেব না। কিচ্ছু নেব না, ওসব এখুনি ফেরত পাঠিয়ে দাও—"

তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের বাড়ি চলে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখা হলো অতুলের সঙ্গে।

"উঃ, আপনি কত দেরি করলেন! আমি নিজেই শেষে রোস্টটা চড়িয়ে দিলাম। ভালো মাটন এনেছি আজ! ভাবলাম আপনি নতুন কিছু একটা করবেন। কিন্তু এসে দেখি আপনি বাড়িতে নেই। ওকি, মুখ অত গম্ভীর কেন! ঝগড়া-টগড়া করে এলেন নাকি কারও সঙ্গে!"

অমা কোনও উত্তর দিল না।

কেবল জিজ্ঞেস করল—"ডাক এসেছে?"

"এসেছে। আপনার কোনও চিঠি নেই।"

অমা আশা করেছিল চাঁদুর চিঠি আসবে আর সে চিঠি নিবিয়ে দেবে তার আগুন।

'চিঠি আসেনি, আসেনি, আসেনি—'

একটা মশাল যেন হাসতে হাসতে বলতে লাগল তার চোখের সামনে। ঘরে গিয়ে অমা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

৭

যে সমাজ-ব্যবস্থাকে সবাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে সেই সমাজ-ব্যবস্থাই অমার কাছে রৌরব মনে হচ্ছে। অমা কি পাগল হয়ে গেছে? ডাক্তাররা হয়তো তাই বলবেন। কিন্তু আমি জানি অমা পাগল হয়নি। তার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছতর হয়েছে খালি। যে জলকে আমরা নির্মল বলে পান করছি সেই জলে সে দেখতে পাচ্ছে পোকা কিলবিল করছে। যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে সে মাইক্রোস্কোপ সে কেমন করে পেল, সেটা কে তার চোখের সামনে ধরল, এইটেই রহস্য। সে রহস্য উদ্ঘাটন করাও সহজ নয়। অনেকে জাতিস্মর হয় শুনেছি, পূর্বজন্মের সবকিছু মনে থাকে তার। কি করে থাকে? কেউ বলতে পারে না। সেই কোন ছেলেবেলায় অমা রৌরবের গল্প শুনেছিল এক পণ্ডিতমশায়ের কাছে। তখন ভাবেনি সেই রৌরবকে সে দেখতে পাবে তার চারদিকে। ভাবেনি এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে সবাই মশাল। স্বার্থের মশাল, রাজনীতির মশাল, ধর্মের মশাল, সুনীতির মশাল, দুর্নীতির মশাল, নানারকম মতবাদের আর আদর্শের মশাল জ্বলছে চতুর্দিকে। মানুষরা মশাল হয়ে গেছে, পুড়ে গেছে তাদের কোমল বৃত্তি। অকারণ পুলকে আর মশগুল হয় না কেউ, সাধারণ ভদ্রতাবোধ লোপ পেয়েছে; ভাল গাইয়েকে, ভাল লেখককে, ভাল চিত্রকরকে প্রাণ খুলে প্রশংসা করে না কেউ আজকাল। সবাই মশাল, দাউ দাউ করে জ্বলছে খালি। জ্বলছে আর জ্বালাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার মশাল নিবে যায় সব। সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতুলকে ভালো লাগছে ক্রমশঃ। তার মধ্যে স্বার্থের অশোভন প্রকাশ এখনও চোখে পড়েনি তার। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, খাওয়ার জন্যে অতটা হ্যাংলামি ভালো লাগে না তার। ভালো লাগে না তার 'বৌদি বৌদি' বলে ওরকম হেদিয়ে পড়া ভাবটা। ভালো লাগে না, তবু তার জন্যে প্রায়ই নানারকম রান্না করে দেয় সে, তার অনুরোধে বাজনা বাজায়, গান গায়, তার সঙ্গে সিনেমাতেও গেছে একদিন। অতুলকে ভালো লাগে, ওকে কোনদিন মশাল বলে মনে হয়নি, তবু—। হ্যাঁ, আশঙ্কা আছে বই কি। সে আর বাপের বাড়ি যায়নি। নীলু এসেছে, তার বৌদি এসেছে, মা এসেছে—কিন্তু তার ওই এক উত্তর—আমি কিচ্ছু নেব না, তোমরা ওসব ফেরত দিয়ে এস। কারও অনুগ্রহ আমি চাই না। আমি যা রোজগার করি তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আমার জন্যে তোমরা কেউ মাথা ঘামিও না। বাবার বিষয় আমি বিক্রি করব না। নিজের উপর নির্ভর করেই আমি থাকতে পারব। তোমরা দয়া করে আমাকে বিরক্ত কোরো না।

সকলেই ভেবেছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মেয়েটার। ডাক্তাররাও হয়তো তাই ভাবত। কিন্তু মাথা খারাপ হয়নি। ও নিজের উপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে নেই। মনে মনে ও চাঁদুকে আঁকড়ে বসে আছে। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছিল সে। সে রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যায়, সে রাজপুত্র ঘুমন্ত পুরীতে গিয়ে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙিয়ে দেয় রাজকন্যার, সে অসমসাহসী, সে দুর্দম, সে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারে।

এই রাজপুত্রের মনকে সে মাঝে মাঝে দেখতে পেত ঝড়ের মেঘে উড়ন্ত পাখীর ডানায়, ফোটা ফুলের সুরভিত হাসিতে। এই মনকেই সে দেখেছিল চাঁদুর মধ্যে। চাঁদুর বাইরেটা দেখতে ভালো নয়। ছেলেমেয়ের মতো পেলব নয় সে। সে পুরুষ, তার ভিতরটা পৌরুষে ভরা, কল্পনায় রঙিন, নূতন কিছু করবার জন্যে সদা উন্মুখ। চাঁদুর এই মনটা সে দেখেছিল, আর কিছু দেখেনি। আর কেউ তার এ মনটাকে দেখতে পায়নি। তার নিজের বাবাও না। তার নিয়ম-ভাঙার পৌরুষকে তিনি মনে করেছেন গোঁয়ার্তুমি, পাগলামি। নিয়মনাথ নামটা কি ভালো? অতি বাজে মিন-মিনে নাম। তার চেয়ে চন্দ্রভূষণ অনেক অনেক ভালো। চাঁদুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তার আশা, আর প্রতি আবর্তনের সঙ্গে ফুটে উঠছে স্বপ্ন, নতুন স্বপ্ন। এই স্বপ্নের রূপকথালোকে সে যখন থাকে তখন রৌরব অন্তর্ধান করে তার মন থেকে। ফুল ফোটে, পাখীরা গান গায়, জ্যোৎস্না ওঠে, সেই ছেলেবেলায় রনতি মাসী বলে ওঠেন—আমি তোর জন্যে একটু সর তুলে রাখছি, খেয়ে যা চিনি দিয়ে। রনতি মাসীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল না। প্রতিবেশী ছিলেন। এখন কোথায় আছেন সে জানে না। কিন্তু তবু তিনি দেখা দেন এখনও তাকে মাঝে মাঝে। এই রূপকথালোকে হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েন তিনি। এই রূপকথালোকে মায়ের চেহারাও অন্যরকম। ভণ্ডামি নেই। দাদাও এত লোলুপ নন। এই রূপকথালোকে বাবা আসেন। তার জন্যে লজেন্স চকোলেট ফিতে শাড়ি কত কি নিয়ে আসেন। বলেন, তোর জন্যে বড় ওস্তাদ ঠিক করেছি। ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখ। ওসব ঠুনঠুন পেয়ালা গান নিয়ে কতদিন থাকবি? বাবার গম্ভীর মুখে হাসির আভা বিচ্ছুরিত হয়। আসলে কিন্তু তিনি ওই সব থিয়েটারি গান শুনতেই ভালবাসেন। তাকে রাগাবার জন্যে ওই কথা বলেন শুধু। কিন্তু এ রূপকথালোক বেশিক্ষণ থাকে না। যখন চোখে পড়ে টাইট-প্যাণ্ট পরা একটা ছেলে একটা মেয়েকে ফলো করছে, যখন তাদের পাড়ার দোকানটা লুট হয়ে গেল কিন্তু পুলিশ এল না, যখন খবরের কাজজের পাতা ওলটায়, তখনি আবার আত্মপ্রকাশ করে রৌরব, আগুন জ্বলতে থাকে। নানারকম আগুন, নানা রঙের আগুন, হাসিও হয়ে যায় আগুনের ফোয়ারা, চোখের জল হয়ে যায় আগুনের ফুলকি, অসহ্য উত্তাপ চারিদিকে। এরই মধ্যে কিন্তু অমা প্রতীক্ষা করে আছে। প্রতীক্ষা করে আছে চাঁদুর চিঠি একদিন আসবে। ইতিমধ্যে সবলা একদিন অতুলকে বললে—চাঁদুবাবু আমাকে খবর পাঠিয়েছেন লণ্ডনে আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করেছেন তিনি। কিন্তু আপনি তাঁকে জানিয়ে দিন, মায়ের মদ যোগাবার জন্যেই আমি চাকরি করি। আমি চলে গেলে মাকে মদ কিনে দেবে কে? মা যদি মদ না পায় তাহলে আমার চাকরির দরকার কি! লিখে দিন আমি যেতে পারব না।

অমা ভান করল যেন শুনতে পায়নি। কিন্তু সব শুনেছিল সে।

মৎস্য-শিকারী যেমন ছিপ ফেলে উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকে ফাতনাটার দিকে, তেমনি ভাবে প্রতীক্ষা করছিল অমা মনে মনে। মাঝে মাঝে তার চোখ পড়ছিল যে, যেখানে সে ছিপ ফেলেছে তা পুকুরের মতো ছোট জলাশয় নয়, যদিও তার জলের রং পুকুরের জলের মতই কালো, কাকচক্ষু। কিন্তু ছোট নয়, সমুদ্রের মতো দিগন্ত-বিস্তৃত তা। তার বিশ্বাস, তার ছিপে তিমিও উঠে আসতে পারে। সবলার কথাগুলো শুনে

স্থির হয়ে বসে রইল সে। না, ঈর্ষাকে প্রশ্রয় দেবে না কিছুতে। উঠে গেল। স্নানের ঘরে গিয়ে স্নান করল শাওয়ার বাথে অনেকক্ষণ, কিন্তু তবু যা ঘটবার ঘটল। কালো জলে দেখা দিল অসংখ্য আগুনের বুদ্বুদ। তারপর সবটা জ্বলতে লাগল, যেন জল নয়, পেট্রল। ফাতনা ছিপ সব পুড়ে গেল। কিন্তু এর পরই চিঠি এসে গেল চাঁদুর। তার পরদিন সকালেই। চিঠি নয় যেন বোমা। একটা বোমা নয়, অজস্র বোমা। তারা চুরমার করে দিয়ে গেল অমার জগতকে। আগুনে আগুনে ছেয়ে গেল চারিদিক। ভীরু অমার সব পুড়ে গেল, ছাই হয়ে গেল।

চাঁদু লিখেছে—"শ্রীমতী অমা, তোমাকে চিঠি লিখতে দেরি হয়ে গেল। আমার সব খবর অতুলের কাছ থেকে নিশ্চয় পেয়েছ তুমি। কিন্তু যে কথাটা তোমাকে মুখে বলতে পারিনি, যে কথাটা লিখে জানাব ভেবেছিলাম, সে কথা যদিও পৃথিবীর সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন কথা নয়, কিন্তু আমাদের দেশে এর যৌক্তিকতাটা ম্লান হয়ে গেছে নানারকম কুসংস্কারের ময়লা পড়ে, সে ময়লা থেকে তোমার মনও মুক্ত নয় (হয়তো মুক্ত, আমি ঠিক জানি না) কিন্তু এই ভেবেই আমি এই যুক্তিযুক্ত কথাটা তোমাকে লিখতে ইতস্তত করেছি এতদিন। আমাদের পুরাণে এ রকম গল্প অনেক আছে, শাস্ত্রকাররা বিধানও দিয়েছেন। তোমরা সবাই যে ছাঁচে 'সতী' থাকতে চাও, পুরাণে কিন্তু যে পঞ্চকন্যাদের প্রত্যহ স্মরণ করতে বলেছেন, তাঁরা সে ছাঁচের সতী নন। তাঁরা সবাই একাধিক পুরুষের সংস্রবে এসেছিলেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা ভালো অর্থাৎ যারা 'সতী', যারা 'পবিত্র' তারা বিবাহিত স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের কথা ভাবাটাও পাপ মনে করে। এটা যে খারাপ তা আমি বলছি না, যারা বলে—আমি আলোচাল ছাড়া অন্য চাল খাব না, খদ্দর ছাড়া আর কিছু পরব না, বিষ্ণু ছাড়া অন্য কোনও দেবতাকে মানব না, দেবেন দত্ত ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতার কথা শুনব না—তাদের এই একমুখী মনের আমি প্রশংসা করি, কারণ এই একমুখিতা বজায় রাখতে হলে যে নিষ্ঠার, যে মনের জোরের দরকার তা দুর্লভ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ আত্মবলিদানেও দেখা গেছে। সতীত্বের ক্ষেত্রে সহমরণকে—স্বেচ্ছায় স্বামী-বিচ্ছেদ-স্বীকারে অনিচ্ছুক শোকাকুলা স্ত্রীর স্বামীর চিতায় আত্ম-বিসর্জনকে আমি অসম্মান করি না। কিন্তু যাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় চড়ানো হতো, তাদের যে ধর্মের নামে প্রকারান্তরে হত্যা করাই হতো তা সবাই জানে। তার প্রতিবাদ যে কোনও সুস্থমনা লোকই করবে। আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে এতদিন ইতস্তত করেছি সেটাও দাম্পত্য-বিষয়ক। আমরা দু'জনে পরস্পরকে পছন্দ করে (কাব্যের ভাষায়, ভালবেসে) বিয়ে করেছি। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এ বিয়ের বিরোধী ছিলেন, তবু যে রোমান্সের আবেগে আমরা দু'জন মিলিত হয়েছিলাম সে রোমান্সের রঙ আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু তার উপর হঠাৎ কর্তব্যের চোখ-ধাঁধানো এমন একটা আলো এসে পড়েছে, যাকে আমার বিবেক উপেক্ষা করতে পারছে না। এটা অবশ্য তুমিও মানবে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই সন্তান লাভ। মানব-সমাজে যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না তখন কুমারী মেয়েরাই যৌবনোদ্গমের পর একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান লাভ করত। ওইটেই তখন চালু প্রথা ছিল। ছেলে বা মেয়ের পিতৃত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু মানুষ

যখন সম্পত্তির অর্থাৎ প্রাইভেট প্রপার্টির মালিক হলো, তখনই সে স্ত্রীকেও তার প্রাইভেট প্রপার্টি করে ফেললে এবং যে সন্তান তার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে, সে যে তারই সন্তান এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে চাইল। এরই ফলে বিবাহ-প্রথা এবং বিবাহ-প্রথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত 'সতী' থাকার নির্দেশ। ভালো হোক মন্দ হোক, এই প্রথাই এখন সভ্য-সমাজে প্রচলিত। 'বিবাহ'কে এবং সতীত্বকে সম্মান করাই এখন বিধি। আমরা সেই বিধিকে মান্য করেই বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু—তার আগে অতুলের গল্পটা তোমাকে বলে নিই। তুমি গল্পটা শুনেছ কি না জানি না। অতুল হয়তো তোমাকেও বলেছে এটা। পাত্র হিসাবে অতুল সত্যিই অতুল। রূপে গুণে সব দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর। একজন ধনী ওকে পাত্র হিসাবে পছন্দ করেছিলেন তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য। মেয়েটি তখন বিলেতে পড়ছিল। ধনী ব্যক্তিটি অতুলের স্বাস্থ্য ভাল করে পরীক্ষা করিয়েছিলেন। এমন কি তার বীর্য পরীক্ষা করিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, সে সন্তানের পিতা হতে সক্ষম। বিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। অতুল একদিন দুঃখ করে গল্পটা আমাকে বলেছিল এবং তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষার রিপোর্টগুলো দেখিয়েছিল। তার রিপোর্টগুলো দেখে আমার মনে হলো সন্তান উৎপাদন করবার বীজ আমার বীর্যে আছে কি? এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। বিয়ে করবার আগেই দেখা উচিত ছিল। সন্তান না হলে যে দাম্পত্য-জীবন নিরানন্দ নিষ্ফল। বিশেষত মেয়েরা যদি মা হবার সুযোগ না পায় তাহলে তাদের জীবন ব্যর্থ। পরীক্ষা করিয়ে ফেললাম একদিন। এক জায়গায় নয়, তিনটে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়েছি। সব জায়গা থেকেই এক উত্তর—অ্যাজোস্পারমিয়া, অর্থাৎ আমার সন্তান হবে না, আমার সিমেনে স্পারমাটোজোয়া নেই। চিকিৎসা করিয়েছি কিছুদিন, কোনও ফল হয়নি। এখানকার ডাক্তাররাও বিশেষ আশা ভরসা দিচ্ছেন না। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তা আমি ভেবেছি অনেকদিন ধরে। শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা তোমাকে জানাচ্ছি আজ। আমার মন সংস্কারমুক্ত। তুমি যদি সন্তান-লাভার্থে অন্য কোনও পুরুষের সাহায্য নাও আমার তাতে আপত্তি হবে না। তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও কমবে না। তোমার যে সন্তান হবে তাকে নিজের সন্তানের মতোই পালন করতে আমার বিবেক কখনও ইতস্তত করবে না, এটা আমি নিঃসংশয়ে তোমাকে বলতে পারি। তোমাকে সন্তানহীনা করে রাখবার আমার কোনও অধিকার নেই। তোমার কাছেই একটি সুপুরুষ আছে, অতুল। তাকে যদি তুমি কাজে লাগাতে পার আমি খুব খুশী হব। আমাদের দেশের শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান আছে, এ তুমি নিশ্চয়ই জানো। কুন্তীর গল্প নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। কিন্তু তবু তোমার হয়তো নিজস্ব একটা মতামত আছে, আমি জোর করে কিছু তোমার উপরে চাপাতে চাই না। আমি আমার মতটা তোমাকে অকপটে জানালাম। বিবাহ না করে কোনও পরপুরুষের সংস্রবে আসা যদি তুমি 'পাপ' মনে কর তাহলেও তোমাকে আমি দোষ দেব না। কারণ এই সংস্কারকে সম্মান করতেই তুমি শিখেছ, এর মধ্যেই মানুষ হয়েছ তুমি। এটা যে কুসংস্কার তা-ও আমি বলছি না। এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি, তোমার ওই সংস্কারকে সম্মান দেখিয়ে তোমাকে বিয়ে করবার সুযোগ দিতেও আমার দ্বিধা নেই। আইনত, বিবাহ-বিচ্ছেদ অনায়াসেই হতে পারে। তুমি যদি আমার কোনও প্রস্তাবেই রাজী না হও তাহলে আমি যা ঠিক করেছি তা তোমাকে

বলছি। আমি কিছুতেই তোমার মাতৃত্বের পথ রোধ করে থাকব না। আমিই বিবাহ-বিচ্ছেদ করবার আয়োজন করব। জানি না তা সফল হবে কিনা, কিন্তু চেষ্টা আমি করব। ভালো করে জিনিসটা ভেবে আমাকে একটা উত্তর দিও। আমি জীবনে আর বিবাহ করব না এটা ঠিক, কিন্তু তোমার জীবনকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। আশা করি আমার কথা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি ভালো করে। তুমি জান আমি একটা নীতি ধরে নিজের বিবেক অনুসারে চলতে চাই। নিজের বাবাকে ছেড়েছি এই কারণে। ভাল কথা, আমার বাবার সঙ্গে কি দেখা করেছিলে তুমি? করে থাকলে একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, তিনি তোমাকে টাকা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে টাকাই এ যুগের শক্তির প্রতীক। প্রত্যেকেরই উচিত সে শক্তি সংগ্রহ করা। তাঁর আর একটা বাতিক আছে—নিয়ম। তিনি কতকগুলো নিয়মকে অন্ধভাবে মানেন। যেমন, তিনি মনে করেন 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা', ও নিয়ম বদলাবে না। বীরের চেহারা বদলাবে হয়তো যুগে যুগে—চেংগিস, তৈমুর, নাদিরশাহ হয়তো ক্লাইভ, ক্যাথারিন, লেনিনের রূপে আবির্ভূত হবেন ইতিহাসে, কিন্তু শত্রুকে পরাজিত করবার মতো বীরত্ব তাঁদের থাকবেই এবং তা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তাঁরা বসুন্ধরাকে ভোগ করবেন। বাবা নিজের বিবেক মেনে চলেন, আমিও তাই। বাবার বিবেকের সঙ্গে আমার বিবেকের মিল হয়নি, তাই তাঁকে ছাড়তে হয়েছে। তোমার বিবেকের সঙ্গে আমার বিবেকের মিল যদি না হয় তাহলে তোমাকেও হয়তো ছাড়তে হবে। যে ভালো-লাগার নীতিকে মেনে সবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলাম তোমাকে, সেই তোমাকেই আবার হয়তো ছাড়তে হবে আর একটা নীতির ধাক্কায়। আমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু আরও কষ্ট হবে বিবেকের নির্দেশ যদি অবহেলা করি। আমার কথাগুলো ভালো করে ভেবে তারপর উত্তর দিও। ইতি—"

অমার মনে হলো—কাকে বিয়ে করেছিল সে? মানুষকে, না বিবেককে? যে লোক সাবুকে সবলা করেছিল সেই লোক নিমেষে অমাকে অমিতা করে ফেলল। উঠে দাঁড়াল অমা। ঠিক করল এ বাড়িতে আর সে থাকবে না। কিন্তু যাবে কোথায়? ভাবল খানিকক্ষণ। শেষকালে একটি মুখই ভেসে উঠল মনে। মায়ের মুখ। যে মায়ের অবাধ্য হয়েছিল সে, যে মাকে ভণ্ড বলে মনে হয়েছিল তার, সেই মাকেই তার একমাত্র আপনজন বলে মনে হলো এখন। অনেকদিন পরে গিয়ে প্রথমে মায়ের যে মূর্তিটি দেখেছিল সেইটেই মনে পড়ল আবার—বাবার ছবির নীচে দাঁড়িয়ে ধূপকাঠি জ্বালছেন। মনে পড়ল, সে ভালবাসে বলে মা তার জন্যেই নারকেল নাড়ু করতেন, তার বাসন্তী রং শাড়ির জন্যে কত খুঁজে খুঁজে ওই রঙের ফিতে কিনে দিয়েছিলেন, তার জন্যেই আলুকাবুলি করেছিলেন একদিন—নানারকম স্মৃতি ঝাঁক বেঁধে এল তার মনে।

দুটো ট্রাংকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে সে অতুলের নামে চিঠি লিখে তার ঘরে ফেলে দিয়ে এল সেটা। ছোট চিঠি।

সবিনয় নিবেদন,

অতুলবাবু, আমি মায়ের কাছে চললাম। ওখানেই এখন থাকব। কিছু

জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি। বাকি জিনিস আমার লোক এসে নিয়ে যাবে। ভাঁড়ারের চাবি আমার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে রইল। চাঁদুবাবুর আপিস থেকে যে টাকা আমার নামে আসে তা আমাকে পাঠাবার দরকার নেই। ইতি—অমা।

অমা একটা ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল। একটা গলির মধ্যে ঢুকে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রচুর ভিড় জমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের মাঝখান থেকে ভেসে আসছিল নাচগানের শব্দ।

ড্রাইভার বলল—"ভিকিরি মাগীটা এখানে আবার নাচগান শুরু করেছে। ও এখন চলবে অনেকক্ষণ। ব্যাক করে অন্য রাস্তা দিয়ে যাই—"

অমার কানে এল গানের একটা কলি—'দেখিয়ে কলা নাচবি যদি টাকা জমা, দেখিয়ে কলা মদ খাবি তো টাকা জমা।' তার সঙ্গে ঝমাঝম নাচ। সবলার মা নয় তো? অমার ইচ্ছা হলো মেয়েটিকে একটু দেখে।

"একটু থামবেন? আমি দেখে আসি একটু।"

ড্রাইভার থামতে রাজী ছিল না তত।

অমার অনুরোধে রাজী হলো শেষটা।

"বেশি দেরি করবেন না। কি দেখবেন, ও একটা পাগলি—"

অমা ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখল উন্মাদিনীর মতো নাচছে একটি যুবতী। সবলার মা? সুন্দরী মেয়েটি। সবলার মা বলে মনে হয় না।

গাছকোমর বেঁধে শাড়িটাকে আঁটসাঁট করে পরেছে, বুকটা উদগ্র রকমের উঁচু। টাইটা করে একটা রঙিন কাপড় বেঁধেছে সেখানে। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা। পায়ে নূপুর নয়, পাঁয়জোড়। দু'হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে নেড়ে উদ্দাম নৃত্য করছে সে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে। আর গাইছে—'দেখিয়ে কলা আগুন যদি জ্বালাতে চাস টাকা জমা। দেখিয়ে কলা আগুন যদি নেবাতে চাস টাকা জমা। ধুমধুমিয়ে মেরে মেয়ে দেখিয়ে কলা আগুন যদি জ্বালাতে চাস টাকা জমা। টাকা জমা, চুমচুমিয়ে আদর করে টাকা জমা, দেখিয়ে কলা মাল খা আর টাকা জমা'।

চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে মেয়েটির। ঠোঁটের দু-কোণে ফেনা। একটি ছোট মেয়ে দর্শকদের কাছে একটা থলি নিয়ে ঘুরছে। অনেক পয়সা পড়ছে তাতে। অমাও একটা টাকা দিয়ে বেরিয়ে এল। অমার মনে হলো ওরও চারদিকে কি আগুন জ্বলছে? টাকা দিয়ে আগুন নেবাতে চায়? মদ খেয়ে? সবলার মায়ের জন্য কষ্ট হতে লাগল তার। সবলার জন্যও। চারদিকে আগুন জ্বললে যে কি অবস্থা হয় তা তো সে জানে। তার চারদিকে এখনও আগুন জ্বলছে যে। মায়ের কাছে গেলে কি এ আগুন নিববে? ওর মতো কলা দেখিয়ে নাচতে পারলে কি আগুন নেবে? এ আগুন কিন্তু নেবাতেই হবে যেমন করে হোক।

টাক্সি বাড়ির দুয়ারে থামতেই অমা দেখল, তাদের গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িতে বসে আছেন তার বৌদি, আর দাদা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

"এ কি, অমা এসে গেলি। তোর কাছেই যাচ্ছিলাম আমরা। আমাদের ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই তোকে ফোন করতে পারিনি।"

অমা বলল—"চাকরটাকে ডাক তো। আমার বাক্স দুটো নামিয়ে নিক।"

"বাক্স এনেছিস ? কেন ?"

"এখানেই এখন থাকব কিছুদিন মায়ের কাছে।"

"এখানেই থাকবে ? কেন, ওখানে কি হলো !"

অমা কোনও উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে। নীলুর পুরোনো ড্রাইভার বাক্স দুটো নামিয়ে চাকর ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল।

অমা ভিতরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার ছবির নীচে একটা চেয়ার পেতে মা হাতজোড় করে বসে আছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমা। কি হলো ? বাবার কোনও খবর এসেছে নাকি। নীলু আর তার বউ এসে ঢুকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল অমা তাদের দিকে।

"চল, উপরে চল।"

অমা কিন্তু গেল না।

মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করল।

"কি হয়েছে মা !"

অতসীবরণীর কান্না আরও বেড়ে গেল।

"কি হয়েছে বলো না !"

চোখের জল মুছে ধরা গলায় অতসীবরণী বললেন—"ওরা আজ দরখাস্ত করবে।"

"কিসের দরখাস্ত ?"

"বিষয় দখলের। ও'র চলে যাওয়ার পর পরশুদিন দশ বছর শেষ হবে। তারপর ধরে নেওয়া হবে উনি আর বেঁচে নেই, ও'র বিষয়-আশয় সব আমাদের। তার জন্যে দরখাস্ত করবে ওরা আজ। আমাকে আর তোকেও ওই দরখাস্ত সই করতে হবে—আমি সই করতে পারব না।"

"আমিও করব না।"

নীলু বোধহয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

"করবে না তো কি করবে !"

আগুন জ্বলে উঠল অমার চোখে।

"কলা দেখিয়ে নাচব। গান শেখাব, বাজনা শেখাব, আর নাচব। তোমরা যে আগুন জ্বেলেছ চারদিকে সেই আগুনের মাঝখানেই কলা দেখিয়ে নাচব—ক্রমাগত নাচব—নাচতে নাচতে চলে যাব।"

সবলার মা হঠাৎ এসে যেন ভর করল তার উপর।

"পাগল হয়ে গেলি নাকি !"

"পাগল আমি নই। পাগল তোমরা। পাগল নয়, মাতাল—মদ খেয়ে মাতলামি করছ। স্বার্থের মদ, আদর্শের মদ, বিবেকের মদ, টাকার মদ—নানারকম মদ। যা কিছু ভদ্র, যা কিছু কোমল, যা কিছু স্পর্শকাতর তা তোমাদের দাপাদাপিতে তছনছ হয়ে গেল—মহাকাল তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন, সেগুলো মশাল হয়ে জ্বলছে—সব পুড়ে গেল, সব ছাই হয়ে গেল। কিন্তু তার ভেতরই আমি নাচব।"

অমার মা চিন্তিত হয়ে চাইলেন অমার দিকে।

"কি আবোল-তাবোল বকচিস। চল আমার ঘরে—হঠাৎ কি হলো তোর !"

অমা জড়িয়ে ধরল মাকে। আবদারের সুরে যা বলল তা-ও অপ্রত্যাশিত। "মা,

আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। তুমি কি এখনও তেমনি সন্দেশ কর? ক্ষীরের ছাঁচ? গোকুল পিঠে?"

"কার জন্যে করব বল, ওরা তো কেউ খায় না। কাল করে দেব তোর জন্যে। এখন একটু দুধ খাবি চল, ভাল বিস্কুটও আছে। আয়—"

অতসীবরণী অমাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন।

বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীলু। তারপরই তার উকিল বন্ধুটি পিছনের দরজা দিয়ে এসে হাজির হলেন। বগলে একটি ফাইল, চোখে নীল চশমা।

"এই যে নীলু, তোমরা সব 'রেডি' তো। আমি দরখাস্ত লিখে টাইপ করে নিয়ে এসেছি। সই করে দাও, আমি যথাস্থানে পেশ করে দেব। তোমার বোন এসেছে তো?"

"এসেছে। কিন্তু তার মাথাটা বিগড়েছে মনে হচ্ছে। সে বলছে—আমি সই করব না। মা-ও মত বদলেছেন। আমি একা সই করলে হবে না?"

"তিনজন সই করলেই ভালো হতো। তোমার মা বোন কোথায়?"

"মায়ের ঘরে।"

"চল একটু বুঝিয়ে বলি ওঁদের। এতে তো অন্যায় কিছু নেই। তোমার বাবা যখন ফিরছেন না, আর আইন যখন—"

ঠিক এই সময় সদর দরজার 'ইলেক্‌ট্রিক বেল'টা জোরে বেজে উঠল।

"কে এল আবার এ সময়!"

পরমুহূর্তেই ছুটতে ছুটতে এল গোবিন্দ।

"দাদাবাবু দাদাবাবু, কর্তাবাবু ফিরে এসেছেন!"

"কোন কর্তাবাবু?"

"আমাদের কর্তাবাবু গো, তোমার বাবা!"

সঙ্গে সঙ্গেই সিংহবদন বিষ্ণুপদ রায় প্রবেশ করলেন।

হঠাৎ চেনা যায় না। নাকটা ফুলে গেছে। ভুরুর চুল নেই। চোখ দুটো লাল। মাথার সামনে টাক।

"বাবা! এ কি, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না।"

নীলু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

"আমার মুখটা হয়তো বদলেছে কিন্তু এ দুটো ঠিক আছে।"

হাতের বুড়ো আঙুল দুটো তুলে ধরল।

"চলে যাওয়ার আগে এ দুটোর ছাপ আমি রেখে গিয়েছিলাম দু'জন গেজেটেড অফিসার সাক্ষী আছে। জমা আছে ছাপ দুটো সাব-রেজিস্ট্রার্স আপিসে। আমি যে বিষ্ণুপদ রায় সেটা প্রমাণ করতে পারব। সিধের কাছে খবর পেলাম তোমরা নাকি আমার বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করবার তোড়জোড় করছ!"

অমা আর অমার মা-ও বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

অমা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

"আমি জানতুম তুমি আসবে বাবা!"

অতসীবরণী স্বামীর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন।

"পা ছাড়ো, ওঠ।"

অতসীবরণী তবু ওঠেন না।

"একি করছ, ওঠ ওঠ ওঠ।"

বিষ্ণুপদর কণ্ঠস্বরও বাষ্পাকুল হয়ে এল।

অতসীবরণী পা থেকে মুখ তুললেন, কিন্তু পায়ের কাছেই বসে রইলেন নতমস্তকে।

উকিলবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ফস্ করে সেটা ধরিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর নীলুর দিকে চেয়ে বললেন—"আমি চলি এখন, পরে আসব।"

"ইনি কে?" প্রশ্ন করলেন বিষ্ণুপদ নীলুকে।

"আমার বন্ধু।"

নীলু এতক্ষণ প্রণাম করেনি বাবাকে। এইবার এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

"বাবা বস। আমাকে তুমি ভুল বুঝে—"

চেয়ারে বসে তিনি বললেন—"তোমাকে আমি ভুল বুঝিনি। আমি নিজেই অবুঝ, তাই তোমার উচিত কথাকে অনুচিত বলে মনে করেছিলাম। আমি সেকেলে লোক, আমার বুদ্ধিও সেকেলে। ভুগেছিও তার জন্যে। খোকন কোথা?"

"সে স্কুলে গেছে।"

"সে স্কুল থেকে ফেরবার আগেই আমি ফিরে যাব। আমি কলকাতার বাইরে পুকুর-সুদ্ধ একটা বড় বাড়ি কিনেছি প্রায় পাঁচ বিঘে জমির উপর। আমি সেখানেই থাকব। আজ তোমাদের দেখতে এলাম।"

"আমি তোমার কাছে থাকব বাবা"—অমা বলে উঠল।

"আমিও।" বলে উঠল অমার মা-ও।

"বেশ তো। থাকতে পার তো চল। সিধের মুখে শুনলাম অমা একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে করেছে। সে কোথায়?"

"সে ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"ও!"

অমা প্রশ্ন করল—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে বাবা?"

"নানা জায়গায় ঘুরেছি। শেষকালে নাগপুরে ছিলাম। সেখানে একটা চেম্বার করেছিলাম। বাড়িতে বসেই লিগাল এড্ভাইস দিতাম। প্র্যাকটিশ ভালই জমেছিল। কিন্তু চলে এলাম তবু। মনে হলো আর ক'দিনই বা বাঁচব, এ দেশে মরলে গঙ্গাও পাব না, ছেলের হাতের আগুনও পাব না। সেকেলে মানুষের সেকেলে এই সংস্কার দুটোই আমাকে আবার নিয়ে এল এখানে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই বাড়িটা কিনে ফেলেছি দালালের মারফত। দিন সাতেক আগে দলিলপত্র হয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গায় বেশ বড় বাড়ি। সামনের পুকুরটি চমৎকর। টলটল করছে কালো জল। পদ্মফুল ফোটে নাকি। এখন ফুল নেই, পাতা রয়েছে—"

নীলুর বউ একটি পাথরের থালায় নানা রকম খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। তার পিছনেই বাতাবির মা একটি ছোট টেবিল নিয়ে।

"না, না। আমি এখন কিছু খাব না। আজকাল হজম হয় না ভালো। ভাতে-

ভাত আর দুধ ছাড়া আর কিছু খাই না। মাছ মাংস ডিম সব ছেড়ে দিয়েছি"—তারপর হেসে বললেন—"তোমাদের বাসনপত্তরগুলো অপবিত্র করতেও চাই না। আচ্ছা, আমি উঠলাম আজ।"

"আমিও যাব বাবা তোমার সঙ্গে।"

"এখনই ?"

"এখনই।"

অমার মনে হলো তার চারিদিকে যে আগুন জ্বলছে, বাবার কাছে গেলেই হয়তো তা নিবে যাবে, মা-ও তো থাকবে সেখানে, হয়তো সেই পুরোনো দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। সেই দিনগুলো, সেই অবর্ণনীয় দিনগুলো।

"মা, তুমি যাবে ?"

"আমিও যাব। কিন্তু এখনই যাই কি করে। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে একেবারে যাব। তুই যাবি তো যা, দেখে আয়—"

অমা জিজ্ঞেস করল—"বাবা, তুমি কিসে এসেছ ?"

"মোটরে। আর একটা মোটর কিনেছি আমি।"

"আমার ট্রাঙ্ক দুটো নিয়ে যাব।"

"বেশ। বড় গাড়ি, কোনও অসুবিধা হবে না।"

নীলু আর নীলুর বউ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাদের স্বপ্নের প্রাসাদ। বিষ্ণুপদ যখন উঠে দাঁড়ালেন, তারা নীরবে এসে প্রণাম করল।

নীলু বললে—"বাবা, আমি আমেরিকায় একটা চাকরি পেয়েছি। মাস-খানেকের মধ্যেই যাব সেখানে।"

"আমি মরার আগে কোথাও যেও না। আমাকে চিতায় তুলে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যেও।"

"ওখানে কিন্তু অনেক বেশি মাইনে—উন্নতির অনেক স্কোপ—"

গর্জন করে উঠলেন বিষ্ণুপদ—"মাইনের লোভে যদি আমাকে ফেলে চলে যাও, তাহলে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করব তোমাকে। চললুম—"

অমাও বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। দেখল প্রকাণ্ড একটা বুইক গাড়ি কিনেছেন বাবা। চমৎকার গাড়ি। হঠাৎ নজরে পড়ল, ড্রাইভারটারও নাক ফোলা। একটা গালের রং কালচে-লাল, মনে হল কে যেন চড় মেরেছে। সভয়ে চেয়ে রইল অমা তার দিকে।

"ওর গালে কি হয়েছে ?"—অমা জিজ্ঞেস করলে বিষ্ণুপদকে।

"আমার যা হয়েছে তাই।"

কলকাতা থেকে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে বাড়ি কিনেছিলেন বিষ্ণুপদ। প্রকাণ্ড পুকুর বাড়ির সামনে। পুকুরের বাঁধানো ঘাট। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বারান্দার সামনে লাল সুরকির রাস্তা। পুকুরের চারদিকে নানা রকম ফুলের বাগান। একধারে 'লন' আছে একটা। 'লনে'র কোণে কৃষ্ণচূড়া গাছ একটি। দ্বিতল বড় বাড়ি। রাস্তা থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে তারপর বাড়ির প্রশস্ত মারবেলের বারান্দা।

গাড়িটা যখন এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, অমা দেখতে পেল বারান্দার উপর যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার নাক নেই। নাকের জায়গায় একটা গর্ত কেবল। হাতের আঙুল নেই। মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে বিষ্ণুপদ বললেন, "বরেন, আমার মেয়ে অমা এসেছে। ছুনি কোথা, শরবৎ কোথা, ওদের খবর দাও।"

ছুনি, শরবৎ দু'জনেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

এক নজর দেখে অমা বুঝতে পারলে এরা দু'জনেও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

"চল, তুই দোতলায় চল, সেখানেই তুই থাকবি।"

অমা যন্ত্রচালিতবৎ উপরে গেল। উপরের ঘর চমৎকার। মারবেলের মেঝে। বড় বড় জানালা। সবুজাভ দেওয়ালের রং। প্রশস্ত ঘর। তবু অমার মুখে আনন্দের আভাস পর্যন্ত দেখা গেল না।

"ওরা কে বাবা!"

"ওরা আমার আত্মীয়। ওদের আমি ভালবাসি। ছুনি আমার বোনের মতো। ও আমার যে সেবা করেছে তা নিজের বোনও করে না। শরবৎ চাকরের মতো সেবা করে আমার। যখন আমি পেটের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম, যখন কাপড়-চোপড় বিছানা সব পায়খানা-পেচ্ছাপে মাখামাখি হয়ে যেত, তখন ওই শরবৎই সব পরিষ্কার করেছে। অথচ ও বড় বংশের ছেলে, লেখাপড়া জানে, আর কি মিষ্টি স্বভাব, কি বিনয়ী, কি ভদ্র! আর ওই বরেন—যার নাকের জায়গায় গর্ত—ও মস্ত পণ্ডিত একজন। যদিও খোনা হয়ে গেছে, তবু ওর সঙ্গে আলাপ করলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। রাস্তায় পড়ে মরছিল লোকটা। আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি, দিয়ে ধন্য হয়েছি।"

"ওরা কি এখানেই থাকবে বরাবর?"

"নিশ্চয়ই। ওরাই তো আমার আত্মীয়। যতদিন বাঁচব ওদের সঙ্গেই থাকব। উইল করে ওদের টাকাও দিয়ে যাব যাতে ওরা অর্থাভাবে কষ্ট না পায়। ওদের সঙ্গে থাকব বই কি—অনু প্রিন্সিপল থাকব।"

"আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না?"

"তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ব্যবস্থা তো করেইছি। তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে সম্মান দিতে গিয়েই তো নিজের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে-ছিলাম। সেই রাস্তাতেই কুড়িয়ে পেয়েছি এদের, সেই দুঃখের দিনে বুঝেছি ওরাই আমার আপন লোক। নতুন একটা বিবেক তৈরি হয়েছে আমার। সে বিবেকের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না।"

কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল অমা।

সে ভেবেছিল, বাবার কাছে এসে সে শান্তি পাবে। কিন্তু আগুন তো নিবল না। এখানেও প্রিন্সিপল আর বিবেক। তার বাবাই যেন একটা মশাল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সে মশালের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর বলছে—আমার কাছে থাকতে হলে এইসব অচেনা অনাত্মীয় কুটেদের সঙ্গে বাস করতে হবে। আর একটু দূরেই চাঁদুও জ্বলছে মশালের মতো। বলছে—তুমি অতুলের কাছে শোও, সন্তান লাভ কর, যদি আপত্তি থাকে আমি চলে যাব তোমার কাছ থেকে, কারণ আমি কুসংস্কার-মুক্ত বিবেকী লোক। চাঁদুর বাবা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন যেন একটা আগ্নেয়গিরির

মতো, তার দিকে টাকা ছ্‌ড়ছেন, বাড়ি ছ্‌ড়ছেন আর দাউ দাউ করে জ্বলছেন দম্ভের আগ্‌নে। তার দাদার দ্‌-চোখও জ্বলছে স্বার্থের আগ্‌নে। আগ্‌ন, আগ্‌ন, চারিদিকে আগ্‌ন। এরা প্রত্যেকে যা বলছে তা যুক্তিযুক্ত, সে-সবে নীতি আছে, আদর্শ আছে, কিন্তু আমার কোমল মন, স্নেহ-পিপাস্‌ অন্তর যে ওদের উত্তাপে প্‌ড়ে গেল। কোথাও আশ্রয় পেল না সে। চারিদিকে রৌরব।

অমা কিন্তু বলল না কিছ্‌।

চুপ করে রইল সারাক্ষণ।

রাত্রে ছ্‌নি এসে বলল—"চুপ করে আছ কেন! চল, খাবে চল।"

"আমি কিছ্‌ খাব না।"

ভালো খাটে ভালো বিছানায় বিনিদ্র হয়ে জেগে রইল সে।

তার পরদিন আর অমাকে পাওয়া গেল না।

একটা আশ্চর্য ঘটনা কিন্তু ঘটল।

বাড়ির সামনে যে প্‌কুরটা ছিল, দেখা গেল, সেই প্‌কুরটা পদ্মফুলে ভরে গেছে। অদ্ভুত পদ্ম। সাদা নয়, গোলাপী নয়, লাল নয়, নীল নয়। প্রত্যেকটি পদ্ম যেন অগ্নিকমল, প্রত্যেকটি পাপড়ি যেন আগ্‌নের শিখা।

রূপকথা এবং তারপর

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গোপাল দা,

সুখে দুঃখে আপনার সঙ্গে বহুদিন থেকে জড়িত হয়ে আছি। প্রয়োজনের সময় আপনি সর্বদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অনেক আবদার সহ্য করেছেন। এইসব স্মরণ করে আপনারই ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত আমার এই বইটি আপনার নামে উৎসর্গ করলাম সকৃতজ্ঞচিত্তে।

৪।৪।৭০

পি ৬৬, বি-ব্লক

লেক টাউন

কলিকাতা—৫৫

স্নেহার্থী

বলাই

"আকাশচুম্বী পর্বতশৃঙ্গের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়েছিল কালো মেয়েটি। তার পরনের বসন ছিন্নভিন্ন, কেশ আলুলায়িত, মুখ ক্ষতবিক্ষত। মেয়েটি কালো বটে কিন্তু অপরূপ সুন্দরী।

মেয়েটি সবিস্ময়ে ভাবছিল—পৃথিবীর খানিকটা এমনভাবে আকাশের দিকে পালিয়ে গেছে কেন? ওকেও কি কেউ ধর্ষণ করতে গিয়েছিল? আমিও কি ওখানে যেতে পারি না? সহসা একটি রূপবান যুবক এবং রূপসী যুবতী আবির্ভূত হ'ল তার সামনে। যুবকটির স্কন্ধে একটি সুদৃশ্য তূণীর, হস্তে ফুলধনু। মুখে স্মিত হাস্য। যুবকটি অভিবাদন ক'রে বলল, "অয়ি পলাতকা, জীবন-ধর্ম থেকে তুমি পালাতে পারবে না। যে যুবকটি তোমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ ক'রে নিষ্পেষিত করতে চেয়েছিল সে তোমার প্রেমিক। তুমি তাকে যদি ভালবাসতে পার তাহলেই আনন্দ পাবে। মিলনেই আনন্দ, তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? পালিয়ে কি নিস্তার পাবে?"

"নিস্তার আমাকে পেতেই হবে। পিশাচকে আমি ভালবাসতে পারব না।"

"ভালবাসলেই বুঝতে পারবে ও পিশাচ নয়, ও সুন্দর।"

"ভালবাসব বললেই কি ভালবাসা যায়—"

রূপসী যুবতীটি এতক্ষণে কোনও কথা বলেন নি।

এইবার মুচকি হেসে বললেন—"না, তা যায় না। আমাদের সাহায্য না পেলে কোনও লোকেরই মনে ভালবাসার ফুল ফোটে না। মহাদেবের মতো শ্মশানচারী সংসারবিরাগী নির্বিকার সন্ন্যাসীর বুকেও আমরা প্রেমের ফুল ফোটাতে পেরেছিলাম—"

"কে আপনারা—?"

"ও'র ওই পুষ্পধনু দেখেও বুঝতে পারছেন না কে আমরা—"

মদন ও রতিকে দেখে ভয় পেয়ে গেল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল সে। পাহাড়ের পথ দুর্গম। তবু মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তার হাত-পা রক্তাক্ত হল, ছিন্ন বসন আরও ছিন্ন, আরও বিস্রস্ত হল। কিন্তু সে থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে সে উঠতে লাগল।

রতি মদনকে বলল—আর দেরি করছ কেন, শরসন্ধান কর। সঙ্গে সঙ্গে মদন ফুলশর নিক্ষেপ করলেন একটি। সে শর আলোকরেখার মতো বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে প্রবেশ করল কালো মেয়েটির বুকে। রতি বললো—"এইবার চল আমরা অদৃশ্যভাবে ওকে অনুসরণ করি। ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।"

অদৃশ্য হ'য়ে গেল দু'জনেই।

মেয়েটি পিছু ফিরে দেখল একবার। কাউকে দেখতে পেল না। আবার উপরে উঠতে লাগল সে। মনে হল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তারপর লাফিয়ে পড়বে নীচে। আত্মহত্যা করবে। শেষ করে দেবে তার ঘৃণিত জীবন। কিছুদূর উঠে সে দেখতে পেল পাহাড়ের চূড়ায় ছোট একটি মন্দিরের মতো দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুদূর উঠে সে বুঝতে পারল মন্দিরই। দুগ্ধধবল সুন্দর মন্দির একটি। চূড়াই কিন্তু

দুস্তর। একটা পাথরের উপর বসে হাঁপাতে লাগল সে। সহসা তার নিরাশ হৃদয়ে যেন আশার সঞ্চার হ'ল। এমন কি সেই পিশাচের মুখটাও ভেসে উঠল তার মনে। লোকটির পেশীসমৃদ্ধ বাহু দুটির কথাও মনে পড়ল। উঃ, কি জোরেই চেপে ধরেছিল। 'না, না, ওর কথা আর ভাবব না, ও মানুষ নয়, পিশাচ, ভয়ঙ্কর পশু একটা'—মনে মনে এই কথা ব'লে উঠে দাঁড়াল সে। আবার উঠতে লাগল সেই মন্দিরের দিকে। প্রখর দ্বিপ্রহর। রোদের উত্তাপ ভয়ানক। অগ্নিবৃষ্টি করছেন সূর্য। তবু মেয়েটি উঠতে লাগল। তার কেমন যেমন আশা হল ওই মন্দিরে পেঁছিলেই তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু কি বিপদ, ওই পিশাচের মুখটা তার মনে ফুটে উঠছে কেন বার বার। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৌতুকহাস্যও চিকমিক করছে। ঘৃণায় পাথরের উপর মাথা কুটতে লাগল মেয়েটি। কপালটা রক্তাক্ত হয়ে গেল। আবার উঠতে লাগল সে। পা পুড়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, মনে হচ্ছে, যেন একটা অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। তবুও কিন্তু সে থামল না, চলতেই লাগল। ওই মন্দিরে তাকে পেঁছিতেই হবে। মন্দিরে যখন সে পেঁছিল তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অস্তমান সূর্যের রক্তকিরণে মন্দিরের দুগ্ধধবল কান্তি রূপান্তরিত হয়েছে। অগ্নির বর্ণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। মন্দিরের দ্বার খোলা, বস্তুতঃ মন্দিরের কোনও দ্বার নেই। মেয়েটি সেই দ্বারপ্রান্তে পেঁছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর দেখতে পেল বেদীর উপর সমাসীন মহাদেব মূর্তিটিকে। জীবন্ত মূর্তি। করজোড়ে দাঁড়িয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল মেয়েটি।

"কে তুমি—"

কোনও উত্তর দিতে পারলে না মেয়েটি।

তার আর্ত দৃষ্টি, কম্পিত কলেবর, যুক্তপাণিই যেন উত্তর রূপে মূর্ত হল মহাদেবের মনে।

"তোমাকে ওরা তাড়া করছে কেন জান ?"

মেয়েটি এবারও কোন উত্তর দিতে পারল না।

"করছে, কারণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তুমি ওদের আকর্ষণ করছ। তুমি চুম্বক, ওরা লোহা। মদন আর রতি তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সত্যিই কি তুমি দমন করতে চাও ?"

"আমি পারব কি !"

"তোমার পায়ের তলায় ওদের অবনত ক'রে দিতে আমি পারি। কিন্তু ওদের দমন করতে হবে তোমাকেই। আমি তোমাকে একটি খড়্গ দিচ্ছি সেই খড়্গাঘাতে ওদের ছিন্নভিন্ন করতে হবে। এই নাও—"

মহাদেব একটি খড়্গ দিলেন তার হাতে। সন্ধ্যার রক্তরাগে সে খড়্গ যেন অট্টহাস্য করে উঠল নীরবে।

"এই খড়্গ নিয়ে ওদের তুমি টুকরো টুকরো করতে পার কিন্তু তাতে ওরা মরবে না। মনসিজের নিবাস মনে, রতিও ওর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। ওকে মন থেকে তাড়াতে হবে। আমি মদনকে ভস্ম করেছিলাম কিন্তু সে মরে নি। রতির চক্রান্তে সে আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে। আমি তাকে মন থেকে দূর করেছি বলেই সে আমাকে আর

বিরক্ত করতে পারে না। তুমি ওদের এই খড়্গ দিয়ে বধ কর, কিন্তু মন থেকেও ওদের বিদূরিত করতে হবে, তা না হলে শান্তি পাবে না—"

"ওরা কোথায়—"

মহাদেব সামনের দিকে চেয়ে আদেশ করলেন—"তোমরা এর পায়ের তলায় অবিলম্বে এসে শুয়ে পড়। তা না হলে—" মহাদেবের তৃতীয় নয়ন রোষদীপ্ত হয়ে উঠল।

অবিলম্বে রতি ও মদন এসে শুয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ের তলায়। তাদের ভয় হল আবার না ভস্ম করে দেন।

"তুমি ওদের উপর উঠে দাঁড়াও—"

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, তাদের দেহের উপর পা দিয়ে।

মহাদেব বলতে লাগলেন, "ওদের বধ করবার আগে ভেবে দেখ ওদের তুমি মন থেকে দূর করতে পারবে কি না। ভেবে দেখ যে পিশাচ তোমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল তার সম্বন্ধে তোমার কোন দুর্বলতা আছে কি না।"

এর পর মেয়েটি যা করল তা অপ্রত্যাশিত।

হঠাৎ সে ব'লে উঠল, "না আমি পারি নি। ওই পিশাচ ক্রমশঃ আমার চোখে সুন্দর হ'য়ে উঠছে। ভয়ংকর কিন্তু সুন্দর। আমার এ কি হল—না আমি স্বহস্তে এর প্রতিকার করব।" সহসা খড়্গ দিয়ে নিজের মুণ্ডটাই কেটে ফেলল সে। মুণ্ডটা কিন্তু মাটিতে পড়ল না, মেয়েটিও পড়ল না। মেয়েটি হাতে মুণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর সেই দণ্ডায়মান কবন্ধ থেকে রক্তের ধারা উৎসাকারে পড়তে লাগল সেই ছিন্নমুণ্ডের মুখে। মনে হ'ল মুণ্ডটি সাগ্রহে যেন সেই রক্তপান করছে।

'মহাদেব নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর প্রণাম করলেন।'

এই পর্যন্ত ব'লে কিঙ্কিণীর হাতটি ছেড়ে দিলেন ভদ্র লোক। উল্লিখিত গল্পটি তিনি কিঙ্কিণীর হাত দেখেই বলছিলেন। যতক্ষণ বলছিলেন ততক্ষণ কিঙ্কিণীর প্রসারিত করতলের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর।

কিঙ্কিণী মেয়েটিও কালো। কিন্তু অপরূপ রূপসী সে। মহাভারতে ব্যাসদেব কৃষ্ণার যে রূপ কল্পনা করেছিলেন সেই রূপ যেন ঝল-মল করছে মেয়েটির আলুলায়িত কুন্তলে, আয়ত নয়নে, স্ফুরিত অধরে, পীবর বক্ষে। গল্পটা শুনে একটা অপূর্ব হাসি বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠল তার চোখে মুখে। তার গায়ের ডুরে শাড়িটাও যেন লুটোপুটি খেতে লাগল তার সর্বাঙ্গে। হু হু ক'রে ছুটে চলেছিল গাড়িটা অন্ধকার ভেদ ক'রে, হু হু করে হাওয়া ঢুকছিল খোলা জানালা দিয়ে। ফার্স্ট ক্লাস গাড়ির একটি কামরায় ব'সে ছিল তারা। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। ভদ্রলোক মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে কৌতুকভরে দেখছিলেন তার বাতাসে-ব্যতিব্যস্ত ডুরে শাড়িটার দিকে। শাড়ির ডুরেগুলো চওড়া এবং সবুজ রঙের। তাঁর মনে হচ্ছিল কতকগুলো লাউডগা সাপ যেন কিলবিল করছে মেয়েটিকে ঘিরে।

কিঙ্কিণী বলল—"আপনি আমার হাত দেখে যা বললেন তা যেন একটা পৌরাণিক গল্প। ওসব কি আমার হাতে লেখা ছিল? আপনি যখন আমার হাত দেখতে চাইলেন আমি ভাবলাম বুঝি আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন। কিন্তু আপনি এ কি বললেন—"

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তার শাড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন।

"আমার সম্বন্ধে কিছ্ বলবেন না ?"

"না। প্রত্যেকেরই জীবন এক। জন্ম হয়, কিছ্দিন ছটফট করে, তারপর মারা যায়। সকলেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কর্মফল অনুসারে সুখ দুঃখের চেহারাটা হয়তো আলাদা আলাদা। জুতোর দোকানে নানারকমের জুতো থাকে, কিন্তু আসলে সবাই চামড়ার তৈরি। কেউ শু, কেউ পাম্ শু, কেউ বুট, কেউ চটি, কেউ স্যাণ্ডাল—রংও নানারকম কিন্তু সবাই জুতো, সবাই চামড়া। তোমার জীবনের বিশেষ ছাঁচটা কি তা আমি দেখতে পাই নি। তোমার হাত দেখে যে গল্পটা আমার মনে জাগল তাই বললাম তোমাকে। এক একটা হাত দেখে ওই রকম গল্প জাগে আমার মনে। সবার হাত দেখে জাগে না। তোমার হাত আমার মনে ওই ছবিটা জাগিয়ে দিলে। কেন জানি না।"

"জাগিয়ে দিলে মানে ? ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"যে গল্পটা তোমায় বললাম তার ছবিটা আপনাআপনি ফুটে উঠল আমার মানসপটে। যা দেখলাম তাই বর্ণনা ক'রে গেলাম। এর সঙ্গে তোমার জীবনের কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা আমি জানি না। তোমার কোন পরিচয়ই তো জানি না। তুমি কে হঠাৎ আমার রিজার্ভড কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে পড়লে কেন রাত দুপুরে তাও তো বুঝতে পারছি না।"

"কোথাও জায়গা পাচ্ছিলাম না। এই গাড়ির কপাটটা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলাম খালি, তাই ঢুকে পড়লাম। এটা যে রিজার্ভড তা বুঝতে পারি নি। সবটাই আপনি রিজার্ভ করেছেন ?"

"হ্যাঁ। আমি ট্রেনে যখন কোথাও যাই, পুরো একটা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করি।"

"আপনার একার জন্যে সমস্ত কম্পার্টমেণ্ট দরকার ?"

"আমার সঙ্গে আরও অনেকে থাকে—"

"কই, আর কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না—"

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তার শাড়ির গায়ে লাউডগা সাপের খেলা দেখতে লাগলেন সকৌতুকে।

"তোমার পরিচয় তো দিলে না। কে তুমি, নাম কি—"

"আমার ডাক নাম কিনি—পুরো নাম কিঙ্কিণী। এর বেশী পরিচয় আর কিছু বলব না, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি পরের স্টেশনে নেবে যাব। কিন্তু তার আগে আর দুটো প্রশ্ন করব আপনাকে। আপনি হঠাৎ আমার হাত দেখতে চাইলেন কেন।—"

"আমি গল্প ভালবাসি। কারো কারো হাত দেখলে মনে গল্প জেগে ওঠে। বিশেষতঃ মেয়েদের হাত দেখলে। তোমার হাত একটা অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছে আমাকে। গল্পটা তুমিও তো শুনলে। অদ্ভুত নয় ?"

"খুবই অদ্ভুত। কিন্তু ওর মানে কি বুঝতে পারলাম না। ছিন্নমস্তার নাম শুনেছি। উনি দশমহাবিদ্যার একজন, কিন্তু আমার হাতের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক—ছিন্নমস্তার মানেই বা কি—"

"তোমার হাত দেখে ছিন্নমস্তার কথা কেন মনে পড়ল তা বলতে পারি না। তন্ত্রে

ছিন্নমস্তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, আছে নিশ্চয়ই কোথাও, তা-ও আমি পড়ি নি। কিন্তু তবু আমি ওর একটা ব্যাখ্যা জানি—"

আবার চুপ ক'রে গেলেন ভদ্রলোক এবং রহস্যময়ভাবে চেয়ে রইলেন বাইরের অন্ধকারের দিকে।

"কি রকম ব্যাখ্যা—"

তবু ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না কোন। অন্ধকারের দিকেই চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কিঙ্কিণীর দিকে ফিরে বললেন—"তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"করেছি কিছু—সামান্য।"

"সামান্য মানে? স্কুল কলেজে পড় নি?"

পড়েছি। আমি ডবল এম. এ.—জার্মানি, ফরাসী আর ইতালি ভাষা জানি। ছবি আঁকতে পারি, গান গাইতে পারি—"

"তাহলে আমার ছিন্নমস্তার ব্যাখ্যাটা হয়তো বুঝতে পারবে। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি বর্তমান বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতাই ছিন্নমস্তা। বিজ্ঞানের নানা রকম আবিষ্কার দিয়ে সে যে খড়্গ তৈরী করেছে সে খড়্গ দিয়ে নিজেরই মাথা সে নিজে কেটেছে। তার কবন্ধ থেকে উৎসারিত রক্ত তারই মুখে পড়ছে—সে কাম আর রতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের দমন করতে পারে নি—এই সভ্যতাই ছিন্নমস্তা। জানি না কেন, তোমার হাতে দেখতে পেলাম।"

আবার তার শাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হতে লাগল ওই সবুজ ডোরাগুলো সত্যিই যদি লাউডগা সাপ হ'ত তাহলে ওগুলোকে ধ'রে ফেলতুম।

আপনি যে বললেন—"আপনি এত বড় কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করেছেন কারণ আপনার সঙ্গে অনেক লোক থাকে। কিন্তু কই, আর কাউকে তো দেখছি না—"

"কেন, তুমি তো আছ। আরও আসবে।"

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেম একটা ধূর্ত শিকারীর ভাব ফুটে উঠল।

"আমি তো পরের স্টেশনে নেমে যাব।"

"যদি যাও, আপত্তি করব না। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যাবে না। আশা করছি আরও দু'একজন আসবে।"

আবার সেই ধূর্ত দীপ্তিটা ফুটে উঠল তাঁর চোখে।

"আমি পরের স্টেশনেই নেমে যাব।"

"যেও।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "তুমি তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বললে না? তাহলে তো আমার সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী দেখছি তোমার। আমি যখন আসি তখন জনকয়েক পলাতক পলাতকা জুটে যায় আমার সঙ্গে। তোমাদের মতো ঘর-পালানো অনেক লোক আমার রাজত্বে গিয়ে বাস করছে। সুখেই আছে তারা—"

"আপনার রাজত্বে? আপনি রাজা নাকি—!"

"আমাকে কোনও সরকার রাজা উপাধি দেয় নি। শাস্ত্রে রাজার যে সব সদগুণ থাকা উচিত তা-ও আমার আছে কি না জানি না। কিন্তু যে বিস্তৃত অঞ্চলে আমি থাকি সেটা আমারই রাজত্ব। আমিই সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি।"

"কোথায় সেটা—"

"তা বলব না। সেখানে যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি। সেখানে গেলে আর আসতে চাইবে না। যারা সংসার ছেড়ে পালায় তারা হয় বিদ্রোহী না হয় দুঃখী। যারা দুঃখী তারাও একরকম বিদ্রোহী। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ করবার শক্তি ইচ্ছে বা সাহস নেই। তারা দুঃখটাকেই মেনে নেয়, অনেকে আবার সেটাকে উপভোগও করে, কেউ কেউ তার থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। আমার রাজ্যে বক এই রকম একটি লোক। যদি যাও আলাপ করে সুখী হবে।"

ঘচ্ ক'রে গাড়িটা থেমে গেল।

"স্টেশন নাকি—"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল কিঙ্কিণী।

"না এ তো স্টেশন নয়। একটা মাঠের মধ্যে গাড়ি থেমেছে—"

খুব জোরে হুইস্‌ল দিতে লাগল ইঞ্জিন।

তারপর জানালায় দেখা গেল একটা মুখ। উৎকট চোখের দৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মনে হল জানলা ধ'রে ঝুলছে লোকটা।

"এখানে জায়গা আছে?"

ভদ্রলোক বললেন, "আছে—"

"কপাটটা খুলে দিন তাহলে"

"কপাট খোলা আছে। ঠেলুন"

কপাট ঠেলে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি বিরাটকায় ব্যক্তি। মাথার চুল লম্বা লম্বা, গোঁফ-দাড়িও আছে, চোখের ভ্রূ-দুটিও বেশ চওড়া এবং রোমশ। কিন্তু সবই কেমন যেন অবিন্যস্ত। পুরু ঠোঁট, চোখ দুটি বড়, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন উৎকণ্ঠিত, ভীত-চকিত। গায়ে একটা ছেঁড়া ফতুয়া, পরনে ময়লা লুঙ্গি, খালি পা। কিন্তু পাটা ভদ্রলোকের পা নয়।

ভদ্রলোকের অনেকগুলি প্যাকিং কেস, কয়েকটি তোরঙ্গ এবং কয়েকটি ঝাঁপি উপর্যুপরি সাজানো ছিল যে দিকটায়, লোকটি সেদিক ঘেঁষে বসলেন। একটা প্যাকিং কেসে ঠেস দিয়েই বসলেন।

"অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছেন তো।"

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল।

"কি ক'রে বুঝলেন আপনি?"

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না।

"খাবেন কিছু? ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়।"

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি আরও বিস্মিত হল। বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ভয়ের ভাবও ফুটে উঠল সে দৃষ্টিতে। তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। ভদ্রলোক হেঁট হ'য়ে বেঞ্চির তলা থেকে নিজের টিফিন কেরিয়ারটি বার করে এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"ধরুন। সব কৌটোগুলোতে মাংস আছে। হরিণের মাংস। আপনি তো ভালবাসেন—নিন, ধরুন।"

আগন্তুক টিফিন কেরিয়ারটি নিলেন। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে ভয় আর বিস্ময় আরও যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শেষকালে বললেন, "আপনি কে বলুন তো—"

ভদ্রলোকের চোখে সেই ধূর্ত দৃষ্টি আবার চকিতের মধ্যে ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি উত্তর দিলেন—"আমিও আপনার মতো শিকারী।"

"ও, তাই নাকি—"

ভদ্রলোক টিফিন কেরিয়ার খুলে খেতে আরম্ভ করে ছিলেন। গাঁউ গাঁউ করে খাচ্ছিলেন। কড়মড় করে চিবুচ্ছিলেন হাড়গুলো। অবাক হয়ে চেয়ে ছিল কিঙ্কিণী। সে অবাক হয়ে ভাবছিল—এই ভদ্রলোক যাদুকর, না জ্যোতিষী, না আরও কিছু। এই জংলী শিকারীটা যে আসবে তা কি উনি জানতেন? ও যে ক্ষুধিত, ও যে হরিণের মাংস ভালবাসে এ-ও কি জানতেন? ওর জন্যে টিফিন কেরিয়ারে হরিণের মাংস নিয়ে এসেছিলেন—আশ্চর্য তো!

ভদ্রলোক তার দিকে না চেয়ে নিজের মনেই যেন বললেন, "কিছুই আশ্চর্য নয়!"

আরও অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী।

জংলী শিকারীটা স্তূপীকৃত প্যাকিং কেসে ঠেস দিয়ে বসে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি লাফিয়ে সরে এলেন।

"এগুলোর ভিতর কি আছে বলুন তো! খসখস আওয়াজ হচ্ছে—"

"ওগুলোতে ঠেস দিয়ে বসবেন না। স'রে বসুন।"

আগন্তুক সরে বসলেন।

"কি আছে ওগুলোর ভিতর?"

কোনও উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক। কিঙ্কিণীর মনে হল একটা চাপা হাসি যেন ফুটে উঠেছে তাঁর সারা মুখে। তিনি হঠাৎ পকেট থেকে ছোট একটা ব্যাগ বার করলেন। তার থেকে বার করলেন একটা 'নেল কাটার'। নিবিষ্ট মনে নখ কাটতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ কোনও কথাই বললেন না। আগন্তুক লোকটি খেয়ে যেতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে। হাড়-চিবোনর কড়মড় শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। হঠাৎ ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল।

এবার গাড়িটা একটা স্টেশনে এসে ঢুকল।

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে একটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

খাওয়া শেষ করে আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন—"খাওয়ার জল আছে এখানে কোথাও?"

কিঙ্কিণীর দিকে চেয়েই প্রশ্ন করলেন তিনি।

ভদ্রলোক জানালার বাইরে মুখটা বাড়িয়ে ছিলেন। মুখটা টেনে নিলেন তিনি ভিতরে।

"আপনার পেট ভরেছে কি? পংখী আরও খাবার আনছে। এখানে বেশ ভালো খাবার পাওয়া যায়। নোনতা মিষ্টি দুইই। এই যে পংখী এসে গেছে—"

পংখীকে দেখে সবাই চমকৃত হয়ে গেলেন। অপরূপ আবির্ভাব একটি। একটি কাকাতুয়া যেন মনুষ্য-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। নাকটি ঠিক কাকাতুয়ার ঠোঁটের মতো। মুখটিও প্রায় সেই রকম। মাথায় যে রেশমের টুপিটা পরে আছে সেটির উপর কাকাতুয়ার একটি ঝুঁটি। হাত দুটি ছোট ছোট, কবজি পর্যন্ত শাদা ভেলভেট দিয়ে ঢাকা। জামাও শাদা ভেলভেটের। পিঠের খানিকটা কেবল ঈষৎ লাল আর সে অংশটা পিছনের দিকে এমনভাবে নেমে গেছে যে মনে হচ্ছে কাকাতুয়া ডানা মুড়ে

আছে। ডানার ডগার দিকে লাল রংটা আরও ঘোরালো। পরনে হল্দ রংয়ের 'চুস্ত' পায়জামা আর পায়ে জরিদার নাগরা জ্তো। পায়ে ঘ্ঙ্র পরা। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম করে পংখী ঢুকল এসে। তার পিছনে এল খাবারওলা, তার হাতে প্রকাণ্ড একঝুড়ি খাবার। পংখীর গলার স্বরও ঠিক পাখির মতো। সে যখন কথা বলল মনে হল একটা কাকাত্য়াই ব্ঝি কথা বলছে।

"ল্চি, কচুরি, শিঙাড়া, আল্র দম, সেওভাজা, রসগোল্লা, সন্দেশ, বাল্শাই—সব এনেছি। আরও কিছ্ চাই কি—"

"না। আমার খাবার পেয়েছ ?"

"আমি এখানে দ্ধ পেলাম না। বেলও পাওয়া গেল না। তবে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দেখলাম দ্ধ আর বেল নিয়ে কাকে যেন খ্ঁজছে।"

"বাস তাহলে আর তোমায় ভাবতে হবে না। তারা আমাকেই খ্ঁজছে—"

হঠাৎ কিঙ্কিণীর দিকে ফিরে বললেন—"ত্মি কি এইখানে নেবে যেতে চাও ?"

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্ত্ত ছিল না কিঙ্কিণী।

বলল—"আপনারা কোথায় যাবেন ?"

"আমরা হিমালয়ে উঠব। এ গাড়িটা কালকা পর্যন্ত যাবে। সেখানে আমাদের মোটর আসবে। সেই মোটরই যাবে হিমালয়ে আমার রাজত্বে। তুমি যাবে কি আমাদের সঙ্গে ?"

কিঙ্কিণী সহসা কোন জবাব দিতে পারল না। একবার মনে হল, এই অজ্ঞাতকুলশীল অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে যাওয়া কি সমীচীন হবে ? আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তাহলে যাবই বা কোথায় ? অতীত জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েই তো চলে এসেছি বাড়ি থেকে। এ ভদ্রলোক যদিও অদ্ভুত, যদিও এঁর আচরণে কেমন যেন একটা অলৌকিক ভুতুড়ে ভাব আছে, কিন্তু ইনি যে শক্তিমান লোক তাতে সন্দেহ নেই। এঁর অদ্ভুত আচরণে কেমন যেন একটা দ্নির্বার আকর্ষণ অন্ভব করছি। মনে হচ্ছে যে কোনও সময়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এমন একটা কিছ্ উনি করে ফেলবেন যা আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাতে আমার ভাল হবে।

কিঙ্কিণীর চিন্তাধারাকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"যদি এখনই না নাবতে চাও নেবো না। পরে ভেবে চিন্তে কি করবে তা ঠিক কোরো। তাড়াতাড়ি কিছ্ নেই। কিছ্ খাও এইবার—'

পংখী হেঁট হয়ে একটি বেঞ্চির তলা থেকে কাঠের বাক্স বার করল একটি। তার ভেতর থেকে বার করল কয়েকটি চীনে প্লেট।

কিঙ্কিণী দেখে ব্ঝতে পারল প্লেটগ্লি সাধারণ প্লেট নয়। তাদের বাড়িতেও ওরকম দামী প্লেট ছিল। সম্মানিত অতিথিরা এলে খেতে দেওয়া হ'ত। অন্য সময় বন্ধ থাকত আলমারিতে।

কিঙ্কিণীর ক্ষিধে পেয়েছিল বেশ। তাই পংখী যখন দ্টি প্লেটে ভ'রে নানারকম খাবার সাজিয়ে তার সামনে ধ'রে দিলে তখন সে আপত্তি করল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটিও আরও কিছ্ খাবার খেলেন। তারপর বড় একটি মীনা-করা র্পোর ভৃঙ্গার থেকে র্পোর গ্লাসে গ্লাসে স্বাসিত জল পরিবেশন করতে লাগল পংখী।

খাওয়া শেষ হলে পংখী নীরবে নেমে গেল।

তখন হঠাৎ সেই আগন্তুক লোকটি ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে, কি নাম আপনার—"

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ স্মিতমুখে। তারপর বললেন, "আমি কে, তা আমি নিজেও জানি না। আমার নামও নেই কোনও। যে কোনও নামে ডাকলেই আমি সাড়া দেব।"

"কি রকম?"

"ওই রকমই। আপনার নামটা কি তাই বলুন।"

"যদি না বলি—"

"কিছু ক্ষতি নেই। দমন দেওকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি।"

আগন্তুকের মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন—"তুমি ডাকাতি করতে যাবার আগে মহোলি পাহাড়ের কালী মন্দিরে যখন পুজো দিতে যেতে তখন আমিও সে মন্দিরের ভিতর থাকতাম। তোমার পুজোর আয়োজন আমিই করে দিতাম, আমিই পুরোহিত ছিলাম সে মন্দিরের। আমি—"

"আপনিই কি মহাদেব মিশ্র?"

"হ্যাঁ, ওই নামেই তখন ডাকত আমাকে সবাই। আমার চেহারাও তখন অন্য রকম ছিল—"

দমন দেও সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "তাহলে আপনি বদলে গেলেন কি করে!"

"কালী কৃপা করলে সবই সম্ভব। কালীর কাছে আমি নিজের জন্যও কিছু চাই নি। তাই তিনি আমাকে সব দিয়েছেন। তুমি কালীকে আরাধনা করতে স্বার্থের জন্য। তাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে জেলে যেতে হল। পরশু রাত্রে তুমি যখন জেলের প্রহরীকে খুন ক'রে পালালে তখনই আমি টের পেয়েছিলাম, তখনই আমি বুঝেছিলাম আমার কাছে না এলে মহাবিপদে পড়বে তুমি। তাই তোমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম। আমি জানতাম তুমি সে ফাঁদে ধরা পড়বে। অবশ্য ধরা পড়েছ ব'লে তোমাকে যে ধরেই রাখব আমার এমন কোনও জবরদস্তি নেই। ইচ্ছে করলে তুমি চলে যেতেও পার—"

ঠিক এই সময়ে বকুল ফুলের গন্ধে সুবাসিত হয়ে উঠল কামরাটা। দ্বার ঠেলে প্রবেশ করলেন একটি যুবক এবং একটি যুবতী। দুজনেরই চোখ-ধাঁ-ধানো রূপ। একজনের হাতে একটি বড় বেল আর একজনের হাতে একটি বড় রুপোর ঘটিতে দুধ।

যুবকটি বললেন, "এই কম্পার্টমেণ্টে ধূর্জটি সেন ব'লে কেউ আছেন কি"

ভদ্রলোক হাসিমুখে চাইলেন তাঁর দিকে।

"তাঁকে কি দরকার তোমাদের"

"আমরা দুজনেই রোজ স্বপ্ন দেখছি যে এই গাড়িতে ধূর্জটি সেন ব'লে একটি লোক যাবেন, তাঁকে যদি একটি পাকা বেল আর এক ঘটি খাঁটি দুধ খাওয়াতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। আমরা মহা বিপদে পড়েছি। তাই আমরা ধূর্জটি সেনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আপনাদের মধ্যে কেউ কি ধূর্জটি সেন?

"হ্যাঁ আমিই। দাও আমাকে বেল আর দুধ। বস তোমরা—"

দুধের ঘটিটা তুলে ঢক্‌ঢক্ ক'রে সব দুধটা খেয়ে ফেললেন তিনি।

"বাঃ, চমৎকার দুধ। বেলটা কাল সকালে খাব—"

বেঞ্চির নীচে রেখে দিলেন বেলটাকে।

যুবকটি একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন মনে হল। অর্থাৎ এই লোকটিই ধুর্জটি সেন কি না তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবার আগেই দুধ আর বেল তো বেহাত হয়ে গেল। যদি ইনি—

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "সন্দেহ হচ্ছে? আমি কিন্তু তোমাদের নাম জানি—তুমি তো রত্ন আর ইনি তো ঝিলিক? তাই না?"

মেয়েটি সবিস্ময়ে তার অপূর্ব ভুরু দুটি তুলে ব'লে উঠলেন, "কি আশ্চর্য। কালই তো রত্ন আমাকে ঝিলিক নামটা দিয়েছে—আপনি জানলেন কি করে! আর তো কেউ জানে না।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, "তোমার আরও অনেক নাম আছে তা তুমিও জান না?"

"আমার আর একটা নাম তো প্রীতি—"

"আরও নাম আছে তোমার। রাগলতা, মায়াবতী, শুভঙ্গী এগুলোও তোমার নাম। আরও অনেক নাম আছে—কিন্তু সেগুলো এত লোকের সামনে বললে তুমি লজ্জা পাবে তাই বলছি না।"

"আপনি কি করে জানলেন এসব?"

"সব কথা কি বলা যায়? বস তোমরা—"

উভয়েই বসে পড়লেন একটা খালি বেঞ্চিতে।

জেল-পলাতক ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছিল। হাতের মুঠো দুটো তিনি খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন।

"ফাঁদ? ফাঁদ পেতে আমায় ধরেছেন? কিসের ফাঁদ? জেল থেকে যে পালাতে পেরেছে তাকে কি রকম ফাঁদে ধরেছেন আপনি? কই, কোন ফাঁদ তো আমার চোখে পড়ল না।"

"আমি যে ফাঁদ পাতি তা দৃশ্য নয়, অদৃশ্য। তা আমার খেয়ালখুশী ইচ্ছার ফাঁদ। আমি যখন আমার রাজত্ব ছেড়ে আসি তখন এই ফাঁদ পেতে দিই চারিদিকে। অনেকেই ধরা পড়ে। যারা আমার সঙ্গে যেতে চায় তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাই। যারা যেতে চায় না তাদের ছেড়ে দিই। আমি কারো কাছে কিছু চাইও না। শুধু বলি তোমরা যদি আমার সঙ্গে আমার রাজত্বে গিয়ে থাক আমি আনন্দ পাব। আনন্দটাই উদ্দেশ্য। কিনির হাত দেখে একটা গল্প জেগে উঠল মনে, ভারি আনন্দ পেলাম। ওই আনন্দটুকুই আমার লাভ।—"

কিঙ্কিণী উৎকর্ণ হয়ে উঠল একথা শুনে। বলে উঠল—"আপনি স্পষ্ট ক'রে কিছু বলছেন না কেন? আমাদের সবাইকে এ রকম একটা অদ্ভুত ধাঁধার মধ্যে ফেলেই বা রেখেছেন কেন?"

"এর চেয়ে স্পষ্ট আর যে করতে পারি না। 'স্পষ্ট' কথার মানেটা কি বলতে পার? যা স্পষ্ট তার পিছনেও অস্পষ্টতার একটা কুয়াশা থাকে। আর সে কুয়াশার মধ্যে যা দেখা যায় তা দৃশ্য বটে কিন্তু স্পষ্ট নয়। তোমরা যারা আজ আমার ফাঁদে ধরা পড়েছ তাদের নিয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোনও নাটক জমে উঠবে ওই অস্পষ্ট

কুয়াশায় তার আভাস পাচ্ছি কিন্তু সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। একটা কথা শুধু জানতে চাই—স্পষ্ট করেই বল সেটা—তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে ?"

"কোথায় নিয়ে যাবেন আমাদের"—কিঙ্কিণীই প্রশ্ন করল আবার।

"জায়গাটার নাম বলব না। কারণ আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু মনোরম জায়গা। হিমালয়ের উপর। গেলে আর আসতে চাইবে না বলেই মনে হয়—"

"সেখানে গিয়ে আমাদের লাভ ?"

"লাভ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, যা এখানে তোমরা কেউ কখনও পাও নি। ওখানে গেলে সে স্বাধীনতা তোমরা পাবে। এখানে স্বেচ্ছাচারী হবার স্বাধীনতাও নেই। যে ডাকাত হতে চায় তাকে জেলে পুরে জোর ক'রে আটকে রাখবার ব্যবস্থা আছে এখানে, কিন্তু তাতে কারও কোনও লাভ হয় নি। ডাকাতরাও খুশী হয় নি, সমাজও নিরাপদ হয় নি। দমন দেওকে জেলে পুরে কি লাভ হয়েছে ? ও একজন লোককে খুন ক'রে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ আবার যদি ওকে ধরতে পারে আবার হয়তো জেলে পুরে রাখবে, কিম্বা ফাঁসি দেবে। কিন্তু তাতে কি ওর সংশোধন হবে ? ওকে নিজের পথে চলতে দিতে হবে, ও ডাকাতি ক'রে ক'রে নিজেই দেখুক এর শেষ কোথায়, এতে সুখ আছে কি না। উপদেশ দিয়ে বা জেলে পুরে রেখে ওকে সংশোধন করা যাবে না। আমার রাজত্বে কেউ ওকে ডাকাতি করতে বাধা দেবে না, লুট করবার মতো অনেক সম্পত্তি সেখানে আছে। মানুষ ওকে বাধা দেবে না বটে, কিন্তু প্রকৃতি দেবে, ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প সাপ বাঘ সিংহকে ঠেকানো যাবে না। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দমন দেও যদি ডাকাতি করতে পারে করুক—কেউ আপত্তি করবে না। কি দমন দেও, যাবে ?"

দমন দেও রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল কথাগুলো।

বলল, "যাব। মহাদেব মিশ্র যদি আমাকে নরকেও নিয়ে যায় যাব। কিন্তু সেখানে খাব কোথায় ? রোজগারের কোনও উপায় আছে কি ?"

"সব আছে। তুমি যেমন ভাবে থাকতে চাইবে তেমনিভাবে থাকতে পাবে। এমন কি যদি বিয়েও করতে চাও বউ জুটে যাবে একটা।"

'যদি ভালো না লাগে—"

"তাহলেই মুশকিল। সেখান থেকে চ'লে আসা শক্ত। তোমার চ'লে আসবার আগ্রহ যদি খুব প্রবল হয় তাহলেই হয়তো হেলিকপ্টার এসে তুলে নিয়ে যাবে তোমাকে। আমরা পাহাড়ে কিছুদূর মোটরে উঠব তারপর হেলিকপ্টারে করেই যাব সেখানে। বিদেশ থেকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া ক'রে আনা হয়েছে আমাদের জন্য। সে হেলিকপ্টার আমাদের নাবিয়ে দিয়েই চ'লে যাবে। আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে তপস্যা করতে হবে।"

কিঙ্কিণী প্রশ্ন করল এবার।

"সেখানে ফোন নেই ? টেলিগ্রাফ নেই ? পোস্টাফিস নেই ?"

"না। আধুনিক সভ্যতার কিছু নেই সেখানে। সে দেশে রাত্রে আলো জ্বলে না। সূর্য চন্দ্রই সে দেশের আলো। বাইরের সভ্য জগতের সঙ্গে সে দেশের কোনও যোগাযোগ নেই।"

"তার মানে ছিন্নমস্তা-সভ্যতার সংস্রব আপনারা ত্যাগ করেছেন ?"

"ছিন্নমস্তা যে সতীরই আর একটা রূপ, শক্তিরই আর একটা বিগ্রহ, তাঁকে কি ত্যাগ করা যায় সহজে? তবে আমার রাজত্বে ছিন্নমস্তার মন্দিরটি খালি আছে এখনও। ন'জন এসেছেন, এমন কি ধূমাবতী পর্যন্ত, কিন্তু ছিন্নমস্তা আসেন নি এখনও। কে জানে হয়তো একদিন আসবেন। কিন্তু ছিন্নমস্তা আর ছিন্নমস্তা-সভ্যতা এক নয়। প্রথমটা পৌরাণিক সাধকদের উপলব্ধি আর দ্বিতীয়টা আমার তৈরি রূপক—হয়তো বাজে রূপক।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন তিনি।

"আধুনিক সভ্যতা থেকে নির্বাসিত হ'য়ে কেউ কি থাকতে পারে আজকাল?"

কোনও উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক, মৃদু মৃদু হাসতেই লাগলেন। রত্ন আর ঝিলিক বলল—"আমরা এখানেই নেবে যাচ্ছি। যে বিপদে পড়েছিলাম হঠাৎ সেটা কেটে গেল। মিলিয়ে গেল কুয়াশার মতো। আশ্চর্য!"

ঝিলিক হঠাৎ রত্নের হাত দুটি ধ'রে বললে—"আমাকে ক্ষমা কর তুমি, আমি তোমাকেই সন্দেহ করেছিলাম। এখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম সব। কি ক'রে যে পারলাম তা-ও কিন্তু বুঝতে পারছি না। সব কিন্তু স্বচ্ছ হয়ে গেল।"

হঠাৎ দু'জনেই প্রণত হল ভদ্রলোকের পায়ের কাছে। মৃদু মৃদু হাসতেই লাগলেন ভদ্রলোক।

বললেন, "স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে অনেক স্ত্রী পুরুষ আসবে যাবে, তাদের কেউ কেউ হয়তো সমস্যারও সৃষ্টি করবে। কিন্তু তোমরা নিজেরা যদি ঠিক থাক তাহলে ভাবনা নেই। তোমাদের নিমন্ত্রণ করছি—যদি আমার রাজত্বে আস খুব খুশী হব।"

"পরে আসব। আজ অন্যত্র একটু কাজ আছে—"

"বেশ, তাই এস। তোমাদের তো সর্বত্র অবাধ গতি। যানবাহনের প্রয়োজনও নেই"

দুজনেরই মুখে স্মিত হাস্য ফুটে উঠল। আর কিছু না বলে নেবে গেল তারা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছেড়ে দিলে।

কিঙ্কিণীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কই, তুমি তো নাবলে না? তুমি যে বলেছিলে নেবে যাব?"

কিঙ্কিণী চুপ করে রইল। তার চোখ দুটো বাঘিনীর চোখের মতো জ্বলতে লাগল। নির্নিমেষে চেয়ে রইল সে ভদ্রলোকের দিকে। তারপর হঠাৎ বলল—"আপনি ভাবছেন আমি নেবে যেতে পারি না?"

ভদ্রলোকের চোখে ধূর্ত শিকারীর ভাবটা আবার ফুটে উঠল। বললেন—"তুমি শক্তির প্রতীক, তুমি কি না পার? আসল কথা হচ্ছে তুমি কি চাইছ তা তুমি নিজেই জান না এই মুহূর্তে, সেটা মহাতমসায় লীন হয়ে আছে, সেই মহাতমসার তামসী তো তুমিই। কোথায় কখন তোমার ইচ্ছার আলো জ্বলে উঠবে তা তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি জানি তা একদিন জ্বলবেই। ইচ্ছাময়ী নিজের ইচ্ছা বেশী দিন চেপে রাখতে পারবেন না।"

কিঙ্কিণীর চোখ দুটো ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলে উঠল।—"আমার আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন? আপনি পুরাকালের সেই যাদুকর দলের একজন যারা ম্যাজিক দেখিয়ে লোকদের ভোলাতো, যারা শেষে ভাঁওতার জোরে পুরোহিত হত, রাজা হত।

আপনি আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন সেই দেশে যেখানে সভ্যতার আলো নেই, কেন চাইছেন কি আপনার মতলব তা আমি বুঝতে পারছি না, ভেবেছিলাম আপনি খুলে বলবেন, কিন্তু আপনি ক্রমাগতই হেঁয়ালি ক'রে যাচ্ছেন। আমি পরের স্টেশনেই নেবে যাব।"

"বেশ যেও, আমি বাধা দেব না।"

"আমি দেব"—বিরাটকায় দমন দেও ব'লে উঠল হঠাৎ।

কিঙ্কিণী দেখল বিস্ফারিত-চক্ষে সে চেয়ে আছে তার দিকে। বিদ্যুৎস্ফুরিত হল ব্যাঘ্রিনীর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে।

"আমি চলন্ত ট্রেন থেকেই নেমে যাচ্ছি—"

গাড়ির কপাট খুলে কিঙ্কিণী যে-ই পা বাড়িয়েছে অমনি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দমন দেও। তাকে হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এল গাড়ির ভিতর। তারপর কোণের দিকে তাকে বসিয়ে দিলে জোর করে।

"চুপ ক'রে বসে থাক এইখানে। উঠতে চেষ্টা করলে খুন ক'রে ফেলব। মনে রেখো আমি ডাকাত।"

"আমি কিছুতেই বসব না এখানে—"

লাফিয়ে উঠতে গেল কিঙ্কিণী। দমন দেও আবার তার ঘাড় ধরে বসিয়ে দিল। কিঙ্কিণী আবার লাফিয়ে উঠল। এই ধাক্কাধাক্কিতে উপর থেকে একটা ঝাঁপি পড়ে গেল, আর সেটা থেকে বেরিয়ে এল এক গোখরো সাপ। ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল সেটা দমন দেও আর কিঙ্কিণীর মাঝখানে। দুজনেই চীৎকার করে উঠল।

ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্বিকার দ্রষ্টা ছিলেন। এইবার উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়ে সাপটাকে নির্ভয়ে ধ'রে আবার ঝাঁপির মধ্যে পুরে ঝাঁপিটা উপরে তুলে দিলেন। তারপর দমন দেওকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "এখানে তোমাকে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। ওই মেয়েটির মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পাবে না তুমি।"

কিঙ্কিণীর দিকে ফিরে বললেন—"তুমি এদিকে এস। তুমি যদি এখনই নাবতে চাও আমি চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেব।"—বলতে না বলতেই ট্রেনটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন—"এটা একটা মাঠ। স্টেশন নয়। নামবে এখানে?"

কিঙ্কিণী কোন উত্তর না দিয়ে ব'সে রইল গুম হয়ে।

ট্রেন আবার ছেড়ে দিল।

কিঙ্কিণী তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে বলল—"আপনি সঙ্গে সাপ নিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

"তোমরা যেমন আমার ফাঁদে ধরা পড়েছ, তেমনি ওরাও পড়েছে। ওরা আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে তাই ওদের নিয়ে যাচ্ছি।"

"ওদের? আরও সাপ আছে না কি—"

"যত প্যাকিং কেস দেখছ সবগুলোতেই সাপ আছে। নানারকম সাপ। ওরা এখানে নিরাপদ নয়, ওদের দেখলেই তোমরা মেরে ফেল। তাই ওরা আমার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। পালাচ্ছেও বলতে পার—"

"সবগুলো প্যাকিং কেসে সাপ আছে? ওই ট্রাংকগুলোতেও?"

"হ্যাঁ, সবই সাপে ভরতি। ভয় পেও না। ওরা কিছু বলবে না তোমাকে। এখনই তো দেখলে ওই গোখরো সাপটাই বাঁচাল তোমাকে দমন দেওয়ের হাত থেকে—"

"এত সাপ! আপনি সাপের ব্যবসা করেন না কি—"

"না। ওরা যখনই যেতে চায় ওদের আমি নিয়ে যাই। ওরাই আমার রাজত্বের পুলিস। আমার রাজত্ব রক্ষা করে ওরা। আমার রাজত্বের তিনদিকে পাহাড় আর একদিকে জঙ্গল। বিরাট অরণ্য। সেই অরণ্য পার হয়ে আমার রাজত্ব থেকে পালানো সম্ভব। কিন্তু সাপগুলো কাউকে পালাতে দেয় না। ওরাই আমার সীমান্ত প্রহরী।"

"কেউ আপনার রাজত্বে থাক বা না থাক তা নিয়ে আপনার এতো মাথাব্যথা কেন।"

"কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার রাজত্বে আমি তো নির্বাক পাথর। তবে আমি চাই যাদের আমি নিয়ে যাচ্ছি তারা যেন বিপদে না পড়ে। যে অরণ্যের কথা বললাম সেই অরণ্যে একটা মায়াবিনী রাক্ষসী নদী আছে। সে নদী পাতালে প্রবেশ করেছে। তাকে অনুসরণ করে আমার রাজত্বের অনেক লোকের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে। তাই যাতে সেই অরণ্যে কেউ প্রবেশ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি আমি। প্রহরী রেখেছি। এই সাপরাই সেই প্রহরী। তুমি যদি যাও সবই বুঝতে পারবে—"

"যা বুঝতে পারছি আপনার ওখানে গেলে তো বন্দী হয়ে থাকতে হবে। সভ্য জগতে আর ফিরতে পারব না—"

"সভ্য জগতে তো শান্তি পাওনি। পেলে এমনভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে না।"

"আবার ফিরে যেতেও পারি। কিন্তু আপনার রাজত্বে গেলে সে পথ তো বন্ধ।"

"না বন্ধ নয়। ওই তো বললাম—তোমার মুক্তির আকাঙ্খা যদি তীব্র হয় তোমার তপস্যায় যদি নিষ্ঠা থাকে—আকাশ থেকে নেমে আসবে হেলিকপ্টার। তোমাকে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি যেতে চাও।"

"আবার আপনি হেঁয়ালি সৃষ্টি করছেন"

"যা তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে তাকেই তোমার হেঁয়ালি ব'লে মনে হচ্ছে। যখন অভিজ্ঞতা হবে সব স্বচ্ছ হয়ে যাবে।"

"তাহ'লে কি করব আপনিই বলে দিন।"

"আমি তোমাকে যেতে অনুরোধও করব না, যেতে মানাও করব না। তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় যদি যেতে চাও তাহলে আমি খুশী হব!"

"আমি সেখানে কিভাবে থাকব"

যেভাবে খুশি থাকতে পার। পংখী আমাদের সঙ্গে যাবে। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে তোমার। তুমি যা চাও তাই পাবে!"

"আপনি থাকবেন না?"

"ওই যে বললাম আমি নির্বাক পাথর হয়ে থাকব সেখানে! আমি কাউকে আদেশও করব না, কাউকে মানাও করব না।"

"এই যে বললেন আমরা গেলে আপনি আনন্দ পাবেন। সেটা পাবেন তাহলে কি করে? পাথরের মূর্তি কি সুখ দুঃখ অনুভব করে?"

"করে হয়তো! সব পাথর তো মরা নয়। জীবন্ত পাথরও আছে। জীবন্ত কিন্তু নির্বাক, নিশ্চল"—মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

দমন দেও হঠাৎ বলে উঠল, "তোমাকে যেতে হবে। তুমি যদি যেতে না চাও, আমিও নেবে যাব তোমার সঙ্গে সঙ্গে। মহাদেব মিশ্রের সঙ্গে না গেলে তোমার বিপদ বাড়বে, কমবে না। দমন দেও ডাকাতের পাল্লা সহজ পাল্লা নয়—"

"কি করবে তুমি আমার—"

"তা আমি জানি না এখন। তবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

কিঙ্কিণী ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল—"আপনি ওকে মানা করবেন না? ও আমার পিছু নিয়ে আমাকে জ্বালাতন করবে আপনি কিছু বলবেন না?"

"আমার চোখের সামনে ওকে অভব্যতা করতে দেব না। কিন্তু তোমরা যদি আমার চোখের আড়ালে চ'লে যাও তাহলে আমি কি করব বল—"

"সত্যি পারেন না কিছু করতে! যা দেখলাম তাতে তো মনে হয় আপনার অনেক শক্তি—"

"তোমরাই শক্তি। তোমরা তোমাদের শক্তি যদি আমাকে দাও তাহলেই আমি শক্তিমান হতে পারি—তা না হলে আমি কিছু নই।"

"তার মানে—"

"তার মানে, আমাকে যদি বিশ্বাস কর তাহলেই আমি শক্তিমান। তোমাদের বিশ্বাসই আমার শক্তি। তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করছ না, মনে করছ হয় আমি যাদুকর, না হয় ভণ্ড তান্ত্রিক, তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমার কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। এ অবস্থায় তোমাকে রক্ষা বরবার দায়িত্ব আমি নেব কি করে? আমার সামনে অবশ্য দমন দেওকে কিছু করতে দেব না—কিন্তু ও যদি আমার নাগাল থেকে চ'লে যায়—ও যদি আমাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে তাহলে আমি নাচার।"

"আমি কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে—"

ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন এ কথা শুনে।

"আপনি এত শক্তিমান, ইচ্ছার ফাঁদ পেতে না কি আমাদের ধ'রে এনেছেন, এতগুলো সাপও না কি আপনার ইচ্ছার ফাঁদে ধরা প'ড়ে আপনার সঙ্গে চলে যাচ্ছে—আপনিই বা আমার মনে বিশ্বাস সঞ্চার করতে পারছেন না কেন। আমি আপনার কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছি, কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছুতেই মনে করতে পারছি না আপনার হাতে আমার ভবিষ্যৎ চোখ বুজে তুলে দিতে পারি। আপনি আমার এ অবিশ্বাস দূর করতে পারছেন না কেন!"

"বিশ্বাস, ভক্তি প্রেম ভালবাসা ওসব ফুলের মতো আপনিই ফোটে। জোর করে ফোটান যায় না। তাছাড়া আমি সব পারি এমন কোনো অহঙ্কারও নেই। আমি সামান্য যেটুকু পারি তাই দেখেই তো তোমার অবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে। শক্তি দেখিয়ে লোককে ভীত করা যায়, সম্মোহিত করা যায়, কিন্তু তার মনে ভালবাসা জাগান যায় না। ভালবাসাই বিশ্বাস। সে ভালবাসা তোমার মনে যখন জাগছে না তখন আমি নিরুপায়। পরের স্টেশনে তুমি নেমে যাও।"

"আমিও নামব—" বলে উঠল দমন দেও।

ভদ্রলোক দমন দেওয়ের দিকে চেয়ে বললেন "তোমাকে অনুরোধ করছি দমন দেও তুমি সভ্য হও। আমার আশ্রয় যদি চাও তাহলে তোমাকে সভ্য হ'তে হবে। আর একটা কথা ভুলো না, তুমি খুন ক'রে জেল থেকে পালিয়েছ। পুলিশ তোমাকে

খুঁজছে। হয়তো পরের স্টেশনেই পুলিশ এসে হাজির হবে। পুলিস যদি আসে তাহলে ওপরের বাংকে যে লম্বা ট্রাংকটা আছে, ওর মধ্যেই ঢুকে পোড়ো তুমি। ওটা খালি আছে, ওটা তোমার জন্যেই এনেছি আমি।"

তারপর কিঙ্কিণীর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমিও পরের স্টেশনে নেবেই যেও। তুমিও পুলিশের কথাটা মনে রেখো। পুলিশ তোমাকেও খুঁজছে। তুমি বড়লোকের মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ, কাগজে কাগজে তোমার ছবি ছাপা হয়ে গেছে, থানায় থানায় খবর পাঠানো হয়েছে, হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ করা হচ্ছে তোমার। তুমিও হয়তো পরের স্টেশনে ধরা পড়তে পার। যাদের তুমি ঘৃণা কর তারাই হয়তো আবার ধ'রে নিয়ে যাবে তোমাকে। তোমার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার বাবা এবার হয়তো অনেক পাহারাদার রেখে দেবে, আর পালাতে পারবে না তুমি—"

"আমার বাবাকে চেনেন না কি।"

"আমি সবাইকে চিনি কিন্তু আমাকে কেউ চেনে না। নিজেকে চেনাবার আগ্রহও আমার নেই।"

"তবে আমাদের ফাঁদে ফেলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন।"

"এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা জান অথচ জান না। তোমরা বিপদে পড়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে যে প্রার্থনা অহরহ করেছ আমি এবং আমার ফাঁদ সেই প্রার্থনারই উত্তর। বিপদে পড়ে সবাই মনে মনে প্রার্থনা করে। কিন্তু সকলেই ডাকে উত্তর আসে না। তার কারণ সকলের ডাকে আন্তরিকতা থাকে না, তাই সকলের ডাক পেঁছিয় না, তাই সকলের ডাকে সাড়া আসে না। তোমাদের ডাকে আন্তরিকতা ছিল, তাই আমি এসেছি। রঘুপতির ডাকেও আমি এসেছিলাম, তাকেও আমি নিয়ে গেছি—"

"কোন রঘুপতি? ডক্টর রঘুপতি মুখার্জি? তিনি তো আমেরিকা গেছেন—"

"সেখান থেকে গেছেন আমার রাজত্বে। বস্তুতন্ত্রের রগড়া-রগড়ি তাঁর ভালো লাগছিল না। মহা অসুখী লোক ছিলেন তিনি। আমার রাজত্বে গিয়েও তিনি রিসার্চ করছেন, আর ভারি আনন্দে আছেন। তাঁর আনন্দের আলো আমাকেও আলোকিত করেছে—"

"রঘুপতির কাছেই কি আমার কথা শুনেছেন আপনি?"

"না। তোমার কথা নিজেই তুমি বাব বার বলেছ আমাকে। কিন্তু নিজেই সেটা তুমি জান না। চোখের জলে রাত্রে যখন তোমার বালিশ ভিজে যেত, তখন আমি তোমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতাম।"

সভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল কিঙ্কিণী। তারপর তার মনে হল কম্প দিয়ে জ্বর আসছে। খুব শীত করতে লাগল।

"তুমি ওইখানে শুয়ে পড়। এইটে গায়ে ঢাকা দাও—"

ওপর থেকে যা পেড়ে দিলেন তা একটা বাঘ ছাল। কিন্তু খুব নরম আর খুব বড়। আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল কিঙ্কিণী।

"তুমি ঘুমোও। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে তোমাকে উঠিয়ে দেব আমি—"

কিঙ্কিণীর বলতে ইচ্ছা করল—"আমি আপনার সঙ্গে যাব, রঘুপতি যেখানে আছে সেইখানেই আমার স্থান—" কিন্তু বলতে পারল না কথাটা। এর পরই খুব কম্প দিয়ে জ্বর এল তার। অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন উঠে বসল সে। জ্বর নেই। লোকও কেউ নেই। এমন কি সাপের ঝাঁপিগুলোও নেই। খালি কামরায় একা ব'সে আছে সে। গাড়ির কপাটটা খোলা। একটু পরে পংখী ঢুকল।

"ও আপনি উঠেছেন দেখছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? যদি ফিরে যেতে চান তাহলে এখান থেকে আপনার টিকিট কেটে দেব আমি।"

"সেই ভদ্রলোক কোথা—"

"তিনি চলে গেছেন। সবাই চ'লে গেছে। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি যেমন বলবেন তেমনি ব্যবস্থা করব। আমাদের দেশে যদি যেতে চান—তাহলে মোটর আছে, চলুন, আর না যদি যেতে চান—"

"হেলিকপ্টার কোথায় আছে—"

"আরও উপরে। একটা উপত্যকার মাঝখানে। খুব সরু রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে সেখানে পেঁছিতে হয়। মোটর সেখানে চলে না। যদি যেতে চান আমি আপনাকে হাত ধরে পার করে দেব সেটুকু।"

"হাত ধ'রে কেন? আমি নিজে পার হ'তে পারব না?"

"না। মোটরে ওঠবার আগে আপনার চোখে ওষুধ লাগিয়ে দেব, খানিকক্ষণ কিছু দেখতে পাবেন না আপনি।"

"ওষুধ? কেন!"

"কিছুদূর উঠলেই বরফে প্রতিফলিত তীব্র আলো এসে চোখে পড়বে আপনার। তাই এই সাবধানতা। কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখতে পাবেন সব। ভয়ের কোন কারণ নেই। বলুন, এখন কি করবেন—"

"সেই ভদ্রলোক কোথা। তাঁর সঙ্গে একটু কথা ব'লে দেখতাম—"

"আর সে সুযোগ পাবেন না। তিনি চলে গেছেন—"

কিঙ্কিণী চুপ ক'রে রইল। পংখীও দাঁড়িয়ে রইল অনড় মূর্তির মতো নীরবে। কিন্তু তার নীরবতাই যেন বার বার বলতে লাগল তাকে—'এখন কি করবেন বলুন—'

এর পর প্রবেশ করল যে লোকটি তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে গেল কিঙ্কিণী।

"এ কি রঘুপতি, তুমি এখানে!"

"পংখী বললে তুমি এসেছ। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"তুমি এখানেই আছ?"

"হ্যাঁ। ঠিক এখানে নয়, আরও উপরে। আমি এখানে অহল্যাপাথর সংগ্রহ করতে এসেছি। হঠাৎ পংখীর সঙ্গে দেখা হল সে বলল কিঙ্কিণী এসেছে—"

"পংখী তো আমার নাম জানে না।"

"জানে তো দেখলাম

"তুমি উপর থেকে নামলে কি ক'রে। শুনেছি ওপর থেকে নামা যায় না—"

"যায়, কিন্তু সহজে যায় না। সে কথা সহজে বলাও যায় না। সে সব আর না-ই শুনলে এখন। তুমি কি উপরে যেতে চাও।"

"তুমি ওখানে বরাবর আছ?"

"হ্যাঁ, আমি রিসার্চ করছি।"

"কেমন লাগছে।"

"খ্ব ভালো—এমন স্বাধীনতা আর কোথাও পাই নি।"

"রিসার্চ করবার জিনিসপত্র সব ওখানে পাও?"

"সব। পংখীকে বললেই সে এনে দেয়।"

"কি নিয়ে রিসার্চ করছ—"

"পাথর নিয়ে। পাথরকে জীবন্ত করা যায় কি না। তাকে চৈতন্যময় করা সম্ভব কি না—এই আমার রিসার্চ।"

"অহল্যা-পাথর কি?"

"পংখী খবর দিয়েছে এখানে না কি একটা পাথর আছে যাকে সবাই অহল্যা-পাথর বলে। অহল্যার পৌরাণিক কাহিনী মনে পড়ল, তাই ঠিক করেছি এই পাথরটাকে নিয়ে একস্পেরিমেণ্ট করব—কে জানে হয়তো পাথর একদিন র্পান্তরিত হবে অহল্যায়। ত্মি যাবে?"

"যাব কি? ত্মিই বল না।"

"সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।"

"না, ত্মি বল। ত্মি যা বলবে তাই করব।"

"আমি কিছ্ই বলব না। তোমাকেই ঠিক করতে হবে।"

ক্ষণকাল মৌন থেকে কিঙ্কিনী বলল—"যাব। ত্মি আছ বলেই যাব। আমার কিন্ত্ ভয় করছে রঘ্পতি।"

রঘ্পতি হেসে উত্তর দিল—"আমি তোমাকে চিনি কিঙ্কিণী। ভয় পাওয়ার মেয়ে ত্মি নও।"

"ত্মি ওখানে কোথায় থাকো? ত্মি যেখানে থাকবে আমি তার কাছাকাছি থাকতে চাই।"

"ওখানে প্রত্যেককেই পাহাড়-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে একা থাকতে হয়। একা না থাকলে সম্প্র্ণ স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করা যায় না। দ্বিতীয় লোকের সান্নিধ্য স্বাধীনতাকে ক্ষ্ণ্ন করে—"

"তাহলে ওখানে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?"

"হবে, যদি আমার অনিচ্ছা না থাকে। আমার ইচ্ছার বির্দ্ধে কেউ আমার এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। প্রত্যেক এলাকাতেই চারদিকে পাহাড়, একটি মাত্র প্রবেশ পথ আছে, সে পথও প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়াল দিয়ে অবর্দ্ধ। সেই এলাকায় যিনি বাস করেন তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তাহলেই সেই পাথরের দেওয়াল স'রে গিয়ে প্রবেশ-পথ ক'রে দেয়। ত্মিও সেখানে তেমনি একটি এলাকা পাবে।"

"সেখানে আমাকে একলা থাকতে হবে? সেখানে কোন সমাজ থাকবে না?"

"সমাজে এতদিন বাস ক'রে তো দেখলে। সেখানে স্বস্তি পাও নি বলেই তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছ, আবার সমাজ চাইছ কেন।"

"আমি সমাজে থেকেই সমাজকে বদলাতে চাই।"

"সমাজকে তোমার মনের মতন ক'রে বদলানো যাবে না। সমাজ বহ্লোকের স্বার্থের ঘ্র্ণাবর্তে আলোড়িত হয়, সে কখনও একার খেয়াল খ্শীর হ্কুম মানে না। এটিলা, চেংগিস, তৈম্র নিছক গায়ের জোরে যা করেছিল তা-ও বেশীদিন থাকে নি,

নেপোলিয়ন হিট্‌লারের জবরদস্তিও টেকে নি। সমাজ বদলায়, কিন্তু তোমার আমার খুশিতে বদলায় না। বদলায় অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন অনুসারে এবং যুগের পরিবেশ অনুযায়ী। যুগের পরিবেশ তোমার বাবাকে কালোবাজারী করেছে, আমার মাষ্টারমশাইকে সামান্য চাকরের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছে, অধ্যাপনার দিকে তাঁর মন নেই তাঁর মন চাকরি বাঁচানোর দিকে। এর বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারব না। তাই আমরা পালাতে চেয়েছিলাম। আমি পালিয়ে এসেছি, ইচ্ছে করলে তুমিও আসতে পার।"

"পাহাড়ের কারাগারে বন্দী হয়ে কি করব আমি—"

"যা খুশি করতে পার—"

"আমি বক্তৃতা দিতে চাই। শ্রোতা কোথায় পাব।"

"অনেক শ্রোতা পাবে। তোমার অন্তত মনে হবে হাজার হাজার শ্রোতা তোমার বক্তৃতা শুনেছে। হাততালিও শুনতে পাবে।"

"কোথা থেকে আসবে শ্রোতা—"

"সে পংখী জানে। সেই সব ব্যবস্থা করে এখানে। তোমার রুচি অনুসারে খাওয়া-পরা খাট-বিছানা আয়না-দেরাজ সব যোগাড় করে দেবে সে। তোমার লাইব্রেরী গুছিয়ে দেবে তোমার মনের মতন বই দিয়ে।"

"এই পাহাড়ের ওপর এত শ্রোতা আসবে কোথা থেকে—"

"পংখী মায়াবী। সে অলীক ছায়া-শ্রোতা সৃষ্টি করবে হয়তো। তোমার মনে হবে হাজার হাজার শ্রোতা বসে আছে তোমার সামনে—"

"ছায়া-শ্রোতাকে বক্তৃতা শুনিয়ে লাভ কি"

"পংখী বলবে ওতেই তোমার কাজ হবে। ওই ছায়ারা গিয়ে প্রবেশ করবে অসংখ্য মানুষের মনে, যে মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনে তুমি কখনও বক্তৃতা করবার সুযোগ পেতে না। তোমার বক্তব্য যথাস্থানে ঠিক ঠিক পেঁাছে যাবে—"

"ওসব গাঁজাখুরি কাহিনী তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ ?"

"একজন গাঁজা-খোর পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন যত রকম ট্র্যাংকুইলাইজার (tranquiliser) আছে, গাঁজাই তার মধ্যে না কি শ্রেষ্ঠ। অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে। এখানে তোমাকে গাঁজা খেতে হবে না, তবু তোমার অশান্ত বিক্ষিপ্ত মন শান্ত হবে এটুকু আমি বলতে পারি। আমার হয়েছে—"

"ওই উপত্যকায় বন্দী হয়ে শান্তি পেয়েছ তুমি ?"

"বন্দী বলছ কেন ? তুমি ইচ্ছা করলেই তোমার কপাট খুলে যাবে। স্বচ্ছন্দে তুমি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে পার। এখানে চারিদিকে এত সৌন্দর্য আছে যে তুমি দেখে শেষ করতে পারবে না—দেখবার মত অনেক জিনিস আছে এখানে—"

পংখী এতক্ষণ নীরবেই দাঁড়িয়েছিল।

এইবার বলল—"কি ঠিক করলেন তাহলে—যাচ্ছেন তো আমাদের সঙ্গে—"

কিঙ্কণী তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে রঘুপতিকেই আবার প্রশ্ন করল—"তুমি কি তোমার উপত্যকায় আমাকে ঢুকতে দেবে না ?"

"আমার যতক্ষণ একা থাকার ইচ্ছে হবে ততক্ষণ আমার দরজা বন্ধ থাকবে। সে ইচ্ছা কতক্ষণ থাকবে তা আমি নিজেও জানি না। তবে আমার দরজা মাঝে মাঝে

আমি খুলে দিই, তখন আসেও কেউ কেউ। বক আসে। তার সঙ্গে গল্প করতে ভারি ভালো লাগে আমার। নীলপর্ণ আসে—সে-ও অদ্ভুত লোক—"

"সে আবার কে—"

"সে কুবেরের প্রহরী। জটায়ু না কি তার পূর্বপুরুষ ছিলেন—"

"পাখী ?"

"বাইরেটা পাখীর মতো। কিন্তু ভিতরে সে মহৎ মানুষ। তার পালকে নীলরঙের বাহার দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। নানারকম নীল। বাইরেটা পাখীর মতো হলেও সে মানুষের মতো কথা কয়। তার গায়ে জোরও খুব। তার ডানার ঝাপটার জোরে আর ঠোঁট-নখের দাপটে সে কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য রক্ষা করে। তার সঙ্গে আলাপ হলে খুশী হবে—"

"তোমার কাছে যেতে পাবো কি না বল—"

যখনই কপাট খোলা দেখবে চলে এস। তবে তুমি যে রঘুপতিকে জানতে সে রঘুপতি আর নেই। আমি যে কিঙ্কিণীকে জানতাম সে-ও হয়তো বদলে গেছে। নতুন করে পরিচয় করতে হবে আবার। আসবে, নিশ্চয় আসবে—"

পংখী আবার ইতস্ততঃ করে বলল—"তাহলে—"

"আমি যাব—"

কিঙ্কিণী যেন মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উপত্যকাটি খুব পছন্দ হয়েছিল কিঙ্কিণীর। এত বড় একটা বিস্তৃত জায়গায় সে যে একা থাকতে পারবে তা তার কল্পনাতীত ছিল। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কোনও পাহাড় বরফে আবৃত, কোন পাহাড় পুষ্পিত বনে ঢাকা, কোনও পাহাড় থেকে ঝরনাধারা দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও পাহাড়ের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, মনে হয় যেন পাহাড় নয় মানুষ ওরা। একটা পাহাড় যেন অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে আছে, আর একটা পাহাড় যেন উঁকি দিয়ে উপত্যকার ভিতরটা দেখাবার চেষ্টা করছে। কিঙ্কিণী যে ঘরটি পেয়েছে সেটিও চমৎকার। বসবার ঘর, শোবার ঘর, লাইব্রেরি, একেবারে অতিআধুনিক ধরনের। বাড়ির চারিদিকেই বারান্দা। চারটি বারান্দার সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রত্যেক বারান্দার নীচেই ফুলবাগান। বাগানে নানারকম ফুল। একটু দূরে একটি ছোট্ট পুকুর আছে, তাতে ফুটে আছে রাশি রাশি নীলকমল। উপত্যকার ভিতর দিয়ে ছোট একটি নদী বয়ে গেছে। তার জল ফিকে সবুজ (সবুজ রঙই কিঙ্কিণীর প্রিয় রং), তার বেগ অতি প্রবল, তার সর্বাঙ্গ ঊর্মিশিহরিত। যে সব পাহাড় উপত্যকাটিকে ঘিরে আছে তারই একটা থেকে বেরিয়েছে নদীটি। উপত্যকার প্রত্যন্ত প্রদেশ দিয়ে বয়ে গিয়ে সেটি প্রবেশ করেছে আর একটি পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট একটি ফাটলের মধ্যে, সেখান থেকে বেরিয়ে সে প্রপাতের আকারে পড়ছে পাশের উপত্যকাটিতে যেখানে রঘুপতি আছে। কিঙ্কিণীর ভাবতে ভালো লাগে যে তার উপত্যকার নদী

প্রপাত হয়ে পড়ছে রঘুপতির উপত্যকায়। কিন্তু কিঙ্কিণীর মনের খটকা এখনও যায় নি। সে বারবার ভাবছে এসব হ'ল কি ক'রে? যে দেশ থাকা সম্ভব নয়, সত্যি সত্যি সে দেশে এসে বাস বরছে সে কি করে? মহাদেবের কৃপায়? যে ভদ্রলোকটির রিজার্ভ-করা কামরায় সে উঠেছিল, যাঁর দেখা সে আর পায় নি, তিনি কি ছদ্মবেশী মহাদেব? যে যুক্তিবাদের বনিয়াদের উপর তার ভাবনা চিন্তা কর্মপন্থা প্রতিষ্ঠিত তা দিয়ে তো এর ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে? মহাদেবের মন্দিরটি সে দেখে এসেছে একদিন। সে মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই, আছে প্রকাণ্ড একটি মর্মরধবল পাথর। সে মন্দিরে ছাতও সেই। সেটা মন্দিরই নয়, পাথর দিয়ে ঘেরা জায়গা খানিকটা। সেই মর্মরধবল পাথরের উপর রোজ বরফ জমে এসে, সেই স্তূপীকৃত বরফ দূরে থেকে দেখলে মানুষেরই স্ট্যাচুর মত দেখায়। কাছে গেলে দেখা যায় বরফ ছাড়া আর কিছু নয়। স্ট্যাচুর যেখানে মুখটা সেখানে বরফেরই খাঁজ পড়ে। কোন কোন দিন মনে হয় যেন একটা মৃদু হাসি ফুটেছে সেখানে। কোন কোন দিন আবার ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে ওঠা মুখটা। কোনদিন কোন ভাবই ফোটে না, উদাসীন বরফের একটা চাঙড়, ভাবলেশহীন হয়ে থাকে। এখানকার ব্যাপার কিঙ্কিণী বুঝতে পারেনা ঠিক। অথচ সত্যিই সে খুব সুখে আছে। দুটি মেয়ে এসে তার সব কাজ করে দিয়ে যায়। তারা নীরবে আসে, নীরবে কাজ করে, তারপর নীরবে চলে যায়। নদীর ধারে তাদের থাকবার জায়গা আছে কিঙ্কিণী শুনেছে, কিন্তু সে জায়গা কিঙ্কিণীর বাড়ি থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ডাকবামাত্র তারা চ'লে আসে। একজনের নাম উমা আর একজনের নাম পার্বতী। কিঙ্কিণী জিগ্যেস করেছিল বলেই নাম বলেছিল তারা। এমনিতে তারা কোনও কথা বলে না। নীরবে সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে ক'রে চ'লে যায়। দেখে মনে হয় তারা যমজ। দুজনের চেহারা একরকম। জিগ্যেস করেছে কিঙ্কিণী, কিন্তু তারা কোনও উত্তর দেয় নি। মৃদু হেসে চুপ করে ছিল। এতো ভালো রান্না কিঙ্কিণী আগে খায় নি। রান্না করবার জায়গাটা একটু দূরে, সেখানে ওরা দুজনে মিলেই রান্না করে। কি রান্না করতে হবে তা কিঙ্কিণী একদিনও জিগ্যেস করে নি, কিন্তু আশ্চর্য কিঙ্কিণী যা যা ভালবাসে তাই রান্না করে ওরা। এই পাহাড়ের উপর ইলিশ মাছ, কই মাছ, ভেটকি মাছ কোথায় পায় ওরা জিগ্যেস করেছিল একদিন। কোনও উত্তর দেয় নি। মুচকি হেসেছিল শুধু। পংখী আসে মাঝে মাঝে। তার না কি সর্বত্র অবাধ গতি। ও শুধু কাকাতুয়ার মতো দেখতে নয়, কাকাতুয়ার মত উড়তেও পারে। উড়ে পাহাড় পার হয়ে চলে যায়। সব উপত্যকার খবর নেয়। কিঙ্কিণী একদিন পংখীকে জিগ্যেস করেছিল—সুখে আছি কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না। কি করে সম্ভব হচ্ছে এসব? পংখী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল খানিকক্ষণ ঘাড়টা একদিকে কাত করে। তারপর বলেছিল, আপনি একটা পরম মুহূর্তে হঠাৎ প্রবেশ করেছেন, সে মুহূর্তের সঙ্গে অনন্তের যোগ আছে, যে অনন্তে অসম্ভব কিছু নেই। আপনি পূর্বজন্মের মানদণ্ড দিয়ে মাপছেন তাই সম্ভব অসম্ভবের কথা আপনার মনে হচ্ছে। আপনার পূর্বজীবনটা যখন অলীক ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে তখন কিছুই অসম্ভব বলে মনে হবে না। আপনার পূর্ব জীবন এখনও প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু। তার ছবি যদি দেখতে চান দেখাতে পারি। একটা পরদা টাঙিয়ে দিয়ে যাব আপনার বারান্দায়। সে পরদাকে হুকুম করলেই সে ছবি দেখাবে আপনাকে। সন্ধ্যের পর অন্ধকারের সময়টা তাতে ভালই কাটবে

আপনার। আপনার যে জীবন আগে ছিল, যে জীবন থেকে হঠাৎ আপনি বেরিয়ে এসেছেন একটি পরমমুহূর্তে, সে জীবন এখনও চলছে, তার ছবি যদি দেখতে চান দেখুন না। টাঙিয়ে দেব পরদা—"

"সিনেমা দেখার মতো ?"

"হ্যাঁ ঠিক তাই"

ট্রেনে সেই ভদ্রলোক কিন্তু বলেছিলেন এখানে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার কিছু নেই, তাহলে সিনেমা দেখাবেন কি করে ?

"না, যাকে আপনারা যন্ত্র বলেন তা এখানে নেই। যন্ত্র বিষয়ে আপনারা এখনও অনেক পিছিয়ে আছেন, আপনাদের যন্ত্র ভারি অপটু, ছোট ছেলের খেলনার মতো—"

"তাহলে সিনেমা দেখাবেন কি করে ?"

"যন্ত্র নেই, কিন্তু মন্ত্র আছে। আর আছেন দেবাদিদেব যিনি সমস্ত আবিষ্কারের উৎস—"

"দেবাদিদেব কোথায় ? তাঁকে দেখতে তো পাই না !"

"তিনি সর্বদাই আপনার নিকটে আছেন। তাঁকে যে দেখতে পাচ্ছেন না সেটা আপনারই অক্ষমতা। এর জন্যে আপনাকে দোষ দিই না, তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জন করতে বেশ কিছু সময় লাগে, আচ্ছা, আমি চললাম। পরদা দক্ষিণ দিকের বারান্দায় লাগিয়ে দেব।"

"ও বারান্দায় খুব হাওয়া—উড়ে যাবে না ?"

"কাপড়ের পরদা টাঙাব না, মর্মর পাথরের পরদা টাঙাব। তাতে ছবি আরও স্পষ্ট হবে।"

পাংখী চ'লে গেল।

কিঙ্কিণী চুপ করে বসে রইল। দূরে পাহাড়ের উপর গাছের সারি, সবাই যেন উন্মুখ হ'য়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। কি গাছ চেনে না, নাম জানে না, তবু যেন ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করল সে। সে-ও তো উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে আছে। তার আকাশ আর ওই নীল আকাশ কি এক ? নীল আকাশের অসীম ব্যাপ্তি আছে, ওই আকাশে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, মেঘ, রামধনুর সমারোহ, তার দৃষ্টির বাইরেও ওই নীল আকাশ বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, কতদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, কতদূর যে তার সীমা, সীমা আছে কি নেই এ সব খবরও জানে না সে। ওই আকাশের দিকে চেয়ে আছে পাহাড়ের ওই গাছগুলো। সে কি ওই আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়েছিল কোনও দিন ? হ্যাঁ চেয়েছিল। দিনে নয় রাত্রে। নক্ষত্র চেনার বাতিক হয়েছিল কিছুদিন। খালি চোখে যে সব নক্ষত্রদের দেখা যায় তাদের পরিচয় লাভ করবার জন্যে উৎসুক হয়েছিল সে রঘুপতির সঙ্গে। নক্ষত্রের বই আর বাইনাকুলার নিয়ে অনেক রাত্রি কাটিয়েছে রঘুপতির সঙ্গে। প্রায় সব নক্ষত্রই চেনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উৎসাহ বেশীদিন রইল না, রঘুপতিও চলে গেল, সংসারখরচ চালাবার জন্যে তাকে 'কোচিং ক্লাস' খুলতে হয়েছিল কিছুদিন। সে ক্লাসে স্বাতী ছিল তাদের পাড়ার সেই ফ্লার্ট (flirt) মেয়েটা। ক্লাস খোলবার পর রঘুপতি তার কাছে আসবার আর সময় পায় নি। স্বাতীর মুখেই তার খবর পেত আর সে খবরে স্বাতী এমন রং লাগাতো যে মনে হতো রঘুপতি বুঝি স্বাতীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারপর রঘুপতি যখন

রিসার্চ করবার স্কলারশিপ পেলো, তখন তাকে কোচিং ক্লাস উঠিয়ে দিতে হল। তখনও কিন্তু সে কিঙ্কিণীর কাছে আসত না। তারপর একদিন স্বাতী আত্মহত্যা করল। কেন করল জানা যায় নি। একটুকরো কাগজে কেবল লিখে গিয়েছিল—আমি স্বেচ্ছায় সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

যারা গুজব-বাজ তারা কিন্তু এজন্য দায়ী করেছিল রঘুপতিকে। রঘুপতি তখন আমেরিকায়। হঠাৎ কিঙ্কিণীর মনে পড়ল তার মাকে—তার যে মা অনেকদিন আগে মারা গেছেন, যাঁর সশঙ্কিত সদা-ভীত রূপটাই সর্বদা জেগে আছে তার মনে। তার মা রূপবতী ছিলেন না, রং কালো ছিল, মুখশ্রীও ভালো ছিল না। চোখ দুটো ছোট ছোট, বড় বড় দাঁতগুলো, নাকটা থ্যাবড়া। সামনের কয়েকটা দাঁত বেরিয়েই থাকত। কিন্তু তিনি ছিলেন বিরাট ধনী সুরেন রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। তাঁকে বিয়ে করবার জন্য বহু সৎপাত্র না কি লালায়িত হয়েছিল, অনেক উঁচু বংশের বিদ্বান ছেলেও ছিলেন না কি সেই দলে। কিন্তু সুরেন রায় নির্বাচন করেছিলেন স্বল্পবিত্ত, স্বল্পবিদ্যা সাতকড়ি বিশ্বাসকে তার বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং অনিন্দনীয় রূপের জন্য। তাঁর কুৎসিত মেয়ের জন্য তিনি স্বাস্থ্যবান এবং রূপবান পাত্রই সংগ্রহ করেছিলেন, বিত্ত বা বিদ্যার দিকে নজর দেন নি, কারণ তিনি জানতেন তাঁর যে বিত্ত আছে তা তাঁর একমাত্র সন্তান কমলাই পাবে আর জামাইয়ের বিদ্যার অভাব চাপা পড়ে যাবে সে ঐশ্বর্যের দ্যুতিময় প্রাচুর্যে। তিনি নিজে লেখা পড়া বেশী শেখেন নি, কিন্তু প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন ব'লে কোথাও এমন কি সভ্য ও বিদ্বৎসমাজেও তাঁর সমাদর কিছু কম হয় নি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে সমাজে আমরা আজকাল বাস করি সে সমাজে টাকাই সব। টাকা দিয়ে সবই কেনা যায়, আলু পটল মাছ-মাংসের মতো মানসম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তিও ক্রীত-বিক্রীত হয়। তাই অন্য দিকে ঝোঁক না দিয়ে তিনি মেয়ের জন্য রূপবান পাত্র খোঁজার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন। সাতকড়ির বিদ্যা, বিত্ত কিছুই ছিল না, কিন্তু রূপ ছিল সত্যই অনন্য। স্কুলে এবং বন্ধুবান্ধব মহলে লালু ছেলে বলত তাকে সবাই। অনেকে ভেবেছিল সিনেমায় ঢুকলে হয়তো ওর ভাগ্য ফিরে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ফিরে গেল অন্য পথে, সুরেন রায়ের একমাত্র সন্তান কমলাকে বিয়ে ক'রে। এতে সে নিজেও ঘাবড়ে গেল, কমলাও ঘাবড়ে গেল। কমলা কল্পনাও করে নি এমন দেবকান্তি সুপুরুষ তার স্বামী হবে। প্রথমেই কেমন যেন ভয় ভয় করেছিল তার, মনে হয়েছিল এতো সুখ তার সইবে না, এ যেন সত্যি নয় স্বপ্ন। স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। সাতকড়িও ঘাবড়েছিল কমলার রূপ দেখে। এই তাড়কা যে মালা হাতে ক'রে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল এ কথা সেও ভাবে নি। বিয়ের আগে সে মেয়ে দেখেনি দেখতে পায় নি। রায় মশাই বলেই দিয়েছিলেন—"আমার মেয়ে দেখতে ভালো নয়, কিন্তু সে আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। বিয়ের বাজারে সামান্য পণ্যের মতো তাকে আমি ফিরি করব না। আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি দেখতে সে ভালো নয় এইটুকু খবরের উপর নির্ভর করেই তাকে বিয়ে করতে হবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, টাকা ছাড়লে পাত্রেরও অভাব হবে না। অনেক পাত্র পেয়েছি, তবে আপনার ছেলেটিকেই আমার পছন্দ। আপনি ভেবে দেখুন। বিয়ে যদি হয় তাহলে আপনি আমার বৈবাহিক হবেন। তখন আপনাকে আর আমার অপিসের কেরানী হয়ে থাকতে হবে না। আমার একটা মিলের সর্বেসর্বা ক'রে দেব আপনাকে। আমার

মেয়ের বিয়েতে যৌতুকস্বরূপ ওই মিলটাই আপনাকে দিয়ে দেব। আমার সাতটা মিল আছে এর মধ্যে যেটা আপনার পছন্দ সেইটেই পাবেন আপনি। আর আমার মৃত্যুর পর সবই তো আপনাদের হবে! ভেবে দেখুন কথাটা। "পরশু দিন আপনার উত্তর চাই—।" কথাগুলো তিনি বলেছিলেন সাতকড়ির বাবা গণেশবাবুকে। এই কল্পনাতীত প্রস্তাব শুনে গণেশবাবু হকচকিয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর বললেন—আমার ছেলেকে আর স্ত্রীকে জিগ্যেস ক'রে তারপর আপনাকে বলব। সুরেন রায় বললেন—পরশু পর্যন্ত আপনাকে সময় দিচ্চি। কারণ তার পরদিন আর একটি ছেলের বাবা আসবেন আমার কাছে। কমলার বয়স তেরো পেরিয়ে গেছে, আমি এই মাসের মধ্যেই তার বিয়ে দিতে চাই।

এ সব গল্প কিঙ্কিণী শুনেছিল তার দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসির কাছে। তিনি সুরেন রায়ের বাড়িতেই থাকতেন। সুরেন রায়ের মৃত্যুর পরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি বলতেন—কিনি তুই পেয়েছিস মায়ের রং বাপের মুখশ্রী। হাত দেখতেও জানতেন তিনি। শুধু হাত নয়, নখ দাঁত চুলের ডগা কপাল চোখ মুখ দেখেও নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন—তোর কপালে সুখ নেই কিনি, কারণ তোর মতের বিরুদ্ধে তুই কিছু মেনে নিবি না, তুই যুঝবি, তুই লড়বি, আমরা যে পারি নি তুই হয়তো তাই পারবি, কিন্তু সুখ পাবি না। তুই শিবপুজো কর।' কিঙ্কিণী বলেছিল, 'আমার যে ওসবে বিশ্বাস হয় না পিসি। তোমার পুজোর ঘরে যে শিবের ছবিটি আছে তা সুন্দর, কিন্তু ওকে পুজো করে কোনও লাভ হবে বলে মনে করি না।' পিসি হেসে বলেছিলেন, 'কলেজে পড়ে এই বুদ্ধি হয়েছে বুঝি তোর। কিন্তু জেনে রাখ শিবই মঙ্গলময়, হয়তো একদিন একথা তুই বুঝবি।'

নানারকম এলোমেলো কথা মনে হ'তে লাগল কিঙ্কিণীর। পিসির মৃত্যুসময়েও সে ছিল তাঁর মৃত্যুশয্যায়। তার মা-ও ছিলেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ পিসি তার হাত ধ'রে বলেছিলেন—"শিব তোকে দয়া করবেন। তুই পারবি। তোর মাকে তুই রক্ষা করিস। তুই ছাড়া তোর বাবার হাত থেকে কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।" নীরবে কাঁদছিলেন। একটা আশঙ্কা মূর্ত হয়েছিল তাঁর চোখে মুখে। তিনি যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে এক নিদারুণ ভবিষ্যতের দিকে চেয়েছিলেন। তার ডান হাতের উপর কালসিটে দাগটাও দেখতে পেয়েছিল কিঙ্কিণী। তার বাবা যে রাত্রে মাতাল হ'য়ে এসে তার মা-কে মারে। এ ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। সে ছেলেবেলা থেকেই দেখছে। প্রথম প্রথম তারও ভয় করত, সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে কাঁদত। কিন্তু কোনও প্রতিকার করতে পারত না। আর একটু যখন সে বড় হল তখন তার লজ্জা হ'ত। তার মাকে যে রোজ মারে এ কথাটা সে যেন চাপা দিতে চেষ্টা করত, এমন কি নিজের কাছেও। তারপর সে হস্টেলে চ'লে গেল। তার পিসিমাই রক্ষা করতেন তার মাকে বাবার হাত থেকে। বাবা যখন মাতাল হয়ে ফিরতেন তখন তাকে লুকিয়ে রেখে দিতেন পিসিমা তালা বন্ধ ক'রে। এর জন্যে পিসিমার গায়েও দু'এক ঘা বেত পড়ত মাঝে মাঝে। কিন্তু পিসিমা সবলা ছিলেন, বাবার হাতের বেত কেড়ে নিতেন তিনি, বাবাকে ধাক্কা মেরে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে কপাট বন্ধ ক'রে দিতেন জোর করে। কিন্তু সব দিন তিনি পারতেন না। মাঝে

মাঝে কম্প দিয়ে জ্বর আসত তাঁর, দু'তিনদিন শয্যাগত হয়ে থাকতে হত তাঁকে। সেই সময় বাবা অত্যাচার করবার সুযোগ পেতেন। মা কিছু বলতেন না, চেঁচাতেন না পর্যন্ত, শুধু উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। আর তাঁর উপর চাবুক পড়ত। শেষকালে কিঙ্কিণীই একদিন প্রতিবাদ করল। তখন সে কলেজে পড়ছে। হস্টেল থেকে বাড়ি এসেছিল সেদিন। পিসিমা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ছবিটা হঠাৎ মনে পড়ল তার। তেতলার ঘরে পড়ছিল সে রাত্রে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন চীৎকার স্তব্ধতাকে ভেদ ক'রে চলে গেল। মা কোনওদিন চিৎকার করত না, সেইদিনই করেছিল কেবল। কিঙ্কিণী তরতর করে নেবে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নেবে দেখল মা সিঁড়ির কাছেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তার কাছেই ছুটে যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু পারেন নি। বাবা চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, মদে চুর, টলছেন। বজ্র-নির্ঘোষ সহসা ধ্বনিত হয়েছিল কিঙ্কিণীর কণ্ঠে—"এ কি করছ তুমি রোজ রোজ। আর কোনও দিন তুমি মায়ের গায়ে হাত দেবে না—।" চাবুকটা কেড়ে নিয়েছিল সে। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল, তার বাবাও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। কিঙ্কিণীর চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল হঠাৎ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝরণাটা উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। তার ঝর্ঝর, কলকল ছলছল শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে যেন একটা উদ্বেলিত হাসি। তিনটি তুষার-পর্বত প্রখর রৌদ্রালোকে স্বর্ণ-কান্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে, আর তার উপর চক্রাকারে উড়ছে, বড় বড় একদল নীল পাখি। ও পাখি কখনও সে দেখেনি। কিঙ্কিণীর মনে হল—ওটা ঝরণা নয়, ওটা তারই হৃদয়, যার ঝর্ঝর, কলকল, ছলছল শব্দ, যার উদ্বেলিত হাসি সে প্রত্যহ অনুভব করেছে কিন্তু কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে ঝরণাটার দিকে। নিজেকেই দেখছে যেন। হঠাৎ তার মনে হল ওর উদ্বেলিত হাসি কি সে অনুভব করেছিল কোনদিন? ওই উদ্বেলিত উচ্ছ্বল হাসির একটি অর্থই তো আছে—কোন বাধা আমি মানব না, কোন বিপদকেই আমি ভয় করব না, সমস্ত তুচ্ছ ক'রে আমার প্রাণের প্রবাহ দুর্দমগতিতে এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে। হাসির এই অর্থ কি সুস্পষ্ট হয়েছিল তার অনুভূতিতে? হ্যাঁ, হয়েছিল বই কি মাঝে মাঝে। কিন্তু ওটা যে হাসি, ওটা যে অন্তরতম উপলব্ধির নিঃসংশয় হর্ষোচ্ছ্বাস তা সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে নি। সে ওটাকে ভেবেছিল প্রেরণা, নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের আনন্দিত রূপকে সে আগে দেখতে পায় নি। আজ পেল। এই প্রেরণার বলেই কিন্তু অসাধ্যসাধন করেছিল সে। যখনই সে বুঝতে পারল যে তার বাবা তার মাকে নির্যাতন করে টাকার জন্য তখনই সে এর প্রতিকার করেছিল। তার দাদামশায় উইল ক'রে গিয়েছিলেন যে তার মা তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সম্পত্তির সমস্ত আয় মায়ের নামেই যাতে ব্যাংকে জমা হয় এর জন্য সরকারকেই তিনি মায়ের রক্ষক ক'রে গিয়েছিলেন। বাবাকে তিনি একটা মিল দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন মাসিক হাজার টাকা করে মাসোহারা। কিঙ্কিণীর জন্যেও আলাদা মাসোহারা ছিল। সুরেনবাবু তার মাকে সর্বময়ী কর্ত্রী করে গিয়েছিলেন তার বিষয়ের। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে তার মা বিষয় দান বা বিক্রি করতে পারবে এ ক্ষমতাও তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁর বাবা তার মাকে পীড়ন করতেন বিষয়টা হস্তগত করার জন্য। ব্যাংকের অনেক টাকা তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে জোর করে। মতলব ছিল বিষয়টাও যাতে তিনি লিখে দেন তাঁর

নামে। একটা দান-পত্র তিনি লিখিয়ে এনেছিলেন এবং মা যাতে সই করে দেন তাতে তার জন্যেই পীড়াপীড়ি করছিলেন অনেকদিন থেকে। মা রাজী হন নি। মার খেয়েও হন নি। সেদিন তার অজ্ঞান মাকে তুলে নিয়ে এসে ঘরে খিল দিয়েছিল কিঙ্কিণী। তার পর থেকেই মায়ের ভার নিয়েছে সে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মাকে সেখানে রেখেছে—বাবার নাগালের বাইরে। সশস্ত্র গুর্খা দারোয়ান রেখেছে পাহারা দেবার জন্য। কিঙ্কিণীর বিনা অনুমতিতে সেখানে বাইরের কোন লোকের ঢোকবার উপায় নেই। আর একটা কাজও করেছে সে। গৌরাঙ্গবাবু উকিলের সাহায্যে মায়ের সমস্ত বিষয় সে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। মা দলিল করে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান ক'রে দিয়েছেন কিঙ্কিণীকে। সে দলিল রেজিস্ট্রীও হ'য়ে গেছে। স্ত্রীকে নির্যাতন ক'রে সাতকড়ি বিশ্বাস যাতে আর বিষয়টি হস্তগত করতে না পারেন সে ব্যবস্থা ক'রেও কিঙ্কিণী কিন্তু শান্তি পায় নি। সাতকড়ি বিশ্বাস গুণ্ডা লাগিয়েছেন তার পিছনে। কিঙ্কিণী তার বাবাকে কোনদিন ভালবাসতে পারে নি। শ্রদ্ধা করতেও পারে নি। বাবার সঙ্গও পায় নি সে ছেলেবেলা থেকে। তার জ্ঞান হয়ে থেকে সে দেখছে বাবা খুব ভোরে বেরিয়ে যান, সমস্ত দিন আসেন না, বাইরেই খান, বাইরেই থাকেন একটা আলাদা বাড়িতে। রাত্রে মাতাল হয়ে তার মায়ের কাছে আসেন এবং মাকে পীড়ন করেন। কিঙ্কিণীকে একটা বোর্ডিংয়ে ভরতি করে দিয়েছিলেন তার বয়স যখন এগারো বারো। বোর্ডিংয়ে হস্টেলেই সে মানুষ হয়েছে। টাকার অভাব হয় নি কোনদিন। তার দাদামশায় তার নামে যে মাসোহারা দিয়ে গিয়েছিলেন তাতে সে ভালোভাবেই পড়া-শোনা করতে পেরেছে। ইংরেজি ছাড়া জার্মানি, ফরাসী আর ইতালী ভাষা শিখেছে সে। ভালো ভালো শিক্ষক অধ্যাপক সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু তার বাবাই ক্লেদাক্ত ক'রে দিয়েছে তার জীবন। সে সাতকড়ি বিশ্বাসের মেয়ে এই পরিচয় ম্লান ক'রে দিয়েছে তার কৃতিত্বকে। ভদ্রসমাজ মনে মনে তাকে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে। সামনে তাকে অনেকে খাতির করে অবশ্য, সম্ভবতঃ তার টাকার জন্যে, কিন্তু মনে মনে তাকে ঘৃণা ক'রে সবাই এটা সে বুঝতে পারে। রঘুপতি এই জন্যেই সম্ভবতঃ তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় নি, যদিও সে নিজে যেচে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল। রঘুপতির বিধবা মা না কি অদ্ভুত রকম ভালো। সেকেলে হিন্দু বিধবা, সেকেলে নিয়ম মেনেই চলেন। কিন্তু একালের উচ্ছৃঙ্খলতায় বিচলিত হন না, তা নিয়ে কোন আলোচনাও করেন না কারো সঙ্গে, নিজের মনে নিজেকে নিয়ে থাকেন নিজের জগতে, নিজের মতে নিজের পথে চলেন। তাঁর কাছে গেলে ভারি ভালো লাগে না কি, অনেকেই বলেছিল কিঙ্কিণীকে, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি তিনি। কিন্তু রঘুপতি তাকে নিয়ে যায় নি। রঘুপতিও আমোল দেয় নি তাকে। আলতো-আলতো ভাবে আলাপ করত, ভদ্র আলাপই করত। কিন্তু কিঙ্কিণী যা চেয়েছিল তা পায় নি। কি চেয়েছিল সে? অনেক প্রণয়ী মধুকরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল তার চারপাশে। কিন্তু সে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল। রঘুপতি এই মধুকরের ঝাঁকের মধ্যে ছিল না। কলেজেই আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক রঘুপতি। সর্বদাই যেন অন্যজগতে থাকত। কিঙ্কিণীর মনে হয়েছিল সে যতবার তার সঙ্গে কথা বলেছিল একবারও তার দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নি, তার কথার সুরে যে আন্তরিকতা ছিল না তা নয় কিন্তু একটা অন্য-

মনস্কতার কুয়াশায় যেন ঢাকা ছিল সব। মনে হত সে অন্য জগৎ থেকে কথা বলছে। রঘুপতিকে দেখে, তার কথা শুনে, যে শ্রদ্ধা কিঙ্কিণীর মনে জেগেছিল তা ভাষায় নিবেদন করবার সুযোগ পায় নি কিঙ্কিণী। তার লজ্জা করেছিল, সঙ্কোচও জেগেছিল মনে। সে যে অস্পৃশ্যা এই বোধটা যেন কণ্ঠরোধ ক'রে রেখেছিল তার। সে কিছু বলতে পারে নি, একটা মাত্র যে লোককে দেখে তার অন্তর পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল তার সামনে নতনেত্রে নির্বাক হ'য়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি সে। মনে পড়ল নক্ষত্র চেনবার ওজুহাতে সে ঘনিষ্ঠতা করেছিল রঘুপতির সঙ্গে। বলেছিল, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু বিজ্ঞানের তো আমি কিছু জানি না যে তোমার সঙ্গে আলাপ করব। তবে গাছ-পালা, পশুপাখী, গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রচুর কৌতূহল আছে আমার কিন্তু কে আমার কৌতূহল মেটাবে বল।" রঘুপতি বলেছিল—"আমিও বিশেষ কিছু জানি না। তবে যে নক্ষত্রদের খালি চোখে দেখা যায় তাদের আমি চিনি। সেগুলো তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তার জন্যে রাত জাগতে হবে—"। একটা বাইনাকুলার নিয়ে রঘুপতির সঙ্গে অনেক রাত জেগেছে সে, তাদের বাড়ির ছাদে। রঘুপতির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে সে অনেক নক্ষত্র দেখেছে। গায়ে গা ঠেকে গেছে অনেক সময়, কিন্তু রঘুপতির নাগাল পায় নি সে। ওই নক্ষত্রগুলোর মতোই রঘুপতি দূরে অনেক দূরে থেকে গেছে। অনেক যুগ্ম-নক্ষত্র দেখিয়েছিল রঘুপতি। সপ্তর্ষি-মণ্ডলে বৃষরাশিতে, বৃশ্চিকরাশিতে, আরও অনেক নক্ষত্রমণ্ডলীতে—দূর থেকে ঠিক মনে হয় তারা যেন পাশাপাশি আছে, কিন্তু রঘুপতি বলেছিল ওদের মধ্যেও নাকি লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যবধান। রঘুপতির সঙ্গে তার যখন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তখন স্বাতি বলেছিল, ওরা মানিকজোড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়, রঘুপতির মতলব বোধহয় কিনিকে বিয়ে করে বিষয়টা হস্তগত করা। স্বাতি বুঝতে পারে নি যে রঘুপতি যদিও তার পাশে পাশে ঘুরেছিল কিছুদিন, কিন্তু সে ছিল লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। স্বাতির আসল নাম কি তা সে জানে না। তার বাবা সাতকড়ির রক্ষিতা ব'লে তাকে সবাই স্বাতি ব'লে ডাকে। তার বাবা তাকে আলাদা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন একটা। স্বাতি একদিন কলেজে এসে দেখা করেছিল তার সঙ্গে। ও রকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রকাণ্ড একটা বুইক গাড়ি করে এসেছিল। কিঙ্কিণীর ক্লাস ছিল তখন। কমন রুমে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল সে। হঠাৎ স্বাতি এসে ঢুকল আর তার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। পাশের চেয়ারটা খালি ছিল, কমন রুমে কেউ ছিল না তখন।

"তোমার নাম কিনি, নয় ?"

"হ্যাঁ। আপনাকে তো দেখিনি কখনও—"

"আমার নাম শুনেছ নিশ্চয়। সকলে আমাকে স্বাতি ব'লে ডাকে। আমি সম্পর্কে তোমার মা হই—"

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিল কিঙ্কিণী। খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারে নি। স্বাতিই আবার বলেছিল—"আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। সাথী হতে চাই তোমার। ভাব করবে আমার সঙ্গে ?"

তবু কোনও উত্তর দেয় নি সে।

নির্নিমেষে চেয়েছিল সে স্বাতির মুখের দিকে। হঠাৎ সে দেখল স্বাতির মুখে যদিও হাসি কিন্তু চোখের কোণে জল টলমল করছে। তবু কয়েক মুহূর্ত কিছু

বলতে পারে নি সে। শেষে বলেছিল—"কোনও মান্বষ কোনও মান্বষের বন্ধ্ব হতে পারে না। মান্বষের সঙ্গে মান্বষের সম্পর্ক সব সময়েই স্বার্থের সম্পর্ক। সেই স্বার্থের কথাটাই আগে বল্বন—"

"তোমার একজন বন্ধ্ব তো আছে—"

"কে ?"

"রঘ্বপতি !"

"রঘ্বপতির সঙ্গে বন্ধ্বত্ব করবার যোগ্যতা আমার নেই।"

"কিন্তু তোমরা তো একসঙ্গে ঘ্বরে বেড়াতে। এমন কি রাত্রেও সে তোমার বাড়িতে যেত এ খবর পেয়েছি !"

"আমরা দ্বজনে আকাশ চর্চা করতাম। আকাশের নক্ষত্র চেনবার আগ্রহ হয়েছিল আমার, তাই তাকে অন্বরোধ করেছিলাম আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দেবার জন্য। সে দয়া করে রাজি হয়েছিল। তার সঙ্গে সম্পর্ক এর চেয়ে বেশী নয়।"

"তাকে তোমার ভালো লাগে নি ?"

"খ্বব। তারও যদি আমাকে ভালো লাগত আমি কৃতার্থ হয়ে যেতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। রঘ্বপতি অন্য জাতের লোক। আপনারা আমাদের নামে যে কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করেছিলেন তা আমি শ্বনেছি, কিন্তু জেনে রাখ্বন তা মিথ্যা। টাকা দিয়ে রঘ্বপতির মতো ছেলেকে কেনা যায় না। সে যা চায় তা আমাদের আয়ত্তে নেই।"

"কি সেটা ?"

"তা-ও জানি না। ও আলোর মতো যতক্ষণ তোমার বারান্দায় আছে, যখন থাকবে না তখন কোনও লোভ দেখিয়েই তাকে রাখা যাবে না। ও রোদের মতো, জ্যোৎস্নার মতো—"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাতি বলেছিল—"আহা, আমি যদি ওর মতো হতে পারতাম—"

কয়েক ফোঁটা জল এর পর গড়িয়ে পড়েছিল স্বাতির গাল বেয়ে।

"আপনি কাঁদছেন কেন ?"

"আমার দ্বঃখ তুমি ব্বঝবে বলেই তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি তো জানি আপনি স্বখেই আছেন। অভিজাত পাড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ি আপনার, দ্বটো গাড়ি, দাই, চাকর, দরোয়ান, শফার, মাসে হাতখরচের জন্য কত পান তা জানি না কিন্তু অনেক পান নিশ্চয়ই—এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার দ্বঃখ থাকে তাহলে তা আপনাকেই মোচন করতে হবে, আর কেউ তো তা পারবে না—"

"তুমি পারবে—"

"আমি ? কি ক'রে ?"

"আমাকে ঘৃণা না ক'রে। আমাকে সবাই ঘৃণা করে—এমন কি যে বাপ-মায়ের দারিদ্র্যমোচনের জন্যে আমি এই ঘৃণিত পথে পা বাড়িয়েছি তারাও ঘৃণা করে আমাকে। আর তোমার বাবাকে তো চেনই, তিনি আমাকে ব্যবহার করেন, ভালোবাসেন না। আমি ঘৃণার শরশয্যায় শ্বয়ে আছি। তুমি আমাকে বাঁচাও কিনি অন্তত একজন

যে আমাকে ঘৃণা করে না এই সান্ত্বনাটুকুই আমি পেতে চাই। আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট হবে”

“কিন্তু আমি যে আপনাকে ঘৃণা করি—”

“তুমি এতো লেখাপড়া শিখেছ, তোমার মায়ের দুঃখ ঘুচিয়েছ আমার দুঃখটা তুমি বুঝবে এই আশা ক'রে এসেছিলাম। ক্রীতদাসীকে ঘৃণা কর তুমি? বলির পশুকে ঘৃণা কর? যে উড়ন্ত পাখিকে তীর মেরে ব্যাধ মাটিতে নামিয়ে আনে—তাকে ঘৃণা কর তুমি?”

“আপনি তো স্বেচ্ছায় এ জীবন বরণ করেছেন ওদের সঙ্গে আপনার তুলনা চলে না। আপনি টাকার লোভে স্বেচ্ছায় যে পথে নেমেছেন সে পথে ভদ্রসমাজ চলা-ফেরা করে না। তাদের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ভালবাসা আপনি কখনও পাবেন না।”

“তুমি বিশ্বাস কর স্বেচ্ছায় আমি এ পথে আসি নি। আমার বাবা পক্ষাঘাতে পঙ্গু, আমার মা অন্ধ, আমার ভাইটা লেখাপড়া শেখে নি সে একটা গুণ্ডা। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সে তোমার বাবার মিলে চাকরি করে, সেই আমাকে জোর ক'রে দিয়ে এসেছে তোমার বাবার কাছে। স্বেচ্ছা? স্বেচ্ছা ব'লে আজকাল আছে না কি কিছু আমাদের? ধনীরা স্বেচ্ছাচারী, গুণ্ডারা স্বেচ্ছাচারী, যারা ভদ্র তারা অসহায়। আমি আত্মহত্যা করতে পারতুম, কিন্তু তা পারি নি। মরতে আমার ভয় করে।”

“কিন্তু ভীতুকে কে শ্রদ্ধা করবে বলুন!”

“আমি শ্রদ্ধা চাই না, তোমাদের একটু অনুকম্পা চাই। আর একটা কথা শোন—আমি হয়তো একদিন আত্মহত্যাই ক'রে ফেলতাম, জীবন আমার দুর্বহ, কিন্তু আমি বেঁচে থেকে তোমার বাবার মনোরঞ্জন করছি বলে আমার পঙ্গু বাবা আর অন্ধ মা সুখে আছেন, আমার গুণ্ডা ভাইটার একটা চাকরী হয়েছে, আইনত যিনি আমার স্বামী তিনি আর একটা বিয়ে করেছেন—সব হয়েছে তোমার বাবার টাকায়। আমি বেঁচে আছি বলেই তোমার বাবা টাকা দেন। ম'রে গেলে আর দেবেন না। তাই ওদের মুখ চেয়েই আমি বেঁচে আছি। তোমরা ভদ্রলোক, আমার দুঃখের কথা, আমার ত্যাগের কথা তোমরা হয়তো বুঝবে না। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম তুমি একটু অন্যরকম হবে। তাই তোমার কাছে এসেছিলাম।”

“আমি কি করব বলুন?”

“আমি কি বলব বল। আমার নিজের দুঃখের কথা তোমাকে খুলে বললাম এখন তোমার যা খুশি কর।”

কিঙ্কিণী চুপ ক'রে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলেছিল, “আপনার কথা শুনে দুঃখ হচ্ছে খুব। আপনি যেমন আছেন তেমনিই থাকুন। ওই নাগপাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সামর্থ্য আপনার যখন নেই তখন—”

“সামর্থ্য আছে, কিন্তু আমি যদি চ'লে আসি আমার পঙ্গু বাবা আর অন্ধ মার কি হবে। তাঁদের সেবার জন্যে আমি এখন মাসে পাঁচ শ' টাকা খরচ করতে পারি, চলে এলে তা তো পারব না—”

কিঙ্কিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভেবেছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলেছিল “আমি যদি আপনার বাবা মায়ের খবর দিই, আপনি চলে আসতে পারবেন?”

"পারব—"

"আমার বাবা কি তাতে বাধা দেবেন না?"

"বাধা দেবেন কি না জানি না। শুধু এইটুকু জানি,—আমার সম্বন্ধে তাঁর আর মোহ নেই। তিনি এখন একটি ইহুদী তরুণীকে নিয়ে ব্যস্ত। তার জন্যে চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটা বড় হোটেলে তিনি খান কয়েক ঘর ভাড়া নিয়েছেন, নিজেও সেখানে থাকেন—তার জন্যে ফ্ল্যাট কিনবেন শুনেছি—"

কিঙ্কিণী মাথা হেঁট করে বসে রইল। নিজের মৃত্যু কামনা করছিল সে ব'সে ব'সে। যে পিতার সম্বন্ধে আমাদের দেশে বলা হয়েছে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ—তার অদৃষ্টক্রমে সেই পিতাই এমন পিশাচ হল কেন? হঠাৎ তার মনে পড়েছিল বাবার সেই কান্নাটা। হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিলেন তিনি তার সামনে। সেটা কি নিছক মাতালের কান্না? সেটা কি তাঁর অসহায় কামনা-পীড়িত আর্ত ব্যক্তিত্বের হাহাকার নয়?

"আপনি যদি আমার বাবার আশ্রয় ছেড়ে চ'লে আসেন তাহলে মাসে মাসে আমি পাঁচ শ টাকা দেব। আপনার ঠিকানাটা দিন আপনাকে চেক পাঠিয়ে দেব সেখানে।"

"কিন্তু আমি আরও কিছু চাই—"

"কি বলুন।"

"আমি তোমাকে চাই। তুমি আমার বাড়িতে এস একদিন। দেখে যাও আমার অসহায় বাবা-মাকে। আর দেখে এসো আমার সিফিলিসগ্রস্ত বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে। সে তোমারই বাবার সন্তান—"

হঠাৎ একটা উচ্ছলিত অট্টহাস্যে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। কিঙ্কিণীর চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে গেল। সে অতীতে ফিরে গিয়েছিল, ওই অট্টহাসির রূঢ় আঘাতে সহসা ফিরে এল বর্তমানে। চোখে পড়ল সেই লীলালাস্যময়ী কলহাস্য মুখরা ঝর্ণাধারা, আর সেই তিনটি নিঃসঙ্গ তুষারাবৃত পর্বত। পাহাড় তিনটির স্বর্ণকান্তি আর নেই, রোদ স'রে গেছে, বহুবর্ণরঞ্জিত মেঘের পাগড়ি প'রে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কিঙ্কিণীর মনে হল তার দিকে চেয়ে তারাও যেন হাসছে নীরবে। তার দুঃখ, তার লজ্জা, তার বেদনা, তার অপমান, তার অতীত জীবনের সমস্ত গ্লানি মুহূর্তে যেন তুচ্ছ হয়ে গেল তার কাছে। আনন্দ-তরঙ্গের স্রোতে সামান্য খড়কুটোর মতো সব ভেসে গেল যেন। অভিভূত হ'য়ে ব'সে রইল সে। উমা আর পার্বতীকে দেখা গেল দূরে। খাবার নিয়ে আসছে তারা। তবু বসে রইল কিঙ্কিণী। ভয় হচ্ছিল যে আনন্দ অভিভূত করেছে তাকে, উঠলেই তা আর থাকবে না। কিন্তু উঠতে হল আর একটা কারণে। হঠাৎ সে দেখল দমন দেও একমুখ হেসে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তার ঘাড়ে একটা বস্তা।

"আপনার কপাটটা খোলা দেখলাম, তাই ঢুকে পড়েছি। আমাকে ভোলেননি আশা করি। এক ট্রেনেই আমরা এসেছি এখানে—"

কিঙ্কিণীর কপাট সর্বদাই খোলা থাকে। সে মনে মনে আশা করে রঘুপতি আসবে কোনদিন। কখন তার আসবার ইচ্ছে হবে তা তো সে জানে না। আন্দাজও করতে পারে না। তাই তার কপাট সব সময়ই খোলা থাকে। একদিন এক পাল পাহাড়ী ছাগল ঢুকেছিল, কিন্তু তাকে দেখেই পালিয়ে গিয়েছিল তারা। তারপর আর

কেউ আসে নি। তার উপত্যকার পুকুরটিতে মাঝে মাঝে একজোড়া রাজহংস নামে এসে। ধপধপে শাদা রাজহংস। কোনও শব্দ করে না। নীরবে ভেসে ভেসে বেড়ায় নীলকমলের বনে। খুব ভোরে আসে। খানিকক্ষণ থাকে তারপর উড়ে যায়। উড়ে যায় ওই বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোর ওপারে। দমন দেও আসবে এ প্রত্যাশা করে নি কিঙ্কিণী। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সে দমন দেওয়ের দিকে। চোখাচোখি হতেই দমন দেও একবার হাসল, তারপর কাঁধের বস্তাটা নামিয়ে রীতিমত অভিবাদনের ভঙ্গীতে নমস্কার করল কিঙ্কিণীকে।

"আমি তোমার কাছেই একটা উপত্যকায় থাকি। তোমার কপাট রোজই খোলা দেখি। মনে করি আসব, আবার ভাবি তুমি হয়তো রাগ করবে। আজ—"

পার্বতী এসে পড়াতে দমন দেও থেমে গেল।

পার্বতী বলল—"আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। আসুন—"

"তুমি খেয়ে এস।"—দমন দেও তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"আমি অপেক্ষা করছি—"

খাওয়া শেষ করে কিঙ্কিণীর একবার মনে হলো ওই অসভ্য লোকটার সঙ্গে আর সে দেখা করবে না। ট্রেনে লোকটা তার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছিল তা মনে পড়ল। হাত ধরে টেনে জোর করে বসিয়ে দিয়েছিল নিজের কাছে। সেই ভদ্রলোক না থাকলে, আর সেই সাপটা ফণা তুলে না দাঁড়ালে···হঠাৎ সব গুলিয়ে গেল আবার। যে ট্রেনে সেদিন সে চড়েছিল সে ট্রেন কি সত্যিই ট্রেন? গুণ্ডার ভয়ে সে মাঠামাঠি ছুটেছিল অন্ধকারে, মোটরে করে পালিয়েছিল কলকাতা থেকে, কিছু দূরে গুণ্ডার মোটরটাও ছুটেছিল তার পিছু পিছু। সে হঠাৎ ড্রাইভারটাকে বলেছিল—তুমি মোটরটা নিয়ে চলে যাও, আমি এখানে নেবে যাই—ওদের মোটরটা তোমার পিছু পিছু যাক—যতদূর পার ভুলিয়ে নিয়ে যাও ওকে—আমি এখান থেকে নেবে চলে যাব। অন্ধকার মাঠের ধারে নেবে পড়েছিল সে—তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল ট্রেনটাকে। খানাখন্দ পেরিয়ে অনেকবার হোঁচট্ খেয়ে অনেকবার পড়ে গিয়ে অনেক দূর আসার পর যখন কোথাও কোনও আশার আলো তার চোখে পড়ছিল না, তখন সেই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ, নিরুপায় মুহূর্তে তার মনে মনে কি ভগবানের কথা জাগে নি? জেগেছিল। তার পিসিমার সেই শিবঠাকুরকেই মনে মনে প্রার্থনা করছিল সে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও—হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই করেছিল, হয়তো তার আপাত-স্পষ্ট জ্ঞানের মুখোশটা খুলে পড়েছিল তখন, হয়তো ক্ষণিকের জন্য সে এমন একটা আশ্রয় পেয়েছিল যা নির্ভরযোগ্য, দারুণ দুর্যোগের অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে সে হঠাৎ হয়তো দাঁড়িয়ে পড়তে পেরেছিল সেই অটল প্রস্তরভূমির উপর যার নাম একান্ত বিশ্বাস, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে হয়তো যে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল, তার ফলেই এই সব অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পংখী যাকে পরম মুহূর্ত বলছিল সেই পরম মুহূর্তেই সে প্রবেশ করেছে হয়তো, তাই সম্ভবঅসম্ভবের পুরোনো ফরম্যুলা হয়তো খাটছে না আর। হঠাৎ তার মনে হল বাস্তবজীবনেও সে ফরম্যুলা কি ঠিক আছে? ফোন, রেডিও, প্লেন, মহাকাশ ভ্রমণ, বিজ্ঞানের আরও অসংখ্য আবিষ্কার কি প্রমাণ করছে না যে আজ যা অসম্ভব কাল তা সম্ভব হচ্ছে, কিম্বা হবে। চাঁদের কাছাকাছি আমরা যেতে পারব তা কেউ কি ভেবেছিল কোনদিন? তাহলে এখন যা দেখছি তা অসম্ভব

বলে মনে হচ্ছে কেন? ওই ডাকাতটাকে তার ভয়ই বা করছে কেন। ওর চেহারায় সে রকম উদ্ধত ভাব তো নেই। হয়তো অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। হয় তো ও ভদ্র হ'য়ে গেছে। দেখাই যাক না কি বলে। বেরিয়ে এসে চমকে গেল কিঙ্কিণী। দেখল দমন দেওয়ের কাছে একটি বিরাট সিংহ বসে আছে। নিবিষ্ট মনে নিজের থাবা চাটছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দমন দেও হেসে বলল, "ভয় পেও না, ও আমার পোষা সিংহ, তোমাকে কিছু বলবে না।"

"পোষা সিংহ? এখানে সিংহ কোথা পেলেন।"

"সিংহ আমার মধ্যেই ছিল। মহাদেবের কৃপায় ওটাকে আমার ভিতর থেকে বার করে ফেলতে পেরেছি। ও এখন পোষা কুকুরের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।"

"আপনার ভিতরে ছিল ওই সিংহটা?"

হাস্যোদ্ভাতি হ'য়ে উঠল দমন দেওয়ের মুখ।

"আমার মধ্যে যে হিংস্র প্রবৃত্তি ছিল তার চেহারা যে সিংহের মতো তা আমিও জানতাম না। যখন বেরিয়ে এল তখন দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম—।"

"কি করে বেরিয়ে এল।"

"মহাদেবের কৃপায়। তিনি বললেন তুমি আন্তরিকভাবে একাগ্র হয়ে যা ইচ্ছা করবে তাই হবে। সত্যিই একদিন ইচ্ছা করলাম আমি ভদ্র হব, আমার মধ্যে যে পশু আছে সে বেরিয়ে যাক। আমি চোখ বুজে একাগ্র হয়ে এই ইচ্ছা করছিলাম, হঠাৎ চোখ খুলে দেখলাম সিংহটা আমার সামনে ব'সে ল্যাজ আছড়াচ্ছে। তার দিকে চাইতেই সে মানুষের ভাষায় বললে—আমি তোমার ইচ্ছায় তোমার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি। তুমি না চাইলে তোমার ভিতরে আর ঢুকব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব বরাবর।"

"আশ্চর্য তো। মহাদেবের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

দমন দেও মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ কথার উত্তর দিল না। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল সে।

"এইবার আমি যারজন্য এসেছি তা বলি—"

এই ব'লে সে নিজের বস্তাটি খুলে যা বার ক'রে রাখল, তা দেখে অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী। অনেক মোহর, অনেক জড়োয়া গহনা, অনেক হীরা, মুক্তা, পান্না, চুনী, স্তূপীকৃত ক'রে ফেলল সে বারান্দার উপর। অবশেষে পকেট থেকে ডিমের মতো প্রকাণ্ড একটা গোলাপী পাথর বার ক'রে বলল—"এটা পদ্মরাগ মণি। দুর্লভ রত্ন—।"

"কোথায় পেলেন এসব—"

"ডাকাতি ক'রে সঞ্চয় করেছিলাম। একটা জঙ্গলে পোঁতা ছিল। পংখীকে একদিন বললাম এনে দাও ওগুলো আমাকে। আমার সারাজীবনের সঞ্চয় ওভাবে নষ্ট হোক এটা আমি চাই না। পংখী এনে দিয়েছে কাল। এখন তোমার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে—"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিঙ্কিণী।

"এগুলো তুমি নাও। সত্যি আমি তাহলে কৃতার্থ হব।"

"আমি? আমি কি করব এসব নিয়ে!"

"কি করবো তা তুমি ঠিক কোরো। কিন্তু তুমি যদি না নাও তাহলে আমার কর্ম-

শক্তি পঙ্গু হয়ে যাবে। কারণ ডাকাতি করা ছাড়া আর কিছুতেই আমার কৃতিত্ব নেই। প্রবৃত্তিও নেই। কিন্তু ডাকাতি ক'রে যা পাব তা কাউকে দিতে না পারলে উৎসাহই থাকবে না আমার—"

"কেন আপনার আপনজন নেই কোথাও ?"

"বাপ মা বাল্যকালে মারা গেছেন। তাদের কথা আমার ভাল মনে নেই। তাঁরাও চুরি ডাকাতি করতেন। আমাকে মানুষ করেছিলেন ডাকু শের সর্দার। তাঁর ফাঁসী হয়ে গেছে। তাঁর মেয়ে কাজরীকে আমি ভালবাসতাম। তাকে জোর ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে যে গুণ্ডা পালিয়েছিল তাকে আমি হত্যা করি। হত্যা ক'রে ধরা পড়েছিলাম, জেলে ছিলাম, হয়তো আমারও ফাঁসি হ'য়ে যেত, কিন্তু জেল থেকে আমি পালাতে পেরেছি—"

"কাজরী কোথা ?"

"সে আত্মহত্যা করেছে। সে থাকলে—"

চুপ করে গেল দমন দেও কিছুক্ষণের জন্য।

তারপর হঠাৎ বলল—"আমি তোমার মধ্যেই আবার কাজরীকে সৃষ্টি করব। তুমি কাজরী এই ভেবেই আমি তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব দেব। লুঠ করে আনব কুবেরের ভাণ্ডার। এনে তোমার পায়েই ঢেলে দেব সব। তুমি শুধু গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর—"

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না কিঙ্কিণী। এ উক্তি শুনে তার যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। কলেজজীবনে অনেক প্রণয়ী তার কাছে নানা সুরে প্রণয় নিবেদন করেছে, সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেছে সে। কাউকে রূঢ়ভাবে, কাউকে ভদ্রভাবে। তার মনে হল দমন দেও যা বলছে তার ভাষাটা যদিও হেঁয়ালির মতো, কিন্তু ভাবটা স্পষ্ট। অর্থাৎ সেও প্রণয় নিবেদন করছে। সে কাজরীকে তার মধ্যেই আবার সৃষ্টি করতে চায়—তার মানেই·· একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। রাগ হল না। বরং তার মনে হল পরম মুহূর্তের অসম্ভব কাণ্ডকারখানার মধ্যে এও একটা নতুন ধরনের সুর বাজছে। কিন্তু কোন কথা বলল না সে। স্মিতমুখে চেয়ে রইল শুধু।

"তুমি কোন উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"যেখানে এসেছি সেখানে সব অসম্ভবই সম্ভব হয় দেখছি। আমার মতামতের কি মূল্য আছে এখানে ? আপনি আমার মধ্যেই আপনার কাজরীকে সৃষ্টি করবেন বলছেন—হয়তো এই অসম্ভবের দেশে তা সম্ভব হবে—কিন্তু আমি কাজরী হতে চাই না, জানি না আমার স্বাধীন ইচ্ছার কোনও মূল্য আছে কি না এখানে—"

"স্বাধীন ইচ্ছারই চরম মূল্য এখানে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হবে না, হতে পারে না, হবার উপায় নেই। আমি শুধু তোমার কাছে আমার ইচ্ছাটা জানালাম। আমি তোমাকে স্পর্শও করব না, শুধু তোমার কাছে আমার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে যাব—এতে তুমি বাধা দিও না। আমি যা পাব তোমার বারান্দার উপর রেখে যাব, তুমি যদি সে সব স্পর্শও না কর তাহলেও যাব। আমার কাজরী আমার মনেই আছে, তাকে শুধু আমি আরোপ করব তোমার উপর—পাষাণ প্রতিমার উপর যেমন আরোপ করি মনের দেবতাকে—এতেও তুমি আপত্তি করবে ?"

"আপত্তি করলেও তো আপনি তা শুনবেন না মনে হচ্ছে।"

"শুনব। সিংহকে আমি বার ক'রে দিয়েছি আমার ভিতর থেকে। জোরজবরদস্তি করছি না তাই। মিনতি করছি। মিনতি করছি তোমার অনিচ্ছা দিয়ে আমার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ কোরো না।"

"একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমাকেই কাজরী করতে চাইছেন কেন। এখানে কি অন্য মেয়ে নাই—"

"আছে। কিন্তু তারা সবাই উমারই নানা রূপ। আমরা যেখানে আছি সেখানে মহেশ্বরই একমাত্র পুরুষ, উমাই একমাত্র নারী। এখানে উমা মহেশ্বরই নানা রূপে আছেন। বাইরে থেকে মহেশ্বরই আমাদের নিয়ে এসেছেন হয়তো আমাদের মুক্তির জন্য। আমাদেরই কেন এনেছেন তা জানি না। কিভাবে আমরা এখানে এলাম তা তোমার অজানা নেই। ট্রেনে যখন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম তখনই আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, যে কাজরীকে আমি হারিয়েছি তাকেই বুঝি ফিরে পেলাম। কাজরী তোমারই মতো কালো ছিল, তার চোখের দৃষ্টিতেও সেই আগুনের আভা ছিল যা তোমার চোখের দৃষ্টিতে আছে। সে-ও জেদী ছিল তোমার মতো। সে অসাধ্যসাধন করতে পারত। দুরারোহ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারত, দুরন্ত ঘোড়াকে বশ করতে পারত। তরোয়াল নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যেত শত্রুর বিরুদ্ধে। সে ছিল বীরাঙ্গনা। তোমার মধ্যেই সেই বীরাঙ্গনাকে প্রত্যক্ষ করছি আমি। আমার মনে হচ্ছে—"

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল পংখী আসছে। আকাশপথে পাখির মতো উড়ে আসছে। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল কিঙ্কিণী সেদিকে।

"পংখী উড়তে পারে না কি!"

"হ্যাঁ। ও সব পারে। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় পংখীর বেশে মহাদেবেরই কোন শক্তি ছদ্মবেশে আমাদের দেখাশোনা করছেন। পংখী সাধারণ লোক নয়।"

"আচ্ছা, সেই ভদ্রলোক কোথা? যাঁর রিজার্ভড কম্‌পারটমেণ্টে আমরা চড়েছিলাম? তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয়েছে আপনার?"

একবার হয়েছিল। তিনি বললেন, 'আমি যে কালীমন্দিরের মহাদেব মিশ্র ছিলাম সেই কালীমন্দিরেই আবার ফিরে যাচ্ছি। সেখানে কালীর সেবা ঠিক মতো হচ্ছে না। যিনি সেখানে পৌরোহিত্য করছিলেন তাঁর পুজো করার দিকে তত মন ছিল না, ডাকাতি করার দিকেই মন ছিল বেশী। মা কালীকে তিনি ডাকাতদের নেত্রী ক'রে তুলেছিলেন। কালী ডেকেছেন আমাকে, তাই আমাকে সেই পাহাড়ে ফিরে যেতে হচ্ছে, কারণ সেই পুরোহিত সর্পাঘাতে মারা গেছে সম্প্রতি। পুজোর একটা সুব্যবস্থা ক'রে ফিরে আসব আমি আবার।' এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।"

পংখী এসে পড়ল।

"যে কথাটা বলতে এলাম—সেটা এই বারান্দায় মর্মর পাথরের পরদা টাঙানো হয়ে গেছে। আপনার বর্তমান জীবনের ছবি আপনি দেখতে পাবেন সেখানে—"

"শুধু আমার জীবনেরই ছবি দেখতে পাব? আর কারোর নয়?"

"আপনার বর্তমান জীবনের সঙ্গে যাঁরা যাঁরা-সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁদের সবাইকেই দেখতে পাবেন। তাঁদের কথাও শুনতে পাবেন—"

"কিঙ্কিণী দমন দেওকে দেখিয়ে বলল—"এঁর জীবন যদি দেখতে চাই—"

"তাও পাবেন, ইনি যদি আপত্তি না করেন। ইনি আপত্তি করলে ও'র ছবি ফুটবে না। এখানে মহাদেবের রাজত্বে স্বাধীন ইচ্ছারই সর্বোচ্চ দাবী। তিনি নিজেও খাম-খেয়ালী, স্বাধীন। অতুল ঐশ্বর্যের মালিক তিনি, স্বয়ং কুবের তাঁর ধনরক্ষক, তবু স্বেচ্ছায় তিনি ভিখারীর মতো বাস করেন শ্মশানে মশানে। তিনি ধ্বংসের দেবতা, কিন্তু আর্ত আতুরকে রক্ষা করাই তাঁর বিলাস। আপনারা কে কখন তাঁকে ডেকেছেন তা আপনারাও জানেন না, কিন্তু তিনি জানেন। যে পরম মুহূর্তটিতে তাঁর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ ঘটেছিল সেই পরম মুহূর্তেই এখন বাস করছেন আপনারা! সেই পরম মুহূর্তের পরম বাণী স্বাধীনতা। এখানে কারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় না। দমন দেও যদি আপত্তি না করেন, অবশ্যই আপনি তাঁর জীবনকাহিনী দেখতে পাবেন ওই পাথরের পরদায়। আর একটা কথা জিগ্যেস করতে এসেছি। দুজন অতিথি এসেছেন এখানে। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। এঁদের আপনি দেখেছেন। এঁরা ট্রেনে ধূর্জটির জন্য বেল আর দুধ এনেছিলেন। ভদ্রলোকের নাম রত্ন আর মেয়েটির নাম ঝিলিক।"

"কে ও'রা—"

"তা ও'দের সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। ও'দের আসতে বলি?"

"বলুন।"

পংখী অন্তর্ধান করল।

দমন দেও বলল—"আমার প্রার্থনা তাহলে মঞ্জুর হ'ল তো?"

"আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমার এই বারান্দার উপর ধনরত্ন স্তূপীকৃত ক'রে আপনি যদি আনন্দ পান তাহলে সে আনন্দের অন্তরায় অবশ্য আমি হব না। কিন্তু আমি জানি আপনার কাজরী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। এ সব ধনরত্ন নিয়েই বা আমি কি করব, তা-ও আমি জানি না। আপনার ওই পদ্মরাগ মণি আর ওই সামান্য পাথরের নুড়িটা তো এখানে সমমূল্য—ও নিয়ে গর্ববোধ করার উৎসাহ নেই আমার।"

"সম-মূল্য স্বীকার করছি, কিন্তু সম-রূপ কি? ওই পদ্মরাগ দ্যুতি কি টাকা দিয়ে কেনা যায়? যে লোকটার কাছ থেকে ওটা কেড়ে এনেছি সে না কি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে ওটা কিনেছিল। সোনার হারে গেঁথে দুলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেয়সীর গলায়। কিন্তু মানায় নি সেখানে। কারণ তার প্রেয়সীর আসল রূপ ছিল না, আসল রূপ থাকে মনে, আসল রূপ থাকে চরিত্রে, আসল রূপ থাকে সংযমে, আসল রূপ শক্তির রূপ—সেই রূপ যার মুখে প্রতিফলিত হয় তিনিই রূপসী। পতিতার মুখে সে রূপ থাকে না, তাই তার গলায় ওই পদ্মরাগ মণি মানায় নি। কাজরীর গলায় মানাতো, তোমার গলাতেও মানাবে। পদ্মরাগ মণিতে যে দীপ্তি আছে তা-ও শক্তির দীপ্তি। তুমি ওটা পোরো। আমি কৃতার্থ হব। আমি এখন যাচ্ছি। ঝিলিক আর রত্ন আসছেন—"

"ওরা কে, চেনেন আপনি?"

"না। তবে মনে হয় ও'রা ছদ্মবেশী দেবতা। মহাদেব ওদের খুব খাতির করেন। আচ্ছা, আমি চলি।"

দমন দেও চলে গেল। তার সিংহও গেল তার পিছু পিছু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলেন রত্ন আর ঝিলিক। বকুল ফুলের গন্ধে ছেয়ে গেল চারিদিক।

আসুন। আপনাদের কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব জানি না।"

"এই যে অভ্যর্থনার অর্ঘ্য আমরা এনেছি"

কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল উমা আর পার্বতী দু ডালি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাত থেকে ডালি দুটি নিয়ে কিঙ্কিণী ফুলগুলি ঢেলে দিল তাদের পায়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল মুরজ মুরলী মন্দিরা, ভেসে এল বীণা বেণুর সুর। রোমাঞ্চিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। হঠাৎ তার মনে পড়ল ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা। তিনি তার হাত দেখে যা বলেছিলেন, যে গল্প শুনিয়েছিলেন, তাই কি মূর্ত হ'তে যাচ্ছে তার জীবনে? রত্নের হাতে পুষ্পধনু দেখে তার সন্দেহ রইল না যে ইনি মদন আর এঁর সঙ্গিনী রতি। সেই ভদ্রলোক যে গল্প শুনিয়েছিলেন তাতেও মদন-রতির আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা কি চান আমার কাছে? কেন এসেছেন দেখা করতে? একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"আপনারা শুনেছি দেবতা। দেবতা কখনও প্রত্যক্ষ করি নি। আপনারা বিনা আহ্বানে আমার কাছে এসেছেন এ জন্য আমি অভিভূত। কিন্তু আমার ভয় করছে।"

"কিসের ভয়!"

"ভয় আপনার এই ফুলধনুটিকে—"

রত্ন তাঁর কাঁধ থেকে শরপূর্ণ তূণীরটি নামিয়ে বললেন—"আমার এই ধনু আর শর আপনাকে দিতেই এসেছি আমরা। আপনি এগুলি নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারেন।"

ফুল-ধনু আর তূণীর কিঙ্কিণীর পায়ের কাছে রেখে রত্ন হাসি মুখে চাইলেন তার মুখের দিকে। স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। হঠাৎ সে যেন হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন দেখল রত্ন তেমনিভাবেই চেয়ে আছেন। ঝিলিকও চেয়ে আছেন সোৎসুকে।

কিঙ্কিণী হাসবার চেষ্টা করল একটু। তারপর একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল—"আমি বুঝতে পারছি না, এসব নিয়ে কি করব আমি। দেবতার অস্ত্র দেবতার কাছেই থাক। আমাকে দিচ্ছেন কেন?"

"আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় এবং স্বাধীন করবার জন্য। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তির দিকে আপনার মনকে আকৃষ্ট করতে আমরা চাই না। যে অস্ত্র দিয়ে তা করতে পারতাম তা আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম। আপনি যদি কাউকে আকর্ষণ করতে চান তাহলে আপনিই ব্যবহার করবেন আমাদের ধনুর্বাণ। আমরা কিছু করব না"

"কেন এরকম করছেন, কিছু বুঝতে পারছি না।"

"করছি ধূর্জটির ইচ্ছায়। তাঁর মনে হয়েছে আপনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে আছেন। আপনাকে তিনি নির্ভয় করতে চান। তাই দমন দেও আপনার কাছে নতি জানিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে গেল। দমন দেও আপনাকে ধনরত্ন দিয়ে গেছে, ধনরত্নই তার সর্বস্ব। আমিও আপনাকে আমার ধনুর্বাণ দিয়ে গেলাম কারণ ও ছাড়া আমারও আর কিছু নেই।"

ধূর্জটির ইচ্ছায়। "ধূর্জটির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে। আপনারও হবে।"

"কিন্তু হচ্ছে না তো।"

"যখন আপনি সুস্থির শান্ত হ'য়ে বসবেন তখনই হবে। ধূর্জটি চান আপনি সুস্থির শান্ত স্বস্থ হোন। তা না হলে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। আপনার ভয়, আপনার অশান্তি, আপনার অস্বস্তি আড়াল ক'রে রেখেছে ওঁকে। আপনার কাছেই উনি। সর্বদা আছেন, কিন্তু আপনার চেতনায় মূর্ত করতে পারছেন না নিজেকে—"

"তিনি শুনেছি সর্বশক্তিমান, তাঁর এ অক্ষমতা কেন?"

"ওখানেই তাঁর রহস্য। তিনি স্থাণু। তিনি অপেক্ষা করতে পারেন, অপেক্ষা করতে চান। আলোর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন বন্ধদ্বারের সামনে। দ্বার খুললেই দেখতে পাবেন তাঁকে।"

অন্যমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। এ বন্ধদ্বার সে খুলবে কেমন ক'রে? তাছাড়া খোলবার দরকার আছে কি? আমার মতো সামান্য প্রাণীকে নিয়ে এঁরা মাথা ঘামাচ্ছেনই বা কেন—!

হঠাৎ চমকে উঠল সে। ঝিলিক হাসিমুখে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

"আজ চললুম ভাই। আবার আসব আপনার কাছে। আসব আপনার রান্না খেয়ে মুখ বদলাতে—"

"এখানে তো রান্না আমি করি না। করে পার্বতী আর উমা।"

"আপনি যদি করতে চান, ওরা বাধা দেবে না। এবার যখন আসব তখন সরষে বাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝাল খেয়ে যাব। বাংলাদেশের মেয়েরা ও রান্নাটায় না কি পারদর্শিনী। পংখীকে বললেই ও সব এনে দেবে। তাছাড়া আর এক রকম মুখ বদলাবার জন্যেও আসব—"

"আর এক রকম মানে?"

"ঘোঁট করতে আসব। ভালো কথা শুনে শুনে কান প'চে গেছে। পরনিন্দা, পরচর্চা, একটু আধটু কেচ্ছা বেশ লাগে—" খিলখিল করে হেসে উঠল ঝিলিক।

"আপনাদের স্বর্গে ওসব নেই?"

"স্বর্গে তো আর কেউ মরে না। অমরদের নিয়ে সব কেচ্ছাই পুরানো হয়ে গেছে। ইন্দ্র মাঝে মাঝে বদল হন। আগে যিনি ইন্দ্র ছিলেন, তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ রসিক লোক—অনেকটা গ্রীক দেবতা জিউসের মতো। মর্ত্যে গিয়েও প্রেম করতেন। কেচ্ছার খোরাক পাওয়া যেত অনেক। আজকাল যিনি ইন্দ্র হয়েছেন তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। শচীর দিকেও তাকান না ভালো ক'রে। দেবগুরু বৃহস্পতির ভক্ত। শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকেন সদাসর্বদা। সুতরাং স্বর্গীয় আব-হাওয়াটা ঝাল-টক-নুন বর্জিত চরুর মতো হয়ে এসেছে অনেকটা। আসব আপনার কাছে মাঝে মাঝে। আমাদের ধনুর্বাণটি যত্ন করে রাখবেন কিন্তু"

"ওটা আমার কাছে রেখে যাচ্ছেন কেন? নিয়ে যান। ওটা আপনাদের হাতে না থাকলে সৃষ্টিকার্য বন্ধ হয়ে যাবে—"

মৃদু হেসে ঝিলিক চাইলেন রত্নর দিকে।

বললেন, "তুমিই এর জবাব দাও।"

রত্ন সদাহাস্যমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু।

তারপর বললেন—"ছাগল, কুকুর প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ সাধারণ জীব যে আবেগের বশে সৃষ্টি-রক্ষা করে সে আবেগের সঞ্চার স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই করেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে। সৃষ্টিরক্ষা ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই। আমাদের ডাক পড়ে মহাসৃষ্টির সময়। কার্তিকের উদ্ভবের জন্য যখন মহাদেবের তপোভঙ্গের প্রয়োজন হয়েছিল তখন আমার ডাক পড়েছিল। জীবন তুচ্ছ করেও এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কি হয়েছিল তা তো আপনি জানেন। আপাতত মহাসৃষ্টির কোনও কাজ নেই। তাই আপনার কাছেই রেখে যাচ্ছি আমার ধনুর্বাণ। ধূর্জটির বিশ্বাস এতে আপনি নির্ভয় হবেন—"

"ধূর্জটি আমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন তা বুঝতে পারছি না।"

"আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন তিনি!"

"কিন্তু আমি তো তাঁকে কোন প্রার্থনা করি নি!"

জ্ঞাতসারে করেন নি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে করেছেন। যে অন্ধকারে আপনি তাঁকে খুঁজছেন সে অন্ধকারের খবর আপনিও জানেন না। সেই গভীর নিবিড় অন্ধকারে যে প্রার্থনা নির্বাক অথচ স্বতঃস্ফূর্ত তাই তিনি শুনতে পেয়েছেন। আচ্ছা, আজ আমরা যাচ্ছি। ধনুর্বাণটা রইল।"

"এ ধনুর্বাণ কি আমি ব্যবহার করতে পারব?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে—এই নির্জন পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় লক্ষ্য করবার মতো লোক পাবেন কি?"

কিঙ্কিণী দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

অন্তর্ধান করলেন রত্ন আর ঝিলিক।

সেই ঝরণার হাসি আবার স্পষ্ট হ'য়ে উঠল তার চেতনায়। পাহাড় তিনটির রূপ বদলেছে আবার। আগে মাথায় তাদের মেঘের পাগড়ি ছিল, এবার সর্বাঙ্গে মেঘের উত্তরীয়, মাথায় সোনার মুকুট। তার উপর ঘননীলের অদ্ভুত চন্দ্রাতপ, অসীমের অনন্ত পটভূমিকা। একদল বড় বড় রাজহংসের সারি উড়ে যাচ্ছে মালার মতো। মনে হচ্ছে তুষার পর্বতের বরফই যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে রাজহংস হ'য়ে। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে। বিস্মিত হবার ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়ে গেছে। সমস্ত পাহাড়গুলোই যদি পাখি হয়ে উড়তে থাকে তাহলেও অবাক হবে না সে। এখানে সবই হতে পারে এ বিশ্বাসটা মনে পাকা হয়ে গেছে তার। যে উপত্যকায় রঘুপতি থাকে সে উপত্যকাটার দিকে চেয়ে দেখল সে ঘাড় ফিরিয়ে। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একটা পাহাড়ের উপর পাহাড়ী কি একটা লতা অজস্র ফুল ফুটিয়েছে। আর একটা দূরের পাহাড় থেকে ঝরণা নাবছে, মনে হচ্ছে একটা রুপোলি স্বপ্ন কাঁপছে যেন। হঠাৎ একটা কাণ্ড ক'রে বসল কিঙ্কিণী। ফুলধনুটি তুলে নিল সে। তুলেই চমকে উঠল। ফুলধনু কথা বইছে।

"দেবি, কি উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যবহার করছেন তা আমাকে বলুন, তাহলে আপনার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে। কি বাণ ব্যবহার করবেন তা-ও আমি ব'লে দেব।"

"ওই যে উপত্যকাটি রয়েছে ওই দিকেই একটা বাণ নিক্ষেপ করতে চাই।"

"কোনও বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয় ?"

রঘুপতির নামটা বলতে পারল না সে। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে রইল।

"বলুন—"

আর একটু চুপ ক'রে থেকে কিঙ্কিণী বলল—"ওই উপত্যকায় যিনি থাকেন তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, তিনি আপনভোলা সন্ন্যাসী মানুষ। ওখানে রিসার্চ করছেন শুনেছি, হঠাৎ আমার মনে হল তিনি কি আমার দিকে একটু মনোযোগ দেবেন না ? কিন্তু এখন ভেবে দেখছি সেটা ঠিক হবে না—"

"তাঁর তপোভঙ্গ করতে চান না ? আমি মহাদেবের তপোভঙ্গ করেই কিন্তু বিখ্যাত হয়েছিলাম একদিন। ভস্মীভূত হয়েও আনন্দিত হয়েছিলাম উমার তপস্যা সার্থক করতে পেরেছিলাম ব'লে। আপনার জন্যে আবার ভস্মীভূত হতে রাজী আছি আমি—"

"না, আমি উমা নই। উমার মতো তপস্যা করি নি আমি। আমার মনের সামান্য দুর্বলতা এটা, এর জন্য আমি লজ্জিত। না, আমি তীর ছুঁড়ব না—"

পুষ্পধনু বলল, "একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন। দুর্বলতাই শক্তি অনেক সময়। বজ্র যখন হার মানে দু'ফোঁটা চোখের জলই তখন জিতে যেতে পারে। যাই হোক, আমরা অপেক্ষা ক'রে রইলাম, যখনই স্মরণ করবেন, সাড়া দেব। ওই আবার কে আসছে যেন।"

ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল পুষ্পধনু আর তূণীর। এদের এই আসা আর চলে যাওয়াটা কেমন যেন আকস্মিক কেমন যেন অদ্ভুত। টপ ক'রে আসে টপ করে চলে যায়। যেন টর্চের আলো। তারপর সে দেখতে পেল একটু কুঁজো হ'য়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে দিয়ে একটি রোগা লোক আসছে তার দিকে। খুব কাছে এসে লাঠির উপর ভর দিয়ে ঘাড়টা উঁচু ক'রে সে তাকাল কিঙ্কিণীর দিকে। লোকটির ভুরু পাকা, মাথায় টাক, ছোট গোল মুখ, চোখে চশমা, সাধারণ চশমা, চশমার দুটো ডাঁটিও নেই, একদিকে সুতো বাঁধা। গায়ের লম্বা জামাটা গরম জামা বলেই মনে হয়, কিন্তু নানা রঙের তালি দেওয়া সেটা। পায়ে জুতো আছে, কিন্তু তাও তালিমারা। লোকটি খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইল। তারপর বলল—"তুমিই কিঙ্কিণী না কি।"

"হ্যাঁ—"

"কি আপদ! আমি ভেবেছিলাম হোমরা চোমরা গোছের কাউকে দেখব। তুমি দেখছি আমার নাতনীর মেয়ে চাঁপার চেয়েও ছোট। তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম, কিন্তু তোমাকে দেখে যে দমে গেলুম গো। তুমি তো খালি মজার গল্প শুনতে চাইবে, কিন্তু মজার গল্প তো সব ভুলে গেছি—"

কিঙ্কিণী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"আরে, আরে ফট্ ক'রে পেন্নাম ক'রে বসলে। তুমি কি জাত গো। আমি যে কায়স্থ। তুমি কি—"

"আজ্ঞে আমি অস্পৃশ্য। আধুনিক ভাষায় হরিজন বলতে পারেন।"

"কি রকম ? হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর এদেরই তো হরিজন ব'লে শুনেছি।"

"আমি ওদের চেয়েও নীচু। আমার বাবা কালোবাজারী মাতাল, চরিত্রহীন গুণ্ডা।"

"কি আপদ। অনেক রকম ভণিতা জানো দেখছি, গড়গড় ক'রে মুখস্থ করা বুলি আউড়ে দিলে! তোমার বাবার উপাধি কি?"

"বিশ্বাস। আসলে কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক—"

"ও বাবা!"

উবু হ'য়ে বসে পড়লেন ভদ্রলোক মাটির উপর।

"ওখানে বসলেন কেন, আসুন, ভিতরে আসুন।"

"বিশ্বাসঘাতকের বেটিকে বিশ্বাস করব কি না ভাবছি। তাছাড়া আমি দামী চেয়ার ফেয়ারে বসতে পারি না। মাটিতে কম্বলের আসন বিছিয়েই বসেছি বরাবর, বড় জোর কাঠের পিঁড়ে—"

কিঙ্কিণী একটু বিব্রত বোধ করছিল, কম্বল কি পিঁড়ে তার কাছে তো নেই। হঠাৎ সে দেখল—পার্বতী তার ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলছে, "এই ঘরে কম্বল পেতে দিয়েছি! পিঁড়েও এনেছি একটা। আপনি আসুন—" বলেই সে মুখটা ঢুকিয়ে নিল ভিতরে। বোধহয় চলেই গেল।

"ওই এক মুশকিল এখানে বুঝলে? ইচ্ছাটি হওয়ামাত্রই তা পূর্ণ হয়ে যাবে। আমার এই পুরোনো জামাটার জন্য মন কেমন করছিল, সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হ'ল সেটা, জুতোটাও!"

"আসুন, ভিতরে আসুন—"

"চল—"

"আপনার পরিচয় তো দিলেন না"

"দেবার মতো পরিচয় নেই কোন। সবাই আমাকে বক ব'লে ডাকে।"

বকের নাম শুনেছিল কিঙ্কিণী।

"আসুন—"

"আমার নাম শুনে ভয় করছে না তোমার?"

"না, ভয় করবে কেন।"

"মহাভারত পড় নি বুঝি। বকরূপী এক রাক্ষসকে অমর ক'রে রেখে গেছেন বেদব্যাস। বক চারজন পাণ্ডবকে ঘায়েল ক'রে ফেলেছিল। পারে নি কেবল যুধিষ্ঠিরকে—"

কিঙ্কিণী বললে, "পড়েছি সে গল্প। আপনার এ নাম কে রেখেছিল, বাবা, মা, না, ঠাকুমা!"

"হল না, আন্দাজ করতে পারলে না। রেখেছিলেন আমার ঠাকুরদা, তিনি কবি ছিলেন। বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের নাম ফুল দিয়ে রেখেছিলেন। আমার নাম ছিল কুরুবক। কিন্তু আমাদের দেশে সব জিনিসকেই তো বেঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়ে দেয়—এইটে করতেই আমরা ওস্তাদ। আমার নামটাকে ক'রে দিলে ক্রূরবক। কেউ কেউ আবার বলত কুর্বক। ঘোঁতা ছুতোর বলেছিল স্ক্রু-বক্। শেষকালে বকটাই স্থায়ী হয়ে গেল। কুরু মারা পড়ল—"

ভিতরে ঢুকে দেখা গেল একটি পুরু কালো কম্বল বিছানো রয়েছে। একটি তাকিয়াও রয়েছে তার উপর। আর একধারে পিঁড়েও রয়েছে একটি।

বক লাঠিটি একপাশে রেখে কম্বলের উপর বসলেন। তারপর কিঙ্কিণীর দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি চেয়ারেই বস—"

"না, আমি আপনার পাশেই বসব।"

ব'সে পড়ল সে।

"বলুন, আপনার গল্প—"

"মজার গল্প একটাও মনে পড়ছে না কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মনে পড়েছে। খুব ছেলেবেলায় একটা প্রজাপতি ধরেছিলাম। ভেবেছিলাম সেটাকে পুষব। ভাবছিলাম কোথায় রাখব, বাবার আলমারিতে না, মায়ের তোরঙ্গে। ঠাকুরদাকে যদি বলি—আমাকে ছোট্ট কাচের বাক্স করিয়ে দাও, দেবে কি? এই সব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলাম, প্রজাপতিটা উড়ে গেল, হাত থেকে গেল ডানার একটা টুকরো। বেশ মজা? না? একটু পরে সেটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে আমার বোন ফল্গুতি। তার পর সেই ডানার টুকরোটা নিজের কপালে আটা দিয়ে সেঁটে সে দৌড়াতে লাগল আর বলতে লাগল আমি প্রজাপতি হয়েছি, আমিও উড়ছি। তারপর কি হল, শুনবে?"

"বলুন—"

"একটু পরেই মোটর চাপা পড়ে মারা গেল মেয়েটা। মানে প্রজাপতিটির মতো সেও উড়ে গেল চিরকালের মতো। মজা লাগছে?"

ম্লান হেসে কিঙ্কিণী বলল—"মরে গেল, এতে আর কি মজা—"

"ওইটেই তো আসল মজা।"

"ফল্গুতি আমাকে খামচে দিত আর আমি তার চুল ধরে টানতাম। এখন কি হয়েছে জানো? ওগুলো ফুল হয়ে ফুটে আছে মনে। ছেলে মেয়ে ভাই বোন নাতি নাতনী অনেক মরেছে, অনেক ফুলের অনেক মালা প'রে ব'সে আছি আমি—"

"দুঃখ হয় নি আপনার?"

"দুঃখ হয়েছিল বই কি। আমি তো সাধারণ মানুষ। অনেক কেঁদেছিলুম, ঠাকুরের পায়ে অনেক মাথা খুঁড়েছিলাম, ঠাকুর কোন সাড়া দেন নি। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখলুম, মন ফুলের মালা প'রে ব'সে আছে। হয়তো ওটা ঠাকুরেরই দয়া, ঠাকুর হয়তো অমনি ক'রেই সাড়া দেন—"

"আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?"

"অনেকদিন, তারিখ টারিখ বলতে পারব না, কারণ তারিখের হিসেব রাখবার দরকার হয় না তো। তবে এসেছি অনেকদিন—"

"ট্রেনে ক'রে এসেছিলেন কি, প্রথমে ট্রেনে তারপর হেলিকপ্টারে?"

"আরে না না! কি আপদ, আমি গরীব মানুষ অত ভাড়া পাব কোথায়? আমি কাশীতে ছিলাম তখন। একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া ক'রে বাবা বিশ্বনাথের কাছে থাকতাম। দেশে বিঘে পঞ্চাশেক ধেনো জমি ছিল, তেনা দেখাশোনা করত। তেনা আমার আপন লোক নয়, পাড়ার লোক। তেনার পুরো নাম ত্রিনয়ন, কিন্তু আসলে সে ছিল কানা। একটি চোখ বসন্তরোগে নষ্ট হয়ে যায় ছেলেবেলায়। সে আমার বড় নাতির সহপাঠী। আমার তো কেউ ছিল না, তাই তেনাই বিষয়ের দেখাশোনা করত। তাকে এ জন্যে মাসে মাসে মাইনে দিতাম। আমার ইচ্ছে ছিল আমার মৃত্যুর পর বিষয়টা আমাদের গ্রামের স্কুলকে দিয়ে যাব। একটা উইলও করেছিলাম এই মর্মে। হঠাৎ তেনা হাজির হল একদিন এসে। বললে, আমিই তোমার জমি কিনতে চাই, ওটা আমায় বিক্রি কর। নগদ দু'হাজার টাকা দিচ্ছি তোমাকে, আমাকে দিয়ে দাও জমিটা।

ব্যাংকে জমা ক'রে দিলে মাসে দশ টাকা ক'রে সুদ পাবে। আর তুমি যতদিন বাঁচবে আমিও ততদিন তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে দেব! ওতেই তোমার চ'লে যাবে কাশীতে। আমি দলিলপত্র সব তৈরি ক'রে এনেছি। দলিলপত্র বার ক'রে তেনা না-ছোড় হয়ে বসল। আমি বললাম—আমি জমি বেচব না। জমি স্কুলকে দান করব। কানা তেনা মুচকি হাসলে একটু। বললে, তোমাকে সদ্বুদ্ধি দিচ্ছি জমিটা আমাকে বিক্রি ক'রে টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়ে দাও। আর তাতে যদি রাজী না হও তাহলে চললুম। তোমার একটা সই জাল করা শক্ত হবে না আমার পক্ষে। জমি আমিই ভোগ করব, তোমাকে যে দু'হাজার টাকা দেব ভেবেছিলাম সেটা আমার বেঁচে গেল। ভালই হল। চললুম! চলে গেল সে। সেই সময় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল। বাবা বিশ্বনাথকে ডেকে বলেছিলাম—ঠাকুর আমাকে এই নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও এবার। আমাকে শান্তি দাও। তার পরদিন সকালে দেখি আমি এখানে চলে এসেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় কে কখন কিভাবে এখানে আমাকে নিয়ে এসেছে জানি না। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখলাম পংখী দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে—'কি কি চাই আপনার? রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?' আমি তো অবাক। জিগ্যেস করলাম, কোথায় আছি আমি? পংখী বললে—পরম মুহূর্তে। পরম মুহূর্তে? সে আবার কি? কি ক'রে এলাম। পংখী বললে—বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায়। এখানে শান্তিতে থাকবেন, কোনও ভয়ের কারণ নেই। আপনার কি কি চাই বলুন, সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। এই মেয়ে দু'টি রইল, এদের বললেই হবে। বলেই সে চলে গেল। দেখলুম দুটি মেয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করছে। হাঁ ক'রে ব'সে দেখছি, এমন সময় আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। প্রকাণ্ড একটি গোখরো সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়াল আমার বারান্দার নীচে। মানুষের ভাষায় বলল—তেনাকে শেষ ক'রে এসেছি। সে আর আপনার জমি নিতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার হাঁ-টা আরও বড় হয়ে গেল। কিছু বলবার আগেই সাপটা চ'লে গেল। কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। হকচকিয়ে ব'সে রইলাম। কতক্ষণ ব'সে ছিলাম জানি না। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সব বুঝলাম—"

"কি বুঝলেন—"

হাসি ফুটে উঠল বকের মুখে।

বললেন—"কি বুঝেছি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। শুধু বুঝেছি লোহার থালাটা সোনার থালা হয়ে গেছে বিশ্বেশ্বরের কৃপায়। ওতে আর মরচে ধরবে না। কক্‌খনো ধরবে না।"

"আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারি নি কিছু। সবই মনে হচ্ছে ধাঁধা—"

"পারবে পারবে। পট্‌ ক'রে হবে না। সময় লাগবে, কিন্তু হবে—"

বকের চোক মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

"কিছু খাবেন?"

"না। আমি একবেলা স্বপাক খাই। আমি খেয়ে এসেছি।"

কিঙ্কিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"স্বপাক খাই গো। ওই অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাকে রেঁধে দেবে কে আমার তিনকুলে কেউ আছে কি? পোয়াটাক দুধ ফুটিয়ে এক মুঠো চাল ফেলে দি তাতে।

তারপর খানিকটা জল ঢালি। তারপর দিই একটু গুড়। সেইটে নাবিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে শিব ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। তারপর প্রসাদ পাই। ওইটুকু করতেই আমার একবেলা চ'লে যায়—মানে, আগে যেত। গোয়ালা বাড়ি গিয়ে সামনে দুধ দুইয়ে আনতাম। চালগুলি একটি একটি ক'রে বাছতাম। তারপর বার তিনেক গঙ্গাজলে ধুতাম। শিবের ভোগ হবে তো? তোলা উনুনটি বারবার নিকোতাম। অনেকটা সময় কাটত। কিন্তু এখানে সবই ওই পার্বতী ক'রে দেয়। আমাকে কিছু করতে দেয় না। চাল বেছে দেয়, একটি কালো গাই নিয়ে এসে পরিষ্কার বাসনে আমার সামনে দুধ দোয়, উনুন ধরিয়ে দেয়। আমি শুধু রাঁধি। নিজে না রাঁধলে আমার তৃপ্তি হয় না। সেইটি রেঁধে শিবের মন্দিরে নিয়ে যাই। শিবের মূর্তির সামনে রেখে বসে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর নিয়ে এসে খেয়ে ফেলি সেটা—"

"শিবের মূর্তি আছে না কি এখানে?"

"মূর্তি ঠিক নয়। একটা বড় শাদা পাথর। তাকেই শিব বলে সবাই—"

"আমি সেটা দেখেছি একদিন। আচ্ছা, অতবড় শক্তিমান দেবতা শিব, আমার পিসিমার কাছে শিবের অনেক গল্প শুনেছি, সেই শিব কি শুধু একখানা পাথর হ'তে পারেন?"

"তিনি হ'তে পারেন সবই। তুমি কি রূপে তাকে দেখবে তা নির্ভর করছে তোমার বিশ্বাসের উপর। তিনি সর্বত্র আছেন, সবই হ'তে পারেন। পাথরে তেমার আপত্তিটা কি? শিব মানে তো মঙ্গল। পাথর কি আমাদের মঙ্গল করে না? রোজ মসলা বাট কিসের উপর? বড় বড় রাস্তা তৈরি হয় কি দিয়ে? পাথরের বড় বড় দুর্গের কথা শোন নি? বড় বড় পাহাড় যে পাথর দিয়েই তৈরি গো। পাথর আমাদের হাজারো উপকারে লাগে, তাই পাথর মঙ্গলময়, পাথরকে শিব বললে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে কেন। শিব চটে গেলে সংহারও করেন। পাথর ছুঁড়ে কত লোক কত লোককে মেরেছে তার ঠিক আছে? পাথরের ভিতর শিব নেই? কে বললে তোমাকে? কি আপদ।"

বলেই হেসে ফেললেন বক। তারপর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো বললেন—"মুখে খই ফোটাতে পারিস, কিন্তু দেখছি কিছু বুদ্ধি নেই তোর। রঘুপতি ছেলেটা কিন্তু বুদ্ধিমান। সে পাথরকে জীবন্ত করবার চেষ্টা করছে। বাহাদুর ছেলে। ঠিক পারবে—"

"রঘুপতিকে চেনেন আপনি?"

"খুব চিনি। তার কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে গল্প করি। তার মুখেই তো তোর খবর পেলাম—সে বললে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, আলাপ করে আসুন। এখন দেখছি বুদ্ধিমতী না কচু। বোকার হদ্দ একটি—।"

কিঙ্কিণী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"আ মরণ, মুচকি হাসা হচ্ছে আবার। এইবার মনে পড়েছে। আমার বোনের এক কালো-কালো নাতনী ছিল ঠিক তোর মতন। ঠিক ওইরকম খঞ্জনের মতো ত্যারচা চোখ আর দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তোকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাকে—"

"কি নাম ছিল তার।"

"বিনি।"

"আমার নাম কিনি। নামের সঙ্গেও মিল আছে।"

"ওই দেখ। আমি ঠিক ধরেছিলুম। মুখচোখের আদলেও মিল আছে। একের নম্বর দস্যি ছিল মেয়েটা। তুমিও লক্ষ্মী নও মনে হচ্ছে।"

"না, আমিও দস্যি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি—"

"ওই দেখ!"

"আপনার বিনি এখন কোথায় আছে—।"

"কি জানি। আছে কি মরেছে তাও জানি না। বোনের নাতনী তো। কাউকে ধ'রে রাখা যায় না কি পৃথিবীতে। ভেসে যায়, তলিয়ে যায়, উড়ে যায়। নাগালের মধ্যে কেউ থাকে না বেশী দিন। আমি নিজেই নিজের নাগালের মধ্যে নেই। ছিলুম কাশীতে একটা ঘুপ্‌চি ঘরে, এসে পড়েছি প্রকাণ্ড হিমালয়ের উপত্যকায়, এরপর আবার কি জানি কোথায় যাব, বাবা বিশ্বেশ্বর আমাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তা তিনিই জানেন। নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

"আপনার ভালো লাগে?"

"খুব। এখন কোনও দায়-দায়িত্ব নেই তো। যা চাইছি তাই হচ্ছে। যখন মনে করতাম আমি সব করছি তখন কিন্তু হ'ত না। অনেক দুঃখ পেয়েছি। এখন আর দুঃখ নেই, কারণ দুঃখ ভোগ করত যে 'আমিটা' সে আর নেই। হালে যিনি ব'সে আছেন তিনি দুঃখত্রাতা।"

"এসব কাণ্ডকারখানা আপনার ভোজবাজী ব'লে মনে হয় না?"

"আগে হ'ত এখন হয় না। এখন বুঝেছি ভোজবাজী বলে কিছু নেই। সবই সম্ভব। আগে ভোজবাজীকে ভোজবাজী বলে মনে হ'ত কারণ তখন বুদ্ধি কম ছিল, মাপকাঠি ছোট ছিল। এখন মনে হয় সবই সম্ভব। তা-ও ঠিক নয়, এখন মনে হয় এছাড়া আর কিছু হ'তে পারত না। সেই রাজপুত্রের মতো অবস্থা হয়েছে আমার—"

"কোন রাজপুত্রের মতো—"

"সেই যে রাজপুত্র নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটা টুকটুকে রাঙা ফল দেখে সেটি কুড়িয়ে খেয়েছিল—জানিস না গল্পটা?"

"না—"

"তবে শোন্। এক রাজপুত্র একবার রথে ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড সোনার রথ ছ'টা বড় বড় ঘোড়ায় টানছে। টগবগ টগবগ করে চলেছিলেন মহা-সমারোহে। সামনে পিছনে অনেক সেপাই সান্ত্রী বরকন্দাজ। কিছুদূরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড নদী দেখা গেল। নদীর চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল রাজ পুত্রের। বললেন—রথ থামাও আমি নামব। নদীর ধারে ধারে বেড়াব। কি সুন্দর নদী। নেবে পড়লেন রাজপুত্র। বেড়াতে লাগলেন নদীর ধারে ধারে। কিছু দূর গিয়ে দেখলেন মাটিতে আঙুলের মতো একটি ফল পড়ে রয়েছে। কিন্তু টুকটুকে লাল। লোভ হল খুব—ফলটি তুলে খেয়ে ফেললেন। যেই খাওয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার হল একটা। রাজপুত্র মাছ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লেন নদীতে। জলের ভিতর তাঁর হাত-পা রইল না, শরীরে গজাল কয়েকটা পাখনা, অদ্ভুত ধরনের ল্যাজ হল একটা, রাজপোশাক রইল না, গাময় গজাল আঁশ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কি হ'ল জান? রাজকুমারের একটুও খারাপ লাগল না, তাঁর মনে হ'ল এই তো

সুন্দর, এই তো স্বাভাবিক, অগাধ জলে সাঁতার কাটার চেয়ে বেশী সুখ আর কি হতে পারে। তিনি যে একদিন স্থলচর ছিলেন, রাজপুত্র ছিলেন এ কথা তিনি ভুলে যান নি, কিন্তু বারবার তাঁর মনে হ'ত, বন্দী ছিলুম, মুক্তি পেয়েছি বেঁচেছি।"

কিঙ্কিণী হেসে উঠল।

"বাঃ বেশ সুন্দর রূপকথাটি তো—।"

"সবই তো রূপকথা। জীবনটাই তো রূপকথায় ভরা। এখানেও চারদিকে রূপকথা। বেরিয়ে দেখেছিস কোন দিন?"

"না। এখান থেকেই তো পাহাড় ঝরণা বরফ কুয়াশা সব দেখতে পাই। আর কি দেখবার আছে।"

"শিবকে দেখেছিস?"

"না, একদিনও তো বেরুই নি।"

শিবকে দেখে এসো একদিন। যদিও একটা শাদা পাথর, কিন্তু চোখ থাকলে ওরই মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পাবে। তারপর দেখো দশমহাবিদ্যার মন্দিরগুলি। ছিন্নমস্তার মূর্তি নেই, কিন্তু মন্দিরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন যেন ভয় ভয় করে। মনে হয় একটা উলঙ্গিনী ছায়া-মূর্তি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।"

কিঙ্কিণীর মনে পড়ে গেল ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা। তিনিও তার হাত দেখে ছিন্নমস্তার গল্পটা বলেছিলেন। তারপর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল বককে।

"আচ্ছা যে গল্পটা আপনি এখুনি বললেন সেটা কি নিছক গল্প? না কোনও রূপক? ওই টুকটুকে লাল ফলের মানে কি—"

বক মুখ উঁচু ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর চোখ মিটমিট ক'রে বললেন, "দেখ্, আমি মুখ্যু মানুষ বেশী বিদ্যে নেই, তাই ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা করতে পারব না। তবে কাশীতে এক জ্যোতিষী আমাকে বলেছিল মঙ্গলের রং লাল আর মঙ্গল হচ্ছেন অহং-এর প্রতীক। যদি বলি ওই লাল ফলটি অহঙ্কার, ওই অহঙ্কারটিকে গিলে ফেলতে পারলেই মুক্তি।"

"মানুষ থেকে মাছ হওয়া মানেই মুক্তি না কি!"

"তা জানি না। বললুম তো আমি মুখ্যু মানুষ, ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা করতে পারব না। যা মনে হল বললুম। একটা রূপকথা বললুম, উনি তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা দাবি করছেন। অতিরিক্ত তার্কিক হয়েই মরেছিস তোরা! বেশী ফাজিল হওয়া ভাল নয়।"

এমন সময় একটা অদ্ভুত হাসিতে ভরে গেল আকাশ বাতাস। কিঙ্কিণীর মনে হল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে কোথায়।

"আমি চললুম। নীলু বেরিয়েছে। আমাকে খুঁজছে বোধহয়।"

"নীলু কে আবার—"

"নীলপর্ণ। কুবেরের ধনরক্ষক। গরুড়ের বংশধর। তোর কাছেও হয়তো আসবে একদিন। আড্ডা দিতে ভালবাসে। চললাম আমি—"

বক খুট খুট ক'রে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

যে বারান্দায় পংখী পাথরের পরদা টানিয়ে দিয়েছিল সেইখানেই বসেছিল কিংকিণী। দূরে আর এক সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, প্রত্যেকটি যেন জ্বলন্ত আগুনের স্তূপ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্তকিরণে সমস্ত প্রকৃতি যেন রক্তস্নান করেছে। কর্কশ একটা পাখির ডাক ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে এই রক্ত-প্লাবিত পরিবেশই যেন সদম্ভে চীৎকার ক'রে বলছে—এই দেখ আমি জয়ী হয়েছি, ওই তুষারশুভ্র পাহাড়দের পরিণত করেছি জ্বলন্ত অগ্নিস্তূপে। অভিভূত হয়ে বসেছিল কিংকিণী। ভাবছিল যা দেখছি, তা সত্য না স্বপ্ন না মতিভ্রম? যে দেশে আছি সে দেশের কি কোনও ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে? পংখী বলেছিল আমি পরম মুহূর্তে বাস করছি, আমার আলাদা জীবনযাত্রা আমার দৈনন্দিন কার্যক্রম না কি অব্যাহত আছে অন্যত্র। দুই বিভিন্ন স্থানে আমার যুগপৎ অস্তিত্ব কি সম্ভব? আমি কি তাহলে কোথাও মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে আছি? মূর্ছার ঘোরে এই সব স্বপ্ন দেখছি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে। নিজের সত্তার গভীরে নেমে গেল ডুবুরীর মতো। কিন্তু মুক্তা পেল না সে। সদুত্তর মিলল না। কিন্তু এই উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।...হঠাৎ সে লক্ষ্য করল সূর্য অস্ত গেছে, কোথাও লালের চিহ্নটুকু পর্যন্ত আর নেই। চাঁদ উঠছে, দূরের পাহাড়গুলো আর জ্বলন্ত আগুনের স্তূপ নয়, রজতসন্নিভ মহিমা হয়ে উঠেছে। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সে তাদের দিকে। মনে হল ওরা যেন নীরবে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। যেন বলছে, আমাদের যে দিকটায় চাঁদের আলো পড়েছে সেই দিকটা দেখেই তুমি মুগ্ধ হয়েছ। কিন্তু আমাদের সবটা আলোকিত হয় নি। আমাদের ও পাশে গাঢ় অন্ধকার। আমরা একই সময়ে আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের মধ্যে এমন জায়গা আছে যেখানে কখনও আলো প্রবেশ করে না। কিংকণীর মনে হল, তাহলে কি—খুক্ করে কাসলে কে যেন পিছন দিকে। কিংকণী দেখল পংখী দাঁড়িয়ে আছে!

"আমাকে ডাকছিলেন কি—" পংখী ইতস্ততঃ ক'রে প্রশ্ন করল।

"না, ডাকি নি তো। আমি ভাবছিলাম।"

"আপনার ভাবনার ডাকেই আমি এসেছি। আপনার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তরও আমি জানি। আপনি একটা জিনিস গুলিয়ে ফেলেছেন ব'লে মনে হয়। আপনি নিজের দেহটাকে কেন্দ্র করেই সব ভাবছেন। আপনি ভাবছেন আপনার অস্তিত্ব আপনার দেহতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। অনাদি অতীত থেকে অনাদি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আপনার অস্তিত্ব প্রসারিত। সে অস্তিত্ব সব সময়ে দৈহিক নয়, তার বহু রূপ বহু রং, একটার সঙ্গে আর একটার মিল থাকে না অনেক সময়, কিন্তু কোনটাই মিথ্যা নয়। আপনি যখন কলকাতার ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়ে থাকেন, তখন সেটা যেমন সত্যি, শুয়ে শুয়ে আপনি যখন স্বপ্ন দেখেন যে সুন্দরবনে বাঘে আপনাকে তাড়া করেছে তখন সেটাও তেমনি সত্যি। স্বপ্নেও আপনার দৈহিক একটা অস্তিত্ব থাকে সেটা কি আপনার অলীক ব'লে মনে হয়?"

"নিশ্চয়ই। স্বপ্ন তো অলীকই। যে দেহটা বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে সেই বেশী সত্য, বেশী বাস্তব। তাকে ধরা ছোঁয়া যায়—"

"ধরা ছোঁয়া মানে আপনি কি হাত দিয়ে ধরা ছোঁয়ার কথা ভাবছেন? তাহলে তো জীবনের অধিকাংশ জিনিসকেই অলীক বলতে হয়। প্রেম, ঘৃণা, উচ্চাশা, আধ্যাত্মিক

পিপাসা, কবির কল্পনা এমন কি লোভ, মোহ—কোনটাকেই ধরা ছোঁয়া যায় না, কোনটাকেই কোনও যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না, তা বলে কি ওসব অলীক বলবেন ?”

“মোটেই না। ওসবের উৎস তো আমার দেহই। দেহের মধ্যে যে মস্তিষ্ক আছে সেই মস্তিষ্কেই ওদের জন্ম। মস্তিষ্ক না থাকলে প্রেম, ঘৃণা, কবি-কল্পনা এসব থাকত কি ?”

মস্তিষ্ক তো একটা বস্তু-পিণ্ড মাত্র। ওই জড়পিণ্ডের মধ্যে প্রেম, ঘৃণা, কল্পনা, কামনা, যে শক্তির ক্রিয়া সেইটিতেই তো আসল। তার হদিস বিজ্ঞানীর যন্ত্রে এখনও ঠিক মতো ধরা পড়ে নি কিন্তু বিশ্বাসীর মনে ধরা পড়েছে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই বিশ্বাসী হয়েছেন তাই পরম মুহূর্তে প্রবেশ করেছেন, সেই অকল্পনীয় দেশে এসে পড়েছেন যেখানে সবই সম্ভব। প্রশ্ন ক'রে কোনও সদুত্তর পাবেন না, কিন্তু বিশ্বাস ক'রে সুখ পাবেন। আপনার দুটো অস্তিত্বই সত্য। ওই পাথরের পরদায় আপনার যে ছবি দেখতে পাবেন সেটা সত্য, কিন্তু ওই ছবিতে একটা জিনিস দেখতে পাবেন না।”

“সেটা কি—”

“সেটা আপনার বিশ্বাসের ছবি। বিশ্বাসের ছবি তোলা যায় না, সেটা অনুভব করতে হয়।”

“কিন্তু আমি তো কিছু অনুভব করতে পারছি না।”

“সব জিনিস কি অনুভব করা যায় ? আপনার দেহের মধ্যেই এমন অনেক জিনিস আছে যার অস্তিত্ব আপনি অনুভব করেন না। একটা উদাহরণ দিই। দেহের রক্ত-কণিকাগুলো অহরহ আপনার শিরায় উপশিরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাওয়া থেকে, খাদ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখছে আপনার দেহের মধ্যেই তাদের জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, এসব কি আপনি অনুভব করেন ? সব জিনিস অনুভব করা যায় না। চেতনার পরও আছে অবচেতনা, তারই গভীরে আছে আপনার বিশ্বাস। তাকে অনুভব করতে পারছেন না বলেই যে তা নেই একথা সত্য নয়। আপনি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এখন আপনার দ্বিতীয় অস্তিত্ব যে পরিবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে সেইটেকেই উপভোগ করবার চেষ্টা করুন। আপনার প্রথম সত্তা অন্যত্র কি করছে তা দেখে এবং তার সঙ্গে তুলনা ক'রে হয়তো আপনার দৃষ্টি খুলে যাবে। হয়তো নূতন কোন বিস্ময়, নূতন কোন জিজ্ঞাসা জাগবে মনে। আপনি ওটা দেখুন, আমি চলি এখন। হ্যাঁ আর একটা কথা—নীলপর্ণ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনার অনুমতি প্রার্থনা করবার জন্যে। আপনার আপত্তি হবে না আশা করি।”

“না না আপত্তি হবে কেন ?”

“আচ্ছা, বলে দেব তাকে। আমি যাই তাহলে।”

পংখী নিঃশব্দে অন্তর্ধান করল।

ইচ্ছা করবার সঙ্গে সঙ্গে পরদার উপর ছবি ফুটে উঠল। আশ্চর্য সুন্দর সবাক চিত্র। ছবি দেখে অবাক হ'য়ে গেল সে। এ কি কাণ্ড।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে সে ? কিঙ্কিণী ? মাথায়, হাতে, পায়ে ব্যাণ্ডেজ। মাথার শিয়রে বসে আছে স্বাতি। কাঁদছে। তাহলে সে কি মোটর

থেকে নেমে পালাতে পারে নি ? মোটর থেকে নেমে মাঠামাঠি দৌড়ে সে পালিয়েছিল তার এই ধারণাটা কি মিথ্যে ? স্বাতি কাঁদছে। অঝোরঝোরে কেঁদে চলেছে। একটি নার্স এসে ঢুকল। হাতে ফিডিং কাপ। গলায় একটা তোয়ালে দিয়ে খাইয়ে দিলে আস্তে আস্তে। তারপর স্বাতির দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর বলল "আপনি কাঁদছেন কেন। ডাক্তারবাবু তো বলেছেন কোন ভয় নেই। আপনি পরশু থেকে এখানে সমানে ব'সে আছেন, নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আপনি বরং বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসুন। আমরা তো আছি, চিন্তার কোনও কারণ নেই, আপনি যান,—"

"ওর যে এখনও জ্ঞান হয় নি—" স্বাতি বললে চোখ মুছে।

"হবে। ঘুমের ইন্‌জেকশন দিয়ে ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আপনি ব'সে থেকে কি করবেন।"

"ওর বাবা যদি আসে—"

স্বাতির চোখে ঘনিয়ে এল একটা ভাষাহীন আশঙ্কা।

নার্স বলল—"এলেই বা। আমরা তো আছি। তিনি কি এসেছিলেন একদিনও ? মনে পড়ছে না তো।"

স্বাতি কোনও উত্তর দিল না। সভয়ে চেয়ে রইল শুধু।

তারপর বলল—"আমি থাকব। যাব না কোথাও।"

কিঙ্কিণীর হঠাৎ মনে হল স্বাতি কি আমাকে পাহারা দিচ্ছে ? রক্ষা করছে বাবার কবল থেকে ? পরমুহূর্তেই সে এর উত্তর পেয়ে গেল। টলতে টলতে প্রবেশ করলেন সাতকড়ি।

"কিঙ্কিণী এখানে আছে না কি ?"

তড়িৎপৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠল স্বাতি। তার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন—"ও তুমিও ওর সঙ্গে জুটেছ দেখছি।"

কোনও উত্তর দিলে না স্বাতি।

সাতকড়ি বললেন—"আমার মেয়েকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে হাসপাতালে রাখা হয়েছে, অথচ আমাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি। বড়ই আশ্চর্য মনে হয়।"

এ কথারও কোন জবাব দিলে না স্বাতি। তার চোখ দুটো শুধু জ্বলতে লাগল।

"ওকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব ব'লে এসেছি—"

"না। ও এই হাসপাতালেই থাকবে। কোথাও যাবে না।"

"কেন। আমার মাতৃহীন মেয়েকে আমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব, বড় বড় ডাক্তার ডাকব।"

"না, ও কোথাও যাবে না। যদি নিয়ে যেতে চেষ্টা কর আমি সব কথা প্রকাশ ক'রে দেব। চীৎকার করব, পুলিস ডাকব—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সাতকড়ি।

"ব্যাপার কি। পাগল হয়ে গেলে না কি—আমার মেয়েকে আমি চিকিৎসার জন্যে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছি—"

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ব'লে উঠল স্বাতি—"নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেলবার জন্য। গুণ্ডারা যে কাজটা সমাপ্ত করতে পারে নি তুমি সেইটে সমাপ্ত করবার জন্যে নিয়ে যেতে চাইছ !"

"Shut up, you bitch" (শাট আপ্ ইউ বিচ্)

"তুমি যদি বেশী চেঁচামেচি কর, আমি পুলিস ডাকব। যে পাঞ্জাবী ড্রাইভার ওকে বাঁচিয়েছিল সে এখনও বেঁচে আছে—পুলিসের হেফাজতে আছে—"

"পুলিস? হা হা হা হা। তুমি এখনও পুলিসের ভয় দেখাও আমাকে! তোমার অন্তত জানা উচিত পুলিসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি।"

এমন সময় নার্সটি এসে প্রবেশ করল। তাকে দেখে যে কাণ্ড করলেন সাতকড়ি তা রীতিমত নাটকীয়। হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন তিনি।

"আমার মা-হারা মেয়েকে গুণ্ডারা মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। তাকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাই। তার ব্যবস্থা করে দিন আপনারা—"

নার্সটি বললে—"পুলিস এঁকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাদের বিনা অনুমতিতে এঁকে কোথাও সরানো যাবে না। তাছাড়া এখানকার ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে। তিনি রোগীকে নাড়ানাড়ি করতে চান না। তাঁর মতের বিরুদ্ধে এঁকে নিয়ে যেতে 'রিস্ক্ বন্ড্'-এ সই করতে হবে। আপনি আপিসে যান তাহলেই সব জানতে পারবেন।"

নার্স চলে গেল।

সাতকড়ি স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি এখানে এসে জুটলে কি ক'রে! আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তুমি কি কিঙ্কিণীর কাছে আশ্রয় নিয়েছ?"

"আমি তোমার কোন কথার জবাব দেব না।"

"আমার ছেলেটাকে তুমি কোন অধিকারে নিয়ে এসেছ?"

"মায়ের স্বাভাবিক অধিকারে। আইনত ও ছেলের উপর তোমার অধিকার নেই, কারণ আইনত তুমি ওর বাবা নও, আমাদের আইনত বিয়ে হয় নি।"

"তোমার আইনজ্ঞান খুব টনটনে দেখছি। কিন্তু একটা পুরাতন আইনের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। নানা নামে সে আইনই আজ পর্যন্ত বলবৎ আছে। সংক্ষেপে সে আইনটির নাম জোর যার মুলুক তার। আমি এখন চললাম, দেখা যাক কি করতে পারি।"

ঈষৎ টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন সাতকড়ি।

ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল কিঙ্কিণীর। হঠাৎ মনে হল একটা দুর্গন্ধ পঙ্ককুণ্ডে পড়ে সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। ছবি দেখার ইচ্ছা তার মন থেকে চলে গেল। ছবিও অন্তর্হিত হ'ল শাদা পরদা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। দূরের তুষার পাহাড়গুলি যেন তুষারের স্তূপ নয়, স্বপ্নের স্তূপ।

মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল সে।

তার বর্তমান বাস্তবজীবনের যে গ্লানি তার মনে জমেছিল তা কে যেন স্নেহস্পর্শ দিয়ে মুছে দিল, কে যেন তার এই ধারণাটা স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলল, ছবিতে যা দেখেছ ওটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়; ওটা সাময়িক, ওটা ক্ষণিক, ওটা তোমার যাত্রাপথের দৃশ্যাবলী, ওগুলো তোমার জীবনে স্থায়ী হবে না, ওগুলো তুমি পার হয়ে যাবে, ক্রমশ পার হয়ে যাচ্ছ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল কিঙ্কিণীর। যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্রী নয়, তবু রঘুপতি তাকে একদিন বিবর্তনবাদের কাহিনী বলেছিল। বাঁদরই না কি মানুষ হয়েছে, মানুষই না কি একদিন অতিমানব হবে। মানুষের মন, বুদ্ধি, চেতনা, স্বপ্ন,

কল্পনা সবই তো তাহলে বিবর্তিত হতে পারে? সে এখন যে চেতনা দিয়ে ওই পাহাড়গুলো দেখছে তা কি তাহলে তার বিবর্তিত চেতনা? বিবর্তন কি এত দ্রুত হয়? নেবে পড়ল সে বারান্দা থেকে। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার মনে হ'ল সত্যই সে যেন স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই স্বপ্নলোক এত বাস্তব যে মনে হয় জ্যোৎস্না বুঝি এখনি কথা কইবে তার সঙ্গে। কথা কইতেও লাগল, কিন্তু সে কথা কোন ভাষার হরফেই লেখা যায় না, সে কথা শব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় না। তবু তা মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে। কিঙ্কিণী যাওয়ার সময় দেখল রঘুপতির উপত্যকার দুয়ার বন্ধ। বিরাট পাষাণ দুয়ার। বাইরে থেকে করাঘাত করলেও ভিতরে শব্দ পৌঁছবে না। ক্ষণকাল সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। তারপর আবার হাঁটিতে লাগল। হঠাৎ মনে হল চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। গরম জামাকাপড় গায়ে না দিয়ে এভাবে হাঁটা ঠিক নয় বাইরে। তুলোর আঁশের মতো বরফ পড়ছে। পথঘাটও বরফে ঢেকে যাচ্ছে। কিন্তু ভালো গরম জামা তার কি আছে? বরফের উপর হাঁটার মতো জুতো? সবই তো ওই পার্বতীরা জানে। যখন যা দরকার হয় তারাই এনে দেয়। এখনও হয়তো দেবে এই আশায় কিঙ্কিণী আবার ঢুকল তার উপত্যকায়। গিয়েই দেখল পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার উপর। কে পার্বতী কে উমা তা চিনতে পারে না কিঙ্কিণী। দু'জনেই একরকম দেখতে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে কিঙ্কিণী বলল—"বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। গরম জামা কাপড় আছে কি?"

"হ্যাঁ, সব আছে। বরফের উপর চলবার পাহাড়ি জুতোও আনিয়ে রেখেছি।"

কিঙ্কিণী আশ্চর্য হল না। সে যেন মনে মনে এটা প্রত্যাশাই করছিল। এটা না ঘটলে সে বরং আশ্চর্য হ'ত। সে ভিতরে গিয়ে দেখল বহুমূল্য চামড়ার 'ফার' দেওয়া ওভার-কোট, নীচে পরবার জন্য দামী পশমী জামা, মাথার জন্য দামী গরম টুপি, পায়ে দেবার জন্য ভালো চামড়ার বুট সব আছে। পার্বতী নিজে হাতে সব পরিয়ে দিল কিঙ্কিণীকে। কিঙ্কিণীর মনে হল কোনও ভালো দর্জী যেন মাপ নিয়ে এগুলো করেছে। সে আশ্চর্য হ'ল না। সে ধ'রে নিয়েছিল এখানে সবই সম্ভব।

জামা জুতো প'রে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পার্বতী বলল—"আপনি তো আগে কখনও বেরোন নি। আমি কি আপনার সঙ্গে যাব? এখানকার পথঘাট তো আপনার চেনা নয়।"

"বেশ চল। যে পাহাড় তিনটে দেখা যাচ্ছে ওগুলো কত দূর।"

"অনেক দূর। হেঁটে গেলে ওদের কাছাকাছি পৌঁছতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে।"

"তাহলে চল প্রথমেই শিব ঠাকুরকে দেখে আসি। এসেই অবশ্য দেখেছিলাম একবার। চল আর একবার দেখা যাক।"

"চলুন।"

মহাদেব নামে খ্যাত শাদা পাথরটি কিছুদূরে একটা উঁচু টিলার উপর দেখেছিল কিঙ্কিণী। তার আশপাশেও ছোট বড় আরও অনেক পাথর ছিল। মহাদেব পাথরটি অবশ্য সবচেয়ে বড়। টিলার উপর উঠে কিঙ্কিণী কিন্তু পাথরটিকে চিনতে পারল না। সবগুলি পাথরই বরফে ঢাকা পড়েছে।

"দিনের আলোয় পংখী যে বড় পাথরটাকে মহাদেব ব'লে চিনিয়ে দিয়েছিল সেটা তো কই দেখতে পাচ্ছি না।"

পার্বতী পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। একথা শুনে তার মুখে হাসিও ফুটল না, অবজ্ঞার ভাবও দেখা গেল না। শুধু বলল—"ওই তো আছেন। এখানে সব পাথরই মহাদেব। প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের বাইরের চেহারাটা বদলায়, কিন্তু ভিতরের মহাদেব ঠিক থাকেন। তিনি বুঝতেই পারেন না যে তাঁর বাইরের রূপ বদলাচ্ছে। ভালো ক'রে দেখুন তিনি ঠিকই আছেন।"

কিঙ্কিণী কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু সে কথা সে মুখ ফুটে বলতেও পারল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল নির্মল শাস্ত্রীকে। তিনি তাঁকে সংস্কৃত ও দর্শন পড়াতেন। তিনি বলেছিলেন—সাংখ্য বলেছেন—ভগবান আছেন একথা মানতে পারি না, কারণ প্রমাণ নেই। আরও বহুলোক একথা বলেছেন। কিন্তু তবু যেন ভগবান আছেন। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করবার মতো বুদ্ধিই আমাদের নেই। ওই সাংখ্যই যে মায়ার কথা বলেছেন সেই মায়াই আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে হয়তো। সেই আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেলেই আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে? তখনই আমরা সত্যকে দেখতে পাব। সত্যই ভগবান। কিঙ্কিণীর মনে হল তার দৃষ্টি কি মায়ামুক্ত হয়েছে? কিন্তু কিছুতেই তো দেখতে পাচ্ছি না, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যে বুদ্ধি আছে তা দিয়ে বর্তমান জীবনের ব্যাখ্যা করতে পারছি না, একটু আগে যে পরদায় ছবি দেখলাম সেইটেকেই আমরা সত্য জীবন ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না সেটাকে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। হুড়মুড় ক'রে শব্দ হল একটা, মনে হল বিরাট একটা অট্টালিকা বুঝি ভেঙে পড়ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পার্বতী প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে আছে।

"ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে?"

"দূরে পাহাড় ভেঙে পড়ছে। একটু দূরে একটা নদীর খাত আছে, সেই দিক দিয়ে গলা বরফের স্রোত ব'য়ে যাবে এখনই। যাবেন দেখতে?"

"বেশ চল।"

একটু পরেই সেই খাতের ধারে এসে দাঁড়াল তারা।

খাতের কাছে এসেই কিন্তু কিছু দেখা গেল না। খাতের মাঝখানে একটি সরু লম্বা গাছ ছিল। সেই গাছের ঋজু বলিষ্ঠতা দেখে যেন আশ্বস্ত হল কিঙ্কিণী। গাছটা যেন আকাশকে, স্পর্শ করতে চায়। মনে হচ্ছে চাঁদকে যেন ছুঁয়ে আছে। বলিষ্ঠতা এবং ঋজুতা তারও জীবনের আদর্শ। গাছটির দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল সে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হল তার। গাছের ঋজুতা বা বলিষ্ঠতা তাকে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু তাকে যদি কেউ এখনই গাছ ক'রে দেয় তাহলে সে কি খুশী হবে? হবে না। ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা নিয়ে অনড় হ'য়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, সে চলবে, সে এগোবে, খুঁজবে নিত্য নূতন দিগন্ত, জানবে অজানাকে, আবিষ্কার করবে নূতন পথ। যে আদর্শকে এখন আঁকড়ে ধ'রে আছে প্রয়োজন হলে সে আদর্শকে ত্যাগ করবে যদি মহত্তর আদর্শের সন্ধান পায়? কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল তার চিন্তাধারা। মনে হল এখন যে অজানার মধ্যে সে আছে তাকে সে স্বীকার

করতে পারছে না কেন। বাস্তব নয় বলে? বাস্তব অবাস্তবের ভেদ রেখা কোথায়? অনেক আগে যখন জড়বস্তু পিণ্ডকে,—যাকে ধরা যেত, ছোঁয়া যেত, মাপা যেত, ওজন করা যেত—আমরা বাস্তব মনে করতুম, তখন অণু-পরমাণুর খবর জানা ছিল না। যখন জানা গেল, তখন তাকেও স্বীকার করলুম, অণু-পরমাণুতেও বিজ্ঞান থেমে থাকে নি, ইলেকট্রন প্রোটন বার করেছে, তাকে আমরা মেনে নিয়েছি, খালি চোখে শুধু হাত পা দিয়ে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা ওদের নাগাল পেয়েছেন, ওদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন, আমরা সাধারণ মানুষরা—যারা বিজ্ঞানী নই, তারাও বিশ্বাস করছি ও'দের আবিষ্কারে। পৃথ্বীর কথায় তাহলে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না কেন। যে মন্ত্র দিয়ে বিজ্ঞানীরা অলৌকিক আশ্চর্য অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন হয়তো কেউ সেই রকম কোনও যন্ত্রের সামনে আমাকে বসিয়ে দিয়েছে, সে যন্ত্রটা এত সূক্ষ্ম, কিম্বা এত বৃহৎ যে আমার বুদ্ধি তার কূলকিনারা পাচ্ছে না……পর মুহূর্তেই চমকে উঠল সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তুমুল বেগে শুভ্র শিলাপ্রবাহ আসছে—দেখতে দেখতে খাতটা ভরে গেল—ঋজু বলিষ্ঠ গাছটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, নুয়ে পড়ল, থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। দেখল গাছটা সামান্য খড়ের মতো ভেসে চ'লে গেল। একটু আগে যাকে বলিষ্ঠ মনে হয়েছিল, দেখা গেল বলিষ্ঠতর শক্তির কাছে সে মুহূর্তে নতি স্বীকার করেছে। এই দুরন্ত শক্তিশালী শিলা-প্রবাহকে গতিহীন ক'রে দিতে পারে এমন শক্তিও তাহলে নিশ্চয়ই থাকা সম্ভব। কোথায় সে শক্তি? কার সে শক্তি? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কিঙ্কিণী। তারপর সে হঠাৎ দেখতে পেল দূরে কে একজন ব'সে আছে। মনে হচ্ছে মাছ ধরছে। দু'হাত দিয়ে কি যেন একটা ধ'রে বসে আছে।

"ওখানে ব'সে আছে কে?"

"রঘুপতি—" উত্তর দিল পার্বতী।

"রঘুপতি?"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে রঘুপতির দিকে। কাছে গিয়ে দেখল রঘুপতি দু'হাত দিয়ে দড়ির মতো কি একটা টেনে রেখেছে।

"রঘুপতি তুমি এখানে? কি করছ তুমি?"

মুচকি হেসে রঘুপতি চাইলে তার দিকে, কিন্তু কথার কোন জবাব দিলে না।

"ওটা কি ধ'রে আছ তুমি—"

"বজ্র-লোহা। থাম টেনে তুলি এটাকে। আমার কাজ হ'য়ে গেছে। তুমিও হাত লাগাও, খুব ভারী জিনিস—"

কিঙ্কিণী ব'সে পড়ল রঘুপতির পাশে, যে জিনিসটা সে ধরেছিল সেও চেপে ধরল সেটা। ঠাণ্ডা কনকনে শক্ত জিনিস একটা, মনে হল যেন লোহার তৈরি মোটা দড়ি একটা।

"টান, খুব জোরে টান—টেনে তুলতে হবে ওটাকে—"

"কি ওটা?"

"আমার সেই অহল্যা পাথরটা"

টানতে টানতে শুয়ে পড়ল দু'জনে তবু কিন্তু কিছু হল না।

রঘুপতি বলল—"এ তো মহা মুশকিলে পড়লাম। পংখী থাকলে হয়তো সাহায্য করতে পারত।"

"এই যে আমি এসেছি। কি ব্যাপার, কি হল—"

"আমি যে অহল্যা পাথরটাকে এনেছিলাম, সেটাকে একটা লোহার জালে পুরে আমি এই শিলাপ্রবাহে ফেলে রেখেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, বজ্র-লোহার জালটা তো আপনিই এনে দিয়েছিলেন। এখনও ওটাকে তুলতে পারছি না—বড্ড ভারী হয়ে গেছে—"

"আমার গায়ে তো বেশী জোর নেই। দমন দেও ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডেকে আনি, আপনারা ধ'রে থাকুন।"

পংখী অন্তর্হিত হল। একটু পরেই হাজির হল দমন দেও, আর তার পিছু পিছু সেই সিংহটি।

"কি তুলতে হবে?"

"একটা লোহার জাল, তার ভিতর একটা পাথর আছে।"

কিঙ্কিণীর পাশে তৎক্ষণাৎ ব'সে পড়ল দমন দেও। সিংহটাকেও আদেশ দিল—"তুইও কামড়ে ধর।" সিংহটাও সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরল লোহার কাঠিটাকে। আর একটা অদ্ভুত কাণ্ডও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। শিলাপ্রবাহের প্রবল বেগ শান্ত হয়ে গেল সহসা। লোহার জালটাকে টানাটানি করে তুলে ফেলল সবাই। কিঙ্কিণীর মনে হল অতি সহজেই তোলা গেল। তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে স্রোত আবার দুর্বার বেগে বইতে লাগল। কিঙ্কিণীর আবার মনে হল জালটা সহজে তোলবার জন্যই যেন স্রোতটা থেমেছিল। কে থামিয়েছিল? কি ক'রে থামিয়েছিল? বিদ্যুৎচমকের মতো প্রশ্ন দুটো জাগল তার মনে, কিন্তু আর সে বিস্মিত হল না। বিস্ময়ের সাগরে সে যেন ডুবে আছে। যুক্তির একটা মানদণ্ড মনের কোনে প'ড়ে আছে, সেটা দিয়ে কিছু কিছু মাপতে আর ইচ্ছে করে না। মাপা যায়ও না। বারবার সেই There are more things in Heaven and Earth .. শেক্সপীয়রের এই উক্তিটাই মনে পড়ে, কিন্তু বেশীক্ষণ এসব কথা ভাববারই সময় পেল না সে। যে লোহার জালটা তারা টেনে তুলেছিল সেইটেই দেখতে লাগল সবাই। অনেক বরফের টুকরো আটকে ছিল জালটাতে। রঘুপতি সেগুলো আস্তে আস্তে খুলছিল। দমন দেও বললে—"একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিই? সবগুলো খুলে যাবে। ওরকম করে কতক্ষণে খুলবেন।"

রঘুপতি বলল—"না, ঝাঁকানি দিতে হবে না। যেমন আছে তেমনি থাক। আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি কাঁধে করে আমার উপত্যকায়। সেখানেই বরফ আস্তে আস্তে গলে যাবে।"

রঘুপতি অবলীলাক্রমে তুলে নিল কাঁধের উপর সেই বরফের পিণ্ডটাকে। রঘুপতি যে এতটা শক্তিধর তা কিঙ্কিণী কল্পনা করে নি।

আমাকে সঙ্গে যেতে হবে কি?"—দমন দেও প্রশ্ন করল।

"না। যা করেছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন সোজা আমার উপত্যকায় যাব।"

কোনদিকে না চেয়ে রঘুপতি সামনের দিকে চলতে লাগল।

কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পার্বতী নীরবে তার অনুসরণ করছে। দমন দেও হাসিমুখে এগিয়ে এল কিঙ্কিণীর দিকে।

তোমাকে যে এখানে দেখতে পাব তা' প্রত্যাশা করি নি। দেখে কিন্তু কি ভালো যে লাগছে। তোমার কাছ ঘেঁষে বসতে পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি।"

"আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?"

"পংখী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি কুবের পুরীর রাস্তা খুঁজছিলাম, পংখী বললে তুমি আগে ওখানে যাও। কুবের পুরীর রাস্তা আমি দেখিয়ে দেব পরে। আমি যাই পংখীকে খুঁজে বার করি, সে হয়তো অপেক্ষা করছে আমার জন্য। পরে দেখা হবে।"

দমন দেও হন হন করে চ'লে গেল। তার সিংহটাও ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু। কিঙ্কিণী দেখল রঘুপতি অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিঙ্কিণী দাঁড়িয়ে পড়ল। কই, রঘুপতি তো তার সম্বন্ধে একটুও আগ্রহ প্রকাশ করল না। এতদিন পরে দেখা হল, অথচ—। তারপরই সে জোরে জোরে চলতে লাগল আবার। রঘুপতিকে জিগ্যেস করতে হবে এই পাথরটা নিয়ে সে শিলা-স্রোতে ডুবিয়েছিল কেন? একথাটা জানবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না। রঘুপতি তার পাথর নিয়ে কি এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট (experiment) করছে তা জেনে সে কি করবে, রঘুপতি যদি তার প্রশ্নের উত্তরও দেয় তাহলে সে উত্তর তার বোধগম্য হবে কি না—এসব কথা তার মনে হল না। যে কোনও অজুহাতে রঘুপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে এইটেই তার কামনা। কিছুদূরে হেঁটে তার মনে হল দমন দেও আর সিংহও রঘুপতির পিছু পিছু চলেছে। তারপর আশ্চর্য হল যখন সে দেখল দমন দেও আর তার সিংহ রঘুপতির মধ্যে যেন ঢুকে গেল। ঠিক যেন ছায়ার মতো ঢুকে গেল। সবিস্ময়ে ভাবল আমার দৃষ্টি বিভ্রম হ'ল না কি। দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর সে ছুটতে লাগল। রঘুপতি যখন তার উপত্যকার দরজার কাছে এসে পড়েছে তখন সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল।

"রঘুপতি—"

"কে ও কিঙ্কিণী, কি হল, হাঁপাচ্ছ কেন"

"আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি। যাব তোমার উপত্যকায়?"

"এস। কোন দরকার আছে না কি!"

"বলছি চল ভিতরে—"

রঘুপতি ভিতরে ঢুকল, ঢুকে একটা প্রশস্ত বারান্দা পার হয়ে প্রবেশ করল নিজের ঘরে। তারপর তুষার পিণ্ডটাকে সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল একটা টেবিলের উপর। কিঙ্কিণীর মনে হল সে যেন একটা শিশুকে নামিয়ে রাখছে। কিঙ্কিণী যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করল। চারদিকে নানারকম পাথর। নানারকম যন্ত্রপাতি। নানারকম আলো।

"আচ্ছা রঘুপতি, তুমি পাথরটাকে বরফের স্রোতে ডুবিয়েছিলে কেন, বলবে আমাকে?"

"কেন? যুক্তির দিক দিয়ে কোনও উত্তর দিতে পারব না। এক কবি বলেছিলেন—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমূল্য রতন পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি পাওয়া যায় এই আশাটাও ত্যাগ করা শক্ত। আমার উদ্দেশ্য অচলকে সচল করা, জড় পাথরকে জীবন্ত করা। আমার মনে হল যে পাহাড় কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অচল অনড় কঠিন ছিল হঠাৎ সে

কোন শক্তি বলে কোন প্রেরণায় সচল হল, বেগবান হল, কি করে স্থাণু পর্বত জঙ্গম হল। আমি ভাবলাম ওই শিলাস্রোতে সেই শক্তির অণুপরমাণু হয়তো বিকীর্ণ হচ্ছে মন্ত্রের মতো, মনে হল আমার অহল্যা পাথরও যদি পারে সেই মন্ত্র শুনুক না, তাকে ডুবিয়ে রাখি কিছুক্ষণের জন্য ওই হিম-প্রবাহে, ক্ষতি কি। যে বজ্রলোহার জালে পুরে তাকে উত্তপ্ত করেছিলাম কিছুদিন, সেই জালে পুরেই তাকে ডুবিয়ে দিলাম হিমানীপ্রবাহে। জানি না কোনও ফল হয়েছে কি না—"

"কি রকম ফল তুমি প্রত্যাশা কর?"

"শক্ত পাথর নরম হবে। জীবনের লক্ষণ কোমলতা সাবলীলতা।"

কিঙ্কিণী কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর হেসে বলল, "তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব। নিজে তুমি পাথর, না জীবন্ত—?"

"তার মানে?"

তোমার কোমলতা, তোমার সাবলীলতা কিভাবে প্রকাশ করেছ তুমি?

"সব প্রকাশ কি সবই দেখতে পায়?"

রঘুপতির চোখে হাসি চিকমিক ক'রে উঠল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গাঢ়কণ্ঠে সে বলল—সংযমের কঠিন বর্মে আমি আবৃত করেছি নিজেকে। তা না করলে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

"কি তোমার লক্ষ্য?"

"সত্য দর্শন"

"সত্য কি? আমরা এখানে চারদিকে যা দেখছি তা কি সত্য? বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে?"

"বিজ্ঞান প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করে না। যা সে দেখে, যা অনুভব করে তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করে সে। বিজ্ঞানের জগৎ অনুসন্ধানের জগৎ। সে সব জিনিসকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে, যখন তার যুক্তিতে কুলোয় না তখন সে ব'লে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করে না সে। মিরাকল (miracle) হয়, হতে পারে এ কথা সে মানে, কারণ সে এও জানে তার যুক্তির মানদণ্ডে খুঁত থাকতে পারে। তুমি কেমন আছ এখানে?"

"আমি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি! যা দেখছি তা সুন্দর, যা পাচ্ছি তার তুলনা নেই, কিন্তু তবু মানতে পাচ্ছি না যে এগুলো সত্য। মনে হচ্ছে কোথাও ফাঁকি আছে। কি করি বল তো?"

"তোমার সমস্যা তুমি সমাধান কর, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। আমার সমস্যা নিয়ে আমি ব্যস্ত।"

"কি তোমার সমস্যা—"

"পাথরকে জীবন্ত করা। অহল্যা পাথরকে জীবন্ত অহল্যা করব এই আমার তপস্যা—"

"জীবন্ত মানুষের দিকে তুমি ফিরে তাকাও না, পাথরকে জীবন্ত ক'রে কি করবে তুমি?"

"কিছুই করব না। কৌতূহল চরিতার্থ হলেই আবার অন্য কিছু নিয়ে মাতব।"

"সত্যিই যদি তুমি পাথরকে জীবন্ত করতে পার তাহলে জীব জগতে ভারসাম্য

কি নষ্ট হ'য়ে যাবে না? যারা জীবন্ত তারাই জীবনযুদ্ধে হিমশিম খাচ্ছে, সমস্ত পাথররা যদি জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তাহলে তো—"

"বিজ্ঞানী আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে। গীতার উপদেশই সে মানে—কাজ করে যাও, ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামিও না। পরমাণু-বোমা আবিষ্কার ক'রে সে মানব সমাজকে সন্ত্রস্ত ক'রেছে, ডাক্তারি ওষুধ বার করে সে স্বাভাবিক মৃত্যুর পথ রোধ করবার চেষ্টা ক'রে চলছে, সমাজের ওপর এসবের নানারকম প্রতিক্রিয়া তো হচ্ছেই। কিন্তু সে দিকে দৃকপাত করবার সময় নেই বিজ্ঞানীর। সে আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল। বরফ গলছে, তুমি এবার যাও কিঙ্কিণী, আমি দেখি এটাকে ভাল করে।"

"আমি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম এখনি।"

"কি—?"

"দেখলাম দমন দেও যেন ছায়া-রূপে তোমার ভিতর প্রবেশ করল। তার সিংহটাও যেন ঢুকে গেল তোমার মধ্যে—তুমি বুঝতে পেরেছিলে?"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল রঘুপতির চোখের দৃষ্টি।

"তুমি দেখলে? কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি কিছু। অবশ্য আমি মনে মনে কামনা করছিলাম দমন দেওয়ের মতো শক্তি আমি যেন পাই। তুমি দেখলে দমন দেও ঢুকে পড়ল আমার মধ্যে?"

"হ্যাঁ দেখলাম তো। কিন্তু কি ক'রে সম্ভব হয় এসব!"

"সে বিচার করবার প্রবৃত্তি নেই এখন। দমন দেও যদি আমার মধ্যে ঢুকে থাকে তাহলে আমি অসাধ্যসাধন করতে পারব। আমি যে পথে চলেছি তা দুর্গম, সে পথে চলতে হ'লে শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন, দমন দেও আমাকে যদি সে শক্তি দেয়—"

হঠাৎ থেমে গেল রঘুপতি। চেয়ে রইল কিঙ্কিণীর দিকে। অবাক হ'য়ে গেল কিঙ্কিণী, শিউরে উঠল। রঘুপতির চোখে ও কার দৃষ্টি? রঘুপতির? না দমন দেওয়ের?

"আমি এখন যাই, তুমি কাজ কর—"

"যাবে? কিন্তু তোমাকে, কি বলব ভেবে পাচ্ছি না, আমি যাব তোমার কাছে আবার—তুমি—"

একটু থেমে তারপর হঠাৎ অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল রঘুপতি—"যাও, যাও, যাও তুমি কিঙ্কিণী, আমাকে কাজ করতে দাও—"

কিঙ্কিণীর মনে হল রঘুপতির মধ্যে দুটো সত্তা যেন দ্বন্দ্ব করছে। একজন তাকে চাইছে, আর একজন তাকে দূরে ক'রে দিচ্ছে। রঘুপতি হঠাৎ আর একটা ঘরে অন্তর্ধান করল। কিঙ্কিণীও বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। গিয়ে দেখল উপত্যকার বাইরে পার্বতী অপেক্ষা করছে তার জন্য। আর চারদিকে থই থই করছে জ্যোৎস্না। নিঃশব্দ অথচ মুখর, স্পষ্ট অথচ রহস্যময়। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। সহসা সে দেখতে পেল একটু দূরে একটি মন্দির রয়েছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল মন্দিরটি। মনে হল অনুচ্চারিত ভাষায় মন্দিরটি তাকে যেন ডাকছে।

"ও মন্দিরটা কিসের?"

"ওটা খালি মন্দির। শুনেছি ওই মন্দিরে একদিন ছিন্নমস্তা অধিষ্ঠাতা হবেন, এখনও হন নি।"

"কতদূরে ওটা?"

"বেশী দূরে নয়। তবে ছোট একটা পাহাড়ে উঠতে হবে।"

"চল দেখে আসি—"

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল তারা।

একটু দূরে গিয়েই কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল কিঙ্কিণী। মনে হ'তে লাগল একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে ওই মন্দিরের দিকে। একটা খালি মন্দির দেখে কি হবে এ কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু সে থামতে পারছিল না। ট্রেনে সেই ভদ্রলোক তার হাত দেখে যে গল্পটা শুনিয়েছিলেন সেই গল্পটা আবার মনে পড়তে লাগল তার। আবছাভাবে এ-ও মনে হতে লাগল তার নিয়তিও বোধ হয় জড়িত হয়ে আছে ওই মন্দিরের সঙ্গে। আরও রহস্যময় হ'য়ে উঠল জ্যোৎস্না, পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়তে লাগল। তার মনে হল পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। তারপর হঠাৎ আবার মনে হল এই সব অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপারে সত্যিই সে বিশ্বাস করছে না কি! তার বাস্তব বুদ্ধি কি লোপ পেয়ে গেল? তবু কিন্তু সে থামতে পারল না। চলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে টিলার উপর উঠে মন্দিরের সামনে যখন সে দাঁড়াল তখনও সে স্বপ্নাচ্ছন্ন। মন্দিরে দ্বার নেই। দেখল মন্দির শূন্য নয়। ভিতরে একটা ছায়ার মতো কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত থামছে না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। সহসা কে যেন তার কানে কানে বলল—তোমার এখনও সময় হয় নি। হবে, শীঘ্রই হবে। চারিদিকে কেউ নেই। একটা হাওয়া উঠেছে। সেই হাওয়ায় নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে অসংখ্য বরফের ফুলকি...। হঠাৎ কলকণ্ঠে হেসে উঠল কে যেন। ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী।

"ওমা, আপনি এখানে?"

রত্ন এগিয়ে এল হাসতে হাসতে। কিঙ্কিণী দেখতে পেল তার পিছনে পিছনে ঝিলিকও আসছেন।

"আপনারা—"

"আপনার ডাকেই তো এসেছি আমরা।"

"আমার ডাকে?"

"হ্যাঁ, আপনি অনেকক্ষণ থেকে ডাকছেন। আমরা পাতালপুরীতে ভোগবতীর তীরে ছিলাম, তাই আসতে একটু দেরি হ'ল। এসে দেখলাম আপনি রঘুপতির উপত্যকা থেকে বেরুচ্ছেন। সেই থেকে আমরা আপনার অনুসরণ করছি। আপনি যখন ওই শূন্য মন্দিরের সামনে বিহ্বল হ'য়ে গেলেন তখন হাসি চাপতে পারলাম না, হেসে ফেললাম—"

ঝিলিক বললেন, "হেসে তুমি অন্যায় করেছ। এটা হাসির ব্যাপার নয়। উনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তাই ডাকছিলেন আমাদের। আমরা এসেছি। এখন কি করতে হবে বলুন—"

রত্ন মুচকি মুচকি হেসে বলল—"রঘুপতির চেয়ে অনেক বড় বড় মহারথীকে আমরা ঘায়েল করতে পেরেছি—আপনার ভাবনা নেই।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। তার মনের গোপন কামনা কি ক'রে টের পেল এরা। এখনই সে তো রঘুপতির কথাই ভাবছিল।

"আমার এ অবস্থা কেন হয়েছে বলতে পারেন?"

"আমাদেরই কীর্তি। আপনি যখন রাত্রে ছাদে উঠে রঘুপতির সঙ্গে নক্ষত্র দেখতেন তখনই আপনাকে লক্ষ্য ক'রে শরসন্ধান করেছিলেন আমার কর্তা। কথাটা আগে আপনাকে বলি নি।"

আবার কলকণ্ঠে হেসে উঠল রত্ন। তারপর মিলিয়ে গেল দুজনে। অন্তর্ধান করল সহসা।

কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পার্বতী নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওরা কি ক'রে এল এখানে?"—প্রশ্ন করল তাকে।

"কই, কেউ তো আসে নি"

"আসে নি?"

তাহলে হয়তো তার মনোলোকেই ঘটে গেল এসব। কিন্তু এত স্পষ্ট, এত বাস্তব!

"আর কোথাও যাবেন কি"—জিজ্ঞাসা করল পার্বতী।

"না, চল ফিরে যাই।"

ঘরের ভিতর চুপ ক'রে বসেছিল কিঙ্কিণী।

রত্ন আর ঝিলিক আবার এসেছে। সত্যি এসেছে, না কল্পনা করছে সে? রত্ন আর ঝিলিকের সঙ্গে সে কথা কইছে, তাদের দেখতে পাচ্ছে, তবু কেন তার মনে হচ্ছে ওরা আসে নি, যা ঘটছে তা তার মনের ভিতরেই ঘটছে, বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব নেই? জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল বরফের পাহাড় তিনটে ঠিক আগেকার মতোই দেখা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নার স্পর্শে রুপোর পাহাড় হয়ে উঠেছে তারা।

রত্ন আর ঝিলিক কিন্তু কথা কইছে। সেও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। অথচ তার আর একটা সত্তা একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন তাদের এই আলাপ শুনছে।···

ঝিলিক। এ কথা এখন স্বীকার করতে আপত্তি নেই, আমরা ট্রেনে যখন উঠেছিলাম তখনই দমন দেওকে অভিভূত করেছিলেন। সে তখনই আপনার প্রেমে পড়েছিল।

কিঙ্কিণী। সত্যি? কেন এ কাজ করলেন?

রত্ন। যে রূপকথালোকে আপনি এসেছেন সেখানে ছিন্নমস্তার মন্দিরটি তো দেখলেন। তার মধ্যে যে কালো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে সে মূর্তিমতী হবে একদিন। তাই এই ষড়যন্ত্র।

কিঙ্কিণী। ষড়যন্ত্র? কে ষড়যন্ত্র করছে?

ঝিলিক। (হেসে) আপনি নিজে, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে। আপনার এই রূপকথালোকে আপনিই ওই মন্দিরে ছিন্নমস্তা স্থাপন করবেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি—

কিঙ্কিণী। এটা আমার রূপকথালোক?

ঝিলিক। আপনারই

কিঙ্কিণী। শিবের নয়?

রত্ন। শিবেরও। শিব সাহায্য না করলে আপনি একা পারতেন না। শিবের ইঙ্গিতেই আমরা এসেছি, দমন দেও এসেছে, রঘুপতি এসেছে।

কিঙ্কিণী। তাই না কি! কিন্তু শিবকে আমি একদিনও দেখি নি কেন।

ঝিলিক। পংখী কি আপনাকে বলে নি কেন দেখতে পাচ্ছেন না তাঁকে। তিনি আপনার আশেপাশেই ঘুরছেন, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না তাঁকে। অবিশ্বাসের পরদা আপনার দৃষ্টির সামনে ঝুলছে।

কিঙ্কিণী। তিনি শুনেছি সর্বশক্তিমান, তিনি এ পরদাটা সরিয়ে দিচ্ছেন না কেন জোর করে?

রত্ন। সরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয় দিতেন। কিন্তু অবিশ্বাসের পরদা জোর করে সরিয়ে দিলে নাটক জমে না। সর্বশক্তিমান ভগবান তা করতে চান না। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ওটা নিজেই ছিঁড়ে যাবে একদিন। ততদিন তিনি অপেক্ষা করতে চান।

কিঙ্কিণী। আপনাদের দেখতে পাচ্ছি, এই অদ্ভুত পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি এও তো অবিশ্বাস্য, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো!

ঝিলিক। পাচ্ছেন, কারণ এটা যে আপনারই সৃষ্টি। শিব কিন্তু আপনার সৃষ্টি নন। তাঁকে দেখবার দৃষ্টি যখন পাবেন তখনই দেখা যাবে তাঁকে, তার আগে নয়—

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কিঙ্কিণী। মনের দিকে চেয়ে দেখল সত্যিই তো সেখানে অবিশ্বাস রয়েছে। এই সব তার সৃষ্টি? দমন দেও, রঘুপতি, পংখী, এই উপত্যকা, ওই পাহাড়গুলো, ওই পার্বতী-উমা, ওই খালি ছিন্নমস্তার মন্দির, ওই বক—এ সব তার সৃষ্টি? কি এমন শক্তি আছে তার? তার মনের অতলে এই শক্তির উৎস লুকিয়ে ছিল? কই, এতদিন তো টের পায় নি সে। কোন মন্ত্রবলে সে আবিষ্কার করল এই শক্তির উৎসকে? মনে পড়ল সে যখন মোটর থেকে নেমে মাটামাঠি ছুটছিল, যখন প্রতিমুহূর্তেই তার আশঙ্কা হচ্ছিল পিছন থেকে কোনও গুণ্ডা এসে তাকে ধ'রে ফেলবে। তখন তার মনে ফুটে উঠেছিল পিসিমার ঠাকুরঘরের সেই শিবের ছবিটি। প্রশান্ত মুখে স্মিত হাস্য। নয়নের দৃষ্টিতে করুণা আর আশ্বাসের বাণী নীরব মুখরতায় মূর্ত। তা ভাষায় কিছু বলছে না অথচ সব বলছে। তার কাছে কি আকুল প্রার্থনা জানায় নি কিঙ্কিণী? ক্ষণকালের জন্য তার মনে কি অগাধ বিশ্বাস জাগে নি? তারই ফল কি এই সব? তার গভীরতম সত্তায় সৃষ্টির যে স্বপ্ন সুপ্ত হয়েছিল তাই কি জেগে উঠল পরম মুহূর্তের আলৌকিক সুষমায়? সেই স্বপ্নের মধ্যে কি লুকিয়ে ছিল মহাশক্তিমান বর্বর দমন দেও, আদর্শবাদী বিজ্ঞানী রঘুপতি, যাদুকর পংখী, পুরাণের মদন-রতি, অতি-বিশ্বাসী বৃদ্ধ বক, বিষধর সাপের দল—এরা সবাই সুপ্ত ছিল তার অবচেতন স্বপ্নলোকে? বিশ্বাসের ছোঁয়া লেগে সবাই জেগে উঠল, বর্ষণের পর ঊষর ক্ষেত্রে যেমন জেগে ওঠে শ্যাম সমারোহ, কিন্তু যে বিশ্বাসের প্রভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে সে বিশ্বাস কি তার এখনও আছে? যদি থাকে তাহলে শিবকেও সে দেখতে পাবে না কেন। ঝিলিককে প্রশ্ন করবার জন্যে সে ঘাড় ফেরাল। কিন্তু দেখল তারা কেউ নেই। অবাক হ'য়ে গেল।

"পার্বতী—"

পাশের ঘর থেকে পার্বতী নীরবে এসে দাঁড়াল।

"এঁরা কোথা গেলেন?"

"কেউ তো আসেন নি"

"আসেন নি? তাহলে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখনই তো রত্ন আর ঝিলিক ব'সে ছিলেন আমার সামনে।"

পার্বতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল—"আপনার কল্পনাই হয়তো মূর্তিমতী হয়েছিল। অনেক সময় হয়। এখন খাবেন কি? খাবার তৈরি হয়ে গেছে—"

"বেশ দাও।"

অনেক রকম সুখাদ্য টেবিলের উপর সাজানো ছিল। কিঙ্কণী সামান্য একটু খেল। তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল সে। জ্যোৎস্না, অপরূপ জ্যোৎস্না চারিদিকে। বারান্দার একধারে সেই পাথরের পরদাটা টাঙানো ছিল। কিঙ্কণীর মনে হল দেখি না আমার জীবন কোন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে এখন।

ঘরের সামনে দু'জন বন্দুকধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।

দু'জন ভদ্রলোক বাইরে থেকে এসে দাঁড়ালেন।

"কিঙ্কণী দেবীর সঙ্গে দেখা করব।"

"আপনারা বসুন এইখানে। আর এই শ্লেটে আপনাদের নাম ঠিকানা আর কেন এসেছেন লিখে দিন।"

"উনি ফোনে আমাদের ডেকেছিলেন।"

"তবু লিখে দিন—"

শ্লেটের লেখা নিয়ে একজন ভিতরে প্রবেশ করল এবং কপাটটি ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিল আবার। বোঝা গেল কিঙ্কণীর সঙ্গে দেখা করা শক্ত। সব সময়ই সে রুদ্ধদ্বারের ওপারে থাকে। দ্বারের সামনে থাকে কড়া পাহারা। প্রহরী যখন ঢুকল তখন কিঙ্কণী টেবিলের উপর ঝুকে প'ড়ে চিঠি লিখছিল। প্রহরী একটু গলা খাঁকারি দিতেই কিঙ্কণী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

"দুজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে।"

শ্লেটের দিকে তাকিয়ে কিঙ্কণী বলল—"হ্যাঁ, আমিই ডেকেছি ও'দের। থাম, তবু একবার চেহারাটা দেখে নি"

কিঙ্কণী উঠে গেল। কপাটের ছেঁদা দিয়ে দেখল কে এসেছে। তারপর বলল—"ঠিক আছে। আসতে দাও ও'দের।"

ভদ্রলোক দুজন এলেন ঘরের মধ্যে। একজন প্রবীণ, আর একজন যুবক। কিঙ্কণী উঠে প্রবীণ ভদ্রলোককে প্রণাম ক'রে বলল—"আসুন মামাবাবু"—যুবকটির দিকে ফিরে মৃদু হাসল একটু—"অসিত তুমি ভালো আছ? তুমি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছ কাগজে দেখলাম পরশু। খাবে কিছু?"

অসিত এককালে কিঙ্কণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু আমোল দেয় নি তাকে কিঙ্কণী। অপ্রত্যাশিতভাবে কিঙ্কণী তাকে ফোন করাতে সে বিস্মিত হয়েছিল একটু।

"না। হঠাৎ ডেকেছ কেন!"

"এঁকে চেন?"

"না"

"ইনি আমার মামাবাবু।"

অসিত নমস্কার করল ভদ্রলোককে। তারপর হেসে বলল—"আমার ধারণা ছিল তোমার মায়ের কোনও ভাই নেই।"

"ইনি মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই। রাঁচিতে থাকেন। ওঁকে 'ট্রাংক কল' করে ডেকে এনেছি আজ।"

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন—"কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। তোমার বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়া চলছে সেটা শুনেছি। সেই সম্পর্কেই ডেকেছ না কি। আমার মত হচ্ছে মিটিয়ে নাও। ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। অনেকদিন জজিয়তি ক'রে এইটে বুঝেছি যে—"

থামিয়ে দিলে তাঁকে কিঙ্কিণী।

"এ ঝগড়া মিটবে না। মিটতে পারে না। বাবা সমস্ত সম্পত্তিটি গ্রাস ক'রে তা মদে মেয়েমানুষে রেসে নষ্ট করতে চান। আমি তা কিছুতে হতে দেব না। জানেন? বাবা গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন? অনেক কষ্টে বেঁচেছি। ভয়ে ভয়ে বেঁচে আছি। চারিদিকে পাহারা রেখেছি। এ সত্ত্বেও হয়তো তিনি খুন ক'রে ফেলবেন আমাকে। তাই আমি একটা উইলে সাক্ষী হবার জন্যে ডেকেছি আপনাদের।"

"বিষয়ের মালিক তুমিই?"

"হ্যাঁ। বিষয় মায়ের ছিল। মা সেটা আমাকে দিয়ে গেছেন।"

"তোমার বাবার কোন অধিকার নেই সে বিষয়ে?"

"না। ঠাকুরদা বাবাকে একটা মিল এবং মাসিক পাঁচ শো টাকা মাসোহারা দিয়ে গিয়েছিলেন। বাকী সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন মাকে। মা যখন বেঁচেছিলেন তখনই তিনি আমাকে সে সম্পত্তি দানপত্র ক'রে দিয়ে গেছেন।"

"উইলটা লিখেছ?"

"লিখেছি।"

ড্রয়ার টেনে উইল বার করল কিঙ্কিণী।

"পড়।"

"এই আমার শেষ উইল। এই উইল দ্বারা আমি আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার বন্ধু অধ্যাপক রঘুপতি মুখোপাধ্যায়কে দিয়া যাইতেছি। তিনি ফিজিক্সের অধ্যাপক। বর্তমানে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মে নিযুক্ত আছেন। আমার সমস্ত বিষয়ের বর্তমান আয় বৎসরে দশ লক্ষ টাকা। আমার ইচ্ছা এই টাকা আমাদের সমাজের নির্যাতিতা নারীদের উদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত হোক। ইহা ছাড়াও অধ্যাপক রঘুপতি মুখোপাধ্যায় যদি এ টাকা অন্য কোন সৎকার্যে ব্যয় করেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আমি আমার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছার দ্বারাই তিনি চালিত হইবেন এমন বাধ্যবাধকতা নাই। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি তিনি এ টাকার সদ্ব্যবহারই করিবেন। তবে আর একটা আশঙ্কাও আছে। তিনি আমার এ দান

প্রত্যাখানও করিতে পারেন। যদি করেন তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনই যেন আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালারের নিকট হইতে অধ্যাপক রঘুপতি মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে পত্রটি পাইয়াছি তাহা এই উইলের সঙ্গে দিলাম। ইহাতে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিস্তৃততর পরিচয় এবং তাঁহার আমেরিকার বর্তমান ঠিকানা দেওয়া আছে।"

উইল পড়া হয়ে গেলে দু'জনেই চুপ ক'রে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন—"এইবার আমাদের সামনে সই কর।"

সই করা হ'য়ে গেলে দু'জনেই যথাবিধি উইলের সাক্ষী হলেন।

কিঙ্কিণী বললে "এ উইলের আর একটি কপি করেছি। দ্বিতীয় কপিটিতেও আমি সই করছি, আপনারাও সই ক'রে দিন। একটি কপি নিয়ে রেজেস্ট্রী অপিসে দিতে হবে।"

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, "আমি তো আজই চলে যাচ্ছি। এখানেই রেজেস্ট্রি করিয়ে নিও। রেজেস্ট্রি না করালেও চলে।"

"রেজেস্ট্রি করাতেই হবে। অসিত তুমি ভার নাও তাহলে—"

"বেশ—"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল কিঙ্কিণী। একটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মনোলোক পরদার ছবিটা মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিহ্বল হ'য়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, কোনটা সত্য? আমি কোথায় আছি, রঘুপতি কোথায়……। এর পর কতক্ষণ কেটে গেছে তা তার মনে নেই। হয়তো সময়ের স্রোত থেমে গিয়েছিল, হয়তো সময় মাপবার চেতনা হারিয়ে গিয়েছিল, হয়তো কিঙ্কিণী এমন একটা লোকে চলে গিয়েছিল যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু নেই, কিন্তু তবু—হ্যাঁ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এটা—সেখানে আনন্দ ছিল বস্তুত আনন্দ ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না এবং আশ্চর্যের কথা সে আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় দিয়ে তা উপভোগ করে নি কিঙ্কিণী উপভোগ কথাটা দিয়েও তা বর্ণনীয় নয়, আসলে খানিকক্ষণের জন্য সে যা পেয়েছিল তা অনির্বচনীয়। কিন্তু সেখানে থেকে চলে আসতে হল অবশেষে। কি ক'রে সে সেখানে গিয়েছিল, কি করেই বা সেখান থেকে ফিরে এল, কিছুই বুঝতে পারল না সে। চোখ খুলে দেখল পংখী দাঁড়িয়ে আছে।

"পংখী আমি কোথায় ছিলাম এতক্ষণ।"

পংখী চুপ ক'রে রইল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায় ভাব। পংখীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কিঙ্কিণী বুঝল ব্যাপারটা। যা বলা যায় না তা ও বলবে কি করে?

কিঙ্কিণী কি বলতে পারবে?

পংখী তবুও বলল—"আপনি আভাস পেয়েছেন।"

"কিসের আভাস?"

"যার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তপস্যা করছেন।"

"কিঙ্কিণী চুপ ক'রে রইল।

তারপর পংখী বলল—"আমি আপনার কাছে একটি নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি। ছিন্নমস্তার যে শূন্য মন্দির আজ আপনি দূর থেকে দেখে এসেছেন সেই মন্দির আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আগামী অমাবস্যায়।"

"মন্দির আমন্ত্রণ জানিয়েছে? মন্দির কথা বলতে পারে?"

"পারে। তার কথা আমি বুঝতে পারি। বলেছে যদি আপনি যান সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাবেন। শাণিত খড়্গ। পথে বিপদের সম্ভাবনা।";

কিঙ্কিণীর মনে হল এইবার ঘনিয়ে আসছে। যা অনিবার্য তা এবার ঘটবে। কিন্তু তারপর?

পংখী বললে—"কাল আমি ভালো খড়্গ রেখে যাব একটা।"

কিঙ্কিণী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর পংখী বললে—"কাল সকালে নীলপর্ণও আসতে চায়। আপনার অনুমতি চেয়েছে। আসতে বলব তো?"

"বোলো—"

খুব ভোরে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছিল কিঙ্কিণী। ভেবেছিল স্বপ্নের ঘোরটা স্নান করলেই কেটে যাবে। কিন্তু কাটে নি। তার পিসিমার কথাগুলো সমানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার কানের পাশে। "আমি শিবকে বলেছি তোর কথা। কোনও ভয় নেই তোর। তিনি বলেছেন সব ঠিক ক'রে দেবেন। বিশ্বাস হারাস নি। বিশ্বাস কর, তিনি যা করবেন তাতে তোর মঙ্গল হবে।"

পিসিমা কতদিন আগে মারা গেছেন। কোথায় আছেন তিনি এখন? সেখানে কি শিবের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর? আমার কথা বলেছেন শিবকে?

"পার্বতী এসে বলল—"আপনার খাবার দিয়েছি।"

খাবার টেবিলে রোজই অনেক রকম খাবার থাকে। সেদিন একটা নূতন খাবার ছিল। শ্বেতপাথরের বাটিতে ঘিয়ের মতো কি খানিকটা।

"কি এটা—"

"মধু।" পংখী বলল—"আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন তাই আপনাকে মধু দিতে।"

কিঙ্কিণী অন্যমনস্ক হ'য়ে রুটিতে মধু মাখিয়ে খেতে লাগল। ক্রমশ তার দেহের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হ'তে লাগল একটা স্নিগ্ধ উত্তাপ। সত্যিই সে খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যেই ভালো ঘুমও হয় নি তার। খুব বেশী ক্লান্তি হলে ঘুম আসে না। আচ্ছন্ন হ'য়ে শুয়েছিল সে বিছানায়, ঘুম আসে নি। এসেছিলেন পিসিমা। এখন ঘুম পেতে লাগল তার। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বুজে গেল। বিশ্রামের অতলে তলিয়ে গেল সে। মনে হতে লাগল বিরাট সমুদ্রের তলায় যেন নেবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তারপর মনে হল কার কোলে যেন সে শুয়ে রয়েছে। কার কোলে শুয়ে আছি? ঘুমের মধ্যেই প্রশ্ন জাগল মনে। তারপর চোখ খুলে দেখবার চেষ্টা করল সে। দেখেই চমকে উঠল। একি—এ যে ট্রেনের সেই ভদ্রলোক। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল সে। দেখল পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে।

"নীলপর্ণ অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে। আপনি ঘুমুচ্ছিলেন বলে আপনাকে ওঠাই নি।"

কিঙ্কিণী বেরিয়ে দেখল বিরাট একটা নীলরঙের পাখি পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সামনের মাঠে। অনেকদিন আগে চিড়িয়াখানায় উটপাখি দেখেছিল, নীলপর্ণ তার চেয়েও অনেক বড়। প্রায় একতলা সমান উঁচু। সর্বাঙ্গে নীলবর্ণের সমারোহ। মাথায় মুকুটের মতো ঝুঁটি একটি। চোখ দুটি বড় বড়। রক্তাভ। পাখির চোখের মতো গোল-চোখ নয়, মানুষের চোখের মতো। পা দুটি সবুজ, মরকতমণি দিয়ে তৈরি যেন। বাঁশের মতো মোটা। পায়ের নখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্ণ-দ্যুতি।

কিঙ্কিণী বারান্দা থেকে নেমে প্রণাম করল তাঁকে।

"আসুন—"

কিঙ্কিণীকে দেখে নীলপর্ণের গায়ের পালকগুলো ফুলে উঠল। নানা আমেজের নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড বেলুন দ্রুতপদে এগিয়ে এল কিঙ্কিণীর দিকে। মানুষের ভাষায় কথা কইল।

"অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। বক মশাই খুব সুখ্যাতি করেছিলেন আপনার।"

"আমাকে আপনি বলবেন না—"

"আপনি তুমি তুই এসব অবান্তর। সুর মিলে গেছে সেইটেই আসল কথা। সুর না মিললে আসতুম না।"

হেসে উঠল নীলপর্ণ। মনে হল গলার ভিতর থেকে কে যেন হাততালি দিচ্ছে।

কিঙ্কিণী বলল—"আপনি মানুষের মতো কথা বলছেন, কিন্তু আপনার পাখির মতো চেহারা কেন।"

"আমরা গরুড়ের বংশধর। যে কোন রূপ আমরা ধারণ করতে পারি। পাখির রূপ ধারণ করে আছি, কারণ তাতে সুবিধে হয়। ত্রিভুবনের সর্বত্র যেতে হয় আমাদের। পাখিই জলে স্থলে আকাশে যেতে পারে। পংখীও ওই কারণে পাখি হয়ে আছে। আসলে ও শুকদেব। মহাদেবই ওকে সৃষ্টি করে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়েছিলেন। এখন ও মহাদেবের কাছেই থাকে। মহাদেবের আদেশে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। পাখি হলে ঘোরাফেরায় সুবিধা হয় খুব।"

"মহাদেবকে দেখেছেন আপনারা ?"

"তাঁর মধ্যেই তো নিমজ্জিত হয়ে আছি। তুমি হাওয়াকে দেখেছ কখনও ? অথচ হাওয়ার মধ্যেই তো ডুবে আছ। যেতে দাও ওসব কথা, বুঝবে যখন বুঝবে, কেউ কাউকে বুঝিয়ে দিতে পারে না। একদিন নিজেই বুঝবে। যারা চোখ বুজে সব মেনে নিতে পারে, তুমি সে জাতের লোক নও। তুমি দ্বিধাগ্রস্ত জিজ্ঞাসু। তোমার দ্বিধাও ঘুচবে। সবাই ডুবে যাবে একদিন। এইবার যে জন্যে তোমার কাছে এসেছি সেইটে বলি। দমন দেও বলে মহাদেবের এক ভক্ত এখানে এসেছে। লোকটা না কি ডাকাত ছিল। লোকটা আমাকে ভারি বিরক্ত করছে।"

"আপনাকে ?"

"হ্যাঁ। মহাদেবের অতুল ঐশ্বর্য কুবেরের ভাণ্ডারে আছে। সেই ভাণ্ডারের আমি প্রহরী। সে ভাণ্ডারের দ্বারে পৌঁছানো সহজ নয়। দুর্গম পাহাড়, দুস্তর

প্রপাত, ভয়ঙ্কর অরণ্য, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার বেষ্টনী পার হয়ে যেতে হয় সেখানে। দুর্ধর্ষ ডাকাত দমন দেও এসব অতিক্রম করে কুবেরের ভাণ্ডারে ঢুকেছিল। ঢুকে স্যমন্তক মণিটি চুরি ক'রে পালাচ্ছিল, কিন্তু ফিরবার পথে ধরা পড়ল নাগ প্রহরীদের কাছে। তারা ওকে বন্দী ক'রে নিয়ে এল আমার কাছে। দমন দেও বলছে সে স্যমন্তক মণিটি তোমাকে দেবে ব'লে চুরি করতে গিয়েছিল, সে তোমাকে ভালবাসে। সাধারণ চোর হ'লে সাপেরা তাকে মেরে ফেলত। কিন্তু সে শিবভক্ত ব'লে সাপেরা তাকে মারে নি। দমন দেও বলছে তুমি যদি স্যমন্তক মণিটি গ্রহণ কর তাহলে মরতেও তার আপত্তি নেই। আমিই বিচারক, কিন্তু আমি একটু গোলমালে পড়েছি। তোমরা দুজনেই মহাদেবের প্রিয়, তা নাহলে এখানে আসতে না। তোমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছে। হঠাৎ একজনের প্রাণদণ্ড দিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? তাই তোমাকে জিগ্যেস করতে এসেছি এখন কি করি বল। এ জট তুমিই ছাড়াও—"

আবার নীলপর্ণের গলার ভিতর হাততালি বেজে উঠল।

"দমন দেও কোথা?"

"সে প্রহরী পরিবৃত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকব তাকে?"

"ডাকুন—"

"শঙ্খচূড়, দমন দেওকে নিয়ে এস—"

এরপর যে দৃশ্য দেখা গেল তাতে যে কোনও লোক শিউরে উঠত, অভিভূত হয়ে পড়ত বিস্ময়ে আর ভয়ে। কিন্তু কিঙ্কিণী প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাই আর ছিল না তার। পাঁচটি উদ্যত-ফণা বিরাট সাপ দমন দেওকে ঘিরে ছিল। দমন দেও এগিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে, সাপগুলোও আসছিল। দমন দেওয়ের হাতে একটা সূর্য জ্বলছিল যেন। ওই কি স্যমন্তক মণি? কিঙ্কিণী বিস্মিত হল না, বরং তার মনে হল এই তো স্বাভাবিক। দমন দেও যখন তাকে ভালবাসে তখন সে তো তার জন্যে অসাধ্যসাধন করবেই। কিছুদিন আগেও তো অনেক মণি-মাণিক্য এনে দিয়েছিল তাকে সেগুলো ওই বারান্দার একধারে এখনও পড়ে আছে। তোলা হয় নি। আবার স্যমন্তক মণি চুরি ক'রে এনেছে আমাকে দেবে বলে। প্রাণ তুচ্ছ করে এনেছে। এইটেই তো স্বাভাবিক। একটা সূক্ষ্ম গর্ব সঞ্চারিত হ'ল মনে।

দমন দেও বললে—"তোমার জন্য এটা এনেছি কিঙ্কিণী। এটা নিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর। এরা আমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু মরবার আগে যদি জেনে যাই তুমি এটা নিয়েছ তাহলে মরেও আমি আনন্দ পাব। নেবে?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে কিঙ্কিণী প্রশ্ন করল—"তোমার সিংহ কোথায়?"

"তাকে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছি। তারই জোরে গিয়েছিলাম কুবেরের ভাণ্ডারে, সেখান থেকে তোমার জন্যে এনেছি সেই স্যমন্তক মণি, যা সূর্য তার বন্ধু সত্রাজিৎকে দিয়েছিলেন, এ মণির অনেক ইতিহাস, অনেক গুণ, তুমি এটি নাও কিঙ্কিণী।"

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল কিঙ্কিণীর মুখ।

"তোমাকে আমি ভালবাসি না দমন দেও। তোমার কাছ থেকে উপহার কি করে নেব? আমি তো তোমাকে দিতে পারব না কিছু।"

"আমি কিছু চাই না। আমাকে ভালবাস না বলছ? কিন্তু তুমি আমারই

ভদ্ররূপটাকে ভালবাস। রঘুপতি আমারই ভদ্ররূপ। রঘুপতির ভদ্ররূপের আড়ালে যে দুর্ধর্ষ ডাকাতটা আছে আমি সেই ডাকাত। আমি রঘুপতিরই মনের আর একটা রূপ। কিন্তু আমি তো আর থাকব না। এরা আমাকে এখনই মেরে ফেলবে। মরবার আগে আমি এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে মরতে চাই—"

"রঘুপতি আর তুমি এক?"

"সেদিন যখন রঘুপতির কাছে গিয়েছিলে তখন কি বুঝতে পারনি সেটা? আমি ওর মধ্যে ছিলাম, যদি মরে যাই তাহলে আর থাকতে পারব কি না জানি না—"

নীলপর্ণ নিজের ডানা দুটো ঈষৎ খুলে মৃদু মৃদু আস্ফালন করছিলেন। আস্ফালন থামিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল কি করবে। বেশি দেরি হয়ে গেলে দুর্বাসার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। তিনি আজকাল আমাদের সর্বাধ্যক্ষ। বড় কড়া লোক।"

"আমাকে কি করতে হবে—" কিঙ্কিণী আবার প্রশ্ন করল।

"জট ছাড়াও। তুমি কি স্যমন্তক মণিটা নেবে?"

"কুবেরের মণি নিয়ে আমি কি করব?"

"মহাদেবের আদেশে তুমি এখানে যতক্ষণ আছ তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে। স্যমন্তক মণি তুমি যদি চাও পাবে, কিন্তু একটা কথা বলা দরকার। বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছাড়া স্যমন্তক কারো কাছে থাকে নি। অধার্মিকের পক্ষে ও মণি অনিষ্টকর। প্রসেনজিৎ এ মণি রাখতে পারেন নি, জাম্ববান পারেন নি। তুমি যদি পুণ্যবতী হও, তাহলে এ মণি তোমার অনেক উপকার করবে, আর তা যদি না হও—"

"আমি পুণ্যবতী কি না জানি না। পুণ্যের সংজ্ঞা কি তাও আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু বলতে পারি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু কখনও করি নি। এখন যে অদ্ভুত আশ্চর্য দেশে আছি তা না কি মহাদেবের অলৌকিক ক্ষমতা বলে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আমার বিবেকের আয়নায় সে মহাদেবকে জ্ঞাতসারে আমি দেখতে পাচ্ছি না এখনও, যদিও পংখী বলেছে আমার অবচেতন লোকে আমার সত্তা না কি বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে বলেই আমি এই পরমমুহূর্তে প্রবেশ করেছি, এখন যা দেখছি তা না কি সেই পরম মুহূর্তের প্রকাশ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কিছু আমার দ্বিধা ঘোচে নি এখনও—"

নীলপর্ণ পাখা দুটি ধীরে ধীরে আস্ফালন করতে করতে শুনছিলেন সব। হঠাৎ বলে উঠলেন—"বাঃ বাঃ বাঃ। খুব খাঁটি লোক তুমি। খাঁটি লোকদের দ্বিধা সহজে ঘোচে না। দ্বিধা ঘুচতে সময় লাগে, অনেক সময় যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর কেটে যায়। নিতে পার তুমি স্যমন্তক মণি। এ মণি শুধু রত্ন নয়, এ মণি সূর্যের আত্মা। তুষ্ট হলে বর দিতে পারেন, রুষ্ট হলে অভিশাপ দিতে পারেন, অতুল ঐশ্বর্য অকল্পিত ক্ষমতা এমন কি আত্মজ্ঞানও লাভ করতে পার এ মণি যদি প্রসন্ন হন—"

"এ মণি এতদিন কুবেরের কাছে ছিলেন? কুবের খুব ভালো লোক বুঝি—"

"এ মণি মহাদেবের। কুবেরের কাছে ছিল, কারণ কুবের মহাদেবের ঐশ্বর্যরক্ষক। কোন ঐশ্বর্য সম্বন্ধে শিবের মোহ বা মমতা নেই। তিনি নিজের আনন্দেই সর্বদা মশগুল। নানা মণিমাণিক্যের আকর রত্নগিরি দিয়ে দিয়েছেন একজন যক্ষকে সে না কি ওঁর খুব ভক্ত। বললেন—ওর হীরে-টিরে নিয়ে খেলবার ইচ্ছে

হয়েছে দিয়ে দাও ওকে রত্নগিরিটা। খেলুক কিছুদিন। তুমি স্যমন্তক নিলে উনি খুশী হবেন—"

"আমি তো স্যমন্তকের কথা জানতাম না। ওঁকে যদি আমি পাই তাহলে কৃতার্থ হয়ে যাব। ভাগ্যবতী মনে করব নিজেকে। কিন্তু আমার একটা কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে, যে দমন দেও আমাকে স্যমন্তক এনে দিলে তার প্রাণদণ্ড দেবেন আপনারা ?"

"তুমি যা বলবে তাই হবে। ওই দুর্ধর্ষ ডাকাতকে তুমি যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও ওকে আমরা মারব না।"

আবার নিজের পক্ষ দুটি ধীরে ধীরে আস্ফালন করতে লাগলেন নীলপর্ণ। কিঙ্কিণী লক্ষ্য করল তাঁর চোখ থেকে একটা চাপা হাসিও যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

"স্যমন্তক তাহলে তুমি নিচ্ছ ?"

"যিনি সূর্যের প্রতিরূপ তাঁকে নেব এ কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। তিনি নিজে যদি আসেন তাহলে ধন্য হব আমি। আমি—"

এরপর অতি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল একটা। যে স্যমন্তক মণি দমন দেওয়ের হাতে এক মুঠো আলোর মতো জ্বলছিল তা দিব্যকান্তি মনুষ্যমূর্তিতে রূপান্তরিত হল সহসা। মৃদু হেসে এগিয়ে গেল কিঙ্কিণীর দিকে। বলল, "দমন দেও আমাকে আনতে পারত না। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি ওর হাতে। কারণ আমি জানতাম ও তোমাকে দেবে বলেই নিয়ে আসছে আমাকে। তুমি আলোর উপাসক, তোমার ডাক শুনেছি আমি, তাই এসেছি—"

ঘরের ভিতর চ'লে গেলে সেই আলোক-মূর্তি। নীলপর্ণ হঠাৎ নৃত্য শুরু করে দিলে মহানন্দে। আর বলতে লাগল—"এরকমটা যে হবে তা ভাবি নি। বাঃ বাঃ বাঃ। দমন দেওকে ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে। শঙ্খচূড় ওকে মুক্তি দাও—"

সাপেরা চলে গেল। বিরাট পক্ষবিস্তার ক'রে উড়ে গেল নীলপর্ণ। সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল হাততালি।

দমন দেও এগিয়ে এল।

"কিঙ্কিণী তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। প্রতিদান তোমাকে কি দেব বল ?"

"কিছু দিতে হবে না।"

"দেবই। তোমার ভুল ভেঙ্গে দেব আমি। তোমাকে বুঝতেই হবে যে তোমার রঘুপতি আর আমি অভিন্ন।"

কিঙ্কিণী এর কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। ভিতরে ঢুকে গেল।

গিয়ে দেখল মনুষ্যরূপী স্যমন্তক সেখানে নাই।

কিন্তু সমস্ত ঘরটা অপরূপ আলোয় ঝলমল করছে। একটা জীবন্ত অথচ নীরব ভাস্বরতা যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে চতুর্দিকে। কিঙ্কিণীর মনে হল তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অবারিত হয়ে গেছে, তার সমস্ত গোপন কথা প্রকাশিত হয়ে গেছে এই আশ্চর্য রঞ্জনরশ্মির কাছে।

বিছানায় বসে পড়ল। তারপর চুপ করে চেয়ে রইল সভয়ে।

আলো কথা কইল সহসা।

"তোমার ভয় করছে ?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমার সব ঢাকা খুলে গেছে।"

"তুমি কি ঢাকা খুলতে চাও না? একটা জিনিস জানি তুমি সত্যকে অপরোক্ষ করতে চাও। সত্যকে আলোতেও দেখা যায় অন্ধকারেও দেখা যায়। আলো যদি তোমার ভালো না লাগে আলোকে অন্ধকারে রূপান্তরিত করতে পারি। তাই কি চাও তুমি—"

চুপ ক'রে রইল কিঙ্কিণী। যেন অপেক্ষা করতে লাগল স্যমন্তকই তার মনের কথা ব্যক্ত করবেন। কিন্তু কিছুই হল না। আলো ক'মে আসতে লাগল ক্রমশ। দেখতে দেখতে সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল চারদিক।

"কোথায় আপনি—"

"আমি তোমার কাছেই আছি। সংহরণ করেছি আমার আলো। অন্ধকারেই হয়তো তোমার দ্বিধা ঘুচবে"

"ঘুচবে কি? যা দেখছি তা কি সত্য?"

কোনও উত্তর এল না।

প্রতীক্ষা করে ব'সে রইল কিঙ্কিণী। কতক্ষণ বসেছিল কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে প্রতীক্ষা ক'রে বসেছিল। স্যমন্তক যদিও কথায় কিছু বলে নি কিন্তু মনের ভিতর একটা উত্তর পেয়েছিল সে। ছিন্নমস্তার মন্দির তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে অমাবস্যায়। সেই অমাবস্যার অন্ধকারে হয়তো সে উত্তর পাবে।

অন্ধকার চারিদিকে। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

পংখী যে পাথরের পরদাটা টাঙিয়ে দিয়েছিল সেটা বারান্দার ওদিকে আছে। সেইদিকেই এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। তার অপর সত্তাটা কি করছে এখন? সেখানে কি স্যমন্তক মণির ছোঁয়া লাগে নি কিছু? কৌতূহল হল। সঙ্গে সঙ্গে ছবি ফুটে উঠল পরদায়। দেখে শিউরে উঠল সে।

তার ঘরের সামনে খুনোখুনি হচ্ছে। দারোয়ান দুটো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। সামনে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা।

কিঙ্কিণী কপাট খুলতেই ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

"উইল করেছ শুনছি। সব খবর পেয়েছি আমি। উইল বদলাও, তা নাহলে—"

"কি করবে তা নাহলে—"ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখব তোমাকে। অকথ্য যন্ত্রণা দেব—"

কিঙ্কিণী নির্বাক হ'য়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তার চোখ বাঘিনীর চোখের মতো জ্বলতে লাগল। হঠাৎ সে ড্রয়ার খুলে বার করল তার রিভলভারটা। রিভলভার উঁচিয়ে ধরে বললে—"এখখুনি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।"

গর্জন করে উঠলেন কিঙ্কিণীর বাবা।

"রাঘো সিং—রমজু মিঞা। আও তুমলোক—খিঁচকে লে যাও এ খচড়িকো।"

দুজন গুণ্ডা প্রবেশ করল দ্রুতবেগে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল কিঙ্কিণীর রিভলভার। পড়ে গেলেন কিঙ্কিণীর বাবা। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তাঁর। গুণ্ডাদের লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়তে লাগল কিঙ্কিণী। কিন্তু তারা পালিয়ে গেল।

আর দেখতে ইচ্ছে করল না কিঙ্কিণীর। ছবি মিলিয়ে গেল। বারান্দার উপর

অবসন্ন হ'য়ে ব'সে পড়ল। এই কি সত্যি? এই বাস্তব জীবন যাপন করছে সে? কিঙ্কিণীর মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তারপর মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল সে। মূর্ছার ভিতরই পংখী এসে যেন দাঁড়াল। বলল—"মনের ভার লাঘব ক'রে ফেলুন। চীৎকার ক'রে বলুন যা বলতে চান। সভা ডাকব? আপনি তো একবার সভায় বক্তৃতা করতে চেয়েছিলেন। সভা ডাকছি। বক্তৃতা করুন সেখানে। খানিকটা বায়ু বেরিয়ে গেলে হালকা বোধ করবেন।"

"বায়ু?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল কিঙ্কিণী।

"মনের ভিতর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সেটাকে আমরা বক্তব্য বলে মনে করি, কিন্তু বেরিয়ে গেলেই তা বায়ু হ'য়ে যায়। মিশে যায় বায়ু-সমুদ্রে। কিছুক্ষণ শব্দের ঢেউ ওঠে তারপর তাও থেমে যায়। মনে যা জমেছে বার ক'রে দিন। আরাম পাবেন—"

বিরাট সভা।

লক্ষ লক্ষ লোক ব'সে আছে উন্মুখ হ'য়ে।

মাইকও এসেছে একটা। কিঙ্কিণী মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক হ'য়ে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কানের কাছে পংখীর মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"যা মনে আসছে, আরম্ভ ক'রে দিন—"

মরিয়া হয়ে শুরু ক'রে দিল কিঙ্কিণী। বলতে লাগল সেই সব কথা বহুবার যা বহুলোকে বলেছে—"আমরা কি সভ্য হয়েছি? সভ্যতার লক্ষ্য যদি সুখশান্তি লাভ হয়, তাহলে বলতে হবে আমরা সভ্য হই নি। কারণ আমাদের কষ্টের অবধি নেই। আমরা খালি ছটফট করছি, আমরা খালি বদলাচ্ছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশুর বাইরের চেহারাটা বদলেছে, কিন্তু সে মরে নি। নিত্য নতুন প্রসাধনে সে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আগে রাজতন্ত্র ছিল, দাসত্ব-প্রথা ছিল, বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নি। এখন গণতন্ত্র হয়েছে দাসত্ব-প্রথা নেই, বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কষ্টের অবসান হয়েছে কি? হয় নি। গণতন্ত্রের নামে নানারকম দল গ'ড়ে আমরা যা করছি তাতে ধনী-দরিদ্র কেউ সুখী হয় নি—লোভীরা, ধূর্তরা, ধনীরা শাসকের আসন দখল করেছে, নূতন ধরনের শৃংখল তৈরি হয়েছে, দেখা দিয়েছে নূতন ধরণের দাসত্ব-প্রথা। আমরা যন্ত্রের দাস হয়েছি, টাকার দাস হয়েছি, ষড়-রিপুর চাবুকের তাড়নায় আমরা যে মরীচিকার দিকে ছুটে চলেছি তা কি সুখ? তা কি সভ্যতা? প্রত্যেকেরই পশু-রূপ বেরিয়ে পড়ছে মুহুর্মুহু, আমরা যে পথের উপর দিয়ে চলেছি তা রক্তাক্ত—আপনারা সবাই জানেন আমাদের স্বরূপ কি—তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করব না। একটি মাত্র প্রশ্নই আজ মানবজাতির সম্মুখে উদ্যত হয়ে আছে—এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বুদ্ধির হাত থেকে যুক্তির হাত থেকে মুক্তি পেলেই কি আমরা সুখী হব? আমি যেখানে আছি সেখানে সুখ আছে, স্বাধীনতা আছে, কিন্তু যাকে আমি এতদিন বুদ্ধি বলে যুক্তি বলে মনে করে এসেছি, তার স্থান এখানে নেই। আমি যেন রূপকথার মধ্যে বাস করছি—মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুত সুন্দর স্বপ্ন দেখছি একটা। যুক্তি কিন্তু মরে নি, পুরাতন বুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে মাপতে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই মিলছে না, তাই শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু যুক্তি আর বুদ্ধিকেও ত্যাগ করতে পারছি

না। তারা যেন জোর করে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে এ সত্য নয়, এ স্বপ্ন, এ ক্ষণিকের মতিভ্রম। আমি যে অস্বস্তি ভোগ করছি তা আপনারাও করছেন, ইতিহাসের জোয়ান অব আর্ক কিন্তু তা করে নি, যে বিশ্বাসের জোরে সে ফ্রান্সের অপদার্থ রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেছিল সেই বিশ্বাসের অভাবই আপনাদের প্রধান অভাব। সেটা অনুভব করছি, কিন্তু যা নেই তা কোথায় পাব, কেমন করে পাব—কেমন করে পাব—"

আবার মূর্ছিত হয়ে গেল সে। থেমে গেল বক্তৃতা। মূর্ছার মধ্যে এল স্যমন্তক। বলল—"মদন আর রতি এসেছিল। তারা তাঁদের পুষ্পধনু রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে না কি? দেখলাম বড় নিস্তেজ, বড় মন-মরা হয়ে গেছে দুজনেই। তোমাকে না বলেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছি তাদের পুষ্পধনু, ওদের খেলার ওইটেই খেলনা, সেটা তোমার কাছে থাকবে কেন।"

তারপর কতদিন কেটে গেছে।

কিঙ্কিণী জানে না। মনে হল অনেক দিন সে যেন ঘুমিয়েছে। উঠে বসেই দেখল পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

বলল—"পংখী এসেছিলেন। আপনার জন্য একটা খড়্গ রেখে গেছেন। আজ অমাবস্যা। ছিন্নমস্তার মন্দিরে যাওয়ার দিন আজ। বললেন, আপনাকে একা যেতে হবে।"

কিঙ্কিণীর মনে হল শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য অভিনয় হবে আজ।

"স্যমন্তক কোথা—"

"অমাবস্যার ধ্যান করেছেন। অমাবস্যার মধ্যেই দেখা হবে আপনার সঙ্গে। ওঘরে আপনার খাবার দিয়েছি—"

চলে গেল পার্বতী। আবার ফিরে এল তখনই।

"রঘুপতি এসেছেন দেখা করতে। দেখা করবেন ?

কিঙ্কিণী উঠে দাঁড়াল সহসা। ঘাড় ফিরিয়ে জানলা দিয়ে দেখতে পেল বারান্দায় রঘুপতি দাঁড়িয়ে আছে। রঘুপতির চোখের দৃষ্টি ওই রকম লোলুপ? রঘুপতি, না দমন'দেও ?

"এখন দেখা হবে না, বলে দাও।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিঙ্কিণী। বেরিয়ে গিয়েই কিন্তু তার সমস্ত অন্তরটা হাহাকার করে উঠল। মনে হল ভুল করলাম বোধহয়, চিরকালের মতো হারালুম ওকে। ও নিজে এসেছিল, ওকে ফিরিয়ে দিলুম? কিন্তু ওর চোখে ওরকম দৃষ্টি কেন। ওরকম দৃষ্টি তো ওর চোখে ছিল না কখনও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল রঘুপতি চলে গেছে কি না। রঘুপতিকে দেখতে পেল না। দেখল দূরে তিনটি তুষার পর্বত সবিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে। তাদের চেহারাও যেন অন্যরকম।

আগের মতনই সব, কিন্তু কিছু কিছু তফাৎ আছে। আগের মতন মানে, ট্রেনে ভদ্রলোক তার হাত দেখে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার মতন। ভদ্রলোক দারুণ দ্বিপ্রহরের কথা বলেছিলেন, এখন কিন্তু গভীর অমাবস্যা রাত্রি। সামনে যে পাহাড়টা উঠে গেছে তা আকাশচুম্বী তা বোঝা যেত না যদি পাহাড়ের উপরের ওই মন্দিরটি দেখা না যেত। মন্দিরের ভিতর আলো জ্বলছে। আকাশের গায়ে উজ্জ্বল একটি আলোকবিন্দু। প্রতিমুহূর্তে ডাকছে তাকে। ওখানে আলো জ্বাললে কে? মহাদেব?

এর পরই জাপটে ধরল তাকে দুটো বলিষ্ঠ বাহু। চুম্বন করল সজোরে।

"কে—কে—কে—তুমি—"

চীৎকার ক'রে উঠল কিঙ্কিণী। তারপর আঘাত করল খড়্গ দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা।

"আমাকে মেরে ফেললে কিঙ্কিণী? আমি রঘুপতি—"

"রঘুপতি? রঘুপতি এমন অসভ্য হতে পারে না—"

পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল কিঙ্কিণী। বুকে ভর দিয়ে সরীসৃপের মতো উঠতে লাগল। তার ভয় হল, ছদ্মবেশী দমন দেও সহজে তাকে নিস্তার দেবে না। কিছুদূর ওঠবার পরই সমতল জায়গা পেল একটা। তার উপরই বসে হাঁপাতে লাগল সে। ওই পর্বতচূড়ালগ্ন ছিন্নমস্তার মন্দির তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সে নিমন্ত্রণ বহন ক'রে এনেছে রহস্যময় পংখী। পংখী খড়্গ দিয়ে গেছে, ব'লে গেছে এই বিপদসংকুল পথে একলা যেতে হবে অমাবস্যার মধ্যরাত্রে। সে চলেছে, চুম্বক-আকৃষ্ট হ'য়ে লোহা যেমন যায়। কিসের এই আকর্ষণ? কেন যাচ্ছে সে? যে নিমন্ত্রণ সে স্বকর্ণে শোনে নি, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে কেন সে? অথচ সে অনুভব করছে তাকে যেতেই হবে। কি এ রহস্য? সহসা বকুল ফুলের গন্ধে ভ'রে গেল চারিদিক। গন্ধের সঙ্গে ভেসে এল রত্ন আর ঝিলিকের কলহাস্য। তারপর শোনা গেল তাদের কথা।

ঝিলিক। ভয় পেও না। এইবার তো সত্যকে দেখতে চলেছ।

কিঙ্কিণী। কিসের সত্য? কোন সত্য?

রত্ন। সত্য তো একরকমই হয় এবং তা অবর্ণনীয়। তুমি এতদিন নিজের কাছ থেকেই পালাচ্ছিলে। এখনও পালাচ্ছ, তোমার যে অংশ তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই পলাতকার সঙ্গে দেখা হবে তোমার আজ—

কিঙ্কিণী। তুমি কি ক'রে জানলে?

রত্ন। আমি যে কাম। আমার রাজ্যেই তুমি আছ এখনও। একটু পরেই আর থাকবে কি না সেটা নির্ভর করছে তোমার বিবেকের ওপর।

ঝিলিক। আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। চললুম এখন আমরা।

বকুল ফুলের গন্ধ মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল কিঙ্কিণী।

সহসা দেখতে পেল বিরাট দৈত্যাকৃতি কি একটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কি ওটা? রঘুপতি কি খড়্গাঘাতে মরে নি তাহলে? আনন্দে বুকটা

দুলে উঠল তার। আবার বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আবার শোনা গেল রত্ন আর ঝিলিকের চাপা হাসি। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে দৈত্যটা। কে ও? রঘুপতি? না দমন দেও? যত জোরে সে তাকে জাপটে ধরেছিল, যাতে মনে হচ্ছিল তার বুকের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যাবে, তত জোর কি রঘুপতির থাকতে পারে? রঘুপতি তো ছিপছিপে রোগা রোগা, তার গায়ে অত জোর! একটা আনন্দ-শিহরণ ব'য়ে গেল তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। তার পরই ভয় হল। এ কি! তার অনেকদিন-আগে-পরা সবুজ ডুরে শাড়িটা এক ঝাঁক লাউডগা সাপ হ'য়ে কিল-বিল করছে তার চারিদিকে। খিল খিল ক'রে হাসছে। সে হাসির সঙ্গে মিশছে বকুল ফুলের ঘন গন্ধ, আর সে গন্ধের ভিতরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে রত্ন আর ঝিলিকের চাপা উন্মাদনা। আত্মহারা হ'য়ে ব'সে রইল কিঙ্কিণী। দৈত্যটা কিন্তু এগিয়ে আসছে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। রত্ন আর ঝিলিকের প্রচ্ছন্ন উন্মাদনাই যেন উৎসাহ দিচ্ছে তাদের। সম্মোহিত হ'য়ে ব'সে রইল কিঙ্কিণী।

"হাঁদার মতো ব'সে আছিস কেন? কি বোকা মেয়ে তুই? পাল পালা, ওপরে উঠে যা। তোর শাড়ির ডুরেগুলো সাপ হয়ে পথ দেখাচ্ছে তোকে, মন্দির ডাকছে, ব'সে আছিস কেন। মন্দিরে পেঁছিলেই হিল্লে হ'য়ে যাবে একটা। ওঠ—ওঠ—উঠে পড় শিগগির—"

কিঙ্কিণীর চোখের সামনে অন্ধকারের মধ্যে আলোর বৃত্ত ফুটে উঠেছিল একটা। কিঙ্কিণী দেখলে সেই বৃত্তের মধ্যে বক দাঁড়িয়ে আছে লাঠি ধ'রে ঝুঁকে, চেয়ে আছে তার দিকে মুখ তুলে। তারপর আর একটা দীর্ঘ আলোর রেখায় দেখা গেল—দীর্ঘ উঁচুনীচু অমসৃণ পথ, সেই পথ বেয়ে চলেছে অসংখ্য লাউডগা সাপ বুকে হেঁটে, চলেছে ওই মন্দিরের দিকে।

বক আবার বলল—"এসে পড়ল যে, পালা পালা—"

আরও কাছে এগিয়ে এসেছে দৈত্যটা লোলুপ বাহু দুটো বাড়িয়ে। কিঙ্কিণী সহসা উঠে অনুসরণ করতে লাগল লাউডগা সাপেদের, পাথরের উপর দিয়ে, বুকে হেঁটে, আলোর মন্দির লক্ষ্য করে। মনে হল ওটা মন্দির নয়, লুব্ধক নক্ষত্র জ্বলছে যেন। রঘুপতি তাকে লুব্ধক নক্ষত্র চিনিয়ে দিয়েছিল।

মন্দিরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল কিঙ্কিণী। ঢুকেই অবাক হ'য়ে গেল। তার পিসিমার ঘরে যে মহাদেবের ছবি ছিল সেই ছবিই এখানে জীবন্ত হয়ে বসে আছেন। লাউডগা সাপগুলো তাঁর ঘাড়ে পিঠে উঠছে সে দিকে লক্ষ্য নেই তাঁর। হাসিমুখে চাইলেন কিঙ্কিণীর দিকে।

"আমাকে ওরা তাড়া করছে—"

"কারা—"

"রঘুপতি। দমন দেও। রত্ন আর ঝিলিক।"

"তুমি কি সত্যি ওদের হাত থেকে মুক্তি চাও? মদন আর রতিকে ডাকছি তারা

এসে তোমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়বে। তোমার হাতে খড়্গ আছে, তুমি ওদের বধ করতে পার। কিন্তু ওরা মরবে না যদি তুমি তোমার মন থেকে ওদের সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পার। তোমার কামনা থেকে ওরা আবার জন্মাবে। তুমি চুম্বক তাই লোহারা তোমার দিকে ছুটে যাচ্ছে। দমন দেও শক্ত লোহা, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, হয়তো সে রঘুপতির মূর্তি ধারণ করেছে। তুমি ওকেও কি বধ করতে চাও? ওকেও এনে দিতে পারি তোমার খড়্গের সামনে। কিন্তু আসল কথা কি জান? তুমি যতক্ষণ চুম্বক থাকবে ততক্ষণ লোহারা তোমার পিছু নেবে। তোমাকে নিষ্কাম নিশ্চুম্বক হতে হবে। ভেবে দেখ কি করবে—আমি ওদের ডাকছি।"

শিবের আদেশে রত্ন আর ঝিলিক এসে শুয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। তারপরই এসে প্রবেশ করল সেই দৈত্যটা। কিঙ্কিণী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এ দমন দেও, যদিও বাইরের চেহারা রঘুপতির।

"তুমি চলে যাও এখান থেকে—" তর্জন করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করল দমন দেও।

মহাদেব হাসিমুখে চেয়ে ছিলেন তার দিকে।

কিঙ্কিণী জিগ্যেস করল—"স্যমন্তক কোথায়?"

"ঘোর অমাবস্যায় তারই আলোকে প্রকাশিত হয়ে আছি আমি এই মন্দিরে।"

"আপনারা বলুন আমি এখন কি করব—"

"আমরা কিছু বলব না, যা করবার তোমাকেই করতে হবে। তুমিই বিচারক, আমরা আশা করব, তুমি ঠিক বিচার করবে। মদন রতিকে যদি দোষী মনে কর তাদের বধ করতে পার। দমন দেও, রঘুপতিকেও দোষী মনে করলে তাদেরও নিঃশেষ ক'রে দিতে পার। কিন্তু তোমার নিজেকে যদি দোষী মনে হয় তাহলে কি তুমি—"

এর পরমুহূর্তেই কিঙ্কিণী ছিন্নমস্তা হ'য়ে গেল।

উৎসাকারে কবন্ধ থেকে রক্তের ফোয়ারা উঠে পড়তে লাগল তার ছিন্নমুণ্ডের ব্যায়ত আননে।

মহাদেব প্রণাম করলেন তাকে।

কিন্তু আর একটা কান্ড হল যা সবচেয়ে আশ্চর্য।

কিঙ্কিণী—আর একজন কিঙ্কিণী—দূরে থেকে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সব। এ কিঙ্কিণী ছিন্নমস্তা নয়। এ যেন কিঙ্কিণীর দ্বিতীয় সত্ত্বা। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল সে, তারপর ব'লে উঠল "না, না, এসব বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। পংখী, পংখী আমাকে একটা হেলিকপ্টার আনিয়ে দাও, আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। আমার মুন্ডুকে আমি বিসর্জন দিতে পারব না—"

অন্ধকার ভেদ ক'রে পংখীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তপস্যা করুন। তপস্যা না করলে হেলিকপ্টার আসবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্কিণী তপস্যায় বসে গেল।

হিমশীতল পাথরের উপর ব'সে অন্ধকার নিশীথে একাকিনী তপস্যা করতে লাগল কিঙ্কিণী। তুমুল ঝড় উঠল একটু পরে। বরফের কুচি লাগতে লাগল চোখে মুখে ছররার মতো। তারপর···তারপর আর কিছু মনে নেই তার···কতক্ষণ সে ব'সে ছিল তাও মনে নেই।

হঠাৎ হেলিকপ্‌টার এসে হাজির হল।

"আসুন—"

হেলিকপ্‌টারে চ'ড়ে বসল। তারপর হু হু ক'রে নামতে লাগল অন্ধকার ভেদ ক'রে।

কিংকিণী জেলে রয়েছে।

পিতৃহত্যার দায়ে ফাঁসি হবে কাল। সে কোর্টে স্বীকার করেছে হঠাৎ উত্তেজনাবশে নয়, সে ইচ্ছে ক'রে তার বাবাকে হত্যা করেছে। তার বাবা মানুষ ছিল না, পিশাচ ছিল।

কাল তার ফাঁসি হবে।

রঘুপতি এসেছিল দেখা করতে।

"এ তুমি কি করলে কিংকিণী—"

"যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। যুক্তির পথে চললে, বিজ্ঞানের পথে চললে এই তো পরিণতি। আচ্ছা, রঘুপতি, আলৌকিকে বিশ্বাস আছে তোমার?"

"তার মানে—?"

"আমি রূপকথালোকে ছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। পংখী বলেছিল পরমমুহূর্তে প্রবেশ করেছি।—"

"পংখী কে?"

"তাতো তোমায় বোঝাতে পারব না। তুমি বড় বিজ্ঞানী, যুক্তির আলো দিয়ে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছ। কিন্তু পংখীকে দেখতে পাবে না তুমি। তাকে বুঝতেও পারবে না। আমি তোমাকে বোঝাতেও পারব না। সে কিন্তু ভারি সুন্দর রঘুপতি। যে দেশে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, কি চমৎকার যে সে দেশ, সে দেশে তুমিও ছিলে, তুমিও রিসার্চ করছিলে অহল্যা পাথর নিয়ে। কি যে অদ্ভুত সে দেশ রঘুপতি, সেখানে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু থাকতে পারলাম না, যুক্তির তাড়ায় চ'লে আসতে হল, অবিশ্বাসের আগুনে সব পুড়ে গেল।"

"তুমি কি ক'রে গিয়েছিলে সেখানে?"

"জানি না। মোটর থেকে নেমে মাঠের মাঝখানে ছুটছিলাম।

পংখী বলে সেই সময় আমি না কি মহাদেবকে মনে মনে ডেকেছিলাম—আমার কিন্তু মনে নেই সে কথা—পংখী বলে নিজের অজ্ঞাতসারে ডাকছিলাম। মহাদেব আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই দেশে। অদ্ভুত সে দেশ রঘুপতি। কিন্তু থাকতে পারলাম না সেখানে। যুক্তি আমাকে টেনে নিয়ে এল এই জেলখানায়। অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন রঘুপতি, কি ভাবছ তুমি—"

রঘুপতি কিন্তু যা ভাবছিল তা বলতে পারল না।

উইল ক'রে যে বিশাল সম্পত্তি কিংকিণী তাকে দিয়ে গিয়েছিল তার কিভাবে ব্যবস্থা করা উচিত তারই আলোচনা করতে এসেছিল সে। কিন্তু পাগলের সঙ্গে কি আলোচনা করবে? রঘুপতি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল কিংকিণী পাগল হয়ে গেছে।

তার চোখের দিকে চেয়ে কিঙ্কিণী হঠাৎ যেন বুঝতে পারল রঘুপতি তাকে পাগল ভাবছে।

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল সে।

আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠল—"বিশ্বাস কর আমি পাগল নই। আমি যা বলছি তা সত্যি, আমি পরমমুহূর্তে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু সেখানে থাকতে পারি নি, যুক্তিকে আঁকড়ে ছিলাম বলেই পারি নি। কিন্তু সেখানে যা দেখেছি তা সত্যি, তা অপরূপ, তা অনবদ্য। আমি—"

আর কিছু বলতে পারল না সে।

চোখের কোণ বেয়ে জল পড়তে লাগল শুধু।

তুমি

পরম স্নেহাস্পদ

ডাক্তার শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

এক

যেদিন তুমি এসেছিলে সেদিন আকাশে হোলি খেলা হচ্ছিল। আবীরের স্তূপ জমা হয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিগন্ত জুড়ে। সোনালী লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল সমস্ত দক্ষিণ আকাশটা। মাথার উপরে মেঘগুলোও ঝলমল করছিল সেই রঙের ছোঁয়া লেগে। উত্তর দিক থেকে প্রকাণ্ড একটা স্তূপ মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল এই উৎসবের আকর্ষণে। একটা অদ্ভুত রক্তিম আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল চতুর্দিকে, লালের মোহ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল সমস্ত প্রকৃতিকে। লালও যেন তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল সেদিন। আকাশের নীলের প্রশান্তির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বেমালুম, মিশে গিয়েছিল বনানীর সবুজ রঙের মরকত দ্যুতির সপ্রতিভতার সঙ্গে।

আমি সবিস্ময়ে বসেছিলাম বজরায়, চেয়েছিলাম নদীর রক্তিম ঊর্মিমালার দিকে। নদী লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল না সেটা রক্তধারা, মনে হচ্ছিল আমি যেন অদৃষ্টপূর্ব এক সুরার স্রোতস্বিনীতে ভাসছি, যে সুরার রং লাল, যা শুধু সুরা নয়, যা অশ্রুতপূর্ব সুরও, যে সুর রক্তে দোলা দেয়, জন্মান্তরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, যা হাতছানি দেয় ইন্দ্রিয়লোকের ওপার থেকে, যা অতীন্দ্রিয় জগতের দিশারী।

বিহ্বল হয়ে বসেছিলাম বজরার ছোট ঘরটায়। ছোট ঘরটা আর ছোট ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন অসীমের মধ্যে বসে আছি। আমার চেয়ারটা হয়ে গিয়েছিল দোলনা, প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম কেউ এসে দোলা দেবে, কারও কলহাস্যের উচ্ছলতায় এমন একটা অপরূপ লাল রং আভাসিত হবে যা বর্ণালীতে নেই, যা বিজ্ঞানী চাক্ষুষ করে নি, কিন্তু কবি কল্পনা করেছে।

আমার সেই ছোট ঘরে মোনা লিসার একটা ছবি ছিল। তার সেই রহস্যময় হাসির উপরও পড়েছিল সেদিনের সেই লাল আলো। তার মধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছিলাম তোমাকে। মোনা লিসার রহস্যময় দৃষ্টির মুকুরে রক্তিম আলোর স্বপ্ন-আবর্তে ভেসে উঠেছিল তোমার যন্ত্রণাকাতর মুখ। কে যেন আমাকে কানে কানে বলে গেল তোমার জন্যই ওর ওই যন্ত্রণা। অবাক হয়ে গেলাম। তারপর সহসা আমিও যন্ত্রণা অনুভব করলাম। তোমার ওই নির্বাক যন্ত্রণা আমাকেও বিঁধতে লাগল, কাটতে লাগল, পোড়াতে লাগল। যন্ত্রণার ঘূর্ণাবর্তে আমি আবর্তিত হতে লাগলাম। তুমি কে তা তখনও জানতাম না এখনও জানি না…।

যন্ত্রণার মধ্যে কৌতূহল এল, প্রশ্ন জাগল তুমি কে।

ভাবতে লাগলাম। ভাবনার অথৈ জলে তলিয়ে গেলাম। মনে হল যুগযুগান্তর কেটে গেছে।

দুই

একটা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম। চায়ের দোকানে চা খাব বলে ঢুকি নি, ঢুকেছিলাম রোদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। বাইরে প্রখর রোদ দাউদাউ ক'রে জ্বলছিল যেন।

হুড়মুড় ক'রে ঢুকে দেখলাম দোকানে কেউ নেই। দোকানী জিজ্ঞেস করল— 'কি চান।'

'চা এক কাপ।'

'এখন তো চা হবে না। সাড়ে তিনটার আগে চা হয় না এখানে।'

'দাও না ভাই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আমি তেষ্টার সময় চা খাই।'

'দুধ নেই এখন।'

'বিনা দুধেই দাও। চিনিও চাই না। তেতো কড়া চা-ই ভালো লাগে আমার।'

তেতো কড়া চা খাচ্ছিলাম চুমুকে চুমুকে।

হঠাৎ নজরে পড়ল তুমি বসে আছ দোকানের এক কোণে। বাইরের জ্বলন্ত রৌদ্র যেন মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। মনে হল নাকের ডগাটা কাঁপছে তোমার। মাথার লাল চুল এলোমেলো হয়ে পড়েছে পিঠের উপর। হলদে শাড়ির লাল পাড় যেন দীপক রাগিণী ধরেছে। আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছ তুমি। নিথর নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছ। যেন ধ্যান করছ।

হঠাৎ আমি এগিয়ে গেলাম তোমার দিকে।

'তুমি এখানে?'

কোনো উত্তর দিলে না তুমি।

দোকানী বলল—'কার সঙ্গে কথা বলছেন। এখানে তো কেউ নেই'

'ওই যে'

'ওটা যে ক্যালেণ্ডারের ছবি'

দেখলাম সত্যিই তাই।

কিন্তু এ-ও সত্যি সেদিন তোমাকেও দেখেছিলাম।

তিন

না, তোমরা যা ভাবছ তা নয়।

আমি পাগল নই। আমি খাই, ঘুমুই, লোকের সঙ্গে আলাপ করি, আপিস চালাই। কিন্তু আমার যে ব্যক্তিত্বটা সূচ্যগ্র-চেতনার মুখে সুরের মতো কাঁপছে তার স্বরূপ কাউকে দেখাতে পারি না। সেই ব্যক্তিত্বটাকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না, তাই এলোমেলো শোনাচ্ছে। আমার সেই চেষ্টা যে রূপ

নিচ্ছে তা তোমাদের পরিচিত রূপ নয়, তাই তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই তোমরা আমাকে পাগলের দলে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছ হয়তো। তুমিও আমাকে পাগল ভাবছ? কিন্তু আমি জানি তুমি আছ বলেই, তুমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছ বলেই, এই ধাঁধাঁ। তোমার 'তুমিত্ব' কোনো বিশেষ ছাঁচের মধ্যে নেই। তা কোনো পীবর-স্তনী হাস্যমুখী শোভন-জঘনা সুবেশিনী যুবতীর লাস্য-লীলায় সীমাবদ্ধ নয়। তবু সে সর্বত্র আছে, সর্বত্র তাকে দেখতে পাই আকস্মিক মহিমার অপ্রত্যাশিত পরিবেশে। সেদিন দেখেছিলাম রূপকথালোকে। অজস্র অপরাজিতা ফুটেছিল নীল-স্বপ্ন বিস্তার ক'রে। তাদের উপর কয়েকটা চুনী খদ্যোত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে ছিলে তুমি। অথচ আমি তখন আপিসে কাজ করছিলাম। 'ফাইল' ক্লিয়ার করছিলাম। স্থিরমস্তিষ্কে মন্তব্য লিখছিলাম। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে দেখছিলাম চুনীর জোনাকিরা উড়ে বেড়াচ্ছে অপরাজিতার নীল পাপড়ির উপর। ...ঠিক এই সময় এলেন মিস মিত্র টাইপ-করা কয়েকটা চিঠি নিয়ে। তিনি আমার আপিসের টাইপিস্ট। খুব মার্জিতরুচি ভদ্রমহিলা। রূপসী, স্বল্পভাষিণী। ধবধবে ফরসা রং নয়। শ্যামলী, কিন্তু শ্রীমণ্ডিতা। তিনি কাছে এলেই মনে হয় তুমিও যেন এসেছ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। আমার মনের বীণায় তখন যে সুরটা বেজে ওঠে তা ভৈরবী কি সাহানা তা বলতে পারব না, এইটুকু শুধু জানি তা কান্না।...মিস মিত্র যে চিঠিগুলি দিলেন সেগুলির দিকে চেয়ে রইলাম বটে কিন্তু সেগুলির মর্ম মাথায় ঢুকল না।

'কি করতে হবে'—প্রশ্ন করলাম বোকার মতো।

'দেখে সই ক'রে দিন'

না দেখেই সই ক'রে দিলাম সবগুলোতে।

মিস মিত্র চলে গেলেন। বীণার সুর থেমে গেল। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম তুমি দাঁড়িয়ে আছ। যে তুমি অরূপা, অধরা, যে তুমি অমেয়া অসীমা, অশেষা সেই তুমি যেন দাঁড়িয়ে রইলে আমার সামনে। মনে হতে লাগল অসীমা যেন সীমার মধ্যে আসবার চেষ্টা করছে, অধরা যেন ধরা দেবে, অসম্ভব যেন সম্ভব হবে। আর সেই দুরূহ দুঃসাধ্য চড়াই-উতরাই ভাঙছ বলে কষ্ট পাচ্ছ তুমি। অসহ্য, অকথ্য কষ্ট। অপরাজিতার নীলকে অতিক্রম ক'রে চুনীর জোনাকিদের লাল আলো মাঝে মাঝে তাই বুঝি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে সেই যন্ত্রণায়?

তবু আমি আপনমনে আপিসের কাজ করছি। তুমি কিন্তু আছ।

চার

সেদিন মিস মিত্র একটু যেন বেশী সাজগোজ ক'রে এসেছিলেন। পরনের শাড়িটি সোনালী রঙের, পাড়টিও অভিনব। কানের দুল দুটিও নূতন মনে হল। মনে হল মুক্তোর ধারা প্রপাতের মতো এসে কাঁধের উপর পড়তে চাইছে। হাতের কাঁকন দুটিও যেন নূতন। অদ্ভুত একটা দীপ্তি চকমক করছে তাদের ঘিরে। মনে হচ্ছে কারও

মিনতি যেন কাঁকনের রূপ ধরে তাঁর হাত দুটি বেষ্টন ক'রে আছে। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়েও একটা মৌন আমন্ত্রণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে। হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কপালের চারিদিকে চূর্ণকুন্তলের সমারোহ, যেন উন্মুখ জনতার অধীর আগ্রহ মৌনতার মন্ত্রে নীরব হয়ে রয়েছে মাঝে মাঝে দুলছে কেবল ধীরে ধীরে। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে চাইছে কিন্তু পারছে না। ফ্যানের হাওয়ায় উতলা হচ্ছে কেবল, ফুরফুর ক'রে কাঁপছে কয়েকটি চুল।

হঠাৎ মিস মিত্র প্রণাম করলেন আমাকে।

'কি ব্যাপার'

'আমার আজ জন্মদিন। একটু সকাল সকাল বাড়ি যেতে চাই। যে ক'খানা চিঠি টাইপ করবার ছিল তা ক'রে দিয়েছি, আপনি দেখে সই ক'রে দেবেন'

কয়েকটি চিঠি আমার টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর সসংকোচে একটি নিমন্ত্রণপত্র বার ক'রে দিলেন আমার হাতে।

'আজ সন্ধ্যেবেলা যদি যান খুব খুশী হব আমরা'

কোনো উত্তর দিলাম না, চুপ ক'রে রইলাম।

মিস মিত্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চলে গেলেন। তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল। সেই ঘটনাটা যা ঘটে নি কিন্তু যা আমার সমস্ত সত্তাকে নিমজ্জিত ক'রে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আমি জানি না। মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন স্থল-হীন হয়ে গেছে। চারিদিকে কেবল জল আর জল। নীল জল। আমি তার মধ্যে আছি, কিন্তু আমার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথাও নেই। 'আমি আছি' এই ধারণাটুকুর মধ্যেই যেন বেঁচে আছি আমি সেই উত্তাল প্রলয়পয়োধির নীলাম্বুরাশির আবর্তে। দেখলাম সেই নীল জল থেকে উঠেছে প্রকাণ্ড একটি পদ্ম আকাশের দিকে। সমস্ত পৃথিবীর ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রার্থনা যেন মূর্ত হয়েছে সেই অপরূপ কমলের পাপড়িতে পাপড়িতে। তার সৌরভ ছেয়ে ফেলেছে চতুর্দিকে। বাতাস মন্থর হয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছে আকাশ। আর দেখতে পেলাম সেই কমলের শীর্ষদেশে জ্যোতির্ময় আবেষ্টনীতে তুমি বসে আছ। সেই তুমি যে আমার মানস-কমলে মাঝে মাঝে এসে আবির্ভূত হও, আবার বিলীন হয়ে যাও। এ সবের অর্থ কি, মন বলতে লাগল বার বার।···

···মিস মিত্র যে চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিলেন আমি সেগুলি পড়ে পড়ে সই ক'রে দিলাম। ঘণ্টা বাজালাম। চাপরাসী এল, চিঠি নিয়ে চলে গেল।

···তারপর চোখে পড়ল নিমন্ত্রণপত্রটি টেবিলের একপাশে পড়ে রয়েছে। মিস মিত্র দিয়ে গেছেন।

খুলে দেখলাম একটা কবিতা লেখা রয়েছে।

আমার জন্মদিনে
আমার আমাকে যে চিনিয়ে দেবে
সে কোথায়।
আমি আমার যে 'আমি'কে চিনি।
সে আমি সামাজিক
সে আমি মুখোশ-পরা।

আমার সত্য সত্তাকে আবিষ্কার করবে যে
তার আশাতেই বসে আছি।
মনে হয় আমার জন্মদিনেই সে আসবে।
জন্মদিনেই তো পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন
সত্য-পরিচয়ের দিনও জন্মদিন হওয়া উচিত।
কিন্তু বাইশটা জন্মদিন তো কেটে গেল।
সে এল না আজও।
এবার আসবে কি?

শ্রীলতা

মিস মিত্রের নাম কি শ্রীলতা? ওর পুরো নাম তো কোনোদিন জানবার দরকার হয় নি। আপিসের খাতা খুলে দেখলাম লেখা আছে মিস এস. মিত্র। কবিতাটা কি ওর লেখা?

হঠাৎ অনুভব করলাম তুমি আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছ।

পাঁচ

তপতী এসেছিল হঠাৎ সেদিন।

তপতী যেন ঝড়, হাসির ঝড়। প্রতি কথায় হাসে, হাসির কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে। ওর প্রসাধনের বালাই নেই। চুল এলোমেলো। মুখে স্নো পাউডারের চিহ্ন নেই। পরনে অতি সাধারণ সুতীর কাপড়। পরবার ধরনও অতি সাধারণ। মনে হয় কাপড়টা জড়িয়ে রেখেছে গায়ে যেন কোনোরকমে। বুকের কাপড় বার বার সরে যায়, বার বার ঠিক ক'রে নেয়। দাঁতগুলো বড় বড় আর ধপধপে সাদা। রং আড়ময়লা। মুখটা পানের মতো। গলাটা একটু যেন বেশী লম্বা। দোহারা চেহারা। তপতীর আসল সৌন্দর্য তার চোখদুটিতে। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ আর সে চোখের আয়নায় তার যে চরিত্র প্রতিফলিত তা অনুপম কিন্তু রহস্যময়। তা যেন সদা চঞ্চলতার মুহুর্মুহুঃ আঘাতে সম্পূর্ণ রূপায়িত হতে পারে না কখনও। আভাস ইঙ্গিতে দেখা দেয়। কখনও মনে হয় সে খুব গভীর, আবার কখনও মনে হয় লঘু। হালকা উড়ন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যায় আকাশচুম্বী পর্বতশৃঙ্গকে। দৃঢ় গম্ভীর পর্বতশ্রেণী হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার হঠাৎ ঢাকা পড়ে যায়। বোঝা যায় না তপতী চরিত্রের মূল সুরটা মেঘ, না পাহাড়। রামধনুও যেমন দেখা যায় মাঝে মাঝে, বজ্রের ভ্রূকুটিও তেমনি বিরল নয়। সবই আছে, কিন্তু সবই একটা স্বতোৎসাহিত আনন্দের দোলায় দুলছে।

হাস্যমুখী তপতীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আসানসোল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। দুঃসহ গরম সেদিন। উত্তপ্ত প্ল্যাটফর্মে নিষ্ঠুর নিদাঘের নিষ্করুণ প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছিলাম ওয়েটিং রুমে। তেষ্টা পেয়েছিল খুব।

চেষ্টা ক'রেও ঠাণ্ডা পানীয় কোথাও পাই নি। স্টেশনের ভেণ্ডারটা বললে, বরফ ফুরিয়ে গেছে, এখন পাওয়ার আশাও নেই। শুষ্কতালু হয়ে ওয়েটিং রুমের ইজি-চেয়ারটায় চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। মাথার উপর ঘুরছিল ফ্যানটা তপ্ত হাওয়ার ঝড় তুলে। এমন সময় হাস্যমুখী তপতী এসে ঢুকল।

'ওমা, আপনি এখানে—'

এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে। তাকে আগে কখনও দেখি নি। একটু বিস্মিত হলাম।

বললাম, 'আপনাকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না'

'আমি আপনাকে চিনি। কে না চেনে আপনাকে। কবি দিগন্ত সেনকে সবাই চেনে। তা ছাড়া আপনার বোন মল্লিকা পড়ত আমার সঙ্গে। আপনি আমাদের স্কুলেও একবার গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। সেই আপনাকে প্রথম দেখি—'

ফিকফিক ক'রে হাসতে লাগল। বুকের থেকে কাপড়টা উড়ে গেল হাওয়ার তোড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ক'রে নিয়ে বলল, 'ভেণ্ডারের কাছে বরফ নেই। আপনি ঠাণ্ডা জল পেয়েছেন?'

'কোথা পাব'

'আমার কাছে আছে থার্মোফ্লাস্কে। দাঁড়ান নিয়ে আসি'

আসানসোলের তপ্ত প্ল্যাটফর্মে বরফশীতল জল খাইয়েছিল আমাকে তপতী। একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশও খাইয়েছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার কবিতার একটা লাইন বুঝতে পারি নি। বুঝিয়ে দেবেন? "হাসির দোলায় দুলতে দুলতে আসবে যে, কান্না সে কি জানবে না?" কান্না তো সবাইকেই জানতে হবে। অনেক সময় হাসিই কান্নাকে ঢেকে রাখে। তাই না?'

বললাম, 'ইঙ্গিতে সেই কথাই তো বলেছি'

তপতী বলল, 'জানেন আমি খুব হাসি। আমার সবেতেই হাসি পায়। মা বলে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে'

বলেই খুব হাসতে লাগল।

তারপর কতদিন কেটে গেছে মনে নেই। তপতীর দেখা পেয়েছি কিন্তু মাঝে মাঝে। কখনও চলন্ত ট্রাম থেকে হাসিমুখে চেয়েছে আমার দিকে, কখনও দেখা হয়েছে সিনেমার ভিড়ে। রবীন্দ্রসদনে একবার গান শুনছি হঠাৎ দেখলুম সে আমার সামনের সিটে বসে আছে। আমাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। একটা সাহিত্য-সভাতেও দেখা হয়েছিল একদিন। তারপর অনেকদিন তার দেখা প্যাই নি।

সেদিন এসে সে যা বলল তাতে হকচকিয়ে গেলাম। বলল—হাসতে হাসতেই বলল—'বড় বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে, উদ্ধার করতে হবে'

বিপন্না নারীকে উদ্ধার করা পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করতে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। আমি কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। আমার অন্তরাত্মা যেন বলে দিল ওকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিলে তোমার বিপদ হবে।

'আমায় সাহায্য করবেন?'

'কি হয়েছে আগে সেটা বল'

'আমাকে ব্যাধেরা ঘিরে ফেলেছে। বিয়ের সম্বন্ধ আসছে চারিদিক থেকে। আমি বিয়ে করব না'

'বিয়ে করবে না কেন'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে'

'তোমার বাড়ির লোকে সে কথা জানে না?'

'কেউ জানে না'

'কেউ জানে না?'

'না। এমন কি যাকে বিয়ে করেছি, সে-ও জানে না'

হেসে লুটিয়ে পড়ল তপতী।

'তা হলে কি রকম বিয়ে সেটা?'

'সেকালে অনেক মেয়ে গাছকে বিয়ে করত। গাছ কি জানতে পারত সে বিয়ের কথা?'

'একালে সে রকম গাছ পেলে কোথা?'

'পেয়েছি। তার বাইরের চেহারাটা মানুষের মতো কিন্তু আসলে সে গাছ। বৃহৎ বনস্পতি। তার ফুল আছে পাতা আছে, তার ডালে পালায় নানা পাখির আনাগোনা, অনেক ঐশ্বর্য তার। সে কিন্তু উদাসীন নির্বিকার। তাকেই বরণ করেছি আমি'

'হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না। আমাকে এখন কি করতে হবে বল'

'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। আপনাকে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার কাছে পয়সাকড়িও কিছু নেই। জানি না আপনার উপর কতটা নির্ভর করতে পারি'

হাসিমাখা দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমার মনে হল অগাধ জলে পড়ে গেছি। সাঁতার জানি না। নাকানিচোবানি খাচ্ছি। তারপর হঠাৎ একটা খড় ভেসে এল আমার দিকে। দিন কয়েক আগে দার্জিলিং যাব বলে একটা টিকিট কিনেছিলাম। সেখানকার একটা হোটেলে রুমও ভাড়া করেছিলাম পনের দিনের জন্য। কিছু টাকাও অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাদের।

বললাম, 'তুমি যদি দার্জিলিং যেতে চাও, তোমাকে একটা টিকিট দিতে পারি। সেখানে একটা হোটেলে একটা ঘরও ভাড়া করা আছে পনের দিনের জন্য।'

'আপনি যাবেন না?'

'না। একটা টিকিটই তো কিনেছিলাম। সেটা নিয়ে তুমিই চলে যাও। আমি কাজে আটকে গেছি, আমার যাওয়া হবে না এখন'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল তপতী।

'কেন যাবেন না, তা বুঝেছি। সুনামে কলঙ্ক লাগবে বুঝি—' একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছু বললাম না।

তপতী বলল, 'বেশ, আমি একাই যাব। দিন টিকিটখানা। কিন্তু আর একটা মুশকিল আছে—'

ঘাড় বেঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

'আবার কি—'

'আমার হাতে পয়সাকড়ি নেই। নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশে যেতে সাহসও হচ্ছে না'

এর পর আমি যা করলাম তা করা উচিত ছিল কি না জানি না। পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে দেখলাম তাতে পঞ্চাশটি টাকা রয়েছে। পঞ্চাশ টাকাই দিয়ে দিলাম তাকে।

তপতী চলে গেল।

আমার টেবিলের এক কোণে একটা লম্বা ফুলদানিতে রজনীগন্ধা ফুল ছিল একগোছা। ফুলদানির পিছনে ছিল একটা কাচের জানলা। আর সে জানলায় ছিল সবুজ একটা পরদা। পরদার ভিতর দিয়ে সূর্যালোক এসে একটা সবুজাভ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল রজনীগন্ধার গুচ্ছটিকে ঘিরে। কাচের লম্বা ফুলদানিতে লেগেছিল সেই পরিবেশের প্রভাব।···পাশের বাড়ির খুকু গীটারে আশাবরী বাজাচ্ছিল। আমি যে অবস্থায় ছিলাম তাকে কি বলে বর্ণনা করব জানি না। সব দেখছি অথচ দেখছি না, সব শুনছি অথচ শুনছি না এই রকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার চৈতন্য যখন মগ্ন হয়ে তন্দ্রালু হয়ে পড়েছিল তখন তুমি আবির্ভূত হলে।···পরদার ভিতর দিয়ে যে সূর্যালোক আসছিল তা যেন রূপায়িত হল সবুজ সুরে। শ্রাব্য নয়, দৃশ্য। অদ্ভুত স্বচ্ছ, অদ্ভুত সবুজ, অদ্ভুত সুন্দর একটা কুঞ্জবন যেন মূর্ত হয়ে উঠল আমার জানলার সামনে। দৃষ্টির মাধ্যমে আমি যেখানে গিয়ে হাজির হলাম তা সুরলোক। কাচের ফুলদানি সমেত রজনীগন্ধার গুচ্ছটা হয়ে গেল যেন ছোট্ট একটি তন্বী রূপসী। আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুভূতি দিয়ে আমি অনুভব করলাম তুমি এসেছ। যে তুমি বার বার নানারূপে আসছে সেই তুমি এসেছ আবার। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে, তুমি কি চাও তা কি তুমি জান? বললাম, জানি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। তুমি বললে, কবিতায় পারবে। আমি বলছি তুমি লেখ। তুমি বলতে লাগলে আমি লিখতে লাগলাম।

কোনও মূর্তিকে আঁকড়ে ধরলেই
অসম্পূর্ণকে পাওয়া হল।
কারণ যারা মূর্তি ধরে নি
সেই সব অমূর্ত অপরূপের দল
রয়ে' গেল তোমার নাগালের বাইরে।
তোমার আলিঙ্গিত মূর্তির
তোমার আলিঙ্গনের ওপারে
হয়তো তাদের আভাস পাবে
আলেয়ার মতো
মরীচিকার মতো
হয়তো তাদের সৃষ্টি করবে কল্পনা দিয়ে
কিন্তু তাদের পাবে না কখনও।
অমূর্ত রূপকে উপভোগ করার ইন্দ্রিয়
তোমার নেই।
আকাঙ্ক্ষা আছে কি?

যদি থাকে
তাহলে তোমার সেই দুরাশাকে
সত্যে রূপায়িত করবে যে শিল্পী
মূর্তি দেবে যে কবি
তাদের সন্ধান করো।

হঠাৎ দুয়ার ঠেলে ঢুকল পাশের বাড়ির খুকু। হাতে গীটার।

'দিগদা আপনার সময় আছে?'

'আছে। কেন?'

'আমি আশাবরীটা অনেক কষ্টে তুলেছি গীটারে। শুনবেন?'

'শুনেছিলাম তো। বেশ হয়েছে'

'বেশ হয়েছে? আপনি বলছেন বেশ হয়েছে? মন দিয়ে শুনেছিলেন? আর একবার শুনুন'

অনুনয়ের সুর বেজে উঠল তার কণ্ঠে। আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বসে পড়ল সে সামনের সোফাটায়। শুরু করল গীটার বাজাতে। খুকুর ভালো নাম চন্দ্রাননী গাঙ্গুলী। যদিও সে আমাকে দাদা বলে কিন্তু রক্তের সম্পর্ক নেই। পাশের বাড়িতে থাকে, আমিও গানবাজনার চর্চা করি, তাই নিজেই এসে আলাপ করেছিল একদিন আমার সঙ্গে। এসে বলল, 'আপনিই কি কাল পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন?' বললাম, 'হ্যাঁ।' খুকু বললে, 'এমন বাজনা শুনি নি আগে। মনে হচ্ছিল সুরের ঝড় বইছে। আপনি গীটার বাজাতে জানেন? বললাম, 'জানি একটু একটু।' অনুনয় ধ্বনিত হয়ে উঠল খুকুর কণ্ঠে—'আমাকে তাহলে মাঝে মাঝে শিখিয়ে দিতে হবে। আমি গীটার শিখছি। দেবেন তো?' 'না' বলতে পারি নি। সেই থেকে খুকু আসে আমার কাছে। গীটার শেখার ফাঁকে ফাঁকে আবিষ্কার করেছি ওকে ঘিরে সেই মহোৎসব চলছে যে মহোৎসব সব নারীর জীবনেই অতর্কিতে আসে এবং অতর্কিতে শেষ হয়ে যায়। যে উৎসবে প্রত্যেক নারীকেই মনে হয় সম্রাজ্ঞী, অপ্সরী বা স্বপ্ন, যে উৎসবের দিকে পুরুষমাত্রেই আত্মহারা হয়ে চেয়ে থাকে, যাকে ঘিরে মূর্ত হয় কবি-কণ্ঠে গান, চিত্রকরের তুলিতে ছবি। খুকুর ঠিক কত বয়স জানি না, কিন্তু এম. এ. ক্লাসের ওই ছাত্রীটির সর্বাঙ্গ ঘিরে যৌবনের বসন্ত-উৎসব যে রঙে রসে মহিমায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তা আবিষ্কার করতে আমার দেরি হয় নি। আমার মধ্যে যে পৌরুষ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার খানিকটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল পাশবিক আগ্রহে, খানিকটা চাইছিল পূজারীর মতো পূজা করতে, আরও একটা অংশ কি যে চাইছিল তা অস্পষ্টতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তা পাশবিক নয়, তামসিক বা রাজসিক নয়, তা যেন ওর প্রস্ফুটিত যৌবনের মধ্যে নিজেকে নিষ্কাম আনন্দে বিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহ। এর নামই কি আধ্যাত্মিক আকুলতা? ঠিক জানি না, কারণ তা মাপবার মাপকাঠি আমার কাছে নেই। তা অস্পষ্ট, তবু সত্য।

'কি রকম হয়েছে'

হঠাৎ বলে উঠল খুকু। আশাবরীতে লাগল যেন আর একটা নতুন সুর। খুকুর গলা সত্যিই খুব মিষ্টি। আমি মন দিয়ে শুনি নি। তন্ময়তার কুয়াশায় অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম।

তবু বললাম, 'চমৎকার হয়েছে'

খুকু হঠাৎ এসে আমাকে প্রণাম ক'রে বললে, 'আপনিই তো আমার গুরু। সত্যিই যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে সে কৃতিত্ব তো আপনারই'

তারপর চলে গেল সে। তার পিঠ-কাটা ব্লাউজের কল্যাণে দেখতে পেলাম তার পুষ্ট পিঠের আর সমুন্নত নিতম্বের খানিকটা। রূঢ় বস্তুলোকের বাস্তবতায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম যেন। মুগ্ধ হলাম, ক্ষুব্ধও হলাম।

তারপর মনে হল অসমাপ্ত কবিতাটা শেষ করি। খাতার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু। এক লাইনও তো লিখি নি! যে কবিতাটা আমার মনে বেজে উঠেছিল সেটাও কি অরূপা তাহলে? অনেকক্ষণ বসে রইলাম। একটা সুমিষ্ট আবেশ যেন ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তা যে সুমিষ্ট তা আমার সর্বচেতনা দিয়ে অনুভব করছিলাম, কিন্তু এ-ও অনুভব করছিলাম যে তার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। অনুভব করছিলাম সে সুমধুর কিন্তু অনতিক্রম্য আবেশ তোমারই নিবিড় আশ্লেষ, তা যদিও অবর্ণনীয়, তা যদিও সীমার বন্ধনে বন্দী হয় নি, কিন্তু তা তুমি, তুমি, তুমি। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম। মনে হল যেন তলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় তা জানি না। হঠাৎ একজায়গায় এসে শক্ত মাটিতে পা ঠেকল। দেখলাম বিশাল এক প্রাসাদের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছি। অঙ্গনও মণিমাণিক্য খচিত। প্রাসাদ রত্নময়। সব কিন্তু ছায়ায় ঢাকা। সহসা একটি রূপসী কন্যাকে দেখতে পেলাম, ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছে কি? কেন? তারপরই মনে পড়ল গল্পটা। বুঝতে পারলাম আমি প্লুটো (Pluto) আর ওই মেয়েটি পার্সিফোন (Persephone)··· প্লুটো পার্সিফোনকে হরণ ক'রে এনেছিল পৃথিবী থেকে। কিন্তু তার মন পেতে অনেক দেরি হয়েছিল তার। কিন্তু আমি প্লুটো হতে যাব কেন? আমি তো কাউকে হরণ করি নি। করি নি? সত্যি করি নি? মনে মনেও করি নি? সামনের জানলার কপাট দুটো সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ঝড় আসবে একটা।

আপিসে বসে ফাইল ক্লিয়ার করছিলাম। অনেক ফাইল জমে গিয়েছিল। অনেক জটিল বিষয় ছিল সে সব ফাইলে। সে সব জটিল সমস্যার সমাধান ক'রে পাশে পাশে আমি মন্তব্যও লিখছিলাম। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে যাওয়া আসা করছিল মিস মিত্রের অনুপস্থিত সত্তা। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম সে এসে পড়বে, কিন্তু সে আসছিল না। আমি টাইপিস্ট মিস মিত্রের সান্নিধ্য কামনা করছিলাম না, আমি সান্নিধ্য কামনা করছিলাম কবি শ্রীলতা মিত্রের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এল না। হয়তো সই-করাবার মতো কোনো চিঠি আজ নেই। ওই বাজে চিঠিগুলোর মাধ্যমেই তো সে আসে। আজ বোধহয় চিঠি নেই।

তারপর আমি যা করলাম তা আমার কাছে অশোভন ঠেকে নি সেই মুহূর্তে।

কিন্তু পরে মনে হয়েছিল এটা না করলেই হত। আমি একটা কোম্পানীকে অদরকারী একটা চিঠি লিখে ঘণ্টা টিপলুম। চাপরাসী আসতে তাকে বললাম, 'টাইপিস্ট মিস মিত্রকে খবর দাও, একটা চিঠি টাইপ করতে হবে।'

চাপরাসী উত্তর দিল, 'মেমসাহেব আজ আসেন নি'

তখন ফোন করলাম আমার বড়বাবুকে।

'মিস মিত্র আজ আসেন নি ?'

'না। তাঁর অসুখ করেছে, একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন'

'কি অসুখ'

'তা তো জানি না। সে কথা লেখেন নি কিছু'

'টাইপিস্টের কাজ করছে কে'

'জগমোহন'

গুফো তোবড়া-গাল জগমোহনের মুখটা মনে ভেসে উঠল।

যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা আর টাইপ করতে দিলাম না।

মিস মিত্র উপর্যুপরি চার দিন এলেন না। বড়বাবু বললেন, 'তিনি এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছেন। ডাক্তার সন্দেহ করছেন তাঁর নাকি টাইফয়েড হয়েছে'

এর পরই দ্রুত পরিবর্তন হল আমার মানসলোকে। বিজ্ঞানীরা বলেন এই নিখিল বিশ্ব একদিন নাকি নিহিত ছিল উত্তপ্ত জ্বলন্ত একটা গ্যাসের পিণ্ডে। তারই ক্রমবিবর্তন আমাদের পৃথিবী এবং মানুষ। সে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন নানারকম কল্পনা এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করে। মিস মিত্রের কঠিন অসুখ করেছে এই সংবাদটাও জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ডের মতো আমার মনের আকাশে আবর্তিত হয়েছিল (কেন হয়েছিল তা জানি না)। কিন্তু সেটা কি ক'রে যে রূপান্তরিত হল, কি ক'রে আমি যে আমার প্রেস্টিজবোধ হারিয়ে কিছু আঙুর-বেদানা-কমলালেবু নিয়ে সারপেনটাইন লেনে আমার টাইপিস্টের বাসাবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম, ওই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডটা কি ক'রে যে বহুবর্ণসমন্বিত সৃষ্টিশোভায় বিকশিত হল, কোন্ মন্ত্রবলে যে আপিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মনিব টাইপিস্টের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রেরণায় তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন এ রহস্যের ইতিহাসও আমার জানা নেই।

সারপেনটাইন লেনের কোন্ নম্বর বাড়িতে থাকেন মিস মিত্র সে খবরটা আপিসের খাতা থেকে জেনে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম সেটা একটা ফ্ল্যাট। কড়া নাড়তেই একতলা থেকে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন তিনিই খবরটি দিলেন আমায়।

বললেন, 'দোতলায় ফ্ল্যাটের আধখানাতে থাকেন মিস মিত্র। বাঁ দিকটায়। আপনি এই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটটায় মিস মিত্র থাকেন। তাঁর অসুখ করেছে'

বললাম, 'সেই জন্যেই তো এসেছি'

'আপনার আত্মীয় নাকি'

'তা বলতে পারেন'

আমার গাড়িটার দিকে চেয়ে তাঁর সম্ভবত সম্ভ্রম জাগল মনে।

বললেন, 'এসেছেন ভালোই হয়েছে। আমার মনে হয় ওঁর ঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না।'

'তার মানে ?'

'হোমিওপ্যাথিই যদি করাতে চায় তা হলে ভালো একজন হোমিওপ্যাথকেই ডাকুক। ওষুধ দিচ্ছেন পাড়ার ননী চৌধুরী, যাঁর আসল কাজ কয়লার ব্যবসা। আমি একথা বলেছিলাম সুরেশবাবুকে কিন্তু আমার কথা তিনি শোনেন নি—'

'সুরেশবাবু কে ?'

'ওর দাদা। আপনি চেনেন না ?'

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু অবাক হলেন। আত্মীয় অথচ চিনি না—

কিন্তু সেকথা প্রকাশ করলেন না।

বললেন, 'আপনি চিকিৎসার একটা সুব্যবস্থা ক'রে যান'

আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। মনে হল তুমিও উঠছ আমার সঙ্গে। দোতলায় উঠে দেখি বাঁ হাতের কপাটটায় ছোট্ট একটি নেম-প্লেট—মিস এস. মিত্র। একটু বিস্মিত হলাম। বাড়িতে দাদা রয়েছে অথচ নেম-প্লেট তার নামে নয় কেন ?

কড়া নাড়তেই কপাট খুলে গেল।

আড়ময়লা-লুঙ্গি-পরা যে লোকটি বেরিয়ে এলেন তিনিই সম্ভব মিস মিত্রের দাদা। গাবদাগোবদা মোটাসোটা চেহারা। মুখে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি নেই। কিছু মাত্র মিল নেই মিস মিত্রের চেহারার সঙ্গে।

'কে আপনি—'

'আমি দিগন্ত সেন'

'আসুন, আসুন আপনি। দাদা, উনি আমার আপিসের 'বস' '

শ্রীলতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সুরেশবাবুর মুখেও তখন সম্ভ্রম ফুটল।

'ও, আসুন আসুন'

ঢুকে দেখলাম শ্রীলতাও তার রোগশয্যায় উঠে বসেছে। একটা শস্তা বেডকভার গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিল, সেটা খসে পড়েছে গা থেকে জ্বরে থমথম করছে মুখখানা। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

'উঠবেন না, শুয়ে পড়ুন'

ঘরে বসবার চেয়ার ছিল না। এক কোণে ছোট টুল ছিল একটা তার উপরই বসলাম।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শ্রীলতার মুখ।

'আপনি যে আসবেন এ আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জ্বর ছাড়ছে না ?'

দাদাই উত্তর দিলেন, 'না। একটু আগে দেখলাম ১০৩'

'কি চিকিৎসা হচ্ছে'

'হোমিওপ্যাথিক'

'অ্যালোপ্যাথিতে টাইফয়েডের ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। অ্যালোপ্যাথি করান'

চুপ ক'রে রইলেন দাদা। শ্রীলতা পাশ ফিরে শুল দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে।

একটু ইতস্তত ক'রে দাদা শেষে বললেন, 'সত্যি কথা বলব ? অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা

করবার পয়সা নেই আমাদের। আমি বেকার হয়ে আছি গত তিন মাস থেকে। শ্রীলতা যা রোজগার করে তাতে আমাদের কুলায় না। এই দুখানি ঘরের ভাড়াই একশ' টাকা দিতে হয়।'

তখন আমাকে বলতে হল—'বেশ চিকিৎসার ভার আমি নিচ্ছি। আমার ডাক্তারকে বলে দিচ্ছি সে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।'

'অ্যালোপ্যাথি ওষুধের দাম শুনেছি বড্ড বেশী'

'ওষুধের ব্যবস্থাও আমি করব। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন উঠি। ভয় নেই ঠিক হয়ে যাবে সব'

কাগজের মোড়কে বেঁধে ফলগুলি এনেছিলাম সেগুলি মেঝের উপরই রাখতে হয়েছিল।

দাদা বললেন—'এগুলো আপনি ফেলে যাচ্ছেন'

'ওতে ফল আছে। মিস মিত্রের জন্যই এনেছি ওগুলো'

'তাই নাকি!'

বিস্মিত হলেন সুরেশবাবু। মিস মিত্র দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রেই শুয়ে রইলেন।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নাবছিলাম।

তুমিও নাবছিলে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

যে কথা তুমি উচ্চারণ কর নি সেই কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল আমার অন্তরে।

'মিস মিত্রের কাছে এভাবে নিজেকে খেলো ক'রে আনন্দ পেলে?'

এর প্রত্যুত্তর দিলাম আমি মনে মনে।

'আনন্দ হল বই কি। একজন গরীবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। এতে খারাপ কি আছে'

'তোমার আপিসের ব্রজবাবু ছ'মাস ধরে অসুস্থ। বিনা মাইনেতে ছুটি নিয়ে আছেন। তিনি মিস মিত্রের চেয়ে অনেক বেশী গরীব। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর। তাঁর কি খোঁজ করেছিলে একদিনও?'

'ব্রজবাবু সামান্য কেরানী। তিনি কবি নন। শ্রীলতা কবি'

এক কথায় মনে হল অট্টহাস্য ক'রে উঠল কে যেন। নিচে নেমে দেখলাম আকাশভরতি কালো মেঘ। চোখ ধাঁধিয়ে একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপর আবার অট্টহাস্য।

সাত

তোমার অনবদ্য প্রকাশের বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই। জলে-স্থলে, অনলে-অনিলে পুষ্পে পত্রে নির্ঝরে-নদীতে সাগরে-মরুভূমিতে কত রূপেই না ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত হচ্ছে তোমার লীলা। তুমি অনির্বচনীয়, তবু তোমাকে ভাষা দিয়েই প্রকাশ করতে চাই। অসম্ভব এ আকাঙ্ক্ষা কেন? এ আমার আকাঙ্ক্ষা নয়, এ প্রয়াস আমি না ক'রে পারি না। তুমি আমার উপর ভর করেছ। তুমি আমাকে

দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছ সেই সব কথা যার অর্থ আমি জানি সীমাবদ্ধ কিন্তু যা আমি প্রয়োগ করছি তোমাকে, অসীমাকে, বর্ণনা করবার জন্য। কিন্তু তোমাকে শুধু অসীমা বললেই তৃপ্তি হয় না, আরও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। সেদিন তোমার আভাস একটু পেয়েছিলাম। কুন্দফুল ফুটেছিল বাগানে অনেক। দিনের আলোয় তাদের দেখেছিলাম, তখন তোমাকে দেখতে পাই নি। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় যখন দেখতে গেলাম তখন দেখা পেলাম তোমার। অবশ্য তা-ও একটা আভাস মাত্র, একটা ইঙ্গিত, একটা ইশারা। জ্যোৎস্নাস্নাত কুন্দফুলগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সেই না-দেখতে পাওয়ার মধ্যেই ছিল একটা অসীমতা। জ্যোৎস্নামাখানো ফুলগুলি আমাকে স্বপ্নলোকে নিয়ে গেল যেখানেই সবই সম্ভব। দেখলাম এক উৎসুক রাজপুত্রকে গল্প শোনাচ্ছে এক চটুলা রাজকন্যা। আরব্য উপন্যাসের আমেজ চতুর্দিক ভরপুর। চামেলী আতরের গন্ধ যেন ঘন হয়ে রয়েছে বাতাসের পরতে পরতে, তার ভিতর থেকে আভাসিত হচ্ছে মেহেদি রঙের স্বপ্ন। রাজপুত্র হঠাৎ বললেন, আচ্ছা শাহজাদী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমাকে আমি মেরে ফেলব এ জেনেও তুমি কি ক'রে আমাকে এমন সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাচ্ছ। শাহজাদী হেসে উত্তর দিলেন—আপনাকে দেখেই তো আমি মারা গেছি। মরবার ভয় আর আমার নেই। আমার ভয় পাছে আবার বেঁচে উঠে আপনাকে হারিয়ে ফেলি। মৃত্যুর মাঝখানে আপনাকে পেয়েছি, ভয় হয় জীবনের মাঝখানে আপনাকে হারিয়ে ফেলব। সাবাস, সাবাস, সাবাস বলে উঠলেন রাজপুত্র। শাহজাদীর থুতনি নেড়ে আদর করলেন। একটা করুণ গম্ভীর সুর ধ্বনিত হতে লাগল অন্তরীক্ষে। হেনা রজনীগন্ধা আর চাঁপার গন্ধ—অভিনন্দনে ভরে উঠল চারিদিক। কুন্দফুলগুলো চোখের সামনেই ছিল, কিন্তু তারা যেন হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল। মনে হল ওরা কি শুধু কুন্দ? আর কিছু নয়? আর মনে হল এ সমস্তকে ঘিরে তুমি বিরাজ করছ।

হ্যাঁ, তুমি।

কিন্তু তোমাকে বর্ণনা করব কি ক'রে?

আট

সেদিন রবিবার।

খোলা বারান্দায় প্রসন্ন প্রভাতের রোদ এসে পড়েছিল। বারান্দার একধারে পড়েছিল খবরের কাগজটাও। কিন্তু সেটা খুলে দেখতে ইচ্ছে করছিল না। কোথাও ডাকাতি বা রাহাজানি হয়েছে, রাজনৈতিক নেতারা কি নিয়ে পরস্পর কলহ করছেন, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহর কোন্ সভায় কতটা হয়েছে, অরাজকতা কেমন ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে এসব বেদনাদায়ক খবর পড়তে ইচ্ছে করছিল না।

ওমর খৈয়াম পড়ছিলাম। ভাবতে চেষ্টা করছিলাম আমার এই ত্রিতল বাড়িটা একটা সরাইখানা আর আমার পাশে কোন অদৃশ্য তন্বী রূপসী বসে আছে সুরাপাত্র

হাতে নিয়ে। ভাবতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল সে চেষ্টা। অবাস্তব কল্পনাটা আরও অবাস্তব হয়ে যাচ্ছিল রাস্তার ভিখারিনীটাকে দেখে। পরনে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি, সারা মুখে হতাশার ছাপ, হাতে ভিক্ষাপাত্র। করুণ প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিল আমার দিকে। তার করুণ নির্বাক দৃষ্টি ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওমর খৈয়াম আর তার সাকীকে। মনটা বাস্তবমুখী হয়ে উঠল। চারিদিকে এত দুঃখ কেন? যখন এম. এ. ক্লাসে পড়তাম তখন মনে হয়েছিল স্বাধীনতা পেলে সুস্থ রাজনীতিই এর সমাধান করবে। এখন সে ভুল ভেঙেছে। এখন দেখছি এদেশে সুস্থ রাজনীতি নেই, আছে পার্টি-নীতি আর স্বার্থনীতি। তবু মনে হয় আমার এই তিনতলা বাড়িতে একা থাকবার অধিকার আমার আছে কি যখন আমার বাড়ির পাশেই শ্যামবাবু বিরাট পরিবার নিয়ে ছোট ছোট তিনখানা ঘরে গুঁতোগুঁতি ক'রে মরছেন? আমি যদি এই বাড়িটা গরীবদের দান ক'রে দিই তাহলেই কি সব দরিদ্রদের সমস্যার সমাধান হবে? হবে না। হবে না, হবে না, হবে না, কিছুতেই হবে না। আমার বাড়িটা নিয়ে তখন নতুন সমস্যা জাগবে, কমিটি বসবে, তাঁরা ঠিক করবেন কার পাওয়া উচিত, শেষপর্যন্ত দেখা যাবে যোগ্য লোকেরা পায় নি তদ্বির-পটুয়া পেয়েছে। মানুষের অশান্তি, অসন্তুষ্টি থাকবেই। ধনী দরিদ্র কারও শান্তি নেই, কেউ সন্তুষ্ট নয়। যে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই চালাকরা নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নেবে আর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকবে বোকারা। বুদ্ধিমানরাই শক্তিমান, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে। তাদের হটিয়ে দেবার মতো কোনো সাধু পন্থা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবু আমি একটু বিরূপ দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলাম আমার সেগুন কাঠের কপাটগুলোর দিকে। মোজেইক-করা মেঝেটা যেন বিদ্রূপ করতে লাগল আমাকে। মনে হল—না, এ বাড়িতে কিছুতেই ওমর খৈয়ামের সরাইখানা ভাবা যাবে না। ওমর খৈয়ামের সুর আর মোহমুদ্গরের সুর মূলত এক—বৈরাগ্যের সুর, পৃথিবীর নশ্বরতার সুর ধ্বনিত হয়েছে ওই দুটো কবিতাতেই। আমার মতো ভোগীর বিলাস-মঞ্চে ও সুর মানাবে না। কিন্তু পরক্ষণেই যা ঘটল তাতে বদলে গেল সব।

খুকু এল গীটার নিয়ে।

'আমি একটা নতুন গান তুলেছি। শোনাই?'

'শোনাও'

খুকু বাজাতে লাগল—'আমায় একটু শুধু বসতে দিও কাছে।'

...একটু পরে অনুভব করলাম আমি বাজনাটা শুনছি না, খুকুর পল্লবিত মুঞ্জরিত দেহশ্রীর দিকেই চেয়ে আছি। মনে হল খুকু যেন গীটার বাজাচ্ছে না, আমাকে সুরা পান করাচ্ছে। আমি ওমর খৈয়াম, সে সাকী। সে স্বপ্নলোকে চিরন্তন ওমর খৈয়াম চিরন্তনী সাকীর জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে সেই স্বপ্নলোক বাস্তবে রূপান্তরিত হল কোন্ মন্ত্রবলে তা প্রথমে বুঝতে পারি নি। হঠাৎ আমার জানলার ফাটা কাঁচটার দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম। দেখলাম একটা বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে গেছে, একটা বাঁকা তলোয়ার যেন মূর্ত হয়েছে ওখানে। বুঝলাম তুমি এসেছ অন্তরালে। তোমার আবির্ভাবেই সব বদলে গেছে। কিন্তু এই স্তব্ধ বিদ্যুৎ কি বলতে চাইছে? ওই বাঁকা তলোয়ার কিসের প্রতীক? 'আমায় একটু শুধু বসতে দিও কাছে' করুণ স্বরে বার বার মিনতি

করছে খুকুর গীটার। রঙ্গনা গাছটার সর্বাঙ্গে মহোৎসব চলেছে, আকাশের উড়ন্ত মেঘটা যেন ঠিকানা পেয়েছে তার দয়িতার, পদ্মের পাপড়িতে প্রতিফলিত সূর্যালোক পদ্মকে পেয়েও যেন পাচ্ছে না, কিন্তু তোমার ওই উজ্জ্বল তলোয়ারের বক্রভঙ্গীতে কি বলতে চাইছ তুমি তা বুঝলাম না। রাগ হয়েছে? ঈর্ষা হয়েছে? কিন্তু তুমি যে অসীমা, কোনো অনুভূতির সীমায় তুমি তো বাঁধা পড়বে না। তবে? না, বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম তুমি এসেছ।

'কেমন লাগল'

গীটার বাজনা শেষ ক'রে জিজ্ঞেস করল খুকু।

'চমৎকার'

'আপনি তো কোনোদিন খারাপ বলেন না'

ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিলে খুকু ঘাড় বাঁকিয়ে।

আমি শুধু হাসলাম একটু।

তারপর খুকু প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল হঠাৎ।

'আজ খুব ভালো ইংরেজী সিনেমা হচ্ছে একটা। একজন সঙ্গী পেলে গিয়ে দেখে আসতাম। কিন্তু কাউকে পাচ্ছি না। একা যেতে ভয় করে'

'তোমার বন্ধু-বান্ধবী কেউ নেই?'

'না, তেমন কেউ নেই। আমি নিতান্তই একা। এই বিরাট কলকাতা শহরে আমার মতো নিঃসঙ্গ বোধহয় আর কেউ নেই।'

তারপর হেসে বললে, 'কারও সঙ্গে মিশতে পারি না যে। কেবল গীটার শেখবার লোভেই আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করেছি, তা-ও খুব ভয়ে-ভয়ে। আমার বাড়িতেও এমন কেউ নেই যার সঙ্গে গিয়ে সিনেমাটা দেখে আসি। বইটা খুব ভালো শুনেছি'

খুকু বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। পুরোনো চাকর রামধনই তাদের ভরসা। সেই সব বাইরের কাজ সামলে দেয়। এমন কি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও আনে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ থেকে নাকি সংসার চলে ওদের।

খুকু যে প্রত্যাশাভরে দাঁড়িয়ে আছে তা আমি মনে মনে অনুভব করছিলাম, কিন্তু সহসা কিছু বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

খুকু বলল, 'আপনি সিনেমা দেখেন না বুঝি'

মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'না, খুব একটা দেখি না। তবে চল আজ দেখে আসি তোমার সঙ্গে'

'যাবেন?'

একটি কথায় খুকুর আনন্দিত অন্তর যেন মূর্তি ধরে দেখা দিল।

সিনেমা দেখে যখন বেরুলাম তখন আমি মাতোয়ারা হয়ে গেছি। গল্পের নায়িকা নায়ককে খুব ভালোবাসত, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভালোবাসত তার স্বদেশকে। সে যে মুহূর্তে বুঝতে পারল তার প্রণয়ী স্বদেশদ্রোহী, গোপনে গোপনে চেষ্টা করছে স্বদেশকে শত্রুপক্ষের হাতে বিকিয়ে দিতে, এর অকাট্য প্রমাণ যেদিন তার হাতে এল সেইদিনই সে গুলি ক'রে মেরে ফেললে তাকে। তারপর দেশের জন্য লড়তে লড়তে প্রাণ দিল নিজেও।

…আমিও একদা 'স্বদেশী' ছিলাম, যদিও ইদানীং বদলে গিয়েছি। এখন মনে হয়েছে রাজনীতি ক'রে আত্ম-আস্ফালন বা আত্ম-সেবা করা যায় কিন্তু স্বদেশসেবা করা যায় না। রাজনীতি করতে হলে দল গড়তে হবে। যে দলই গড়া যাক না কেন সে দলে দলাদলিই শেষে মুখ্য হয়ে উঠবে, স্বদেশ হবে একটা উপলক্ষ মাত্র। এখন মনে হচ্ছে এই অজুহাতটা নিতান্তই একটা পঙ্গু অজুহাত। আমি আসলে পলাতক। এখন মনে হচ্ছে দেশকে যদি সত্যিই ভালোবাসতাম তাহলে অত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতাম না, ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আসলে আমিও নিজেকেই ভালোবাসি তাই গা-বাঁচিয়ে আত্মসেবাই করছি। নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ল। যে সূর্য চিরকালের মতো অস্ত গেছে সেই সূর্যই যেন দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে উদিত হল আবার। মনে পড়ল কোয়াকে। সে কোথায় আজ? তার জেল হয়েছিল, তারপর তার আর কোনো খবর পাই নি। তার উজ্জ্বল নির্ভীক চোখ দুটো ভেসে উঠল মনের উপর। শচীনের মুখটাও মনে পড়ল। পুলিসের গুলিতে মারা পড়েছিল সে। তার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল শচীনের মুখের হাসিটা। বিজয়ীর হাসি, আত্মোৎসর্গের অপরিসীম তৃপ্তি সে হাসিতে উদ্ভাসিত। সে হাসি যেন বলছিল, দেশের জন্য মরতে পেরেছি, আমি ধন্য। দেশকে ভালোবাসি তার প্রমাণ দিতে পেরেছি এইতেই আমি কৃতার্থ। এই হাসিটা অনেকদিন আমার জীবনকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছিল। কোথায় গেল আমার সে জীবন? কোথায় গেল সেই দিগন্ত? এই কথাটাই যেন বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমার মনের সেই অন্ধকার গহন-প্রদেশে যা একদিন আলোকিত ছিল। আলো নিবে গেল কেন? সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বিরাট একটা অর্কেস্ট্রার মতো বাজতে লাগল, আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল আমার সমস্ত সত্তাকে। আমি খুকুর পাশে নির্বাক হয়ে বসে ছিলাম। মনে হল সেই উদ্দাম অর্কেস্ট্রার ভিতর সহসা একটা নূতন সুরও বাজল যেন। সে সুর বলতে লাগল দিগন্ত কোথাও যায় নি, যাবে না, যেতে পারবে না। তার পুরাতন জীবন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, সূর্য যেমন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে রাত্রির অন্ধকারে। অন্ধকারের যবনিকা সরে যাবে, আত্মপ্রকাশ করবে সে আবার। আমার মনে হল…কি যে মনে হল তা ব্যক্ত করা যাবে না। বার বার মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম, দেশকে ভালোবাসি বই কি। যদিও নেতা হতে পারব না কখনও কিন্তু দেশকে ভালোবাসি…

মোটরটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা প্রসেশন আসছে। অপরূপ একটি সরস্বতী প্রতিমা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল ছেলে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে পড়ল কাল সরস্বতী পুজো। তারপর চমকে উঠলাম হঠাৎ। মনে হল প্রতিমাটি যেন আমার দিকে চাইলে। তার মুখের স্মিতহাস্য যেন আমারই জন্য বিশেষ একটা অর্থ বহন ক'রে আনল। তার মধ্যে আমি তোমাকে চিনতে পারলাম। নানারূপে তুমি দেখা দিয়েছ, আজ সরস্বতীরূপে দিলে। তোমাকে…

এর পর সব গোলমাল হয়ে গেল।

খুকু কথা কইল।

'সিনেমাটা ভালো লাগে নি বুঝি'

'খুব ভালো লেগেছে। এমন ভালো ছবি অনেকদিন দেখি নি'

'তাহলে চুপ ক'রে আছেন যে'

এর উত্তরে আবার চুপ ক'রে যেতে হল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললাম, 'ভালো লেগেছে বলেই চুপ ক'রে আছি। কত ভালো লেগেছে তা তো কথা দিয়ে বলা যাবে না'

'তা ঠিক'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার লোককে কেউ ধন্যবাদ দেয় নাকি'

বললাম, 'তোমাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তোমার জন্যেই এমন ভালো ছবি দেখা হল আমার'

'এটা রাখুন—'

একটা দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিল খুকু।

'একি!'

'না না, টিকিটের দামটা আপনি কেন দেবেন। সঙ্গ দিয়েছেন এই যথেষ্ট'

আমি হেসে বললাম, 'এটা কি আপনার লোকের মতো ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া দশ টাকা তো লাগে নি'

'বাকিটা পরে ফেরত দেবেন।'

খুকুর বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতেই খুকু নেবে গেল তাড়াতাড়ি। আমার মনে হল সত্যিই তো, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ওকে সিনেমা দেখাবার কোনো অধিকার তো আমার নেই। থাকলে এ প্রস্তাবই ও করত না। এ নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালাম না। টাকাটা পকেটে পুরে নেমে পড়লাম। আমার মনে তখন অন্য সুর বাজছিল। ওপরে উঠেই ফোন করলাম কুমোরটুলিতে। সেখানকার একজন শিল্পীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে।

'ভাই, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'কি বলুন'

'আমি কাল সরস্বতী পুজো করব। একটি ভালো প্রতিমা দিতে হবে'

'আগে অর্ডার দেন নি?'

'না। কিন্তু দিতে হবে ভাই একটা প্রতিমা। সেই জন্যেই তোমাকে ফোন করছি। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে'

'ছোট প্রতিমা কিন্তু নেই একটাও। একটা বড় প্রতিমা দিতে পারি'

'বড় হলে ক্ষতি নেই? দেখতে সুন্দর তো?'

'হ্যাঁ, দেখতে চমৎকার'

'তাহলে ওইটেই পাঠিয়ে দিও'

পরদিন সকালে খুকুকে খবর পাঠালাম।

'তুমি তোমার গীটার নিয়ে এস। সরস্বতী পুজো করছি। প্রতিমা আনতে গেছে। তোমার গীটারের সুর দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে বীণাবাদিনীকে। অবিলম্বে চলে এস'

আমার নিচের বড় 'হল' ঘরটায় আলপনা দিয়েছিল পাড়ার মেয়েরা। কয়েকটা

বড় বড় ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছিলাম গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা গোলাপ আর শ্বেতপদ্ম। একধারে বসে খুকু গীটার বাজাচ্ছিল। চমৎকার দরবারী কানাড়া শুরু করেছিল সে। প্রতিমা যখন এল তখনও তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে সে। প্রতিমাকে যথাস্থানে স্থাপিত ক'রে চাইলাম প্রতিমার দিকে। চমৎকার প্রতিমা। কিন্তু সেদিন রাস্তায় প্রতিমার চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম, মুখের যে মৃদু হাসি আমার মনে আনন্দ-হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছিল সে দৃষ্টি সে হাসি এ প্রতিমার নেই। সুন্দর মুখ, কিন্তু ভারী গম্ভীর। চোখের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত, আমার দিকে নয়।

···খুকু বাজিয়ে চলেছে, মীড়ে মীড়ে সুরে সুরে দরবারী কানাড়া মূর্ত হয়ে উঠেছে। উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে গোলাপ আর পদ্মের পাপড়িগুলো।

প্রতিমার মুখে কিন্তু হাসি নেই, কোনো ইঙ্গিত নেই, কোনো বার্তা নেই।

তুমি কি রাগ করেছ?

নয়

আপিসের কাজ করছি। চাপরাসী একটা কার্ড নিয়ে ঢুকল। কার্ডে দেখলাম লেখা রয়েছে এস. গুপ্ত। ঠিক চিনতে পারলাম না। তবু বললাম, সেলাম দেও। সাহেবী পোশাক পরে যিনি এলেন প্রথমে তাঁকে চিনতে পারি নি। তারপর কথা কইতেই চিনতে পারলাম। ওরকম মিহি নিখাদে-বাঁধা কণ্ঠস্বর আর তো কারো শুনি নি।

'আরে সৌরভ যে। এস, এস, বস। অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। কি খবর, কি করছ আজকাল'

'পুলিসের চাকরি করছি'

'আমাকে ভোল নি দেখছি এখনও'

'তোমাকে ভোলা কি সহজ নাকি। তোমার স্মৃতিচিহ্ন এই দেখ আমার হাতে এখনও রয়েছে'

অনেক দিন আগে—যখন দু'জনে কলেজে একসঙ্গে পড়তাম—তখন তার জন্মদিনে একটা হাত-ঘড়ি উপহার দিয়েছিলাম তাকে। দেখলাম ঘড়িটা এখনও তার হাতে বাঁধা আছে।

'ঘড়িটা এতদিন চলছে! আশ্চর্য—'

'মাঝে মাঝে অয়েল করিয়েছি শুধু। চমৎকার ঘড়ি, এক মিনিট স্লো-ফাস্ট হয় না'

'আপিসে কেন এলে ভাই। এখানে কি দিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করি। চা বা কফি খাবে?'

'না। তোমার বাড়িতে পরে একদিন যাব। আগে যে জরুরী কথাটা তোমাকে বলতে এসেছি সেটা বলে নি। তপতী বলে কোনো মেয়ে কি তোমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দার্জিলিঙের একটা হোটেলে উঠেছিল?'

'হ্যাঁ। কেন'

'সে মেয়েকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। সে একজন টেরারিস্ট। হোটেলের ম্যানেজার বললেন ঘরটা তোমার জন্যেই রাখা ছিল। মেয়েটি তোমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে গিয়ে সেই ঘরটা দখল করেছিল। হোটেলের ম্যানেজার তোমার চিঠিটা আমাকে দেখালেন। . চিঠিতে তুমি লিখেছ পত্রবাহিকা তোমার আত্মীয়া, তাকে যেন তোমার ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়। ভাগ্যে তুমি মহিলার নামটা লেখ নি—'

'তপতী টেরারিস্ট। তাই নাকি'

'তার তোরঙ্গ থেকে আমরা রিভলবার পেয়েছি একটা। আরও চিঠিপত্রও পেয়েছি। ও যে টেরারিস্ট তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এখনও কি টেরারিস্ট দল আছে?'

'আছে। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাতে ওরা সন্তুষ্ট নয়। যাক সে সব কথা। আসল কথাটা হচ্ছে আমি চাই না যে তোমার নামটা ওর সঙ্গে জড়িত হয়। আমি যখন আছি এর মধ্যে তোমাকে বেমালুম বার ক'রে দেব। তবে তোমাকে একটা আত্মীয়া খাড়া করতে হবে যে দরকার হলে বলবে যে তুমি তাকেই চিঠিটা দিয়েছিলে। চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছিল বলে সে যেতে পারে নি। তপতী সেই হারিয়ে-যাওয়া চিঠিটা নিয়ে দার্জিলিঙের হোটেলে লুকিয়ে ছিল তোমার আত্মীয়া সেজে—এইটে আমরা প্রমাণ করব।'

বললাম, 'আমার তো তেমন কোনো আত্মীয়া নেই ভাই। তাছাড়া—'

সৌরভ বলল, 'বেশ আমিই তাহলে তোমার আত্মীয়া আবিষ্কার করি একজন। গোটা কয়েক টাকা পেলেই অনেক মেয়ে রাজী হয়ে যাবে'

'আমি ভাই কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারব না। পুলিস আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি বলব আমি তপতীকেই চিঠি দিয়েছিলাম'

'তার পরই পুলিস কি জানতে চাইবে জান? ওর সঙ্গে কি আলাপ ছিল আগে, কোথায় কিভাবে আলাপ হয়েছিল'

'তখনও সত্যি কথা বলব। ওর সঙ্গে আগে আমার আলাপ ছিল না, এখনও তেমন নেই। কিছুদিন আগে ঘোর গ্রীষ্মের দুপুরে আসানসোল স্টেশনে ও আমাকে বরফ-জল খাইয়েছিল থার্মোফ্লাস্ক থেকে। এই সূত্রেই আলাপ—'

'পুলিস জানতে চাইবে অযাচিতভাবে অচেনা লোককে বরফ-জল খাওয়াতে গেল কেন সে'

'তখন বলব যদিও মুখোমুখি কোনো দিন দেখা হয় নি তবু ও চিনত আমাকে আমার লেখার ভিতর দিয়ে। আমি কবি, আমার অনেক কবিতাই ছাপা হয়েছে কাগজে, সেই সূত্রেই আমাকে চিনত তপতী, যদিও মুখোমুখি দেখা সেই প্রথম'

'কিন্তু পুলিস এই 'কক অ্যান্ড বুল' (cock and bull) গল্প বিশ্বাস করবে না'

'তাহলে আমি নাচার। মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না। তপতী এখন কোথায়'

'জেলে আছে। তুমি তাহলে তোমার মত বদলাবে না?'

'না। তপতী যে টেরারিস্ট একথা আমি জানতাম না। তার সঙ্গে আমার দেখাও বেশীবার হয় নি, ঘনিষ্ঠতাও হয় নি। সে হঠাৎ একদিন এসে বললে বাড়ির সবাই জোর ক'রে তার বিয়ে দিতে চাইছে, তাই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছিল। তাই আমি তাকে দার্জিলিঙের হোটেলে চালান ক'রে

দিয়েছিলাম। ওর সম্বন্ধে এর বেশী আর কিছু জানতাম না আমি। তোমার কাছে ওর নতুন পরিচয় পেয়ে কিন্তু আমার যা মনে হচ্ছে তা কি তুমি বরদাস্ত করতে পারবে?'

'বলে ফেল, দেখি পারি কিনা'

'ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মেয়েটি অসাধারণ'

'সত্যি টেরারিজ্‌মকে ভালো মনে কর?'

'করি। যেখানে সর্বত্র অবিচার, যেখানে সবাই মতলববাজ, যেখানে কালো-বাজারীদের দাপটে সবাই সন্ত্রস্ত, যেখানে শাসনের নামে কুশাসন, যেখানে দেশের নামে সবাই চুরি ডাকাতি করছে সেখানে টেরারিজ্‌মই একমাত্র প্রতিবাদ। আর প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সে প্রতিবাদ যারা করে তারা নমস্য। অবশ্য অনেক মেকী টেরারিস্টও আছে যারা আসলে মতলববাজ গুণ্ডা, আশা করি তপতী তাদের দলে নয়। ক্ষুদিরাম কানাইলাল বাঘা যতীন, দীনেশ বাদল বিনয় যে পথে চলেছিল, স্বয়ং অরবিন্দ একদিন যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, নিবেদিতা যে পথের আলোকপাত করেছেন আশা করি তপতীও সেই পথের যাত্রী। তুমি এটাকে খারাপ বল?'

'এটাকে খারাপ বলবার জন্যেই মাইনে পাই, যে মাইনে দিয়ে পালক করি আমার বুড়ো মা বাবাকে আর বউ ছেলেমেয়েদের। অন্য পথে চলবার উপায় নেই আমার। যার নিমক খাই তার বিরুদ্ধাচরণও করতে পারব না। তবে তোমাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব। কারণ তুমি আমার বন্ধু আর এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি নির্দোষ। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন। পরে আবার আসব একদিন'

হেসে বললাম, 'আমি যদি সত্যি কথা বলি তাহলে আমাকে বাঁচাবে কি ক'রে'

'এই 'পিকচার' থেকে বেমালুম লোপাট ক'রে দেব তোমাকে'

'কি ক'রে সম্ভব হবে তা'

'দার্জিলিঙের ওই হোটেলওলার কাছ থেকে তোমার চিঠিখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেব। তিনিও ভয় পেয়েছেন খুব। আশা করি আমার কাছ থেকে অভয় পেলে চিঠিখানা আমাকে তিনি দেবেন'

সৌরভ চলে যাওয়ার পরই চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। জানলা দিয়ে দেখলাম আকাশে ঘন-ঘোর মেঘ। আলো জ্বালতে হল। বেয়ারা এসে ডাকটা দিয়ে গেল। অধিকাংশই আপিসের চিঠি। একটা বড় চৌকোনা খাম প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খামটা খুলে চমকে গেলাম। তপতীর ফটো। আমার দিকে চেয়ে হাসছে। সেই হাসিটা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল সহসা। আমি ভুলে গেলাম যে আমি আপিসে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি। অবলুপ্ত হয়ে গেল আমার পরিবেশ। আমার সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

'আমার হাসি তোমরা কিছুতে নিবিয়ে দিতে পারবে না। আমি অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। আমার হাসবার অধিকার আছে। কালোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি আমি আলো, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি আমি সরলতা। আমি হাসব না? নিশ্চয়ই হাসব। আমার এ হাসিকে নেবাতে পারবে না তোমরা কেউ। এ হাসি সূর্যালোকের দীপ্তি। ফাঁসিকাঠে যখন ঝুলব তখনও এ হাসি অম্লান থাকবে"

ফোনটা ঝনঝন ক'রে বেজে উঠল।

সৌরভ ফোন করছে।

'কে দিগন্ত? শোন, তপতী জেল থেকে পালিয়েছে। তোমার ওখানে যদি যায় আমাকে একটু খবর দেবে? আমার ফোন নাম্বার'··

'মাপ কর ভাই। যদি আসে—সম্ভবত আসবে না—কিন্তু যদি আসে তাহলে তোমাকে খবর দিতে পারব না, মানে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার সৌরভকে খবর দিতে পারব না, বন্ধু সৌরভকে খবর দিতে পারি যদি সে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না ভাই! নিজেরাই যা পার কর'

সৌরভ ফোন কেটে দিলে।

ফটোটার দিকে আবার চাইলাম। তপতীর হাসি আবার বাঙ্ময় হয়ে উঠল। বলল, 'আমি যাব আপনার কাছে। তখন যদি ধরিয়েও দেন মনে করব না কিছু। কারণ জানি ধরা একদিন পড়বই। এ পথে যারা চলেছে তাদের সকলের যে পরিণতি হয়েছে আমারও তাই হবে এ জেনেও এ পথে নেমেছি। যদি না-ও নামতাম তাহলেও মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতাম না। কিন্তু সে মৃত্যু হত অন্ধকারের মধ্যে পদদলিত লাঞ্ছিত পশুর মৃত্যু। এখন আমার সান্ত্বনা আমি আলোর নৌকোয় পাড়ি দিচ্ছি অন্ধকার সমুদ্রে। নৌকোও ডুববে কিন্তু যা ডুববে তা আলোর নৌকো। অন্ধকার তাকে গ্রাস করলেও হজম করতে পারবে না। কোনো-না-কোনো রূপে তা আবার দেখা দেবে নূতন দিগন্তে···।'

এর পরই বৃষ্টি এল। ঝমঝম শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক। মনে হল অসংখ্য নর্তকী যেন নাচছে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে। নাচের শব্দ থেমে গেল তারপর। হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল নূতন কিছুর আবির্ভাবে সসম্ভ্রমে থেমে গেল যেন সব। তারপর শোনা গেল গম্ভীর একটা সুর। তানপুরার সুর। তানপুরা বাজাচ্ছে কে? তারপর দেখতেও পেলাম তানপুরাটা। অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা গেল। যে বাজাচ্ছে তার মুখ দেখা গেল না, আলো-আঁধারিতে দেখা গেল শুধু তার অলকগুচ্ছ, আর তার শুভ্র হাত দুটি। মনে হল তানপুরাটা শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, ওটা যেন জীবন্ত একটা হৃদয়। সে হৃদয় থেকে যা উৎসারিত হচ্ছে তা শুধু সুর নয়, তা কান্নাও নয়, তা যেন নির্দেশ, তা যেন আদেশ।

যে বাজাচ্ছে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু জানি আমি সে কে।

সে তুমি!

দশ

অনেকদিন পরে মিস মিত্র আপিসে এসেছেন। রোগা হয়ে গেছেন খুব। রোগা হয়ে তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেছে। একটা অদ্ভুত সূক্ষ্মতা, একটা অনির্বচনীয় লঘুতা তাঁকে ঘিরে যে শোভা সৃষ্টি করেছে তা যেন ধরবার ছোঁবার জিনিস নয়, তা যেন ভঙ্গুর, রূঢ়তার সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়বে তা। প্রজাপতির ডানায় হাত দিলে

যেমন তার রং ঝরে যায়—অনেকটা তেমনি। বহুকাল আগে সাঁওতাল পরগনায় এক পাহাড়ের ধারে শীর্ণকায়া স্বচ্ছতোয়া একটি তরঙ্গিণীকে দেখেছিলাম। তাকে মনে পড়ছে। জনতাকে এড়িয়ে নদীটি সসংকোচে বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলে গেছে। তার আশে-পাশে রয়েছে কিছু নুড়ি আর নাম-না-জানা পাহাড়ী ফুলগাছ কয়েকটা। আমি যেদিন দেখেছিলাম সেদিন তার তীরে বসে একটা দোয়েল পাখি জল খাচ্ছিল ঘাড় উঁচু ক'রে ক'রে। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। নদীটাও সশঙ্কিত হয়ে উঠল যেন।

অনেকগুলি চিঠি টাইপ ক'রে মিস মিত্র যখন দাঁড়ালেন আমার পাশে তখন আমি তাঁর দিকে না চেয়েই প্রশ্ন করলাম—'এখন বেশ ভালো আছেন তো'

'হ্যাঁ—'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে এই অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন তিনি। আমি চিঠিগুলি দেখে দেখে সই করতে লাগলাম। কয়েকটা সই ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মিস মিত্র নেই। তাঁর জায়গায় বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে আছে। শেষ চিঠিটা সই করবার পর দেখলাম সবশেষ চিঠিখানা খামের চিঠি, আমার নামে। টাইপ-করা চিঠিগুলো বেয়ারার হাতে দিয়ে আমার চিঠিটা খুললাম। শ্রীলতার চিঠি।

মান্যবরেষু,

আপনি আমার অসুখের সময় যা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই আমার। প্রখর গ্রীষ্মের পর বর্ষার ধারা-জলে স্নান ক'রে একবার ভারি তৃপ্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্য বর্ষাকে ধন্যবাদ জানাই নি। জানাবার কথা মনেও হয় নি। আপনাকেও জানাব না। প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য অকৃপণ অজস্রতায় চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, আপনাদের মতো লোকের উদার দাক্ষিণ্যও অনেকটা তেমনি। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোট করব না। তবু কিন্তু একটা কথা সসংকোচে বলছি। আমার অসুখের জন্য যে টাকাটা আপনি খরচ করেছেন সেটা আমি দিয়ে দেব। না দিলে আমার তৃপ্তি হবে না। আমার মাইনে থেকে প্রতিমাসে কিছু কিছু যদি কেটে নেন আমি অত্যন্ত খুশী হব। আধ্যাত্মিক ঋণ শোধ করা যায় না, কিন্তু আধিভৌতিক ঋণ যায়। যা শোধ করা যায় তা করাই উচিত। আপনি আশা করি আমার এ অনুরোধটি রক্ষা করবেন। আমার দাদা সম্প্রতি একটা চাকরি পেয়েছেন। মাসে মাসে কুড়ি টাকা ক'রে যদি আমার মাইনে থেকে কেটে নেন তাতে আমার অসুবিধা হবে না। আর যদি হতই তাহলেই বা কি। যা কর্তব্য তা তো করতে হবেই।

আপনি আমার অসুখের সময় একবার মাত্র গিয়েছিলেন। আর যান নি। আপনার এই না-যাওয়াটা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। ওর মধ্যেই আপনার মহত্ত্বকে, কবি দিগন্তের সুষ্ঠু মাত্রাবোধকে বার বার অনুভব করেছি এবং কৃতার্থ হয়েছি।

আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীলতা

চিঠিটার দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর টং ক'রে ঘণ্টা টিপলাম। বেয়ারা আসতেই বললাম, 'মিস মিত্রকে ডেকে দাও একবার।'

শ্রীলতা সসঙ্কোচে এসে দাঁড়াল।

'আপনি যা চেয়েছেন তাই হবে। কিন্তু আপনার চিকিৎসার জন্য ঠিক কত খরচ হয়েছে তা এখনও আমি জানি না। বিল এখনও আসে নি। ডাক্তার আমার বন্ধুলোক, সে বলেছে ফি নেবে না। ওষুধের জন্যে যা খরচ হয়েছে তা জানতে পারলে আপনার মাইনে থেকে কেটে নেওয়ার কথা ব'লে দেব। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে এর অন্য দিকটা আপনি দেখলেন না।'

'অন্য দিকটা মানে বুঝতে পারলাম না ঠিক'

'মানে আমার দিকটা। টাকাটাকেই বড় ক'রে দেখলেন আপনি। যদি দেখেন তাতে আপত্তি করবার অধিকার আমার নেই—যা বলবেন তাই করব। এতে আপনার চরিত্রের একটা বিশেষ রূপও ফুটে উঠেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে মানবিক একটা সম্পর্ক আবিষ্কারের যে পথ হঠাৎ পেয়েছিলাম সেটাকে আপনি দুর্গম ক'রে দিলেন। আমার আপিসের দুঃস্থ কর্মচারীদের সামান্য সাহায্য ক'রে আমি আনন্দ পাই, সে আনন্দ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করছেন'

'আমাদের আপিসে ব্রজবাবু আমার চেয়েও দুঃস্থ। ছ'মাস ধরে ভুগছেন। তাঁর জন্যে—'

অবাক হয়ে গেলাম। তুমিও এই কথা বলেছিলে আমাকে যদিও সেকথা ভাষায় উচ্চারিত হয় নি সেদিন। কিন্তু গোপনে সেটা সঞ্চারিত হয়েছিল মর্মে। ব্রজবাবুর ব্যবস্থা করেছি আমি।

শ্রীলতাকে বললাম, 'হ্যাঁ, তাঁর জন্যেও ব্যবস্থা করেছি বই কি। তিনি বিনা মাইনেতে ছুটি নিয়েছিলেন কারণ তাঁর ছুটি আর পাওনা ছিল না, আমি বলে দিয়েছি তিনি যতদিন অসুস্থ থাকবেন ততদিনের পুরো মাইনে পাবেন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছি। এর জন্যেও তাঁর কোনো খরচ করতে হবে না। আপনি আপত্তি করেছেন টাকা নিতে উনি করেন নি। উনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ লম্বা চিঠি লিখেছেন একটা। সেটাও অবশ্য খুব ভালো লাগে নি আমার। আপনি টাকাটার উপর জোর দিয়েছেন। হয়তো এইটেই আপনার বৈশিষ্ট্য, তাকে আমি অসম্মান করতে চাই না। কিন্তু বিশ্বাস করুন অন্যরকম হলে আমার ভালো লাগত'

মিস মিত্র দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর চলে গেলেন। পরদিন একটা কবিতা এল ডাকে।

> হিমালয়কে যখন প্রণাম করি
> তখন আশা করতে পারি না
> বাঙ্ময় হয়ে তিনি আশীর্বাদ করবেন।
> পাথরের দেবতারাও
> নির্বাক্ নিষ্পলক হয়ে থাকেন
> যখন আমরা তাদের প্রণাম করি।
> তাই প্রণামের পরিবর্তে কিছু পাব
> এ প্রত্যাশা আমি করি না।
> অসংখ্য প্রণামের ভিড়ে
> আমার প্রণাম হারিয়ে যাবে জানি

তবু প্রণাম করি
প্রণাম ক'রে যে তৃপ্তি হয়
সেইটেই আমার লাভ
এর বেশী কিছু চাই না
চাইলেও পাব না
যিনি প্রণম্য
তিনি অতিদূরবর্তী আকাশ-লগ্ন বিস্ময়।
নিজের মহিমার বিশালতাই
উত্তুঙ্গ করেছে তাঁকে।
নিয়ে গেছে তাঁকে নাগালের বাইরে।
মনে হয় তিনি যেন
মূক, বধির, অন্ধ নির্বিকার
তবু
তাঁর উদ্দেশেই
রেখে গেলাম আমার প্রণামটিকে
কোনো প্রত্যাশার বন্ধনে নিজেকে বন্দী না ক'রে।

চিঠির নিচে কোনো নাম নেই।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না কবিতাটি কে লিখেছে।

ফোনটা বেজে উঠল।

'শরাল হাঁস এসেছে চকদীঘিতে। শিকারে বেরুবে নাকি? যদি রাজী থাক এখুনি এস। আমি যাচ্ছি'

আমার শিকারী বন্ধু দাসু ফোন করেছে।

বললাম, 'ফোনটা ধরে থাক। দেখি এখন আমার বেরুনো চলবে কি না'

বড়বাবুকে ডাকলাম।

তিনি বললেন, 'না তেমন কোনো জরুরী কাজ নেই। কেউ যদি দেখা করতে আসে তাঁকে কাল আসতে বলব'

বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে গেলাম কাপড়চোপড় না বদলেই। বন্দুকটা নেবার জন্যেই বাড়ি যেতে হয়েছিল। মোটরগাড়ি বেশীদূর গেল না। সামনে একটা মাঠ ছিল। দাসু বলল, 'ও মাঠ দিয়ে গাড়ি চালানো নিরাপদ নয়। মনে হচ্ছে সব সবুজ, কিন্তু মাঝে মাঝে জল আছে, গর্তও আছে জলের তলায়। চল হেঁটেই যাই আমরা এখান থেকে। মাঠের ওপারেই চকদীঘি সেইখানেই হাঁস ও এসেছে'

মাঠের ধার দিয়ে দিয়েই চলতে লাগলাম দু'জনে, একটা সরু আলপথ বেয়ে।...

আমি মিস মিত্রের কবিতাটাই বিশ্লেষণ করছিলাম মনে মনে। মিস মিত্রের প্রণম্য লোকটি কে? আমি কি? সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলা নেই কোথাও, কিন্তু ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এর স্থূল অর্থটা কি? মাইনে থেকে ও চিকিৎসার খরচটা কাটিয়ে দিতে চায় কি না তা তো বোঝা যাচ্ছে না। কবিতাতে অবশ্য এসব কথা লেখা শক্ত। কিন্তু...আমার প্রতি মিস মিত্রের প্রকৃত মনোভাবটা কি তা জানবার জন্য সহসা আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে হল দুর্গম পাহাড়ের শিখরে যে বদ্ধদ্বার দুর্গটা

রয়েছে, সে দুর্গে বন্দিনী হয়ে আছে আমার অদেখা প্রিয়তমা আমি যেন তারই উদ্দেশ্যে চলেছি। মিস মিত্র···

হঠাৎ সুরটা কেটে গেল।

দাসু বলে উঠল, 'ডান দিকে—'

ডান দিকের রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যমনস্ক হয়ে।

দাসু আবার বললে, 'ঝোপগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলো। ঝোপের মধ্যে অনেক সময় সাপ থাকে। আমাকে একবার একটা কেউটে তাড়া করেছিল এখানে—'

রাস্তাটার চারদিকেই ঝোপঝাড়। একটা গাছও চিনি না। এক ধরনের গাছ দেখলাম অনেকগুলি রয়েছে। চমৎকার পাতাগুলি। বেশ বড় বড় পাতা, লাউয়ের পাতার মতো। পীতাভ সবুজ রং। বেশ ঢলঢলে চেহারা। এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে মিস মিত্র হারিয়ে গেলেন। তবু কেন জানি না মনে হতে লাগল এই ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালেই তিনি চলেছেন আমার সঙ্গে। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। মনে হল মিস মিত্রের কথা এত ভাবছি কেন? এ প্রশ্নটাও হারিয়ে গেল পরক্ষণে। তারপর মনে হল আমি আমাকেই যেন খুঁজে পাচ্ছি না। মিস মিত্রের কবিসত্তা আমার কবিসত্তার সঙ্গে মিলে যে মেঘলোকে উধাও হয়েছে, সেই মেঘলোকে আমি হারিয়ে গেছি। তারপরই টিটিভ ডেকে উঠল একটা। ডিড-হি-ডু-ইট—ডিড্-হি-ডু-ইট—ডিড-হি-ডু-ইট। আবার ফিরে পেলাম নিজেকে। দাসু আমার সামনে হনহন ক'রে চলেছে। আমি পিছিয়ে গেছি। হঠাৎ দেখলাম সেই চওড়া চওড়া সবুজ ঢলঢলে-পাতাওলা গাছগুলো ভিড় করেছে এক জায়গায়। মনে হল মিস মিত্রের সঙ্গে এদের মিল আছে। এদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যে সহজ শোভা উথলে পড়ছে সেই সহজ শোভা যেন অন্য রূপে উথলে উঠেছে মিস মিত্রকে ঘিরে। সে শোভা যৌবনের নয়, সে শোভা বাহুল্যহীনতার। অকারণে মনে হল এই মেঠো রাস্তায় মিস মিত্রই যেন ঝোপঝাড়ের ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখবে বলে—এরা সবাই ছদ্মবেশী মিস মিত্র। তারপর দেখতে পেলাম একটা গাছে ফুল ফুটেছে। অপরূপ ফুল। এরকম ফুল আগে দেখি নি। মনে হল গাছটা যেন আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে। আঙুলের ডগায় ঘন বেগুনী রং আর তার পেছনে একটু হলুদের ছোঁয়া। হলুদের ভিতরও কয়েকটি বিন্দু। বাকি ফুলটা শাদা। দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল মিস মিত্রই বুঝি একটা নতুন রকম কবিতা এনেছে আমার জন্য। হাত বাড়িয়ে ফুলটা তুলছি এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে শব্দ—ফোঁস। পরক্ষণেই দেখলাম উদ্যত-ফণা একটি গোক্ষুরে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ফণা নাবিয়ে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল—দেখলে তো। দাসু বলে নি। সে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তুমি বলেছিলে। হ্যাঁ, তুমি। যে তুমি অপ্রত্যাশিত, যে তুমি দুর্বোধ্য, যে তুমি রহস্যময়ী। রহস্যময়ী না রহস্যময়? তুমি নারী, না পুরুষ তা তো জানি না। তোমার সান্নিধ্য অনুভব করেছি বার বার, কিন্তু এ কথাটা জানি না। জানবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কি বলতে চাইছ তুমি? কোনো উত্তর পেলাম না।

···এক ফালি শাদা মেঘ ভেসে চলেছে। কিছু দূরে স্তর মেঘের স্তূপীকৃত হয়ে আছে যেন কার অপেক্ষায়। শাদা মেঘটা ভেসে চলেছে কোথায়। স্তর মেঘের স্তূপ কার অপেক্ষায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে? এই অকারণ প্রশ্নটা দুরূহ সমস্যার মতো কেন

জানি না আমাকে আকুল ক'রে তুলল। মনে হল এ সমস্যার সমাধান আছে, কিন্তু তা আমার নাগালের বাইরে। এক ঝলক হাওয়া এসে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গেল ঝোপঝাড়গুলোকে। মনে হল মিস মিত্রও বিচলিত হয়েছে এতে ···।

দাসু দেখলাম অনেক দূরে থেকে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাছে মানুষের গলার স্বর শুনে হাঁসগুলো উড়ে যায় তাই বোধহয় হাতছানি দিচ্ছে।

অনেকগুলো হাঁস পেয়েছিলাম। দাসু চারটে নিয়ে গেল। আমি নিতে চাইছিলাম না তবু দাসু জোর ক'রে দিয়ে দিল দুটো। বাড়ি ফিরে দেখি আমার 'কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড' চাকরটি জ্বরে শয্যাগত। হাঁস ছাড়িয়ে মাংস রান্না করা অসম্ভব তার পক্ষে। আর আমার অন্য যে বালক ভৃত্যটি আছে সে বড়জোর রুটি-মাখন-জ্যাম-জেলি ডিমসিদ্ধ 'চীজ্' দিয়ে আমার রাত্রের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু হংস-সমস্যা সমাধান করা তার সাধ্যাতীত। আমার ড্রাইভারটি মুসলমান। ছিমছাম ভদ্র চেহারা। খুব চালাক চতুর। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোনো ব্যবস্থা করতে পারে কি না। সে বললে, 'এক্ষুনি ক'রে দিচ্ছি।' বলেই বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই পাশের বাড়ি থেকে খুকু এসে হাজির।

'আপনি নাকি দুটো হাঁস শিকার ক'রে এনেছেন আপনার ড্রাইভার বললে। কই দেখি—'

'হাঁস গাড়িতেই আছে। কিন্তু ও দুটোকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সরোজের জ্বর হয়েছে। রাঁধবে কে? তুমি না হয় নিয়ে যাও ও দুটো'

'আমার বাড়িতে? মা আছেন যে। তিনি ওসব দেখলে আঁতকে উঠবেন। আমাদের বাড়িতে ওসব ঢোকেই না। আমি এখানেই রান্না ক'রে দিচ্ছি আপনাকে'

'ছাড়ানো কোটা নানা হাঙ্গামা। মসলাও পেশা নেই হয়তো—'

'হাঙ্গামা আবার কি। আপনার তো প্রেসার-কুকার আছে?'

'আছে'

'তাহলে তো ভাবনাই নেই। আমি গোটা মসলা দিয়ে স্ট্যু রান্না ক'রে দেব'

খুকু বেরিয়ে গেল।

আমার ঘরের সামনে যে ছোট বারান্দাটা আছে সেইখানেই সে এসে বসল মরা হাঁস দুটো নিয়ে। বালক ভৃত্যটি তার ফরমাশ খাটতে লাগল। বঁটি আনল, থালা আনল, জল আনল একটা গামলায় ক'রে। তারপর হাঁসের পালক ছাড়াতে লাগল। খুকুও সাহায্য করতে লাগল তাকে। আমি খুকুর দিকে চেয়ে ছিলাম—তার পুষ্পিত দেহটার দিকে। যৌবনের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম ক্রমশ। মনে হল অপূর্ব। এর পর খানিকক্ষণ কি ঘটেছে তা আমি জানি না। আমি যখন নিবিড়ভাবে মুগ্ধ হই তখন স্থান কাল লুপ্ত হয়ে যায় আমার চেতনা থেকে। আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাই।

···হঠাৎ একটা শব্দ হল। ফিরে পেলাম নিজেকে। দেখলাম খুকু একটা পালক-ছাড়ানো হাঁসকে কাটছে বঁটি দিয়ে। তার দু'হাতে রক্ত। যে হাত দিয়ে সে গীটার বাজায় সে হাত দুটো রক্তে মাখামাখি। কেন জানি না আমার মনে ভেসে এল ইতিহাসের এট্টিলা, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং, নাদির শাহ, ভেসে এল ইতিহাসের নরঘাতক দস্যুরা, ভেসে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপর সব ডুবে গেল রক্তের

সমুদ্রে। দেখলাম সে সমুদ্রে খুকু যেন ডুবুরীর মতো ডুবছে আর উঠছে। তারপরই দেখতে পেলাম আকাশ। নির্মল নীল আকাশ, নির্মেঘ জ্যোতির্ময়। কিন্তু সূর্য নেই। তবু একটা অদ্ভুত আলো ঝলমল করছে সে আকাশে। অদ্ভুত অপূর্ব বিস্ময়কর সে আলো। কিন্তু আমার মনে বিস্ময় জাগল না। আমি বুঝতে পারলাম তুমি হাসছ। ওটা তোমার হাসির আলো। ওই আকাশও তুমি। কিন্তু তোমাকে বুঝতে পারলাম না। আমার সমস্ত ভালো-লাগার পটভূমিকায় বারংবার তোমার এ আবির্ভাবের অর্থ কি? তুমি কি চাও না আমি কাউকে ভালোবাসি? কিন্তু তুমি কি জান না আমি চেষ্টা ক'রে দু'হাত বাড়িয়ে কাউকে চাই নি? কিন্তু ওরা যে রোদ্দের মতো, হাওয়ার মতো, বৃষ্টির মতো, শারদ প্রভাতের মাধুরীর মতো, ফুলের সুগন্ধের মতো এসে যায়, আপনিই এসে যায়, তখন ওদের অস্বীকার করব কি ক'রে? করবই বা কেন! তা করা যে অসম্ভব আমার পক্ষে। অসম্ভব তোমাকে অস্বীকার করাও। তুমি আছ তা আমি জানি। কিন্তু তুমি যে দুর্বোধ্য, তুমি যে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, তুমি যে ভাষায় কথা কও তা ইঙ্গিতের ভাষা, ইশারার ভাষা। আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু আমার বক্তব্য তোমাকে বোঝাতে পারি না। তোমাকে নিয়ে আমি কি করি, কি করি—'

শেষের কথাগুলো বোধহয় আমি উচ্চারণ ক'রে ফেলেছিলাম।

খুকু জবাব দিল—'পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না। শিকার ক'রে খুব ক্লান্ত হয়েছেন নিশ্চয়। শুয়ে পড়ুন কাপড় জামা ছেড়ে। রান্না হয়ে গেলে আমি ওঠাব আপনাকে। প্রেসার-কুকারে স্ট্যু রাঁধতে বেশী দেরি লাগবে না। লুচি খাবেন না ভাত?'

'লুচিই কর—'

'বেশ। ঘি ময়দা কোথায় আছে?'

বালক ভৃত্যটি বলল, 'আমি সব বার ক'রে দিচ্ছি।'

উঠে পাশের ঘরেই চলে গেলাম। কাপড় জামা ছেড়ে লুঙ্গি পরে শুয়ে রইলাম।··· ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি পড়ি নি সে কথা অবান্তর। আসল কথা আমি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। বিরাট একটা সোনার তরী হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ভাসছিলাম আলোর সমুদ্রে, যে আলো তোমার হাসির আলো। সে সমুদ্রের ওপারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল বন্দরও একটা। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল আরও অনেক সোনার তরী ভিড় করেছে সেখানে। তাদের প্রত্যেক মাস্তুলে রঙিন পতাকা উড়ছে। আমার মাস্তুলে কিন্তু পতাকা নেই। নেই কেন? ওই বন্দরে পৌঁছলে কি পতাকা পাওয়া যাবে?···

একটা শব্দ শুনে উঠে বসলাম। প্রেসার-কুকার থেকে স্টীম বেরুচ্ছে। রান্নার মনোরম গন্ধে চতুর্দিক ভরপুর।

এগার

পতাকা আমাকেও পেতে হবে এই জিদটা যেন পেয়ে বসল আমাকে। সেদিন তোমার হাসির আলোর সমুদ্রে সোনার তরী হয়ে ভেসেছিলাম, কিন্তু পতাকা পাই নি। দূরে আবছাভাবে যে বন্দরটা দেখা যাচ্ছিল সেখানেও সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলি সোনার তরী। প্রত্যেকের মাস্তুলে বহুবর্ণ বিচিত্র পতাকা উড়ছিল। বুঝতে পারলাম তোমার পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই ভিড়েছে ওই আবছা-বন্দরে আর তাদেরই তুমি পতাকা শিরোপা দিয়েছ। আমাকে দেবে না? কি সে এমন শক্ত পরীক্ষা যাতে আমি উত্তীর্ণ হতে পারব না? জীবনে কোনো পরীক্ষায় তো কখনও হারি নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো স্বর্ণপদক আছে আমার বাক্সে। তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ পরীক্ষার প্রশ্ন কি তা-ই তো জানা নেই। প্রশ্ন কি তা-ও আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। তুমি তো স্পষ্ট ক'রে কিছু বলবে না। তোমার দুর্বোধ্য ইঙ্গিতগুলোর জট ছাড়িয়ে প্রশ্নটা আমাকেই বার করতে হবে। তারপর উত্তর দিতে হবে।

আজ ছুটির দিন। নিজের বাড়ির খোলা বারান্দায় বসে আছি আকাশে কয়েকটা কালো মেঘ প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাদের বিশেষ কোনো সৌন্দর্য নেই, তবু তারা বেমানান নয়। মনে হল এইটেই বড় কথা। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো সাজসজ্জা নেই ওদের। কোনো রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত নয় ওরা। ওরা আকাশবিহারী মেঘ এইটুকুমাত্র ওদের পরিচয়, আর মনে হচ্ছে তাতেই যেন ওরা গর্বিত।

…নজরে পড়ল দূরের বাড়ির জানলাটা। রোজই পড়ে। রোজ তাতে শাদা পরদা টাঙানো থাকে। আজ দেখলাম পর্দাটা নীল হয়ে গেছে। উগ্র ধরনের নীল। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মনে হল সবাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। জীবনলীলার এইটেই যেন বড় টেকনিক। সবাই যেন বলছে—দেখ, দেখ, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। এই আত্ম-বিজ্ঞাপন বাজছে নানা সুরে, নানা ছন্দে, নানা গ্রামে। মনে হল যে আত্মগোপন করতে চায় তার স্থান কোথায়? ব্যর্থতার মরুভূমিতে? না, সার্থকতার সেই অতিউচ্চলোক যেখানে জনতার দৃষ্টি পৌঁছায় না? কালো কালো মেঘের টুকরোগুলির দিকে চাইলাম আবার। ওরা সন্ধ্যার মেঘ নয়। উষার মেঘ নয়, জ্যোৎস্নামণ্ডিত মেঘ নয়, ওরা নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ মেঘ। ওরা অনলঙ্কৃত, নিরহংকার, কিন্তু অসার্থক নয়। ওরাই হয়তো সন্ধ্যা-উষার স্পর্শ পাবে একদিন, মণ্ডিত হবে জ্যোৎস্নালোকে। মনে হল ওরা কি সোনার তরী হয়ে ভাসতে পারবে কোনোদিন তোমার হাসির আলোর সমুদ্রে, পৌঁছবে সেই আবছা-বন্দরে, পাবে কি পতাকার শিরোপা? এই অদ্ভুত কথাটা কেন মনে হল জানি না। আমার জিদটা কি নানা বাঁকা-চোরা পথে গিয়ে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি তোমার কাছ থেকে শিরোপা পাব সে পরীক্ষার প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা জানতে পারলে আমি তার উত্তর দেবই এবং ঠিক উত্তর দেব।

আমার বালক ভৃত্যটি প্রবেশ করল একখানি কার্ড হাতে ক'রে। কার্ডে নাম রয়েছে ওয়াই. জেড. গুপ্ত. (Y. Z. Gupta,)—এ আবার কে? এ নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ল না।

'কি চান ইনি ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বৈঠকখানায় বসিয়েছি'

একবার মনে হল বলি দেখা করব না। বেশ বসে আছি আপনমনে, কোথা থেকে এ উৎপাত এসে জুটল। কিন্তু সে কথা বলতে ভদ্রতায় বাধল। ওই অদ্ভুত নামটাও আকর্ষণ করতে লাগল আমাকে। উঠে পড়লাম শেষে।

বৈঠকখানায় বসে ছিলেন প্রচুর গোঁফ-দাড়িওলা লোকটি। মাথায় বাবরি চুল। ভুরুর চুলও বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া।

নমস্কারান্তে বললাম, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো'

বললাম বটে, কিন্তু মনে হতে লাগল ভদ্রলোকের মধ্যে কি যেন একটা আছে যা আমার সম্পূর্ণ অচেনা নয়। কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারলাম না।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন মেয়েলী গলায়।

'আপনি আমাকে চেনেন। পরিচয় পরে দিচ্ছি। কেন এলাম সেটা আগে বলছি। আসাম থেকে যেদিন কলকাতা রওনা হব সেদিন আপনার বান্ধবী তপতীর সঙ্গে দেখা হল সেখানে। কথায় কথায় আপনার কথা উঠে পড়ল। দেখলাম তিনি আপনার লেখার খুব ভক্ত। আমি বললাম, আমারও ওঁর লেখা খুব ভালো লাগে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ কখনও হয় নি। তপতী দেবী বললেন, আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন তো ? আমি আলাপ করবার সুযোগ দিচ্ছি। উনি আনারস খেতে খুব ভালোবাসেন। আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা আনারস দিচ্ছি। ওঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, আপনি আমার নাম ক'রে আনারসগুলো দিয়ে আসবেন ওঁর বাড়িতে। আর আলাপও ক'রে আসবেন। এই বাক্সে আনারস আছে।'

ছোট একটা কাঠের বাক্স নিচে রাখা ছিল। সেইটে দেখালেন। দেখলাম বাক্সটি খুবই ছোট। ক'টা আনারস পাঠিয়েছে তপতী। একটি নাকি।

সে কথা না বলে প্রশ্ন করলাম, 'আপনার সঙ্গে কোথাও আমার আলাপ হয়েছিল নাকি ?'

'হয়েছিল। কিন্তু সে কথা বললে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তাই তা আর বলব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার আসল আলাপ হয়েছে আপনার কবিতার ভিতর দিয়ে। আপনার লেখা এই লাইনগুলো প্রায়ই আবৃত্তি করি আমি।

> সত্য-শিব-সুন্দরই আমার উপাস্য দেবতা।
> এই আদর্শেই
> সৃজন করেছি আমার দেশমাতৃকাকে।
> তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক।
> এই প্রতীককে
> এই সত্য-শিব-সুন্দরকে
> যারা কলঙ্কিত করবে
> তারা আমার শত্রু।

তারা দুর্যোধনের দল
তাদের অনিবার্য বিনাশ যে পাণ্ডবদের হাতে
তারা আছে এবং থাকবে চিরকাল।
আমি তাদের দলে।'

আবেগভরে আবৃত্তি ক'রে গেলেন।

মনে পড়ল অনেকদিন আগে এ কবিতা লিখেছিলাম। আমার যে বইটাতে এ কবিতাটা ছাপা হয়েছিল সে বই বাজারে চলে নি, পোকায় কেটেছে। আমি যে এ কবিতা লিখেছিলাম তা-ও আমার মনে ছিল না। এতদিন পরে এ কবিতা একজন অচেনা লোকের কণ্ঠে শুনে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অভিভূতও হলাম একটু।

বললাম, 'আমার 'কয়েকটি মুহূর্ত' বইটা কি বাজারে আছে এখনও?'

'তা জানি না। আপনার ঐ কবিতাটি 'নদী' মাসিক পত্রিকায় প্রথমে পড়ি। তখনই আমি মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলাম'

অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল 'নদী' নামক অধুনা-লুপ্ত একটি পত্রিকায় কবিতাটা লিখেছিলাম বটে। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার 'কয়েকটি মুহূর্ত' বইটি আছে আমার। আপনার সব বইই আছে। অনেক কবিতা মুখস্থও আছে'

তারপর হঠাৎ খোলা জানলাটার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'আপনার বাথরুম'টা কোন দিকে?'

'এই যে পাশেই'

দেখিয়ে দিলাম দরজাটা। বাথরুমে ঢুকে গেলেন ভদ্রলোক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার সৌরভ গুপ্ত।

'এই যে দিগন্ত বাইরেই আছ দেখছি। তোমাকে একটা খবর দিয়ে যাই। আমরা খবর পেয়েছি তপতী কলকাতায় এসেছে। হয়তো তোমার কাছে আসবে। তুমি তো বলেছ তাকে ধরিয়ে দেবে না। তাই তোমার বাড়ির সামনে একজন কনস্টেবল রেখে যাচ্ছি। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে সে অ্যারেস্ট করবে তাকে। আমি চাই না যে সে তোমার বাড়িতে ধরা পড়ুক। পড়লে তুমি-সুদ্ধ জড়িয়ে পড়বে। তাই যদি ও আসে পত্রপাঠ বিদেয় ক'রে দিও।'

খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সৌরভ হেসে বললে, "তোমাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করছি। তুমিও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। অনর্থক রাজ-রোষে পড়বার মানে হয় না কোনো। অন্য কোনো অফিসারের দৃষ্টিতে যদি পড়ে যাও তাহলে তোমাকে চেষ্টা ক'রেও বাঁচাতে পারব না। কারণ চাকরিটাই আমাকে সর্বাগ্রে বাঁচাতে হবে'

'বস। কি খাবে—'

'এখন আর বসব না ভাই। আই. জি. ডেকে পাঠিয়েছেন সেখানেই যাচ্ছি। যাবার মুখে তোমাকে খবরটা দিয়ে গেলাম। চলি—'

সৌরভ চলে গেল। আমি আশা করতে লাগলাম সেই ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরুবেন। হয়তো আমার আরও দু'একটা কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাবেন আমাকে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, তিনি বাথরুম থেকে বেরুলেন না। কি হল? বাথরুমের দরজাটার দিকে চেয়ে দেখলুম। তারপর হঠাৎ সেটা হাওয়ায় খুলে গেল। উঠে

পড়লাম। দেখলাম বাথরুমের ভিতর কেউ নেই। বাথরুমটা বেশ বড় বাথরুম। ভিতরের দিকেও এর একটা দরজা আছে। সে দরজাটাও খোলা দেখলাম। কোথা গেলেন ভদ্রলোক? চাকরটাকে ডাকলাম। সে বলল, 'বাবু তো উপরে বসে আছেন'

'উপরে?'

'আপনি যেতে বলেন নি?'

'না'

'আমি ভাবলাম আপনি বলেছেন'

আশ্চর্য কাণ্ড। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে দেখলাম আমার শোবার ঘরে বিছানার উপর বসে আছেন তিনি। আমি উপরে যেতেই তিনি হেসে বললেন, 'কপাটটা বন্ধ ক'রে দিন'

'কপাটটা? কেন।'

'দিয়েই দেখুন না কি হয়'

দিলাম কপাট বন্ধ ক'রে।

সঙ্গে সঙ্গে যা হল তা অপ্রত্যাশিত। চুল দাড়ি গোঁফ ঝাঁকড়া ভুরু খুলে বেরিয়ে এল তপতী। সেই চোখে-মুখে হাসি। হেসে লুটিয়ে পড়ল একেবারে।

'কেমন ঠকিয়েছি। কিন্তু আর বেশীক্ষণ বসব না। পুলিস এসেছিল, না? এইবার পালাতে হবে। আপনার বাড়িতে খিড়কি দুয়ার আছে নিশ্চয়—'

'হ্যাঁ। সেটা দিয়ে কিন্তু পাশের গলিতে যাওয়া যায়। গলিটা অবশ্য সদর রাস্তায় পড়েছে'

'ওই দিক দিয়েই পালাব। সদর রাস্তায় আমার ট্যাক্সিটা 'ওয়েট' করছে। আর শুনুন, ওই বাক্সটায় আনারস নেই, আছে একটা রিভলভার। আপনি ওটা রাখুন। দরকার হলে ব্যবহার করবেন। আপনি আপনার কবিতায় বলেছিলেন আপনিও পাণ্ডবদের দলে। কিন্তু নিরস্ত্র পাণ্ডব তো কিছু করতে পারবে না, তাই আপনাকে একটা অস্ত্র দিয়ে গেলাম। ওই বাক্সে আর একটা জিনিস আছে। একটা খাতা। শ্রীলতার বাবার ডায়েরি। তিনি মরবার সময় ওটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আমি যেন ওটা ওকে দিয়ে আসি। কিন্তু এখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। শ্রীলতাকে চেনেন নিশ্চয়। আপনার আপিসেই কাজ করে। সে-ও কবিতা লেখে। আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

'শ্রীলতার বাবা মারা গেছেন নাকি।'

'হ্যাঁ, তাঁর যক্ষ্মা হয়েছিল। স্নেহময়ী দিদির কাছে থাকতেন তিনি। সেখানেই মারা গেছেন—'

'স্নেহময়ী দিদি কে? কোনো আত্মীয়?'

'না। রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁকে ভালোবাসতেন উনি, বিশ্বাস করতেন। স্নেহময়ী দিদি সে ভালোবাসার সে বিশ্বাসের মর্যাদা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। আপনি ডায়েরিটা যদি পড়েন সব জানতে পারবেন। আমি কিন্তু এবার যাব। এগুলো আবার পরে ফেলি'

তপতী জামার পকেট থেকে দাড়ি গোঁফ লাগাবার আঠা বার ক'রে আমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করল। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে চেয়ে আবার হাসল সে। মনে হল তার চোখ দুটো দেখেই তাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

'আপনার খিড়কি দরজা কোন্ দিকে?'

খিড়কি দরজা দিয়ে বার ক'রে দিলাম তাকে। তারপর সেই বাক্সটা নিয়ে এলাম বাইরের ঘর থেকে। তার ভিতর লোডেড্ রিভলভার আর একটা খাতা ছিল। আমার বন্দুক আছে, কিন্তু রিভলভার নেই। রিভলভার কেনবার প্রয়োজন অনুভব করি নি কোনোদিন। সত্যি সত্যি টেরারিস্ট হওয়ার কল্পনা করি নি কখনও। স্বপ্নলোকে কবিত্বের ইন্দ্রধনু তৈরি করেছি কেবল দিনের পর দিন। কথার পর কথা গেঁথে গেছি শুধু। কথাকে কার্যে পরিণত করবার কথা একবারও মনে হয় নি। ছাত্রজীবনে পরিচয় হয়েছিল কোয়ার সঙ্গে, শচীনের সঙ্গে। তাদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাদের নিয়ে কবিতা লিখেছিলাম, কিন্তু তাদের দলে যোগ দিতে পারি নি। বাপের একমাত্র ছেলে আমি, বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দুর্গম পথে যাওয়ার সত্যিকার প্রেরণা ছিল না আমার। বিলেতে গিয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি এনেছি, আমাদের ব্যবসার উন্নতির জন্য নামজাদা বিলিতী ফার্মে ট্রেনিং নিয়েছি। আমি শুধু শুধু বোমা পিস্তল নিয়ে লোক খুন ক'রে বেড়াব কেন? সত্যি কথা, কোয়া, আর শচীনকে নিয়ে যে দিগন্ত কবিতা লিখেছিল সে সৌখীন কবিমাত্র, বিলাসের স্রোতে সে ভেসে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ওদের কথা ভেবে লজ্জা হত, চক্ষুলজ্জা, কিন্তু সেটাও নিতান্ত সৌখীন লজ্জা, মানসিক বিলাস মাত্র।

...আজ তপতী লোডেড রিভলভার (loaded revolver) দিয়ে গেল। এর মর্যাদা রাখবার উৎসাহ কি আছে আমার? টেরারিজ্মের উপর আর বিশ্বাস আছে কি? দু'চারজন লোককে পিছনে থেকে লুকিয়ে হত্যা করলেই কি দেশের দুর্দশা ঘুচবে? সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে? বার বার তো এ প্রহসন হয়ে গেছে নানা দেশে...

আবার ছাতে গিয়ে খোলা বারান্দাটায় বসলাম। তুমি আবার বাঙ্ময় হয়ে উঠলে। মনে মনে স্পষ্ট যেন শুনতে পেলাম—'গীতায় বলেছে মা ফলেষু কদাচন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই তোমার কর্তব্য। তার ফল কি হবে এ নিয়ে ভাবছ কেন। ওরকম ভাবাটা তো ভীরুতারই নামান্তর।'

চুপ ক'রে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর চাইলাম আকাশের দিকে। দেখলাম কালো মেঘগুলি টুকরো টুকরো হয়ে অসংখ্য পালকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে। তাদের যা দেখেছিলাম তা আর তারা নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে।

আবার শুনতে পেলাম তোমার কণ্ঠস্বর। ওই পালক মেঘগুলোতেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল তোমার কথা।

'রূপ থেকে রূপান্তরই নিয়ম। তুমি বদলাবে। প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছ। তুমিও ভাবছ ভুল পথে যাবে? কোনো পথই ভুল পথ নয়। পরিবর্তন যেমন অনিবার্য বিপথে যাওয়াও তেমনি অসম্ভব। তোমার লালসা, কামনা, লোভ, হিংসা, তোমার উদারতা, তোমার কবিত্ব ওরা কেউ তোমার নয়। ওরা বাইরের ঢেউ, ওরাই অবশেষে তোমাকে নিয়ে যাবে সেই দেশে যে দেশে পরিচ্ছন্ন মানবতা অমর হয়ে আছে সভ্যতার অমরাবতীতে। যখন সে দেশে উত্তীর্ণ হবে তখন মিথ্যা হয়ে যাবে ওরা।

অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে, যেমন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় রেলের টিকিট আর রেলগাড়ি যখন যাত্রা শেষ হয়ে যায়। তখন যা জানবে তা চিরন্তন সত্য, কিন্তু সেটা এখন তোমাকে বোঝানো যাবে না, কারণ তা অবর্ণনীয়...'

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গোলমাল উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম রাস্তায় হই-হই চীৎকার করছে অনেক লোক।

'কি হয়েছে?'

'খুন হয়ে গেছে একজন'

'কে খুন করলে—'

'ট্যাক্সিতে চ'ড়ে একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক যাচ্ছিল, এক ভদ্রলোক হাত তুলে ট্যাক্সিটা থামাতে গেলেন। ট্যাক্সি থামল না, তখন খুব জোর হুইস্‌ল বাজালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ-দাড়িওলা লোকটা গুলি করলে তাঁকে, তারপর জোরে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড!'

আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটা। রক্তে ভিজে গেছে তার বুকের জামাটা। তখনই নিজের গাড়ি বার ক'রে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তাকে। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।

বাড়ি ফিরে এসে একটু পরে সৌরভের ফোন পেলাম।

'তোমার বাড়ির সামনে যে প্লেন ড্রেস-পরা কনস্টেবলটিকে রেখে এসেছিলাম তাকে একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক গুলি ক'রে মেরেছে। লোকটা নাকি ট্যাক্সিতে ছিল। তুমি কিছু জান?'

'আমি তখন ছাতের উপর ছিলাম। স্বচক্ষে কিছু দেখি নি। তবে লোকটিকে আমিই মোটরে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুকে গুলি লেগেছিল—'

'মিস্টার রায় কিন্তু তোমার পাড়া থেকে দু'জন সাক্ষী যোগাড় করেছেন। একজন বলছে লম্বা কোটপরা গোঁফ-দাড়িওলা একজন লোককে সে তোমার বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। আর একজন বলছে তোমার বাড়ির ঠিক পাশেই যে গলিটা আছে সেই গলি থেকে সে ঠিক ওইরকম একটা লোককে বেরুতে দেখেছে। ওরকম গোঁফ-দাড়িওলা লোক কি তোমার বাড়িতে এসেছিল কেউ?'

চুপ ক'রে রইলাম।

'হ্যালো—'

তাগাদা দিতে লাগল সৌরভ।

বললাম, 'আসাম থেকে একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক এসেছিলেন আমার কাছে আনারস নিয়ে। তাঁকেই হয়তো দেখে থাকবেন তোমাদের সাক্ষী'

'এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল?'

'না। আসামের একজন বন্ধু এঁর হাত দিয়ে আনারস পাঠিয়েছিলেন আমাকে'

'আসামের সে বন্ধুর ঠিকানা কি'

'তা-ও তো জানি না। চিনি না তাঁকে আমি। তিনি আমার লেখার একজন ভক্ত। সব ভক্তদের নাম ঠিকানা মনে রাখা কি সম্ভব'

'দেখ দিগন্ত এই কেসটার এনকোয়্যারির ভার পড়েছে মিস্টার রায়ের উপর। তিনি চৌকশ জাঁদরেল অফিসার। কারও খাতির করেন না। তোমাকেও করবেন না।

তুমি আমার কাছে যে সব জবাব দিলে তা তাঁর কাছে গ্রাহ্য হবে কিনা সন্দেহ আছে। তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যা বলবে তা যেন খোপে টেঁকে'

ফোন কেটে দিলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপরই খুকু এল হঠাৎ। হাতে একটা বাটি।

'আপনার বাড়ির সামনে খুন হয়ে গেছে নাকি!'

'হ্যাঁ। আমি লোকটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বাঁচল না। তোমার হাতে বাটি কেন?'

'মা আপনার জন্যে সুক্তো পাটিয়েছেন। সুক্তো ভালোবাসেন তো'

'বাসি বই কি'

'সেদিনকার স্ট্যুটা সত্যি ভালো লেগেছিল? না, আমার মন রাখার জন্যে বললেন'

'না, না, সত্যি খুব ভালো হয়েছিল। সেইদিনই বুঝেছি শুধু বাজনায় নয়, রান্নাতেও তুমি একজন বড় আর্টিস্ট। ইচ্ছে আছে একদিন ভালো 'মাটন্' এনে তোমাকে দিয়ে কোর্মা রান্না করাব। অবশ্য তুমি যদি রাজী থাক'

'বলছেন কি, আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। আমার নিজেরই খুব ইচ্ছে করে আপনাকে মাছ মাংস রেঁধে খাওয়াই, কিন্তু মা বিধবা, আমাদের বাড়িতে আমিষ ঢোকে না। আমিও অধিকাংশ দিনই নিরামিষ খাই। মাঝে মাঝে যখন মাছ মাংস খেতে ইচ্ছে হয় হোটেল থেকে আনিয়ে খাই, আলাদা একটা প্লেট আছে তাতেই খাই। 'হরিজন' প্লেটটা আলাদা একটা তাকে রাখা থাকে—'

খুকুর মুখে এমন একটি মিষ্টি হাসি ফুটল যার তুলনা দিই এমন উপমা আমার ভাণ্ডারে নেই।

'এটা আপনার চাকরকে দিয়ে আসি—'

বাটিটা নিয়ে চলে গেল খুকু। একটু পরেই ফিরে এল। বলল, 'একটা গজল তুলেছি গীটারে, শুনবেন?'

দেখলাম তার চোখে একটা সলজ্জ মিনতি ফুটে উঠেছে। গীটারে গজল বাজতে লাগল একটু পরে। খুকুর দিকেই চেয়ে ছিলাম মুগ্ধ হয়ে। হঠাৎ দেখি খুকুকে আড়াল ক'রে তপতী এসে দাঁড়িয়েছে। হাসছে আমার দিকে চেয়ে। তারপর তপতীকে আড়াল ক'রে এসে দাঁড়াল শ্রীলতা মিত্র, সসংকোচে আনতনেত্রে। তারপর তিনজনই মিলে মিশে রূপান্তরিত হল আর একটি অনবদ্য আবির্ভাবে। বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। একে তো কখনও দেখি নি। আলোর পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে কে ওই জ্যোতির্ময়ী? তুমি কি? কিন্তু তুমি যে অরূপা, অসীমা। সীমার সংকীর্ণতায় তুমি কি ধরা দিতে পার?

কি জানি!

বারো

তুমি যখন বার বার সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছ তখন তোমার একটা নামকরণ করা উচিত। ঠিক করেছি নাম রাখব রঙ্গিণী। যদিও তুমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে, একটা বিশেষ রূপের সীমায় তোমায় বাঁধা যাবে না, কিন্তু রঙ্গিণীকে যাবে, আমার কল্পনার নাগালের মধ্যে তাহলে তোমায় পাব খানিকটা। রঙ্গিণীই তো তুমি। আমার মাথার উপর মিস্টার রায়-রূপী বজ্র যখন উদ্যত হয়ে আছে তখনও তোমার রঙ্গ কমছে না। মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা বিরাট দাবানলের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছো। তোমার মুখে হাসি, চোখে আলো, সারা দেহে অপরূপ ছন্দ, যতির মধ্যে ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নেই, ভয়ের আভাস পর্যন্ত ফুটছে না মুখভাবে। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হচ্ছে তুমিই ওই দাবানল, তোমারই অন্তর-বহ্নি যেন শতশিখায় মূর্ত হয়েছে বাইরে। আমাকে তুমি কি কিছু বলতে চাইছ ইঙ্গিতে? তুমিও কি আমাকে অমনি হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছ আগুনে? কিন্তু মুশকিল হয়েছে আগন যে একাধিক। কোনটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি?···

···একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে কিন্তু এই মুহূর্তে। আমার ঘরের মেজের দিকে চেয়ে দেখছি একদল ছোট ছোট পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা মরা ভিমরুলকে। সৎকার করবে বলে নয়, খাবে বলে। ওটাও অবশ্য একটা সৎকার্য। আমার মনের নেপথ্যলোকে তুমি অগ্নিতে অবগাহন করছ আর আমার মনের প্রত্যক্ষলোকে রয়েছে ওই পিঁপড়েগুলো। ওরা আমাকেও যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতীত ইতিহাসের দিকে। আমরাও তো এককালে ওইরকম ছিলাম, জানোয়ারদের শব সংগ্রহ ক'রে বেড়াতাম আহারের জন্য। মনে হচ্ছে, এখন সভ্য হয়েছি এখন আর শব সংগ্রহ করি না, জীবন্ত জীব কেটে খাই। পেটের তাগিদে মানুষের গলায় ছুরি বসাতেও আপত্তি করি না। যাঁরা আবার সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন তাঁরা প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও অন্য রকম তাগিদের তাড়ায় সর্বদাই উত্তেজিত। মানের তাগিদ, প্রেমের তাগিদ, লোভের তাগিদ, মোহের তাগিদ, রাজনীতির তাগিদ, জাতীয়তার তাগিদ—আরও কতরকম তাগিদ। এইসব তাগিদের সংঘাতেই নাকি সভ্যতার বর্ণবৈচিত্র্য। এরই তাগিদে যুদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করছে। অ্যাটম-বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে, মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে, অন্যান্য গ্রহেও হয়তো যাবে, এইসব নিয়ে আবার হয়তো যুদ্ধ বাধবে, অন্তরীক্ষেও আমাদের রক্তধারা হয়তো রঞ্জিত করবে আমাদের সভ্যতাকে।

···সামান্য কয়েকটা পিঁপড়ের কাণ্ড দেখে মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতে এসে হাজির হলাম। তারপর মনে পড়ল তপতীর কথা। সে নাকি একটা ধূর্ত খয়েরখাঁ পাষণ্ড কালোবাজারীকে হত্যা করেছে। কিন্তু না তপতী যা করছে তা আমি সমর্থন করি না। হানাহানির পথে মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু তা ব'লে কি তপতীকে ধরিয়ে দিতে পারি? তা-ও পারি না। হাস্যমুখী তপতীর মুখটা বার বার ভেসে ওঠে মনে। যেন আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে—আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবেন

আপনি? দিন না। আপনি যদি দিতে পারেন আমিও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারি। দেখবেন, হাসতে হাসতে মরব।

···না, তপতীর কথা পুলিসকে বলব না। বলতে পারব না। ওর সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা আছে। কেন এ দুর্বলতা এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে হয়তো তাঁকে বলব এর জন্যে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই। কিন্তু নিজের কাছে এর একটা জবাবদিহি আছে। ফ্রয়েড বা ও'র সমগোত্র বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, আমি এ কথা মানব না যে ওর প্রতি আমার এই আকর্ষণ নির্জ্ঞান বা সজ্ঞান যৌন-লালসা। একটা আদর্শের জন্য ও প্রাণ তুচ্ছ ক'রে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এজন্য আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। এই শ্রদ্ধা যৌন-লালসারই একটা রূপ এ কথা আমি মানি না। একজন পাগল কেমিস্ট ছিল। সে বলত ভেবে দেখলে সব জিনিসই রসগোল্লা। রসগোল্লাতে কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট আছে, অন্য সব খাবারেও তাই আছে। সুতরাং সব খাবারই রসগোল্লার সমগোত্র। ভাতে গরম ঘি মেখে আলুভাতে দিয়ে খাওয়া রসগোল্লা খাওয়ারই রকমফের। পোলাও খাওয়াও তাই, লুচি মাংস খাওয়াও তাই—সব রসগোল্লা। বিজ্ঞানীরা সেক্সের মাপকাঠি দিয়ে অনেক জিনিস মাপতে গেছেন। তাঁদের বৈদগ্ধ্যকে আমি সম্মান করি, কিন্তু তবুও এ কথা আমি মানতে পারছি না তপতীর প্রতি আমার শ্রদ্ধার মূলে আছে নির্জ্ঞান যৌন-প্রবৃত্তি। ···তপতীকে বাঁচাব যেমন ক'রেই হোক। কিন্তু···ওকি, এ কি কাণ্ড করলে তুমি রঙ্গিণী। কোথায় গেল দাবানল। বিরাট সমুদ্রে ময়ূরপঙ্খী ভাসছে, ছাদের উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ দিগন্তের দিকে চেয়ে। আকাশ ঢেকে উড়ছে তোমার ইন্দ্রধনু রঙের ওড়নাখানা।

'আসতে পারি'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম খুকু দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল তার চোখের দৃষ্টিতে একটা রহস্যময় কিছু আভাসিত হচ্ছে যেন।

'এস। কি হল—'

গলা খাটো ক'রে বললে, 'আপনার বাড়ির সামনে সেদিন যে পুলিসের লোকটি খুন হয়ে গেল তার সম্বন্ধে এনকোয়্যারি করতে এসেছিলেন একজন পুলিসের অফিসার আমাদের বাড়িতে—'

'তোমাদের বাড়িতে? কি এনকোয়্যারি করলেন।'

'বললেন একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক নাকি খুন করেছিল ওই কনস্টেবলকে। অনেকেই নাকি তাকে দেখেছে। জানতে চাইছিলেন আমরা কোনো গোঁফ-দাড়িওলা লোককে এ পাড়ায় দেখেছি কি না সে সময়'

'ও। তুমি কি বললে—'

'বললাম দেখি নি'

তারপর মুচকি হেসে বললে, 'মিথ্যে কথা বললাম। লোকটা আপনার বাড়িতে যখন এসেছিল তখন তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আপনার বৈঠকখানার ঘরটা তো আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায়। আমি দেখেছিলাম তাকে। কিন্তু আপনি পাছে বিপদে পড়ে যান তাই কথাটা চেপে গেলাম। আপনার কথাও জিজ্ঞেস করছিলেন অনেক'

'আমার কথা ? কি জিজ্ঞেস করছিলেন ?'

'আপনি কেমন লোক, আমাদের সঙ্গে আলাপ আছে কি না, কি ধরনের লোক আপনার বাড়িতে আসে এই সব আর কি। আমি বললাম উনি আমার গুরু, ওঁর কাছে গীটার শিখি। অবাক হয়ে গেলেন! উনি আমার ব্যবসার কথা, কবিতার কথা, আপনার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানেন, কিন্তু আপনি যে গানবাজনায় একজন বড় শিল্পী এ কথা জানেন না। মিস্টার রায়েরও গানবাজনার দিকে খুব ঝোঁক। সেতার বাজান। বললেন আপনার বাজনা শুনতে আসবেন একদিন'

'ভদ্রলোকের নাম বুঝি মিস্টার রায় ?'

'হ্যাঁ। তারাসেবক রায়। আমরা অবশ্য ওঁকে মিনুদা বলি।'

'আত্মীয়তা আছে নাকি'

'না, আত্মীয়তা নেই। তবে—'

খুকু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'আমার বাবা আর ওঁর বাবা এক আপিসে কাজ করতেন। যখন রংপুরে আমরা ছিলাম খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। মনে হতে লাগল সৌরভ যে জাঁদরেল অফিসারটির খবর দিয়েছিল ইনি কি সেই ব্যক্তি ?

খুকু হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'পুলিসে যারা চাকরি করে তাদের আমরা খারাপ মনে করি কেন'

'ওটা একটা কুসংস্কার'

'তার মানে ওরা খারাপ নয় ?'

'সবাই খারাপ নয়। অনেক ভালো পুলিস অফিসারকে আমি চিনি। তাঁরা প্রকৃত ভদ্রলোক। আবার ভস্মমাখা গেরুয়াধারী সাধুদের মধ্যেও অনেক অসাধু লোক দেখেছি। এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন'

'না এমনি'

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কল্পনায় আঁকতে চেষ্টা করলাম মিস্টার রায়ের ছবি। ভালোই মনে হল। ফরসা রং, ছিপছিপে পাতলা, ভদ্র মার্জিত চেহারা। একটু যেন লাজুক প্রকৃতির। এসে যেন বললেন, 'নমস্কার। আমার কথা খুকু নিশ্চয় বলেছে আপনাকে। আপনি কবিতা লেখেন, ব্যবসা করেন এ সব কথা জানতুম, কিন্তু আপনি যে গানবাজনাতেও একজন বড় শিল্পী, এ কথা তো জানা ছিল না আমার'

কল্পনাতেই লোকটির উপর শ্রদ্ধা হল আমার। কল্পনাতেই কথাবার্তা কইতে লাগলাম তাঁর সঙ্গে। খুব ভালো লাগতে লাগল ভদ্রলোককে। আমার প্রশংসা করলেন বলেই কি ?

বললাম, 'বড় শিল্পী আমি নই। অ্যামেচার মাত্র। শখ আছে, চর্চা করি মাঝে মাঝে'

'খুকুর তো আপনার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা। সে বললে আপনি যদি নিজেকে বাজারে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করতেন তাহলে আপনাকে সুর-সম্রাট বলত সবাই'

হেসে বললাম, 'সম্রাটরা তো আজকাল বাতিল হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর খাতির

আজকাল সম্রাটের চেয়ে অনেক বেশী। সুর-প্রধানমন্ত্রী বা সুর-রাষ্ট্রপতি হয়তো চলবে দিন কতক পরে'

হেসে উঠলেন মিস্টার রায়।

বললেন, 'ওগুলো কিন্তু ভালো শোনাচ্ছে না—'

'সুর-সম্রাট বা সাহিত্য-সম্রাটই কি ভালো শোনায়? সম্রাটরা যে জগতের লোক শিল্পীরা সে জগতের নয়। ফুলের সঙ্গে আচার বা মোরব্বা জুড়ে দিলে কি শোভন হয় তা? সুরের জগতে, বস্তুতঃ, সব শিল্পের জগতেই, থাকেন স্রষ্টা আর রসিক। তাঁরা পরস্পরকে যা দিয়ে থাকেন রাজনীতির ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। শিল্পের জগতে adult franchise নেই, সেখানে রসিকের রায়কেই মানতে হবে। কিন্তু রসিকেরা স্বল্পসংখ্যক, সুতরাং শিল্পের জগতে স্রষ্টারা যাদের ভোট পান তারা 'মাইনরিটি'। কিন্তু তাদের ভোটই চরম এবং অকাট্য। অর্থাৎ রাজনীতির জগতে যা ঘটে ঠিক তার উলটো'

'ঠিকই বলেছেন আপনি!'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি গানবাজনার শখ আছে নাকি? ওইটেই আসল জিনিস। অবনী ঠাকুর বলেছেন, শখ থাকা চাই, শখের প্রেরণাতেই মানুষ আর্টিস্ট হয়ে ওঠে'

মিস্টার রায় বললেন, 'সেতার বাজাই। খুকু বলছিল আপনি নাকি খুব ভালো বাজান। সেতারে সে একদিন আপনার ভৈরবীর আলাপ শুনেছিল'

'কই মনে পড়ছে না তো'

যদিও কল্পনাতেই আলাপ চলছিল তবু ওই শেষের কথাগুলো জোরে উচ্চারণ ক'রে ফেললাম।

খুকু দাঁড়িয়েই ছিল।

সে বললে, 'কি মনে পড়ছে না,

'মনে পড়ছে না কবে তোমাকে সেতারে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়েছি'

'শোনান নি তো একদিনও। হঠাৎ এ কথা মনে হল যে এখন'

অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললাম—'শোনাব মনে করেছিলাম সেইটেই আমার মতিভ্রমে ওই চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল'

মুচকি হেসে খুকু চলে গেল। বলে গেল, 'মিনুদা শিগ্‌গিরই একদিন আসবেন আপনার কাছে'

রঙ্গিণী তুমি হাসছ? দেখতে পাচ্ছি তোমার হাসি ফুটে রয়েছে ওই দোপাটি ফুলগুলোতে। কিন্তু আমি ওর মধ্যে একটা বিদ্রূপও দেখতে পাচ্ছি যেন। হাসির ভাষায় যেন বলছ, 'তুমি নিজেকে বড্ড জড়িয়ে ফেলছ। হয়তো বন্দরে শেষ পর্যন্ত পেঁছিতে পারবে না।'

কিন্তু আমি জানি আমি পেঁছবই। তোমার পতাকাও উড়বে আমার নৌকোর মাস্তুলে।

তের

শামুক ভয় পেয়ে নিজেকে খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে এ উপমা দিতে ইচ্ছে করছে না। আরব্য উপন্যাসে পড়েছি এক দৈত্য নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পেরেছিল একটা কলসীর মধ্যে, এ উপমাও নয়। শ্রীলতাকে শামুক বা দৈত্য ভাবতে ইচ্ছে করছে না। বরং বলতে ইচ্ছে করছে একটা প্রস্ফুটিত ফুল আত্মগোপন করেছে কুঁড়ির মধ্যে, কিংবা আকাশব্যাপী জ্যোৎস্না নিজেকে সংহরণ করেছে যেন মেঘের স্তূপের আড়ালে, কিংবা একটা উড়ন্ত প্রজাপতি হঠাৎ যেন ফিরে গেছে তার রেশমের গুটির অন্তরালে।

হ্যাঁ, কেন জানি না, শ্রীলতা সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে আমার কাছ থেকে। চিঠি সই করাতেও আর আসে না, চাপরাসীর হাতে পাঠিয়ে দেয় চিঠিগুলো। সে টাইপিস্ট, টাইপ করাই তার কাজ, টাইপ-করা চিঠিগুলো যে তাকেই আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আমি যদি কিছু সংশোধন করি তাহলে সংশোধিত চিঠি আবার সে পাঠিয়ে দেয় চাপরাসীর হাত দিয়েই। নিজে আসে না। আসবার দরকার তো নেই। আমিও ডেকে পাঠাতে পারি না তাকে। লজ্জা করে, আত্মসম্মান বাধা দেয়। কিন্তু একটা জিনিস বুঝি। ধনুকের দুই প্রান্তকে যে রজ্জু বেঁধে রেখেছে তা যদিও অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নি। বরং মনে হয় টানটা বেড়েছে। আত্মবিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি। কেন এই টান? আমি টানছি, না ও টানছে? না, দুজনেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরকে টানছি? এই কি প্রেম? এরই পরিণাম কি বিবাহ? কিন্তু না, না, শ্রীলতাকে, আমার অফিসের টাইপিস্টকে আমি সহধর্মিণী করব এ কল্পনাও তো করি নি কোনো দিন, তাহলে এ কি কৌতূহল কেবল? শ্রীলতা আমার কাছাকাছি এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে কেন এই রহস্যটা কি, তাই জানাবার জন্যে কি আমার মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে? আমার প্রতি এই বিরূপতা কেন এইটুকু জানলেই কি আমি নিশ্চিন্ত হব? একটা কথা মনে হল। হয়তো টাকাকড়ির ছোঁয়াচ লেগেই এই নেপথ্যলীন মাধুর্যটুকু বিলীন হয়ে গেল। আমি যে ওর চিকিৎসার টাকাটা ওর কাছে নিচ্ছি না—বড়বাবুকে বলে দিয়েছি ওর মাইনে থেকে কিছু কাটতে হবে না—সেটা কি ও শুনেছে? ওকে কিন্তু বলেছিলাম ওর মাইনে থেকে টাকা কেটে নেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নি। ওষুধের দাম আড়াই শ' টাকা লেগেছে। মনে হল এই সামান্য টাকাটা—।

আত্মবিশ্লেষণ বন্ধ করতে হল। মনের মধ্যে যে মুখটা জেগে উঠল তা শ্রীলতার।

শান্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বলল, 'আমাকে ভিখারিনীর দলে ফেলে দিলেন কেন? আমি গরীব, কিন্তু ভিখারী নই। আপনার দান করবার মতো বাড়তি টাকা আছে, কিন্তু কারো দান নেবার মতো প্রবৃত্তি নেই যে আমার'

তখনই বড়বাবুকে ডেকে বললাম, 'মিস মিত্রের ইচ্ছে যে তাঁর মাইনে থেকে তাঁর চিকিৎসার খরচটা কেটে নেওয়া হোক। আড়াই শ' টাকা খরচ হয়েছিল। উনি যে মাসে যতটা কাটতে বলেন কেটে নেবেন'

বড়বাবু বললেন, 'এ মাসে উনি কুড়ি টাকা কম মাইনে নিয়েছেন। আমি যখন

বললাম সাহেব মাইনে কাটতে বারণ করেছেন তখন উনি চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, আপনি কুড়ি টাকা কমই দিন আমাকে। আমি সাহেবকে বলব। কিছু বলেন নি আপনাকে?'

'না, আসেন নি তো। বেশ কেটেই নেবেন'

বড়বাবু চলে গেলেন। মনে মনে ভারী লজ্জিত হয়ে পড়লাম আমি। তখনই মনে হল শ্রীলতা গরীব হতে পারে কিন্তু আসলে সে সম্রাজ্ঞী। দান গ্রহণ করে না অর্ঘ্য গ্রহণ করে। কিন্তু সে অর্ঘ্য দিতে আমি কি প্রস্তুত? সে দাবিও কি আছে আমার?···হঠাৎ আত্মস্থ হলাম। মনে হল আমার আপিসের টাইপিস্টকে সম্রাজ্ঞী মনে ক'রে তাকে অর্ঘ্য নিবেদন করবার কথা আমার মনে জাগছেই বা কেন!

তারপর তুমি এলে।

উত্তর পেয়ে গেলাম মেজের দিকে চেয়ে। দেখলাম একটা কাঁচপোকা প্রকাণ্ড একটা আরসোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হল, তোমারই ষড়যন্ত্র কি? তুমিই কি অলীক একটা মায়াছবি সৃজন ক'রে আমাকে বলে দিচ্ছ, সাবধান আরসোলার পর্যায়ে নেমে যেও না। তুমি মানুষ।

ইচ্ছে হল প্রশ্ন করি—মানুষের সংজ্ঞা কি? তার কি কোনো দুর্বলতা থাকবে না, কোথাও কারও কাছে অবনত হবে না সে? আত্মসম্মানের প্রস্তরবেদীর উপর প্রস্তরমূর্তির মতো চিরকাল মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলেই তার মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে? হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলোকে দলে পিষে মেরে ফেলাই কি হবে তার কৃতিত্ব?··· নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ঘণ্টাটা টিপলাম। চাপরাসী এল। ভেবেছিলাম তাকে বলব মিস মিত্রকে ডেকে দিতে। কিন্তু তা না বলে বললাম, 'আজকাল তোমরা কি ঘরদোর পরিষ্কার কর না? ঘরে আরসোলা এসেছে কেন?'

'কই আরসোলা?'

'মেজেতে'

ঝুঁকে দেখতে লাগল চাপরাসী।

'কই দেখতে পাচ্ছি না তো'

আমিও ঝুঁকে দেখলাম। কিন্তু আর দেখতে পেলাম না আরসোলা। কোথায় অন্তর্ধান করল সেটা! আবার মনে হল তোমার ষড়যন্ত্র নয় তো। কে তুমি! কেন তুমি এমনভাবে আসছ আমার কাছে রঙ্গিণী? কি চাও, কেন চাও···।

চাপরাসী চলে যাওয়ার পরই মিস মিত্র নিজেই এসে হাজির হলেন। হাতে খানকয়েক টাইপ-করা চিঠি। চিঠিগুলো দেখে সই ক'রে দিলাম। টাকাকড়ির কথা উল্লেখ না ক'রেই চলে গেলেন তিনি। মনে হল হেরে গেলাম।

ডাক এল। উপরেই দেখলাম খুব বড়-বড়-অক্ষরে-ঠিকানা-লেখা একটা খামের চিঠি রয়েছে। ঠিকানা বাংলায় লেখা। চিঠি খুলে আরও অবাক হয়ে গেলাম। ছেলেমানুষের মতো বড় বড় অক্ষরে কে যেন লিখেছে—'শতকোটি প্রণাম জানাই। আপনি জয়ী হয়েছেন। গর্বে আমার মন ভরে উঠেছে। কি আনন্দই যে হয়েছে

তা বলবার নয়। ইতি—' নিচে কোনো নাম নেই। মনে হল লেখাটা হয়তো বাঁ হাতের লেখা। তপতী কি?

এর পর আর এক আশ্চর্য কাণ্ড হল। চিঠির অক্ষরগুলোর উপর ভর ক'রে তুমি এলে আবার। বললে, 'হ্যাঁ, জয়ী তোমাকে হতে হবেই। তোমার জীবনে তিনটি ছায়া পড়েছে। ওরা যে ছায়াই, তার বেশী আর কিছু নয় এইটে প্রমাণ করতে হবে তোমাকে তোমার পৌরুষ দিয়ে। সে পৌরুষ নিষ্ঠুরতা নয়, অভদ্রতা নয়, অকোমল নয়, তা সৌজন্যপূর্ণ, তা শালীনতা-স্নিগ্ধ, কিন্তু তা নিজের গাম্ভীর্যে গৌরবময়, তা মহত্ত্বের মহিমায় উত্তুঙ্গ, তা শক্তির সামর্থ্যে অটুট। তা ক্ষণিক নয়, তা শাশ্বত…।'

এর পর যা ঘটল তা আমার কল্পনার কাণ্ড, না তোমার কাণ্ড বুঝতে পারলাম না।

তিনটে বড় বড় থামের মতো কি এসে মূর্ত হল আমার চোখের সামনে। ধোঁয়াটে রঙের তিনটে ডাকিনী যেন। প্রত্যেকেরই মাথায় এলোমেলো চুল, মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছে।

তুমি বললে, 'ওদের অস্বীকার করতে হবে। ওরা নানাভাবে বার বার আসবে। কিন্তু মনে রেখ আসলে ওরা ডাকিনী মোহিনী। তোমার দুর্বলতাকে বীণা ক'রে ওরা সুর বাজাবে। ওরা সাইরেন, শেষ পর্যন্ত তোমাকে শুয়োর বানিয়ে দেবে। তবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না, শুয়োর হতে চাও যদি—হও। আমি শুধু তোমাকে বলে দেব—পশুত্ব অনেক সময় কবিত্বর মুখোশ পরে আসে…'

আমি মানস-কর্ণে তোমার এ কথা শুনে ভাবলাম ছেলেবেলায় যে পশুপতি মাস্টারের কাছে পড়েছিলাম, যিনি সামান্য ভুল হলেও কান মলে দিতেন, যিনি অনেকদিন পূর্বে মারা গেছেন তাঁরই প্রেতাত্মা এসে আমার উপর ভর করল নাকি!

হঠাৎ একটা গিটকিরি-ভরা অপরূপ সুর যেন বলে উঠল—না—না—না—নারে—।

জানলা খুলে দেখি সামনের বাড়ির রেডিও কণ্ডাক্‌টার বাঁশের উপর বসে একটা দোয়েল। আকাশের পানে চেয়ে গান গাইছে।

চোদ্দ

আমি কি রকম যেন আচ্ছন্নের মতো বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল দূরে আকাশে কতকগুলো পর্বতশৃঙ্গ যেন খাড়া হয়ে আছে। আকাশকে বিঁধতে চাইছে।

…মিস্টার রায় এসেছিলেন। আগে যেমন তাঁকে কল্পনায় দেখেছিলাম, মোটেই সেইরকম নন। ভারিক্কী মুখের উপর একজোড়া প্রচণ্ড গুম্ফ, মোমের সাহায্যে প্রান্ত দুটি ঊর্ধ্বমুখী। মাথার সামনে দিকটায় ঈষৎ টাক। বেশ মজবুত বলিষ্ঠ চেহারা। খাকী পোশাক। হাবভাব জঙ্গী। হাতে একটি সরু বেত। সেটি বার বার নাড়াচ্ছেন। পায়ে মিলিটারি বুট। খুকু বলেছিল এঁর নাকি গানবাজনার দিকে

খুব ঝোঁক। এই চেহারার আড়ালে কি কোনো সংগীত-রসিক প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন? কে জানে!

নমস্কার ক'রে বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে অনেক খবর জেনেছি। কিন্তু আপনি যে গানবাজনার একজন বড় ওস্তাদ এ খবরটা জানতাম না। মিস চন্দ্রাননীর কাছে প্রথম শুনলাম। ও নাকি আপনার শিষ্যা। আমারও সামান্য ঝোঁক আছে ওদিকে। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। আগে কাজের কথাগুলো সেরে নি'

নির্নিমেষে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন আমার দিকে। লক্ষ্য করলাম চোখের তারা দুটো কালো নয়, নীলচে। একটা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান গুণ্ডাকে দেখেছিলাম একবার। তার চোখের তারার রংও এইরকম ছিল।

যদিও একটু ভয় ভয় করছিল তবু সপ্রতিভভাবে বললাম, 'কি কাজের কথা—'

'আমি পুলিসের লোক। অফিসিয়াল ডিউটিতেই এসেছি আপনার কাছে। সেদিন আপনার বাড়ির সামনে একটা প্লেন-ড্রেস-পরা কনস্টেবল খুন হয়ে গেছে। আপনিই তো তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সো গুড অব ইউ (So good of you)—এখন আমরা তার হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারেন কি?'

'আমি তো কাউকে খুন করতে দেখি নি।'

'একটা গোঁফ-দাড়িওলা লোকে তাকে খুন করেছে। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবে গোঁফ-দাড়িটা আসল না নকল জানি না আমরা। খুব সম্ভবত নকল। ওটা ছদ্মবেশ। যাই হোক, দু'একজন সাক্ষী বলছে একটা গোঁফ-দাড়িওলা লোক সেদিন নাকি আপনার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। আপনার বাড়ির পাশের গলিটা থেকে বেরুতে দেখেছে একজন। আপনি কি দেখেছিলেন ওরকম কোনো লোককে?'

বললাম, 'সেদিন একটি গোঁফ-দাড়িওলা লোক আমারই কাছে এসেছিল দুটি আনারস নিয়ে। আনারস পাঠিয়েছিল আমার একজন ভক্ত আসাম থেকে। আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখি—'

'হ্যাঁ, সে খবর তো জানি আমি। আমিও পড়েছি আপনার কবিতা। সিম্‌প্লি ওয়ান্‌ডারফুল—। কিন্তু আপনার সে ভক্তটির ঠিকানা কি'

'তাকে আমি চিনি না। তার ঠিকানাও জানি না। সেই গোঁফদাড়িওলা লোকটি বললেন, আমি কলকাতা আসছি শুনে তিনি আমার হাতে আনারস দুটি দিয়ে বললেন কবি দিগন্ত সেনকে দিয়ে দেবেন। আমি সে ভক্তকেও চিনি না, ওই গোঁফ-দাড়িওলা লোকটিকেও আগে কখনও দেখি নি। তিনি আনারস দিয়েই চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য খুনটা হল। আমি ছাতে ছিলাম। গোলমাল শুনে নিচে নেবে এলাম। একজন লোক বললে খুনীটা নাকি ট্যাক্সি ক'রে এসেছিল। ট্যাক্সি থেকেই তাকে গুলি করতে দেখেছে সে'

'হ্যাঁ, ট্যাক্সিটাকে 'ট্রেস' (trace) করবার চেষ্টা করছি আমরা। এখনও পারি নি। আচ্ছা, সেদিন যে লোকটি আনারস নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল তার গোঁফ-দাড়ি ছাড়া আরও কোনো বৈশিষ্ট্য কি আপনার চোখে পড়েছিল'

তপতীর চোখ দুটোর কথা মনে হল আমার। কিন্তু নিষ্কম্প কণ্ঠে বললাম 'না আর তো কিছু মনে পড়ছে না—'

'লোকটির হাইট (height) কি রকম মনে হয় আপনার'

খুব লম্বাও নয়, বেঁটেও নও, মাঝারি গোছের'

এই সময় একটা কাণ্ড হল।

আমার ঠিক সামনে টাঙানো ছিল আমার মায়ের ছবি। নামজাদা শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্র একখানা, অনেকদিন ছবিটার দিকে চেয়ে দেখি নি। আজ চোখ পড়ল ছবিটাতে। দেখে চমকে গেলাম। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। চোখের দৃষ্টি যেন জীবন্ত। সে দৃষ্টি যেন বলতে লাগল, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ভুলে গেছ তোমার বাবার সত্যনিষ্ঠার কথা। ভুলে গেছ সত্যকে আঁকড়ে ছিলেন বলে কত নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন? এই তো কয়েকদিন আগে তুমি সৌরভকে বলেছিলে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না। শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন হঠাৎ তপতী মেয়েটার মধ্যে কি এমন দেখলে যে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছ অনর্গল? বুঝতে পারছ না তোমার এ দুর্বলতা তোমার পৌরুষকে তোমার মনুষ্যত্বকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে? তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তোমার এ অধঃপতন আমি সইতে পারছি না…'

বুঝতে পারলাম মায়ের ভিতর তুমি এসেছ। আমার মা ভালোমানুষ লোক ছিলেন। আমাকে কখনও বকতেন না। তাঁর চোখের এরকম জ্বলন্ত দৃষ্টি কখনও দেখি নি। বুঝলাম তুমি এসেছ মায়ের চোখে।

তোমার কথার জবাব দিলাম আমি মনে মনে। 'তুমি যাকে দুর্বলতা বলছ অন্যদিক থেকে দেখলে বুঝতে পারবে সেটা দুর্বলতা নয়, শক্তি। তপতীকে বাঁচাবার জন্যে আমি যে চেষ্টা করছি সে চেষ্টারই মহৎ রূপ কি তুমি দেখ নি মা যখন আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে?'

মায়ের চোখের দৃষ্টি আরও জ্বলজ্বল ক'রে উঠল। সেই দৃষ্টিতেই শুনলাম তোমার উত্তর।

'সত্যি সত্যি যদি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সত্যি যদি প্রাণ তুচ্ছ ক'রে তপতীর দলে যোগ দিতে তাহলে বাহবা দিতাম তোমাকে। বলতাম—সাবাস। কিন্তু তুমি নিজে গা বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছ, যে নীতিকে তুমি সমর্থন কর না এখন সেই নীতিরই সপক্ষে দাঁড়িয়েছ ওই তপতী মেয়েটার সম্বন্ধে তোমার মোহসঞ্চার হয়েছে বলে, অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছ কাপুরুষের মতো—এটা শক্তি নয়। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র বীরত্ব বা মহত্ত্ব নেই'

মিস্টার রায়ের কণ্ঠস্বরে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম আবার।

'তাহলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াচ্ছে আপনি কোনো ক্লু (clue) দিতে পারছেন না। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি'

'বলুন'

'টেরারিজ্‌ম সম্বন্ধে আপনার সত্যিকার মত কি। আপনি ওটাকে ভালো মনে করেন, না, মন্দ মনে করেন। আপনি লেখক মানুষ আপনার মতামতটা মূল্যবান মনে করি'

এই বলে তিনি পকেট থেকে একটা খাতা বার ক'রে কি যেন লিখতে লাগলেন। আমি চুপ ক'রে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে মিস্টার রায় বললেন—'আপনার স্টেটমেন্টটা লিখে নিচ্ছি। লেখা হয়ে গেলে আপনি ওর নিচে সই ক'রে দেবেন। তাহলেই

আমার কাজ 'ফিনিশ'। তারপর আপনার বাজনা শোনবার ইচ্ছে আছে একটু। যদি দয়া ক'রে শোনান খুবই বাধিত হব। বাগেশ্রী শুনব আপনার কাছে। ওটার প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। টেরারিজ্‌ম সম্বন্ধে আপনার মতটা লিখে—'

মায়ের ছবিটার দিকে চাইলাম।

দেখলাম বিপুল প্রত্যাশায় তাঁর চোখ দুটো ভাষাময় হয়ে উঠেছে। কিসের প্রত্যাশা?··

বললাম, 'আগে বাগেশ্রীটা আপনাকে শুনিয়ে দিই। তারপর আমার স্টেটমেণ্ট দেব।'

'তার মানে?'

'মানেও পরে বলব। পাশের ঘরে চলুন। ওইখানেই আমার সংগীতচর্চা হয়। আপনি কিসে বাগেশ্রী শুনবেন? সেতারে, এস্রাজে, বেহালায় না গীটারে—'

'সবই বাজাতে পারেন আপনি?'

'একটু একটু পারি—'

'সেতারেই শোনান তাহলে। আমি সেতারই বাজাই'

'আসুন'

পাশের ঘরে গেলাম দুজনে।

আমি সাধারণত চোখ বুজে বাজাই। চোখ বুজেই বাজাচ্ছিলাম। কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম জানি না। বাজনা যখন শেষ করলাম তখন মনে হল সুরের অলকনন্দায় অবগাহন ক'রে উঠেছি। আমার দেহে বা মনে আর কোনো মলিনতা নেই। চোখ খুলে দেখলাম মিস্টার রায়ও চোখ বুজে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে, মনে হল তন্ময় হয়ে বসে আছেন। বাজনা শেষ হবার পরও কয়েক সেকেণ্ড বসে রইলেন। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'চমৎকার'। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন আমাকে।

'এ কি, এ কি করছেন—'

'মহান শিল্পীকে প্রণাম করলুম। তাছাড়া আপনি চন্দ্রাননীর গুরু। আমার প্রণম্য—'

'আমি কারো গুরু নই। কারো হতে চাই না, পারবও না। আপনিও বা লুব্ধ কিসে? আপনি তো শিল্পী। আমরা সবাই একই পথের যাত্রী, দরকার হলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি, এর জন্যে গুরু হবার দরকার কি—'

'আমি আসব কিন্তু মাঝে মাঝে। হয়তো দু'জনে একসঙ্গেই আসব'

'দু'জনে, মানে?'

'চন্দ্রাননীকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। চমৎকার মেয়েটি—'

'কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তারপর যন্ত্রচালিতবৎ বললাম, 'বাঃ শুনে খুব সুখী হলাম'

কয়েক মুহূর্ত আবার চুপচাপ।···আমার মনে হতে লাগল ঝড় উঠেছে। ঝড়ের

মাঝখানে বসে আছি। চারিদিকে ধুলো উড়ছে, গাছপালা ভেঙে যাচ্ছে, গাছের ভাঙা ডাল উড়ছে, ঘরের চাল উড়ছে, মনে হল একটা বিরাট স্তম্ভও যেন উড়ে যাচ্ছে। যে তিনটে ছায়াস্তম্ভ দেখেছিলাম তারই একটা কি? বিরাট একটা গাছের ধাক্কায় ভেঙে গেল সেটা। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার রায়।

'আপনি কি একটা স্টেটমেণ্ট দেবেন বলছিলেন। টেরারিজ্‌ম বিষয়ে—'

'আগেকার স্টেটমেণ্টটা কেটে দিন, ওতে অশুচি মনের মলিনতা লেগে আছে। সুরের স্রোতে অবগাহন ক'রে এখন নির্মল হয়েছি আমি। এখন যা বলব তা স্পষ্ট, তা সত্য'

'বলুন। তাই তো আমি চাই'

'আমার ঘরে সেদিন গোঁফ-দাড়িপরা যে লোকটি এসেছিল সে পুরুষ নয়, মেয়ে একটি। সে ছদ্মবেশে আমার কাছে এসেছিল আনারস দিতে না, একটি রিভলভার দিতে। সে-ই আপনাদের কনস্টেবলকে খুন করেছে কিনা জানি না। কিন্তু মেয়েটির নাম আমি জানি'

'কি নাম'

'তা আমি বলব না। সে আমাকে বিশ্বাস করেছে, আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পরব না। সে যে রিভলভারটা দিয়েছিল সেটাও আপনি নিয়ে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'নাম বলবেন না?'

'না। এর জন্যে যদি আমাকে অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে যান—'

'না না অ্যারেস্ট করব কেন। আমি শুধু একটি কথা জানতে চাই। একটি মেয়ের চিঠি আপনাকে দেখাচ্ছি—আপনি যদি বলেন এ মেয়ে সে মেয়ে নয় তাহলেই নিশ্চিন্ত হব আমি'

একটি চিঠি বার ক'রে দিলেন মিস্টার রায়। চিঠিতে আছে—

দাদা, এই তৃতীয়বার তোমাকে অনুরোধ করছি। ও চাকরি ছেড়ে দাও তুমি। তোমাকে ভালোবাসি তাই তোমাকে শত্রুপক্ষের শিবিরে দেখতে চাই না। আমার হাতে তোমার মৃত্যু হোক এটা আমার মোটেই কাম্য নয়। তুমি অন্য কোনো কাজ কর। আমি আর ফিরব না, ফিরতে চাই না, ফিরবার উপায়ও নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে আমি শেষ হয়ে যাব। এইটিই আমার সাধনা, কামনা সব। আমি কারো দলে নেই। আমি একক।। যা করি একাই করি। যে লোকটাকে মেরেছি, যার জন্যে তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ সে লোকটা যে কত পাষণ্ড ছিল তা তোমাদের অবিদিত নেই, কিন্তু তোমরা তাকে শাস্তি দাও নি, সম্মানের আসনে বসিয়ে সেলাম করেছ। আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। জানি এর জন্যে আমাকেও শাস্তি দেবে তোমরা একদিন, ব্যাধের হাত থেকে হরিণী বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারে না।. কিন্তু ব্যাধেদের দলে তুমিও থাকবে? আমাকে মারবার জন্যে যে সব ব্যাধরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও দু'একজনকে মেরেছি আত্মরক্ষা করবার জন্যে। আর একটা দুর্ধর্ষ কালোবাজারী আছে তাকে মেরে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব। তারপর হয়তো ফাঁসিকাঠে ঝুলব। আবার জন্মাব আমি, যুগে জন্মাব, যতক্ষণ না পৃথিবী

কলুষমুক্ত হয়। তোমাকে শুধু অনুরোধ, তুমি ও চাকরি ছেড়ে দাও। আমার প্রণাম নিও।

ইতি—তপতী।

'তপতী আপনার কে হয়'

'আমার নিজের ছোট বোন। বড্ড ভালোবাসি ওকে। ও আপনার কাছে আসে নি শুনলে নিশ্চিন্ত হব'

'ও আমার কাছে আসতে পারে এ ধারণা কি ক'রে হল আপনার'

'আপনাকে ভক্তি করে খুব। আপনার লেখা ওর কণ্ঠস্থ। লক্ষ্য করেছি আপনার লেখাতেও বিদ্রোহের সুর আছে। আপনি যে এককালে টেরারিস্টদের সঙ্গে ছিলেন সে খবর আমি আমাদের পুরোনো ফাইল থেকে উদ্ধার করেছি। কোয়া, শচীন আপনার বন্ধু ছিল। তাই মনে হচ্ছে তপতীও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচব আমি—'

'কেন বুঝতে পারছি না'

'এখনও পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে চলেছি। কেউ তার নাম করেনি কিন্তু আপনি যদি বলেন সে ছদ্মবেশে আপনার কাছে এসেছিল, এসে একটা রিভলভার দিয়ে গেছে তাহলে তাকে বাঁচাতে পারব না আর। কারণ সেটা আমাকে রেকর্ড করতে হবে'

'অন্য নাম রেকর্ড করতে পারেন না?'

'পারি। কিন্তু আমি জানি মিথ্যেকে শেষ পর্যন্ত চাপা দেওয়া যায় না। তাই আমি মিথ্যা কথা কখনও বলি না, মিথ্যা কথা রেকর্ড করতে চাই না। তাছাড়া আপনি একজন অনেস্ট লোক আপনি কি ওই মিথ্যা স্টেটমেন্টে সই করবেন? বিশ্বাস করুন আমিও অনেস্ট অফিসার। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু আপনি কি টেরারিজ্‌ম্‌ ভালো মনে করেন'

বললাম, 'দেখুন, মহৎ উদ্দেশ্যে যারা প্রাণ বিসর্জন দেয় তারা সবাই শ্রদ্ধেয়। ঝান্সীর রানী, কানাইলালকে শ্রদ্ধা করি, নরুর কুণ্ডুকেও করি। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন, ফাঁসিকাঠে উঠেছেন তাঁরা সবাই আমার কাছে নমস্য। কিন্তু সব জিনিসের যেমন আসল নকল আছে টেরারিস্টদের মধ্যেও তেমনি আছে। নকল টেরারিস্টরা—যারা বন্দুক চালিয়ে বোমা ফাটিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে—তারা ঘৃণ্য। আপনি যদি খাঁটি মানুষ হন তাহলে আপনারও এই মত হবে এটা আমি বিশ্বাস করি'

'আমার মত যাই হোক, আপাতত কিন্তু ভারী কষ্ট পাচ্ছি'

'কেন'

'বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি বলে। আমি বুঝতে পারছি আমার বোন তপতী টেরারিস্ট। তাকে আমার ধরবার চেষ্টা করাই উচিত, কিন্তু তাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করছি। করছি, কারণ তাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা বড়, না কর্তব্য বড়, তা আপনারা কবিরাই ভালো বলতে পারবেন। আমি সামান্য মানুষ, আমি ভালোবাসাকেই বড় স্থান দিয়েছি, এর জন্যে বিবেক দংশন করছে, কিন্তু তবু সুখ পাচ্ছি। আপনি দয়া ক'রে সাহায্য করুন আমাকে। আপনি বলুন তপতী আপনার কাছে আসে নি'

'আমি তো আগেই বলেছি এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না'

'একথা রেকর্ড করলে আপনাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে এবং আপনি যাতে নামটা বলেন তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। সেটা সুখকর হবে না মোটেই। আমি তা করতেও চাই না'

'আপনি যা খুশি করতে পারেন। কোনো নাম আমি বলব না।'

'দোহাই আপনার, একটু সাহায্য করুন আমাকে'

'আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না। আপনি বলছেন আপনি 'অনেস্ট' অফিসার। কিন্তু যা করেছেন তা কি 'অনেষ্টি'র নমুনা? দোষীকে বাঁচাবার চেষ্টা কি অসাধুতারই নামান্তর নয়?'

'আমি তো আগেই বলেছি ভালোবাসার চাপে আমি কর্তব্যচ্যুত হয়েছি। আপনার স্টেটমেন্টটা একটু বদলে দিন। 'বলুন, তপতী আপনার কাছে আসে নি—'

'মাপ করবেন। যা বলেছি তার বেশী আর কিছু বলব না'

হঠাৎ রূঢ়কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার রায়। 'বলুন, তপতী আপনার কাছে এসেছিল কি না'

পকেট থেকে বার করলেন একটা রিভলভার এবং সেটা উঁচিয়ে ধরলেন আমার দিকে।

বললাম, 'ভয় দেখাচ্ছেন? ভয় পাবার ছেলে আমি নই'

দড়াম ক'রে আওয়াজ হল।

আমার কিছু হল না, মিস্টার রায়ই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তপতী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে রিভলভার মুখে হাসি। হাসতে হাসতেই বললে, 'শেষ ক'রে দিলাম শয়তানটাকে। ও নিশ্চয় বলেছিল তপতী আমার আপনার লোক'

'বলেছিল তুমি ওর ছোট বোন'

'আর একজনের কাছে বলেছে আমি ওর স্ত্রী। আমি ওর কেউ নই'

'তোমার এই চিঠিটা দেখিয়েছিল আমাকে'

চিঠিটা সামনেই পড়েছিল, দিলাম তাকে।

পড়ে বললে, 'এ বানানো চিঠি'

'আমাকে বলেছিল আপনি বলুন তপতী আসে নি তাহলেই আপনাকে ছেড়ে দেব'

'তার মানে আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছিল আপনি তপতীকে চেনেন'

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রক্তে চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে। মেজেতে, বিছানার চাদরে, চতুর্দিকে রক্ত। তার মাঝখানে মিস্টার রায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।

'এটা নিয়ে কি করবেন এখন'

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম।

তপতী আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমি হঠাৎ উঠে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলাম।

'ও কি করলেন'

রাগ হল হঠাৎ। এ কি বিপদে ফেললে আমাকে মেয়েটা।

বললাম, 'আমি এখনি পুলিসে ফোন করব। তোমাকে ধরিয়ে দেব'

হোহো ক'রে হাসতে লাগল তপতী।

তারপর এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে।

'আপনার কাছে এইটেই প্রত্যাশা করেছিলাম। আপনি কবি, আপনি বিদ্রোহের গান গেয়েছেন। কিন্তু বিদ্রোহকে মূর্ত করতে হলে যে নোংরা কাজ করতে হয় তা আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আপনারা ইঞ্জিনিয়র, প্ল্যান ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু যে জনমজুরেরা আপনাদের প্ল্যানকে রূপ দেয় তাদের দলে আপনারা যেতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' পড়েই বুঝেছিলাম যে কবিরা যে কল্পলোকে বাস করেন তা নিখুঁত, সেখানে সত্য-শিব-সুন্দর ছাড়া আর কিছু নেই। আমি কবি নই, কিন্তু আমি জানি সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরকে ধ্বংস করতে হয়। আপনাদের মতে সেটা নোংরামি, সেটা জঘন্য নিষ্ঠুরতা। এর জন্যে যে নির্মম নির্দয় ক্ষাত্রবীর্য থাকা দরকার তা আপনাদের নেই। কারণ আপনারা স্বভাবতই ব্রাহ্মণ। শুদ্ধ, শুচি, পবিত্র। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষাত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বলে ব্রাহ্মণ-সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে আছেন। আপনি পুলিসে খবর দিন আমি আপত্তি করব না। আমার রিভলভারে আরও গুলি আছে'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? ভেবেছ যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ সেই হেতু আমি ভীতু?'

তপতী এগিয়ে এসে আমার রিভলভারটা আমার পায়ের কাছে রেখে দিলে।

'আপনাকে গুলি করব এ কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমার অনুরোধ আপনি আমায় শাস্তি দিন। পুলিসের অত্যাচার সহ্য ক'রে ফাঁসিকাঠে ঝুলে সামান্য খুনীর মতো মরতে চাই না। আপনি আমার বিচার করেছেন আপনি আমাকে শাস্তি দিন। সে আমার সুখমৃত্যু হবে। আমি বুক পেতে দাঁড়াচ্ছি—'

'আমি বিচারক নই, জল্লাদও নই। তুমি আইন ভঙ্গ করেছ, আইনই তোমাকে শাস্তি দেবে। আমার কোনো অধিকার নেই তোমাকে শাস্তি দেবার'

টিক টিক টিক টিক ক'রে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল কি? আমার মনে হল তুমিই যেন বলে উঠলে ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক।

এরপর তপতী যা করল তা নাটকীয়। বললে, 'একটা কথা কেবল বলুন। আপনি আমাকে সামান্য খুনী মনে করেন কি? সত্যি কথা বলুন। সত্যি কথাটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। সাধারণ খুনীকে যেমন ঘৃণা করেন আমাকেও কি তেমনি ঘৃণা করেন?'

'না তপতী, তোমাকে আমি ঘৃণা করি না শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু আমাকে পুলিসে খবর দিতে হবে, তা না হলে আমার বিবেক আমাকে রেহাই দেবে না।'

'আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন এ শুনে আমি চরিতার্থ হয়ে গেছি। আমার হৃদয়ে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কিন্তু আমি পুলিসকে ধরা দেব না। চললাম—'

সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলভারটা তুলে নিলে আমার পায়ের কাছ থেকে। নলটা নিজের মুখে পুরে টিপে দিল ট্রিগারটা। দড়াম ক'রে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল আমার সামনে। দড়াম দড়াম ক'রে চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগল। পুলিস ফোর্স এসেছে। মিস্টার রায় তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমি মরি নি'—বলেই আমার দিকে তাক ক'রে রিভলভার তুললেন।

'করুন গুলি আমি ভয় পাই না'

ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক বলে উঠল টিকটিকিটা।

দড়াম ক'রে শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিবা-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। নিবিষ্টচিত্তে মিস্টার রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে যে স্বপ্নলোক সৃজন করেছিলাম তাতেই উপরোক্ত ঘটনাগুলো ঘটে গেল পর পর। আশ্চর্য! স্বপ্নকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা কি সম্ভব? কিন্তু করলাম তো।

চারদিকে চেয়ে দেখলাম। মায়ের ছবিটাকে দেখতে পেলাম শুধু। আর কিছু নেই। তারপর দেখলাম টিকটিকিটা মায়ের ছবির পিছন থেকে সন্তর্পণে মুখ বাড়াচ্ছে।

টিক টিক টিক—আবার ডেকে উঠল সে। আবার লুকিয়ে পড়ল ছবির পিছনে। তারপর তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'যা দেখলে তা স্বপ্ন নয়, সত্য। ওগুলো তোমার অবচেতনলোকের নোংরামি, ভয় আর আশা-আকাঙ্ক্ষা। ওর মধ্যে তোমার মহত্ত্বের নমুনাও আছে একটু। কিন্তু সবটা মিলিয়ে একটা জগা-খিচুড়ি। কিন্তু মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, সত্য। তুমি আত্মদর্শন করেছ'

উঠে জানলাটা খুলে দিলাম। দেখলাম চাঁপাগাছে একটি ফুল ফুটেছে।

হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

পনের

হাজারিবাগে চলে এসেছি। কলকাতা আর ভালো লাগছিল না। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে চমৎকার ভালো বাড়িটি পেয়েছি। বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান। মালীটি আমার খুব অনুগত হয়ে উঠেছে। বলেছে ভালো ভালো কয়েকটা গোলাপের কলম আমাকে ক'রে দেবে। তাছাড়া পুরোনো চাকর ভোজুকে পেয়েছি।

তপতী যে খাতাখানা আমাকে দিয়ে গিয়েছিল সেইটে বার ক'রে পড়ছি। টেবিলের উপর মাথার কাছে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে। খাতাটা নিয়ে যখন বসেছিলাম তুমি তখন আপত্তি করেছিলে একটু। বলেছিলে, শ্রীলতার বাবার ডায়েরি খুলে বসলে কেন! পরের ডায়েরি কি পড়া উচিত? তোমার কথা শুনেও শুনি নি। তোমার চোখের প্রখর দৃষ্টি যে আমার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে তা অবশ্য অনুভব করছিলাম। পড়ছিলাম তবুও। তোমার কথা যে শুনি নি এতে মনে মনে ভারি আনন্দ অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল বুঝি মুক্তি পেলাম। মুক্তি কিন্তু পাই নি, পরে সেটা বোঝা গেল। মুক্তি বোধহয় চাইও না।

শ্রীলতার বাবার হাতের লেখা ভালো নয়। খাতাটিও জরাজীর্ণ। এটা ঠিক ডায়েরিও নয়। এলোমেলোভাবে জীবনের নানা ঘটনা লিখেছেন। পড়তে মন্দ লাগছে না।

রাস্তার ধারে লোমওলা কুকুর ধুঁকছে একটা। আমি কিছু ছাতু কিনেছিলাম। ছাতু আর গুড়। তাই খাচ্ছিলাম রাস্তার ফুটপাথে বসে বসে। ছাতুর চেয়ে ভালো কিছু জোটে নি সেদিন। জোটাতে পারি নি। কাল অনাহারেই কেটেছে। আজ মোট বয়ে আনা চারেক রোজগার করেছি। কুকুরটার দিকে চেয়ে মনে হল ও বেচারাও বোধহয় অনাহারে আছে, ওকেও একটু দিই। একটা ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। আশ্চর্য কাণ্ড। কুকুরটা ঘেউঘেউ ক'রে তেড়ে এল আমার দিকে। ভাবটা, আমাকে খাবার ভিক্ষে দিচ্ছ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। ছাতুর ডেলাটার দিকে ফিরে চাইলও না। চলে গেল গটগট ক'রে। এরকম আভিজাত্য মানুষের মধ্যেও দেখি নি। মানুষমাত্রেই তো দু'হাত পেতে দেহি দেহি করছে। বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা বেশ মানী লোক ছিলেন। দোর্দণ্ড প্রতাপও ছিল তাঁর। দুলাল মিত্তিরকে সবাই চিনত, সবাই ভয় করত। তেজারতি কারবার ছিল, জমিদারিও ছিল। সাহেবসুবোরাও খাতির করতেন তাঁকে। রায়বাহাদুর খেতাব পাব পাব ক'রেও পান নি। এহেন লোককেও ভিক্ষা করতে দেখেছি আমি। আমাদের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হত। সেই দুর্গোৎসব উপলক্ষে যাত্রা হত, বাঈনাচ হত, ভাগবত পাঠ হত। সে সময় বড় বড় অফিসারদের নিমন্ত্রণ করতেন বাবা। সেবার বাবা লক্ষ্য করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর নিমন্ত্রণে আসেন নি। বাবা নিজের জুড়িগাড়ি ক'রে গেলেন তাঁর বাড়িতে। আমিও ছিলাম বাবার সঙ্গে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে গাড়ি দাঁড়াল, বাবা নেমে গেলেন। আমি গাড়িতে বসে রইলাম। গাড়িতে বসেই সব দেখতে পাচ্ছিলাম। সাহেব বেরিয়ে আসতেই বাবা খুব ঝুঁকে সেলাম ক'রে কি যেন বলতে লাগলেন আমি শুনতে পাই নি। মনে হল বাবা ওঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা করছেন। সাহেব পাঁচ মিনিটের জন্য এসেছিলেন।

বাবার কাছে আমি থাকতে পারি নি। প্রথমেই একটা কথা লেখা উচিত, আমি স্বাধীনচেতা লোক। বাবার হুকুম বর্ণে বর্ণে না মানলে তাঁর বাড়িতে থাকা অসম্ভব দেখে খুব ছেলেবেলায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে ছিলাম আমি। আর ফিরি নি। মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। বাবা রক্ষিতা রেখেছিলেন একটি। আমাকে ফিরবার জন্য অনুরোধ ক'রে কয়েক সপ্তাহ কাগজে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দু'একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখেও পড়েছিল। কিন্তু ফিরে যাওয়ার প্রবৃত্তি হয় নি। তারপর থেকে নানা জায়গায় ঘুরেছি। নানা জায়গায়। যখন পালিয়েছিলাম তখন আমার বয়স বারো। চেহারাটা যতদিন ভদ্র ছিল ততদিন অসুবিধা হয়েছিল। কাজ জুটত না। প্রথম প্রথম ভিক্ষেও করতে পারতাম না। লজ্জা করত। একটা ধর্মশালায় ছিলাম কয়েকদিন। সেখানে দেখা হল নরেশবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন —আমার একজন চাকরের দরকার। তিনি পশ্চিমের একটা শহরে থাকতেন। শহরের নামটা আর লিখব না। তাঁর সঙ্গে গেলাম সেই শহরে। সেখানে থাকলাম কিছুদিন তাঁর কাছে। কিন্তু বেশী দিন থাকতে পারলাম না। লোকটি ব্যবসাদার। ধনী লোক। কিন্তু ভারী অহঙ্কারী আর রাগী। বউ বাঁজা। মোটা থসথসে কালো চেহারা। নাকে একটা নথ। বউটার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করতেন নরেশবাবু। যা মুখে আসত তাই বলে গাল দিতেন। হারামজাদী, খচ্চরি, লক্ষ্মীছাড়ী, আবাগী— এই সব। একদিন দেখলাম চাবুক দিয়ে মারছেন। আমি আর সহ্য করতে পারলাম

না, রুখে দাঁড়ালাম। চাবুকটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলাম। বললাম, আপনি পাষণ্ড, আপনার বাড়িতে আমি চাকরি করব না। নরেশবাবু জুতো ছুঁড়ে মারলেন আমাকে। জুতোটা কিন্তু আমাকে লাগল না। আমি বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। তিনিও একটু পরে দোকানে বেরিয়ে গেলেন। আমি বাড়ির আশে-পাশেই ঘুর ঘুর করছিলাম। গিন্নীমা আমাকে ডেকে খেতে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি বাবা আমার একটা উপকার করবে? বললাম, বলুন কি করতে হবে। তিনি তখন বললেন, 'আমি আর এখানে থাকতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে আমার বাপের বাড়ি পৌঁছে দাও। মোকামায় আমার দাদা রেলে কাজ করেন, সেইখানে পৌঁছে দাও আমাকে। বললাম, বেশ চলুন। গিন্নীমা এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়লেন আমার সঙ্গে। তাঁকে তাঁর দাদা কাছে মোকামাতে পৌঁছে দিলাম। তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন। তারপর বললেন, তুমি বাঁশজোড়া যাবে? সেখানে আমার দিদি থাকেন, আমার ভগ্নীপতি সেখানে ডাক্তার। দিদি খুব ভালো লোক, জামাইবাবুও। তিনি এখানে চিঠি লিখেছেন একটা ভালো চাকর যোগাড় ক'রে পাঠাতে। তুমি তাঁদের কাছে থাক না গিয়ে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি একটা। তিনি একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন।

'আমাকে কি খুব বিশ্বাসী মনে করেন'—এ কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি মুচকি হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'করি'।

বিজয়াদি ধমকে উঠলেন—'সবটা খেয়ে ফেললি, স্নেহের জন্যে রাখলি না একটুও! কি রাক্কোস রে তুই। বঁটি দিয়ে আধখানা কেটে নিলেই হত'

মুখ গোঁজ ক'রে রইলাম। ইচ্ছে ক'রে রাখি নি। রোজই আমার খাবার থেকে খানিকটা রেখে দিতাম স্নেহময়ীর জন্য। কিন্তু কাল শুনলাম বাবু আড়ালে বিজয়াদিকে বলছেন, 'ছোকরাটা খলিফা মনে হচ্ছে। স্নেহের সঙ্গে জমাবার চেষ্টায় আছে। একটু নজর রেখ'

বিজয়াদি হেসে জবাব দিলেন, 'জমাক না। স্নেহকে আমরা তো কেউ ভালোবাসি না। দায় বলে মনে করি। ও যদি একটু ভালোবাসে বাসুক—'

'বেশ বাসুক। কিন্তু ঝামেলা আমি পোয়াতে পারব না শেষে যদি কিছু হয়—'

কর্তা বেরিয়ে গেলেন।

স্নেহময়ী এদের গলগ্রহ। বিজয়াদি ওকে খেতে পরতে দিতেন, গালমন্দও দিতেন যথেষ্ট। প্রায়ই বলতেন, 'বানে সবাই ভেসে গেল, তুই কেন বেঁচে রইলি মুখপুড়ি'

মুখপুড়ি কিছুই বলত না, পাশগাদায় বসে একমনে বাসন মাজত মাথা হেঁট ক'রে। স্নেহময়ী বিজয়াদির বাপের বাড়ির আত্মীয়। আত্মীয়তাটাও বিশুদ্ধ নয়। ওর বিধবা কাকীর জারজ মেয়ে স্নেহময়ী। বিজয়াদির বাবা বিপত্নীক ছিলেন। তিনি ভ্রষ্টা কাকীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন নি। কাকীই কর্ত্রী ছিলেন বিজয়াদির বাপের বাড়িতে। স্নেহময়ীকে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছিলেন বিজয়াদির বাবা। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন কিছু। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক মোটামুটি জানত। বিজয়াদির বাবা বেঁচে থাকলে স্নেহময়ীর চেহারা হয়তো অন্যরকম হত। কিন্তু দামোদরের প্রবল বানে তিনি ভেসে গেলেন। বাড়িসুদ্ধ সবাই ভেসে গেল, রইল শুধু

স্নেহ। বিজয়াদি খবর পেয়ে নিয়ে এলেন তাকে। পেটভাতায় ভালো ঝি পেয়ে গেলেন একটা। স্নেহময়ীর বয়স তখন দশ বছর। কিন্তু দেখলাম সমস্ত সংসারের ভারটা ওই সামলায়। বিজয়াদির ছেলে খোকনকে পর্যন্ত। খোকনটা এমন বিরক্ত করত তাকে। চুল ধরে টানত, খামচে দিত, কামড়ে দিত। আদুরে জেদী ছেলে। সব হাসিমুখে সহ্য করত স্নেহময়ী…।

যখন খবরের কাগজ ফেরি করতাম তখন আলাপ হয়েছিল ওকূলুর সঙ্গে। সে-ও ফেরিওলা ছিল। আপেল ফেরি করত। দমদমে একটা ছোট ঘর ভাড়া ক'রে থাকত সে। আমাকেও আশ্রয় দিয়েছিল সেখানে। বলেছিল তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না, তুমি আমার ছেলেটাকে দেখো। আমি তো সমস্ত দিন বাড়িতে থাকি না। ছেলেটা সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। কোন্ দিন হয়তো মোটর চাপা পড়ে যাবে, কিংবা হারিয়ে যাবে। তোমার কাজ তো দশটা এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তুমি তারপর যদি ওর একটু দেখাশোনা কর, নিশ্চিন্ত হই। রাজী হয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু পরে দেখলাম ওকূলুর ছেলে শুকুলকে দেখাশোনা করা আমার সাধ্যাতীত। সাত আট বছরের ছেলে। দুষ্টু নয় মোটেই। কিন্তু মহা খামখেয়ালী আর ভবঘুরে। যেন আমারই দ্বিতীয় সংস্করণ! রোজই বাড়ি ফিরে দেখতুম শুকুল বাড়ি নেই। তখন তাকে খুঁজতে বেরুতে হত। একদিন দেখি একটা টিনের টুকরোয় দড়ি বেঁধে সেটা নিয়ে ছুটছে আর হেঁচকা টান দিচ্ছে। বললাম, 'কি করছিস তুই?' হেসে বললে, 'ওটাকে ঘুড়ি করেছি। কিন্তু কিছুতেই উড়ছে না—'

'টিনের ঘুড়ি কখনও ওড়ে?'

'ওড়ে না? কেন!'

'কেন জানি না। চল বাড়ি চল। খিদে পায় নি?'

'পেয়েছিল। ও বাড়ির মা আমাকে একখানা রুটি দিয়েছিল তাই খেয়েছি, এখন খিদে নেই'

'চল বাড়ি চল। রাঁধতে হবে—'

আমিই রাঁধতাম। শুকুল আমায় সাহায্য করত। কাঠ এনে দিত। মসলা (গুঁড়ো) এগিয়ে দিত। উনুনে হাওয়া করত। জল নিয়ে আসত ঘটি ক'রে। খেয়েই বেরিয়ে যেত আবার।

আমি খেয়ে ঘুমুতাম একটু। উঠে আবার শুকুলকে খুঁজতে বেরুতাম। একদিন অনেক খোঁজবার পরও শুকুলের দেখা পেলাম না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর পাড়ার একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, শুকুলকে দেখেছিস? সে বললে, ওই পুকুরপাড়ে যাও সেইখানেই শুকুল আছে। গিয়ে দেখি একটা পুকুরের ধারে বসে আছে। আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে একটা পুকুর ছিল। পুকুরের পাড়ে ছিল একটা ভাঙা বাড়ি। অনেকগুলো উঁচু উঁচু ভাঙা থাম ছিল সেখানে। দেখলাম শুকুল একটা থামের উপরে চড়ে বসে আছে।

'কি রে এখানে বসে কি করছিস'

'বেশ সুন্দর জায়গাটা, তুমিও এস না'

এই ছিল শুকুল।

আর একদিন আর এক কাণ্ড করেছিল। একটা কুকুরছানার গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির। বলে, 'পুষব'।

বললাম, 'আরে আমাদেরই থাকবার জায়গা নেই ওকে রাখবি কোথায়।'

'দিনের বেলায় রাস্তায় থাকবে। রাত্রে আমার পাশে শোবে। আমার খাবারের অর্ধেক ওকে খাওয়াব। কি চমৎকার কালোয় শাদায় রংটা দেখেছ! এই কানের পাশটা দেখ—'

আমি আর কিছু বললাম না তখন।

দিনের বেলা কুকুরটাকে বাড়ির সামনে রাস্তায় টেলিগ্রাফ পোস্টে বেঁধে রাখত। পরিত্রাহি চেঁচাত কুকুরটা। আমার দিনের ঘুম মাথায় উঠল। শুকুল কিন্তু কুকুরটার কাছে বসে থাকত না। সকালে উঠেই বেরিয়ে যেত। টোটো ক'রে ঘুরে বেড়ানোই তার স্বভাব ছিল। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কুকুরটাকে একদিন আমি পাচার ক'রে ফেললাম। একটা থলির ভিতর পুরে ফেলে দিয়ে এলাম রেলের ওপারে। শুকুল বাড়ি ফিরে এসে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিলে। মিথ্যে কথা বলতে হল তাকে। বললাম, 'দড়ি কেটে পালিয়ে গেছে'

'তুমি দেখতে পেলে না।'

'আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।

'পালিয়ে গেল? এত ভালোবাসতুম, তবু পালিয়ে গেল। আচ্ছা নেমকহারাম তো—'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বললে, 'আবার সে আসবে'

কিন্তু আসে নি।

আমার শুকুলের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করত। মনে হত ওর কাছে অপরাধী হয়ে আছি। এই জন্যেই একদিন সরে পড়লাম ওখান থেকে।

আমি লেবুর টুকরিটা মাথায় ক'রে নিয়ে এলাম। দার্জিলিং থেকে বাবুর বেয়াই পাঠিয়েছিলেন এক ঝুড়ি লেবু। ও'রা সবাই মিলে খেলেন। পাড়ায় বিতরণ করলেন কিছু হোমরাচোমরাদের বাড়িতে, মানে, সেই সব বাড়িতে যাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করলে লাভ আছে কিছু যাদের 'বাহবা' পাওয়া খুবই আনন্দজনক। পচেও গেল অনেকগুলো লেবু। কিন্তু আমাকে একটাও দিলেন না। আমি যে চাকর! আমি যে মানুষ, আমি যে দেড় মাইল দূরে স্টেশন থেকে অতবড় ঝুড়িটা বয়ে আনলাম এসব কথা মুনসেফবাবুর বা তাঁর স্ত্রীর মনে হল না। অথচ দেখেছিলাম ও'দের বাড়িতে বিবেকানন্দের এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী চকচকে শেলফে সাজানো আছে। আমি যদিও চাকর হয়েই বাহাল হয়েছিলাম, ওই লেবুতে যদিও আমার কিছুমাত্র দাবি বা লোভ ছিল না তবু ও'দের ব্যবহারে খিঁচড়ে গেল মনটা।

একদিন মুনসেফবাবু 'বেটাচ্ছেলে' বলে আমার উল্লেখ করলেন শুনতে পেলাম আড়াল থেকে। সেইদিনই সরে পড়লাম সেখান থেকে।

জীবনে অনেক জায়গায় চাকরি করেছি। কত নাম আর করব। হাওড়ায় হাজারিবাবুর কাছে, শেওড়াফুলিতে পালেদের দোকানে, নশিপুরে এক জমিদারের বাড়িতে, ফটোগ্রাফার নগেন সিংঘির ওখানে, আরও কত জায়গায়। মগরায় এক চাষার

বাড়িতেও কাজ করেছিলাম কিছুদিন। ময়রার দোকানেও কাজ করেছি, ফুলশিয়ার কেদার ময়রার কাছে। চমৎকার প্যাঁড়া আর পানতুয়া তৈরি করত, আমিও শিখেছিলাম। কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকতে পারি নি। ফুলশিয়া বেহারে। সেখানে দেখলাম 'বাঙালীয়া'কে মনে মনে ঘেন্না করে সবাই। তাই সেখানে থাকতে পারি নি। এর পর দিনাজপুরের হানিফ মিঞার ওখানে ছিলাম কিছুদিন। কিন্তু যেদিন দেখলাম ঈদের পরবে ওরা গরু কাটল সেইদিনই চলে এলাম ওখান থেকে। তারপর ছিলাম হলধরবাবু ডাক্তারের কাছে। তিনি 'হেল্‌থ অফিসার' ছিলেন, 'টুর' করতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হত আমাকে। এ ভদ্রলোকও বিহারী ছিলেন। খুব ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি যা খেতেন আমার তা ভালোও লাগত না, পেটেও সইত না। দিনের বেলাটা তিনি ছাতু খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। রাত্রে খেতেন 'রোটি' আর 'শাক' মানে নিরামিষ একটা যা হোক কিছু। তার সঙ্গে আচার। এরপর দুধ খেতেন আধ সের। তিনি যা খেতেন আমাকেও তাই খেতে হত। আমার জন্যেও দুধ কিনতেন তিনি। কিন্তু মাছ ভাতের জন্যে আমার বাঙালী প্রাণ কাঁদত। রাত্রে তাঁর গা-হাত-পা টিপে দিতে হত। এটাও আমার ভালো লাগত না। তেলও মাখাতে হত তাঁকে ডলাই মলাই ক'রে। এটাও অপছন্দ ছিল আমার। তাই শেষ পর্যন্ত সেখানকার চাকরি ছেড়ে এক বাঙালী বাবুর বাড়িতে এসে বাহাল হলাম। নাম চিন্ময়বাবু। মাছ-ভাতের প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখানেও হতাশ হতে হল। দেখলাম তিনি এক পো'র বেশি মাছ কেনেন না। বাড়িতে খাওয়ার লোক পাঁচজন। আমার ভাগে কিছু পড়ত না। শুনলাম চিন্ময়বাবু বাজেট অনুসারে চলেন। এক পোয়ার বেশী মাছ কোনো দিনই কিনবেন না। বড় মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলাম, এমন সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। সৈরভির আবির্ভাব ঘটল আমার জীবনে। আধুনিক ভাষায় তাকে 'তরুণী' বলা যেতে পারে, গ্রাম্য ভাষায় বললে বলতে হয় 'ডবকা ছুঁড়ী'। চিন্ময়বাবুর বাড়ির ঠিকে ঝি সে। এসে বাসন মেজে দিয়ে চলে যায়। আমার বয়স তখন কুড়ি পার হয়ে গেছে, গোঁফ গজিয়েছে। দেখতে দেখতে ভাবসাব হয়ে গেল সৈরভির সঙ্গে। আমার দুঃখের কথা শুনে সৈরভি বললে, হায়, হায়, এরা তোমাকে মাছ-ভাত খাওয়াবে? নিজেরাই তো খেতে পায় না। পিঁপড়ে টিপে গুড় বার করে। তুমি এখানে শুকো একটা মাইনে ঠিক ক'রে নাও। আমি তোমার মাছ-ভাত খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ক'রে করবে? সৈরভি ঝংকার দিয়ে উঠল—সে ভাববার তোমার দরকার কি। সে ব্যবস্থা আমি করব। সে ভার আমার। চিন্ময়বাবুকে বললাম একদিন। তিনি শুকো ব্যবস্থায় আমাকে রাখতে রাজী হলেন না। সৈরভি বললে, তুমি ছেড়ে দাও এ চাকরি। ফ্যাক্‌টারির বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেখানে ঢুকিয়ে দিতে পারব তোমাকে। ফ্যাক্‌টারির বড়বাবু প্রবীণ মৃত্যুঞ্জয় বোসের বাড়িতেও কাজ করত সৈরভি। বাবা বলে ডাকত তাঁকে। সৈরভি নাছোড় হয়ে ধরে বসল তাঁকে আমার চাকরির জন্য। বললে, আমার গাঁয়ের লোক, মা-বাবা মরে গেছে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়েছে এসে···অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে লাগল। কিন্তু ফল হল। ফ্যাক্‌টারিতে চাকরি হয়ে গেল একটা। আমি সৈরভির কাছেই থাকতে লাগলাম। নিজের কথা রেখেছিল সে। দু'বেলা পেট ভরে মাছ-ভাত খাওয়াত আমাকে। নিজেই রাঁধত। চমৎকার রাঁধত।

দু'বছর ছিলাম তার কাছে। একটি ছেলে হয়েছিল। সৈরভিই তার নাম রেখেছিল সুরেশ। সুরেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে তার ছেলেবেলায় নাকি ভাব ছিল। তারই স্মৃতিকে সে নিজের ছেলের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সে নিজেই কিন্তু হঠাৎ মরে গেল একদিন কলেরায়। অনেক চেষ্টা ক'রেও বাঁচাতে পারি নি তাকে। তার পর থেকে আমি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বিপদে পড়ে গেলাম এক-বছরের ছেলে সুরেশকে নিয়ে। সুরেশ যে আমারই ছেলে তা আমি হলফ ক'রে বলতে পারব না। সৈরভি অনেক লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। অনেকের সাথে ভাবও ছিল তার। আমার সে বিয়েকরা বউ ছিল না, সুতরাং তার ওপর আইনত কোনো জোর ছিল না আমার। থাকলেও যে তাকে বেঁধে রাখতে পারতুম তা মনে হয় না। সে ছিল ঝরনার মতো, চারিদিকে নিজেকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকতে ভালোবাসত। তবু রেগে মেগে মারধোর করতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু তাকে ছাড়ি নি, ছাড়তে পারি নি। ওর মধ্যে কি এমন একটা ছিল যে ওকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। এর নামই কি ভালোবাসা? জানি না ঠিক। সৈরভিও আমাকে ছেড়ে কোথাও চলে যায় নি, আমার কাছেই বরাবর থেকেছে। আর কি সেবা যত্নই করত আমার।...এই সময় আমার ভাগ্যোদয় হল। ফ্যাকটারির মালিক মরিসন সাহেবের মেম হঠাৎ একদিন একটা কুয়োয় পড়ে গেলেন পাখি দেখতে গিয়ে। মাঠের মাঝখানে ঘাসে ঢাকা কুয়োটা ছিল, তিনি দেখতে পান নি। মেমসাহেব রোজ 'বাইনাকুলার' নিয়ে পাখি দেখে বেড়াতেন মাঠে মাঠে। সঙ্গে থাকত তাঁদের বেয়ারা মিঠুয়া, দশ বারো বছরের ছেলে একটা। সে ছুটে এসে খবর দিলে, আমরা সবাই গেলাম সেখানে। মরিসন সাহেবও গেলেন। কিন্তু কি ক'রে ওই এঁদো কুয়ো থেকে মেমসাহেবকে উদ্ধার করা যায় তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম কুয়োর ভিতর কেউ নামতে রাজী নয়। সবাই হাঁকডাক আর সরফরাজি করতেই ব্যস্ত। মরিসন সাহেব বললেন, তিনিই নাববেন। তখন আমি বললাম, আমাকে আগে নাবিয়ে দিন সাহেব। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না। আমার কোমরে একটা শক্ত দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিল সকলে। মেমসাহেবের তেমন কিছু হয় নি। চেঁচিয়ে বললাম, একটা লম্বা বাঁশের সিঁড়ি নামিয়ে দাও। মেমসাহেব উঠে যেতে পারবেন। তাই হল। মেমসাহেবের কপালে একটু চোট লেগেছিল। দু'দিনেই সেরে উঠলেন। সাহেব জাত অকৃতজ্ঞ নয়। মরিসন সাহেব আমাকে বললেন, তোমার উপর আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমাকে উঁচু পোস্টে প্রমোশন দিতে চাই। আসামে আমার একটা ফ্যাকটারি আছে। তুমি যদি সেখানে যেতে চাও সেখানেই পাঠাব তোমাকে। সেখানে একজন ভালো ম্যানেজার চাই। ভালো ম্যানেজারের অভাবে ফ্যাকটারিটা চলছে না ভালো। তুমি যদি যাও তোমাকেই ম্যানেজার ক'রে দেব। মাইনে পাবে আড়াই শ' টাকা, তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টারস্। রাজী আছ তো? রাজী হয়ে গেলাম। সুরেশও আমার সঙ্গে রইল। তাকে রেখে যাব কোথায়?

গৌহাটিতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল স্নেহময়ীর সঙ্গে। সেই স্নেহময়ীকে, যে বাসন-মাজা ঝি ছিল। সে এখন একটা প্রাইম্যারি স্কুলে মাস্টারি করছে। পরনে মোটা থান কাপড়। মাথায় সিঁদুর নেই। শুনলাম সে বিজয়াদির ওখানে বেশীদিন থাকতে পারে নি। শেষকালে নাকি মারধোর করত। বিজয়াদির স্বামীর চালচলনও ভালো

লাগছিল না তার। একদিন সে পালিয়ে গেল। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল চুঁচুড়ার ভাদুবাবুর বাড়িতে। ভাদুবাবু মাস্টার, খুব ভালো লোকও। ভাদুবাবুর বাড়িতে সামান্য কাজ করত, ফাইফরমাশের কাজ। তার পর ক্রমে ক্রমে ভাদুবাবুর আপন লোক হয়ে গেল সে। তাকে লেখাপড়া শেখালেন ভাদুবাবু। স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল সেখান থেকে। তারপর তার জীবনের ধারা বদলে গেল। ভাদুবাবুর এক বন্ধুর পত্নীবিয়োগ হল। ছেলে পিলে হয় নি তাঁর। কিন্তু ক্রমশ নিঃসঙ্গ জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠল তাঁর। ভাদুবাবুকে লিখলেন একটি বয়স্থা গরীবের মেয়ে যদি পাই বিয়ে করি। ভদ্রলোক মাসে দেড় শ' টাকা মাহিনা পান। টিউশনি ক'রে আরও শ'খানেক টাকা রোজগার করেন। বয়স পঞ্চাশ। ভাদুবাবু স্নেহময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওইখানেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। ভাদুবাবুর স্ত্রী বললেন, এখখুনি কর। বিয়ে হলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে। স্নেহময়ী বললে, আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব। কিন্তু জাতে আমি সদগোপ। উনি তো শুনেছি ব্রাহ্মণ, উনি আমাকে বিয়ে করবেন কি ক'রে। ভাদুবাবু হেসে বললেন, ব্রাহ্মণের মুখনা ন'টা তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ব্রাহ্ম। জাতটাত মানেন না। তুমি যদি রাজী থাক আমি তাঁকে চিঠি লিখতে পারি। লোক খুব ভালো। গৌহাটিতে তাঁর বাড়ি আছে, কিছু জমিজমাও আছে। স্নেহময়ী বললে, আপনি আমার বাবার মতো। আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে। বিয়ে হয়ে গেল। স্নেহময়ী দাসী রূপান্তরিতা হল স্নেহময়ী গাঙ্গুলীতে। কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্টে দাম্পত্যসুখ ছিল না। বিয়ের মাস ছয়েক পরেই গাঙ্গুলীমশাই হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। তাঁর তিন কুলে কেউ ছিল না। সুতরাং স্নেহময়ীই তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ওখানের একটা মেয়ে স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেল সে। একটা কোন্ অনাথ-আশ্রমের সঙ্গেও যোগাযোগ হল ওর। সেখানে অনাথ ছেলে-মেয়েদের খুব সেবাযত্ন করত। কিছু অর্থ সাহায্যও করত।

রূপান্তরিতা স্নেহময়ীকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। স্নেহময়ীও আমাকে দেখে খুব খুশী। বললে, তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ত। তুমি যে এমনভাবে হঠাৎ এসে হাজির হবে তা ভাবতেই পারি নি। ফ্যাকটারিতে কাজ পেয়েছ? কোথায় থাকবে?' বললাম, 'সেখানে আমার কোয়ার্টার্স আছে। মুশকিলে পড়েছি আমার ছেলেটাকে নিয়ে। আমি তো সমস্তদিন ফ্যাকটারিতে থাকব। ওর দেখাশুনা করবে কে, ভাবছি একটা চাকর রেখে দেব—'

'তোমার বউ কোথা'

'আমার বউ ছিল না কেউ।'

'তাহলে ছেলে হল কি ক'রে'

'কপাল ভালো, তাই বিয়ের ঝক্কি না পুইয়েই ছেলে পেয়ে গেছি একটা। যার গর্ভে জন্মেছিল সে তো মরে গেছে। আমাকে একটা চাকর যোগাড় ক'রে দাও না'

'তোমার ছেলে আমার কাছেই থাক। আমার একটা ভালো ঝি আছে, সেই দেখাশুনা করবে। আমিও করব'

'তুমি পারবে?'

'পারব না কেন। আমার নিজের ছেলেপিলে হয় নি কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের আমি খুব সামলাতে পারি। মনে নেই বিজয়াদির ছেলেকে তো আমিই সামলাতুম। একটা অনাথাশ্রমের ভার আমার উপর। সেখানকার ছেলেমেয়েরা খুব ভালোবাসে আমায়। তোমার ছেলেও থাক আমার কাছে'

সুরেশ স্নেহময়ীর কাছে রইল। আমি প্রায় রোজই আসতে লাগলাম তার বাড়িতে। রোজ স্নেহময়ীর বাড়িতে আসার ফলে যা ঘটবার তাই ঘটল। স্নেহময়ীর নামে কুৎসা রটাতে লাগলেন আমাদের সমাজের অনারারি অভিভাবকগণ। আমি জানি স্নেহময়ীর মনে পাপ ছিল না। কিন্তু আমার মন যে নিষ্পাপ ছিল তা আমি হলফ ক'রে বলতে পারব না। আমি যে তার সম্বন্ধে নির্বিকার নই একথা সে বুঝত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোরকম প্রশ্রয় দেয় নি সে আমাকে। একদিন হঠাৎ সে বলল, 'হারুদা, তুমি বিয়ে কর। পুরুষমানুষের বউ দরকার। একটি লক্ষ্মী বউ ঘরে আন, সে সুরেশের দেখাশোনাও করবে, তোমারও করবে। ভালো চাকরি হয়েছে, থিতু হয়ে বস এইবার'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'লক্ষ্মী বউ পাব কোথায়। লক্ষ্মী লাখে একটা হয়, সে আমার গলায় মালা দেবে কেন। এখন বিয়ে করলে অলক্ষ্মীই জুটবে একটা, শান্তির চেয়ে অশান্তিই বেশী হবে। বেশ আছি। সুরেশকে তুমি মানুষ কর, যা খরচ লাগে আমি দেব'

'আহা খরচের জন্যেই যেন আটকে যাচ্ছে সব। তোমার নিজের জন্যেই যে একটি বউ দরকার। সুরেশের ভার না হয় আমি নিলাম, কিন্তু তোমার ভার কে নেবে'

'কেন তুমি'

'আমি পারব না। একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে কর'

'ভালো মেয়ে পাবো কোথায়'

'আমার সন্ধানে আছে একটি ভালো মেয়ে'

'কোথায়'

'অনাথ আশ্রমে। খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে জানি। আশ্রমের লোকেরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল তাকে। আমি যখন আশ্রমের সম্পর্কে এলাম তখন ওর বয়স পাঁচ বছর। তখন থেকেই দেখছি আমি মেয়েটিকে। খুব ভালো মেয়ে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। এখন বয়স ষোল বছর। আমরা ভাবছি ওর বিয়ে যদি না দিতে পারি তাহলে ওকে নার্সিং শেখাবার জন্যে কোথাও পাঠাব। তুমি বিয়ে কর ওকে—'

'অনাথাশ্রমের মেয়ে যখন তখন বাপ মার ঠিক নেই?'

'না তা নেই। রাস্তায় কুড়োনো মেয়ে। কিন্তু ও যে ভালো বংশের মেয়ে তা বোঝা যায়।'

'কি ক'রে?'

'চালচলন চেহারা থেকে। অ্যালসেসিয়ান কুকুরবাচ্চাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলেও তাকে চিনতে ভুল হয় না সে যখন বড় হয়। তুমি জাত মান নাকি,

'আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে মানি না। আচ্ছা ভেবে দেখব'

স্নেহময়ীর পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতে হল শেষ পর্যন্ত। ভালোই লাগল। অনেক

দিন থেকেই একটা মেয়েমানুষের অভাব বোধ করছিলাম। কুড়োনী দেখলাম চৌকশ মেয়ে। রূপ তো চোখধাঁধানো। স্নেহময়ী ওর নাম দিয়েছিল যমুনা। আমি সেটাকে সংক্ষেপ ক'রে মুনা বলেই ডাকতাম তাকে।

এবার মেয়ে হল একটা। তার মা তার নাম রাখল শিলু। আমি যে বাড়িতে থাকতাম তার ছাতের উপর শিলের মতো একটা চওড়া পাথর পাতা ছিল। শিলুর বয়স যখন দু'মাস, তখন শীতকাল। যমুনা ওকে সেই শিলের উপর রোদে শুইয়ে দিত। আর পাশে বসে সে হয় বড়ি দিত, না হয় সেলাই করত, না হয় বই পড়ত। শিলের উপর শুয়ে থাকত বলে ওর নাম হল শিলু। শুনেছি সেই নাম বদলে শিলু এখন শ্রীলতা হয়েছে। শ্রীলতা! হা হা হা হা। যমুনার মেয়ে শ্রীলতা, লতা বলেই কাছে যে গাছটা পেয়েছিল তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। যমুনাকে আমি বুঝতে পারি নি কোনো দিন। মনে হত স্নেহময়ীর হুকুমে সে যেন আমাকে বিয়ে করেছে। নিখুঁত কাজকর্ম, ব্যবহারও অনিন্দনীয়, কোথাও কোনো ভুলচুক নেই, কিন্তু তার এই কেতা-দুরস্ত লেফাপা ছাড়া আমি আর কিছুই পাই নি। আমি মানুষটাকে চিনতেই পারি নি। বুঝতে পারতাম আমাকে সে ভালোবাসে না, আমার প্রতি তার মমতা নেই। শিলুর প্রতিও ছিল না। নিখুঁতভাবে আমাদের দুজনেরই সেবা সে করত। তারপর খাঁচার দুয়ার একদিন খুলে গেল। তথাকথিত একটি বিদ্বান ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেল একদিন। ওখানকার তেলের পাম্পের একজন লোক। আমার কাছে নানা দরকারে প্রায়ই আসত ছোকরা। বেশ একটু কবি-কবি ভাব। প্রায়ই কোনো-না-কোনো ছুতোয় বাড়ির ভিতরে চলে গিয়ে বলত—একটু চা খাওয়াবেন? যমুনা তাকে চা খাওয়াত। এইভাবে শুরু হয়েছিল শেষ হল পলায়নে। ঘন ঘন আসত ছোকরা। যমুনা রূপসী ছিল সত্যিই। সাহিত্য, রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করত ওরা। এমন সব আলোচনা যা আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু হঠাৎ পালিয়ে যাবে তা আন্দাজ করতে পারি না। কিন্তু গেল। খুব যে একটা মুষড়ে পড়েছিলাম তা নয়, বরং মনে মনে বলেছিলাম, যাকগে। মানুষের সমাজে শুধু প্রজাপতিরা নয়, ফুলেরাও ওড়ে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি নি। স্নেহময়ীকে গিয়ে বললাম, 'তোমার লক্ষ্মী মেয়ের কাণ্ড দেখ। আমি এখন ওই কচি মেয়েটাকে নিয়ে কি করি বল তো। কি ঝামেলায় আমায় ফেললে বল দেখি।'

স্নেহময়ী শান্ত কণ্ঠে বললে, 'ওদের আমার কাছে রেখে যাও। আমিই ওদের মানুষ করব।'

'বেশ'

সুরেশ আর শিলুকে দিয়ে এলাম তার কাছে। তারপর গৌহাটী ত্যাগ করলাম। গৌহাটির আলো বাতাস আর ভালো লাগছিল না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলাম একদিন হঠাৎ। স্নেহময়ীকে না জানিয়েই।

তোমার চোখের প্রখর দৃষ্টিটা যে আমার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে তা অনুভব করছিলাম, কিন্তু একটু পরে সেটা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে, আর সহ্য করতে পারছি না। রগের উপর যেন ছুঁচ বিঁধছে। মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম টেবলু

ল্যাম্পের আলোটা ঠিক রগের উপর পড়েছে। সরিয়ে দিলাম ল্যাম্পটা। চোখে পড়ল কয়েকটা গোলাপ ফ্ল। আড়ালে ফ্লদানি ছিল ল্যাম্পটা সরাতেই সেটা আত্মপ্রকাশ করল। মালী কাল বিকেলে কয়েকটা আধফ্টন্ত গোলাপ-কুঁড়ি রেখে গিয়েছিল। দেখলাম সেগ্লি সব ফ্টেছে। তাদের প্রসন্ন হাসিতে হঠাৎ তোমার কথা শ্নতে পেলাম।

'তুমি যদি আমার কথা শ্নে শ্রীলতার বাবার ডায়েরিটা না পড়তে তাহলে তোমার হয়তো স্বাধীন সত্তার মর্যাদা ক্ষ্ন্ন হত, যে স্বাতন্ত্র্যের জন্য তুমি স্ষ্টির একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জীব হয়তো সে স্বাতন্ত্র হারিয়ে তুমি অসংখ্য সাধারণ ধ্লিকণার মতো স্বাতন্ত্র্যহীন ধ্লিকণা হয়ে যেতে। কিন্তু আমার প্রশ্ন ডায়েরিটা পড়ে যে অপ্রত্যাশিত খবরটা পেলে তার জন্যে কষ্ট হচ্ছে তোমার। সত্য জানতে হলে তার দাম দিতে হয়, ওই কষ্ট-পাওয়াটাই তার দাম। কিন্তু তোমার কষ্টই বা হচ্ছে কেন। শ্রীলতা কার মেয়ে, তার মায়ের চরিত্রই বা কি ছিল এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও তোমার আপিসের টাইপিস্ট, টাইপিস্ট হিসেবে সে ভালো, তার ব্যবহারও অনিন্দনীয় এর চেয়ে তার বেশী পরিচয় জানবার কি প্রয়োজন আছে? ভালোবেসেছ নাকি ওকে? যদি ভালোই বেসে থাক তাহলে তো কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তোমার ভালোবাসার জাদ্মন্ত্রে ও তো মহিয়সী হয়ে উঠবে তোমার চোখে, ওর তুচ্ছতাও মহনীয় হয়ে উঠবে তোমার কাছে, ওর ক্ষ্দ্রতাকেও মহত্ত্ব মনে হবে প্রেমের মানদণ্ডে মাপলে। প্রেম নয়? কাম? ইংরেজীতে যাকে বলে লাস্ট (lust), তাই না কি। তাহলেই বা ওর কুলজী জানবার প্রয়োজন কি। যারা বারবনিতার কাছে কামের ক্ষ্ধা মেটাবার জন্যে যায় তারা কি তাদের কোষ্ঠী বিচার ক'রে যায়? রেস্তরাঁয় বসে তুমি যখন কাটলেটে কামড় দাও তখন কি নিঃসন্দেহ হতে চাও মাংসটা পাঁঠার, ভেড়ার, কুকুরের না গর্র? দোকানী যা বলে তাই বিশ্বাস কর। তাছাড়া অপবিত্রাকে পবিত্র ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে কি তোমার? পরাশর ম্নির যেমন ছিল। তিনি মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধা করতে পেরেছিলেন, কুজ্ঝটিকা আর দ্বীপ স্ষ্টি ক'রে জন্ম দিয়েছিলেন দ্বৈপায়নের। সে ক্ষমতা আছে তোমার? লোভটুকুই তো তোমার সম্বল। দ্রে দাঁড়িয়ে হ্যাংলার মতো ওষ্ঠলেহন করছ খালি। তার বেশী কিছ্ করবার ক্ষমতা আছে কি তোমার? হা—হা—হা—হা—হা।

দ্রে হায়নাগ্লো ডাকছে।

মনে হল তুমি হাসছ।

আবার ডায়েরিতে মন দিয়েছি।

ট্রেনেই ম্কুন্দ ঘোষের সঙ্গে ঘ্ষোঘ্ষি হল। থার্ড ক্লাসে খ্ব ভিড় ছিল। দ্জনেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম পাশাপাশি। বাথর্মে যাবার সময় তার পা-টা মাড়িয়ে ফেলেছিলাম। সে বলে বসল—শালা, দেখে চলতে পার না। বাথর্ম সেরে এসে আমি তার কথার জবাব দিলাম। বললাম, তুমি শালার বেটা শালা। সঙ্গে সঙ্গে এক ঘ্ষি ঝেড়ে দিলাম তার নাকের উপর। সে-ও এলোপাতাড়ি ঘ্ষি চালাতে লাগল। আমার সামনের দাঁত ভেঙে গেল একটা। দ্জনেই রক্তারক্তি। মিনিট দ্ইয়ের মধ্যেই

দুজনের জামার সামনেটা রক্তে ভিজে গেল। হইহই ক'রে উঠল প্যাসেঞ্জাররা সব। পরের স্টেশনে পুলিস এল। ধরে নিয়ে গেল আমাদের দুজনকেই। সেই সময়ই বুঝতে পারলাম মুকুন্দ ঘোষ টাকার কুমীর। অনায়াসে কোমরের গেঁজে থেকে অনেক টাকা ক'রে ফেললে। পুলিসদের পান খাওয়ার খরচ বাবদ যা দিলে তাতে একটা ছোটখাটো সংসার এক মাস চলে যায়। দু'শ' টাকা নেহাত কম নয়। পুলিস ছেড়ে দিলে আমাদের দুজনকেই। আমি চলে যাচ্ছিলাম, মুকুন্দ ঘোষ ডাকলে—এই শোন। ফিরে দাঁড়ালাম। মুকুন্দ ঘোষ ফিক ক'রে হেসে বললে, 'আয়, মারামারি তো অনেক হল এবার কিছু খাওয়া যাক।' রক্তাক্ত নাকটা স্টেশনের কলের জলেই ধুয়ে নিলে সে। আমিও কুলকুচো ক'রে ফেললাম কয়েকটা। দাঁতের রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর স্টেশনের ভেন্ডারের কাছ থেকে গোটা বিশেক রসগোল্লা কিনে ফেললে মুকুন্দ। দশটা আমাকে দিলে, দশটা নিজে খেলে। খেতে খেতে বললে, 'তোর কবজির জোর দেখে খুশী হয়েছি, কি করিস ?'

বললাম, 'আগে চাকরি করতাম, এখন কিছুই করি না।'

'চাকরি গেল কেন। সেখানেও মারপিট করেছিলি নাকি'

'সে খবরে তোমার দরকার কি'

'দরকার আসলে একটি শক্তসমর্থ ভালো লোকের। তোর কবজির জোর দেখে খুশী হয়েছি। ভাবছি'

তারপর শেষ রসগোল্লাটি মুখে ফেলে দিয়ে সেটি গলাধঃকরণ ক'রে হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমার ফার্মে চাকরি করবি ?'

'না, চাকরি আর করব না কোথাও'

'কি করবি তাহলে। খালি মারপিট ক'রে বেড়াবি ? ঘরে রেস্ত আছে বুঝি'

'কিচ্ছু নেই'

'তবে ? পেট চলবে কি ক'রে ?'

'কুলিগিরি করব'

'ও কাজটা মন্দ নয়। আমিও করেছিলাম কিছুদিন। তারপর যখন অসুখে পড়ে গেলাম, দেখলাম হাতে একটি পয়সা নেই। পাড়ার ডাক্তারবাবুর কৃপায় বেঁচে উঠলাম। মনে হল একটা বাঁধা চাকরি করাই ভালো। একটা মোটর পার্টসের দোকানে চাকরি নিলাম। এখন ব্যবসা করি—'

'কিসের ব্যবসা'

'ওই মোটর পার্টসেরই। মল্লিক বাজারে বড় দোকান আছে আমার। একলা পেরে উঠি না। যারা কাজ করে তারা সব কটাই তালপাতার সেপাই আর সব কটাই ফাঁকিবাজ। কেবলই বলে মাইনে বাড়িয়ে দাও। দোকানে একদিন কয়েকটা গুণ্ডা এসে হামলা করলে—সব ব্যাটা সটকে পড়ল। আমি একাই যতটা পারি সামলাই। কড়ে আঙুলটা জখম হয়ে গেল'

কড়ে আঙুলটা দেখালে আমাকে। দেখলাম বেঁকে গেছে।

বলতে লাগল, 'সেই থেকে শক্তসমর্থ আর সৎ লোক খুঁজছি আমি। আমাদের দেশে ওইটির বড় অভাব। তোর ঘুষির জোর দেখে মুগ্ধ হয়েছি, এখন তোর মনের

জোর আছে কি না, তুই সাচ্চা লোক কি না, সেইটে ভাবছি। আসবি তো আয়, আমার সঙ্গে ভিড়ে যা—'

'না, চাকরি করব না'

'পার্টনার হবি? তাতেও আমি রাজি আছি। কিন্তু সাচ্চা হওয়া চাই।'

বললাম, 'পার্টনার হতে পারি। কিন্তু আপাতত আমার খরচখরচাটা দিতে হবে কিছুদিন'

'তা দেব, তা দেব। তুই তো দোকান চালাবি। যেমন দরকার নিয়ে নিস'

আমি যে সাচ্চা লোক সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই আমি বোধ হয় ওর সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মুকুন্দ দোকান থেকে অনেক পয়সা রোজগার করত। চোরাকারবারীদের সঙ্গে প্রচুর দহরম-মহরম ছিল। অনেক ছিঁচকে চোরও পার্টস্ চুরি ক'রে বিক্রি ক'রে যেত তার কাছে। দাঁও মাফিক সাধারণ জিনিসের তিন চার গুণ দাম নিয়ে নিত। কেন সে একজন সাচ্চা পার্টনার খুঁজছিল তা বুঝতে দেরি হল না আমার। বিয়ে করে নি, আত্মীয়স্বজন ছিল না তেমন, বলত আমি খানকীর ছেলে। মদ মেয়েমানুষ নিয়েই থাকত বেশীর ভাগ সময়। প্রায়ই দোকানে আসতে পারত না। নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজছিল তাই একজন। আমাকে পেয়ে বর্তে গেল সে। রোজ যা বিক্রি হত আর তার থেকে যে লাভ হত তা রোজই সে দিয়ে দিত আমাকে। আমাকে অর্ধেক দিয়েও বাকি যা থাকত তাতে তার মদ আর মেয়েমানুষের খরচ উঠে যেত। যখন কম পড়ত তখন আমার কাছে ধার নিত। আবার শোধ ক'রে দিত। এ বিষয়ে সে-ও খুব সাচ্চা লোক ছিল। আমি আসাতে দোকানের সম্পূর্ণ ভার আমার উপর দিয়ে নিজের বেলেল্লাগিরিতে মেতে থাকত মুকুন্দ। দোকানে আর আসত না। একটি অনুগত গুণ্ডার দল ছিল তার, তাদের সঙ্গেই থাকত বেশীর ভাগ। হঠাৎ হঠাৎ দোকান থেকে উধাও হয়ে যেত তারপর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বা হাতে প্ল্যাস্টার জড়িয়ে এসে হাজির হত আবার। হাসত মুচকি মুচকি। বলত—যুদ্ধে গিয়েছিলাম। পুলিস মামলাতে মাঝে মাঝে মবলগ টাকাও বেরিয়ে যেত দোকানের ক্যাশ থেকে। মুকুন্দ বলত, ও টাকা আমার নামে খরচ লেখ। সেদিন বুঝলে—বউবাজারের মোড়ে কোথায় গুণ্ডামি করেছে তারই গল্প জুড়ে দিত। আমাকে কিন্তু ভালোবাসত খুব। বলত, তুই মরদকা বাচ্চা, অক্ষয় বট, ঠিক খাড়া আছিস। কথা রেখেছিস তোর। কোনোরকম ছিঁচকেমি ধরতে পারি নি। জানিস তোর পিছনে স্পাই রেখেছিলাম?

মুকুন্দ মরে গেল হঠাৎ একদিন। খুন হয়ে গেল একদিন একটা বেশ্যাবাড়িতে। একটা উইল বেরুল তার উকিলের কাছ থেকে। দেখলাম আমাকে তার সর্বস্ব দিয়ে গেছে। অমন চালু দোকানটা পেয়ে গেলাম, তাছাড়া ব্যাংকেও নগদ বিশ হাজার টাকা। আমারও কিছু টাকা জমেছিল। মুকুন্দর যে টাকাটা ব্যাংকে ছিল সেটা সম্ভবত তার মায়ের টাকা। কারণ দেখলাম ব্যাংকে ফুলজানি দাসীর নামে যে অ্যাকাউণ্ট ছিল সেইটেই ট্রান্সফার্ড হয়েছে তার নামে।

আমি বউবাজারে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকতাম। খেতাম হোটেলে। হাতে টাকা হওয়ায় বাড়ি ভাড়া ক'রে ফেললাম একটা। সুরেশ আর শিলুকে নিয়ে এসে স্কুলে ভরতি ক'রে দিলাম। রাঁধুনী বামুন রাখলাম একটা। তারপর···

…হঠাৎ মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। এ কি! আমার চারদিকে কংক্রিটের গাঁথুনি। আমার অজ্ঞাতসারেই কে যেন গেঁথে ফেলেছে আমাকে গলা পর্যন্ত। স্তরে স্তরে গেঁথেছে। নানা স্তরে নানারকম রং, অদ্ভুত বিচিত্র রং সব। তুমি। তোমারই বহুবর্ণ বিচিত্র সত্তা খেয়ে ফেলেছে আমাকে, বেঁধে ফেলেছে, বন্দী করেছে। আমাকে ঘিরে গড়েছে নতুন রকম পিরামিড, রঙিন পিরামিড। ওই পিরামিডের ভিতর কি আমি আছি? পিরামিডের ভিতর তো মড়া থাকে। এই পিরামিডের ভিতর কে আছে…আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। খাতাখানা পড়ে গেল হাত থেকে। পিরামিড কথা কয়ে উঠল।

পিরামিড। তুমি চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন। খাতাটা শেষ কর। দেখ শেষ পর্যন্ত শ্রীলতার কি হল। হয়তো তপতীর খবরও ওর মধ্যে পাবে।

আমি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

পিরামিড। আমি তো তোমাকে বন্দী করি নি

আমি। তবে আমার চারদিকে কংক্রিটের এসব কি

পিরামিড। যা দেখছ তা তুমিই। আমি ওর মধ্যে কোথাও নেই। তুমিই ক্রমে ওইরকম হয়ে গেছ

তারপর কুহু কুহু ক'রে ডেকে উঠল একটা কোকিল। হাজারিবাগে কোকিল আছে নাকি। ঝিরঝির ক'রে বাতাস ঢুকল জানলা দিয়ে। দেখলাম পিরামিড অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভোজু এল।

ভোজু আমাদের পুরোনো চাকর। আমাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। জাতে সাঁওতাল। এখন ওকে পেনশন দিয়েছি। এই হাজারিবাগেই থাকে। আমি যখন হাজারিবাগে আসি তখন আমার কাছে এসে থাকে। শিকার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। অভিজ্ঞতাও আছে। ভোজু এসে বললে, 'মাচান বাঁধা হয়েছে'

'হয়েছে? চল তবে যাওয়া যাক আজ'

ভোজু ঘাড় চুলকে বললে, 'আগে থাকতে একটা পাঁঠা ওখানে বেঁধে রাখলে ভালো হত। বাঘটা আসত ঠিক। অমনিই হয়তো আসবে। ওইটেই ওর যাওয়া-আসার রাস্তা। ওখান দিয়েই জল খেতে যায়। কিন্তু পাঁঠা থাকলে—'

বললাম, 'না পাঁঠা বাঁধতে হবে না। শুধু শুধু একটা নিরীহ জীবকে মেরে লাভ কি—'

ভোজু একটা অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে, 'বাঘটাই বা তোর কি দোষ করেছে। ওকে মারতে চাইছিস কেন'

'ও যে বাঘ। ও যে আমাদের শত্রু। মানুষের কি কম অনিষ্ট করে?'

'তবে চল। পাঁঠাও আমাদের শত্রু। আমার শাকের ক্ষেতটা মুড়িয়ে খেয়েছে। যে গাছে একবার মুখ দেয় সে গাছ আর হয় না। দুনিয়ায় কে শত্রু নয়? জানিস আমার ব্যাটার সঙ্গে আমার মুখদেখাদেখি নেই'

গাছের উপর মাচানে বসে আছি।

চারিদিকে বড় বড় গাছ। একটু দূরে চিকমিক করছে একটা নদী। ওই নদীতেই বাঘটা আসে নাকি জল খেতে। সন্ধ্যার পরই আসবে।

'ত্যাকর ত্যাকর ত্যাকর'—ডেকে চলেছে একটা অজানা পাখি। আসন্ন সন্ধ্যার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে আরক্তিম সূর্যালোকে। একদল কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। একটু পরে ময়ূর ডেকে উঠল। মনে হল তার কেকারব তরবারির মতো আস্ফালিত হল যেন শূন্যে। তারপরই দেখতে পেলাম। বাঘ নয়, নদীর ধারে একটি হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। একটি ছবি আঁকা রয়েছে যেন আকাশপটে। শাখাময় শিংগুলি কালো। গায়ের রং স্বর্ণাভ। মনে হল তার উপর শাদার ছিটও রয়েছে। স্বপ্নালু দৃষ্টি তুলে চেয়ে রয়েছে আমার দিকেই। ও তো জানে না অদূরেই মাচানের উপর বন্দুক-হাতে মানুষ বসে আছে, যে মানুষ এক মুহূর্তে তাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু না, যদিও আমি মানুষ, (হঠাৎ মনে হল মানুষের সংজ্ঞা কি, বিধাতার সৃষ্টিধ্বংসকারী ঘোর স্বার্থপর সম্প্রদায়?),
কিন্তু না তবু আমি ওই হরিণকে মারব না, কিছুতেই মারব না।

পাশের গাছে আর একটা মাচানে ভোজু বসে ছিল। সে ইঙ্গিত করল—মারো। কিন্তু না, আমি কিছুতেই মারব না ওকে। একথা মনে হতে না হতেই বাঘটা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম আমি। বাঘ পালিয়ে গেল। ভোজু তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে গেল। দেখলাম আমার গুলি হরিণেরই বুকে লেগেছে। বাঘটার কিছু হয় নি। ভোজু হরিণটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। তার মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি। বললে, এ হরিণের মাংস চমৎকার হবে।

···সবাই মিলে মাংসটা ভাগ ক'রে নিয়ে গেল। খাবার সময় দেখি ভোজু আমার জন্যেও এক বাটি মাংস রেঁধে এনেছে।

···খেয়ে ফেললাম। বেশ ভালো লাগল। কিন্তু খেতে খেতে হরিণের জীবন্ত মূর্তিটা চোখের উপর ভেসে উঠল—সেই স্বর্ণাভ তন্বী মূর্তি, চোখের সেই স্বপ্নময় দৃষ্টি।

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? কবি, না পিশাচ?

হা-হা-হা-হা ক'রে দূরে ডেকে উঠল হায়নার দল।

মনে হল তুমি হাসছ।

ষোল

হাজারিবাগ থেকে ফিরে মিস মিত্রের বাবার ডায়েরিটা আবার পড়তে শুরু করেছিলাম। খাতাটা খুলেই কিন্তু হতাশ হতে হল। দেখলাম অনেকগুলো পাতা নেই। যেটুকু আছে তা এই।

···শিলু কলেজে পড়ছে। আছে স্নেহময়ীর কাছে। স্নেহময়ীর কাছেই শেষে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওদের। আমি টাকা পাঠাতাম। আর সুযোগ পেলেই ওদের দেখে আসতাম। ওদের কেন বরাবর নিজের কাছে রাখি নি তার একটা কারণ অবশ্য ছিল।

কারণটা অকপটে স্বীকার করাই ভালো। ডায়েরিতে মিথ্যা কথা লিখতে নেই। পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল আমার সংস্পর্শে থাকলে ওরা খারাপ হয়ে যাবে। আমার চরিত্রদোষ ঘটেছিল। হাতে বেশী টাকা থাকলে যা হয় তাই হয়েছিল। মদ খেতাম। মেয়েমানুষও রেখেছিলাম একটি। সে আবার মাঝে মাঝে আমার বাসাতেও এসে হাজির হত। তাই শিলু আর সুরেশকে স্নেহময়ীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই সুযুক্তি মনে হল। স্নেহময়ীকে অকপটে লিখলাম সব কথা। চিঠি পেয়ে স্নেহময়ী আর্জেন্ট একটি টেলিগ্রাম করল—ওদের অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও। পাঠিয়ে দিলাম একজন লোক সঙ্গে দিয়ে। চক্ষুলজ্জাবশত প্রথমে নিজে যেতে পারি নি। কিছুদিন পরে যখন গেলাম তখনও স্নেহময়ী আমার পদস্খলন নিয়ে একটা প্রশ্ন করল না। স্নেহময়ীর ওইরকমই স্বভাব ছিল। মাঝে মাঝে যেতুম ওদের কাছে। সুরেশ লেখাপড়ায় মোটেই মেধাবী ছিল না। সে ম্যাট্রিক পাস করতে পারল না। এদিকে কিন্তু বেশ তাগড়া হয়ে উঠেছিল। শিলু কিন্তু খুব ভালো ছিল পড়াশোনায়। সে দেখতে দেখতে আই. এ. পাস করে বি. এ. ক্লাসে ভরতি হয়ে গেল। আমি একবার ওর জন্যে কিছু বই কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি সুরেশ নেই। স্নেহময়ী বললে, 'ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি ওকে নিয়ে কোথাও কাজে লাগিয়ে দাও।' বললাম, 'তাড়িয়ে দিলে কেন?' স্নেহময়ী একটু থেমে জবাব দিলে, 'শিলুর সঙ্গে ওকে মিশতে দেওয়া আর নিরাপদ নয়।'

'কোথা আছে সে?'

'ওর আড্ডা বথা বলেন ভৌমিকের বাড়িতে'

গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি মস্ত এক তাসের আড্ডা জমেছে। সম্ভবত জুয়ো খেলা হচ্ছে। সুরেশকে ডাকলাম। বাইরে নিয়ে গেলাম তাকে।

চোখ পাকিয়ে বললাম, 'তুমি শিলুর গায়ে হাত দিয়েছিলে এটা সত্যি কথা।'

চুপ করে রইল।

তারপর বললে, 'হ্যাঁ দিয়েছিলাম। ওকে আমি ভালোবাসি, ওকে আমি বিয়ে করব'

'বোনকে বিয়ে করবে!'

'ও আমার বোন নয়। আমি সব খবর পেয়েছি। সৈরভি আমার মা ছিল, আর আপনি আমার বাবা কি না তারও ঠিক নেই। আর সব চেয়ে বড় কথা আমি শিলুকে ভালোবাসি, শিলুও আমাকে ভালোবাসে।'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তার মুখের দিকে চেয়ে।

'এ বিয়ে হবে না। হতে পারে না'

'কেন হবে না। আপনিই তো আমার আদর্শ। প্রেমই যে জীবনের সবচেয়ে সেরা জিনিস এটা বুঝেছিলেন বলেই তো আপনি সৈরভির সঙ্গে ছিলেন। শিলুর মাকে আপনি ভালোবাসতে পারেন নি বলেই সে পালিয়ে গেল। স্নেহমাসীর সঙ্গেও আপনার কি সম্পর্ক তা-ও আমরা জানি। আমার বেলাতেই বাধা দিচ্ছেন কেন—'

এর পরই তার নাকে ঘুষি মেরেছিলাম একটা। সুরেশের বন্ধুরা আমাকে ধরে পিটিয়েছিল খুব।

খবর পেয়েছি শিল্ আর স্রেশ স্নেহময়ীর কাছ থেকে চলে এসেছে। আসবার আগে তাকেও খ্ব অপমান করেছে নাকি। স্নেহময়ী কিছ্ বলে নি। আমি ওখানকার একজন লোকের ম্খে শ্নলাম। এ-ও শ্নেছি ওরা কলকাতাতেই আছে। শিল্ শ্রীলতা হয়েছে। টাইপরাইটিং শিখে কোনো এক প্রাইভেট আপিসে নাকি কাজ করছে। আর ওদের খোঁজখবর করি নি। করবার ইচ্ছেও নেই। নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতন ঘ্রে বেড়াচ্ছি। মদের মাত্রা বাড়িয়েছি এবং—হ্যাঁ আর আর যা আন্ষঙ্গিক তা-ও বেড়েছে। স্নেহময়ীকে আর চিঠি লিখি না। শরীরটা খ্ব খারাপ হয়েছে। পেটের ডান দিকে ব্যথা। কাশি হয়েছে খ্ব। নানারকম ওষ্ধ খাচ্ছি, কিছ্ হচ্ছে না।

একদিন দোকান থেকে ফিরে এসে কাশতে কাশতে শ্য়ে পড়লাম। কাশি বরাবরই ছিল, সেদিন একটু বেশি হল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কাশির সঙ্গে রক্তও বের্চ্ছে। প্রথমে একটু বের্চ্ছিল তারপর প্রচুর বের্ল। একটা গামলা ভরে গেল রক্তে। ডাক্তার এলেন। বললেন যক্ষ্মা হয়েছে। স্যানাটোরিয়মে যাওয়ার উপদেশ দিলেন।

…স্নেহময়ীর কাছে চলে এসেছি।

শেষ কটা দিন এখানেই থাকব। কটা দিনই বা আছে আর। স্নেহময়ী খ্ব সেবা করছে। ও আমার কেউ নয়। রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ওই আমার সব।

সতের

আপিসে এসে মিস মিত্রকে ডেকে পাঠালাম। তাঁর বাবার ডায়েরিখানা ভালো ক'রে প্যাক ক'রে নিয়ে এসেছিলাম। আসতেই তাঁর হাতে দিলাম সেটা।

'তপতী এটা আপনাকে দিতে বলেছিল'

'কি এটা'

'তপতী বলেছিল এটা আপনার বাবার ডায়েরি'

'সে পেল কি ক'রে'

'স্নেহময়ীর সঙ্গে তার আলাপ ছিল। স্নেহময়ীই তাকে দিয়েছিল আপনাকে দেবার জন্য। তপতী কিন্তু আপনার দেখা পায় নি। তারপর যখন শ্নল আপনি আমার আপিসে কাজ করেন তখন আমাকেই দিয়ে গেল আপনাকে দেবার জন্য। আপনার বাবার নাকি শেষ ইচ্ছা ছিল ডায়েরিটা যেন আপনার হাতে পেঁছয়'

'কবে পেয়েছেন এটা'

'বেশ কয়েকদিন আগে'

প্যাকেটটি হাতে ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন মিস মিত্র।

'তপতীর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?'

'হয়েছিল একবার আসানসোল স্টেশনে'

'তার সব কথা জানেন আপনি?'

'না। আপনার সঙ্গে কতদিনের আলাপ'

'অনেকদিনের। একসঙ্গে পড়তাম আমরা। জানেন ওকে আজকাল পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে? হিম চন্দ্র বলে যে কালোবাজারী লোকটা খুন হয়েছে পুলিসের সন্দেহ সেটা তপতীরই কাজ'

'তাই নাকি। তা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব হবে কেন। সবই সম্ভব। তপতি সাধারণ মেয়ে নয়। তপতী কবে আপনার কাছে এসেছিল?'

'বেশ কিছুদিন আগে। যেদিন আমার বাড়ির সামনে একটা খুন হয় সেই দিনই। তারিখটা মনে নেই ঠিক। পুলিস তো অনেক খোঁজাখুঁজি করলে কিন্তু কাউকে ধরতে পারে নি'

'পুলিসের সন্দেহ এ খুন তপতী করেছে'

বিস্ময়ের ভান ক'রে বললাম, 'তাই নাকি!'

মিস মিত্র কিছু না বলে মুখ টিপে হাসলেন একটু।

আমি বললাম, 'তপতীর ঠিকানাটা জানলে তাকে জানিয়ে দিতাম যে খাতাটা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।'

মিস মিত্র বললেন, 'আমি জানিয়ে দেব—'

'তার ঠিকানা আপনি জানেন?'

'জানি'

হঠাৎ তাঁর মুখভাবটা কেমন যেন কঠোর হয়ে উঠল। তবু তার উপর হাসির ঝলক খেলে গেল একটু। মুখ টিপে তিনি হাসলেন তারপর চলে গেলেন।

আশ্চর্য, মিস মিত্রের ওই কঠোর মুখের হাসিটাই নানা বিচিত্র রূপে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার চোখের সামনে। কখনও মনে হল ঘন কালো মেঘের মাঝখানে ছোট্ট একটু বিদ্যুৎ স্থির হয়ে আছে। কখনও মনে হল দীপক রাগের ছোট্ট একটা মীড় যেন মূর্ত হয়েছে মানসপটে, কখনও মনে হয় আগ্নেয়গিরির ছোট্ট একটি অঙ্কুর ফুটি ফুটি করছে ওর চাপা ওষ্ঠ প্রান্তে।

আঠার

খুব বৃষ্টি পড়ছিল।

বাজ পড়ছিল ঘন ঘন।

গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম বিনিদ্রনয়নে। নামজাদা এক লেখকের উপন্যাস নিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম একটু আগে। ভালো লাগল না। খালি কথার কচকচি, খালি বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা। সুর জমে নি।

···ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম।

ঘাগরা-পরা জিপ্সি মেয়ে এসেছে যেন।

উদ্দাম যৌবন তার। গায়ের জামাটা টাইট আর বেখাপ্পারকম সবুজ। পিঠে

বেণী দুলেছে। কপালের উপর এসে পড়েছে গোছা গোছা কোঁকড়ানো চুল। চোখে মুখে কৌতুকের মোহিনী হাসি। হাতে কাচের চুড়ি। কুচকুচে কালো রঙের। গৌরবর্ণ হাত দুটিতে সুন্দর মানিয়েছে।

আমার সামনে এসে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খেলনা লিবি ?'

'খেলনা ? কোথায় আছে'

'আমার বুকে'

'দাও—'

হাত বাড়ালাম।

হঠাৎ মেয়েটা পিছিয়ে সরে গিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে নাচ শুরু ক'রে দিল ঘাগরা ঘুরিয়ে।

দিব নাই, দিব নাই, দিব নাই
তুই শুধু চেয়ে যা, চেয়ে যা, চেয়ে যা
বল শুধু চাই চাই চাই চাই
আমি দিব নাই, দিব নাই, দিব নাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে তুমি ?'

আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

'আমাকে চেনো না ? আমাকেই তো দেখছ বারে বারে'

ঘুম ভেঙে গেল।

আলোটা জ্বাললাম ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। একটা অসম্ভব প্রত্যাশা মনে জেগে উঠল। আশা করতে লাগলাম সেই জিপ্‌সি মেয়েটা আবার হয়তো হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে ঘরের কোণ থেকে। হয়তো নাচ শুরু করবে। স্বপ্নকে একবার তো প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু এবার কিছুই হল না। কেউ এল না। চুপ ক'রে বসে রইলাম সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে। মনে হল দেওয়ালে কার যেন একটা মুখ আঁকা রয়েছে। চেয়ে আছে উপরের দিকে, মাথার দীর্ঘ চুল যেন উড়ছে। প্রার্থনা করছে মনে হল। কে কার জন্যে প্রার্থনা করছে ? কিসের প্রার্থনা ? মনে হয়েছিল ওটা মেয়ের মুখ কিন্তু একটু পরে কেন জানি না মনে হল পুরুষের মুখ ওটা। শ্রীলতার বাবা কি ? শ্রীলতার জন্য প্রার্থনা করছেন ? প্রার্থনায় কি বিশ্বাস ছিল তাঁর ? বিশ্বাস না থাকলেও অন্তর থেকে অজ্ঞাতসারেই প্রার্থনা উত্থিত হয় অনেক সময়। তারই ছবি কি ওটা ? সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর ভুলটা ভেঙে গেল। ওটা চুনকামের পোঁচড়ার দাগ। নিতান্তই আকস্মিক। ওর অর্থ কিছু নেই। বাজে। মনটা কিন্তু ওকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরতে লাগল। একবার মনে হল ওটা যীশুখ্রীষ্টই বা নয় কেন ? হয়তো আমার দুঃখেই কাতর হয়ে মূর্ত হয়েছেন আমার ঘরের দেওয়ালে। তারপর তীক্ষ্ম তীব্র চীৎকার শুনতে পেলাম একটা। সাইরেনের শব্দ নয়, পাখির ডাক মনে হল। কি পাখি ? পেঁচা ? শহরের মাঝখানে পেঁচা আসবে কি ক'রে ? উঠে জানলাটা খুললাম। আকাশের পশ্চিম দিগন্তে প্রচুর কালো মেঘ জমে রয়েছে। কিন্তু মেঘের নিচে রক্তাভ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ওটা কি ? প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর পারলাম। চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। গোল নয়। প্রকাণ্ড প্রতপ্ত একটা টাঙির মতো। মনে হল তপ্ত ক্ষুরধার একটা প্রতিবাদ যেন মূর্ত হয়েছে।

শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ। কিন্তু অমন রুদ্র মূর্তি কেন? সন্ধ্যায় ওকেই তো অপরূপ লেগেছিল ধবল মেঘপুঞ্জের আড়ালে।

হঠাৎ—না, কি মনে হল বলব না।

উনিশ

ক'দিন কেটে গেছে মনে নেই।

কলকাতা শহরেই ছিলাম। আপিসে গেছি, বাড়িতে এসেছি। নিশ্চয়ই দিনও হয়েছে রাতও এসেছে। ফাইল সই করেছি, খাবার খেয়েছি, পোশাক পরেছি। কথাবার্তাও হয়তো বলেছি কারো কারো সঙ্গে। কিন্তু আমার কিছু মনে নেই। কিছু মনে নেই। একটা বিরাট অন্যমনস্কতার কুয়াশায় আবৃত ছিল আমার সত্তা। সেই কুয়াশার মধ্যে যে সব ছায়ামূর্তি দেখেছি সেইগুলোর কথাই মনে আছে। সেগুলি অদ্ভুত। কারো হাঁটুর উপর চোখ মুখ নাক, ধড় আছে, মুণ্ডু নেই। কারো আবার কপালের উপর চোখ, কারো একটা, কারো দুটো, কারো তিনটে। কারও কপালে চোখ নেই, ঠোঁট আছে। সেই ঠোঁটে আবার হাসি। নানা মূর্তি। আবার মিছিলও দেখেছিলাম একটা। প্রেতের মিছিল। সবার মুখে মুখোশ। কারো মুখোশ ভয়ংকর, কারো মুখোশ মনোরম। সে মিছিলে তুমিও ছিলে। হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলে। মুখোশটা সরিয়ে দিলে, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাই নি। অদ্ভুত অদৃশ্য একটা আবরণের তলায় আত্মগোপন করেছিলে। চিনেছিলাম তোমার হাসিটা দেখে। সেই চেনা হাসিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল মুখোশের তলা থেকে। সে হাসিটা বলেছিল, 'এদের মধ্যেও আছি। দেখছি এদের দৌড় কোন্ মসজিদ পর্যন্ত।' কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল তারপর সব। সে অন্ধকারের মধ্যেও কিন্তু আবছাভাবে দেখতে পেয়েছিলাম তপতীকে। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার উপর জ্বলছিল একটা বর্তিকা। বর্তিকার শিখা কাঁপছিল না। উর্ধ্বমুখী শিখা যেন আরতি করছিল কোন অদৃশ্য দেবতাকে। আমি মিস মিত্রকেও খুঁজেছিলাম সেই অন্ধকারে। খুকুকেও। কিন্তু তাদের দেখা পাই নি। এই না-পাওয়াটা অন্ধকারকে গাঢ়তর করেছিল যেন। কেন তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি নি। বস্তুত কোনো চিন্তার ঢেউ ওঠে নি আমার মনে। অন্ধকারের সমুদ্রে ভেসে চলছিল আমার মন কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে তা ভাববার চেষ্টাও করি নি। ছেড়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। সমুদ্রে ঢেউ ছিল কি? জানি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কে যেন আমাকে ভাসিয়ে উপরে তুলে আনছিল। মনে হচ্ছিল একটা অদৃশ্য 'বয়া' (buoy) যেন ঠেলে আনছে আমাকে। বার বার ডুবে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বার বার সে আমায় ভাসিয়ে তুলছিল। আকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকার আকাশ। কিন্তু আকাশ। হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে ওটা 'বয়া' নয় বাহু। তোমার বাহু।

হঠাৎ কুয়াশা মিলিয়ে গেল।

কেটে গেল অন্ধকার।

স্বচ্ছ দিবালোকে দেখলাম আমার সামনে আপিসে বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

বলছেন, 'মিস মিত্র আর এখানে চাকরি করবেন না। একটা রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়েছেন।'

যথোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে বললাম, 'চাকরি করবেন না তো এক মাসের নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল আগে। তাঁকে সেটা জানিয়ে দিন। চাকরি করবেন না কেন। না করেন তো আমরা এক মাসের মধ্যে অন্য লোক খুঁজে নেব'

'মিস মিত্র সে কথাও লিখেছেন। লিখেছেন আমি কাল থেকে আপিস যেতে পারছি না। আমার এক মাসের নোটিশ দেওয়া উচিত তা-ও পারলাম না। এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে যা কেটে নেবার নেবেন। আমি নিয়ে আসছি দরখাস্তটা'

বড়বাবু একটু পরেই দরখাস্তটা নিয়ে এলেন। দরখাস্ত পড়ে বুঝলাম মিস মিত্র আর আসবেন না। লিখেছেন শরীর খারাপ তাই আর কাজ করতে পারছেন না। লিখেছেন, 'আমার অসুখের জন্য আপিস থেকে যে টাকা অগ্রিম নিয়েছিলাম তার কিছুটা শোধ করেছি, কিছু বাকি আছে। সেটাও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কেটে নেবেন'

দরখাস্তটার দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

'একজন টাইপিস্টের খোঁজ করুন তাহলে'

'আমার ভাইপো গজুকে নিয়ে এসেছি। সে আপাতত কাজ চালিয়ে দেবে। সে একজন পাসকরা টাইপিস্ট। স্পীড ভালোই। যদি আপনার পছন্দ হয় তাকেও রাখতে পারেন'

'তাকে ডাকুন—'

একটু পরেই গজু এল। দু'গালে চওড়া জুলফি, ঠোঁটের উপর পাতলা লতানে গোঁফ। ঠোঁটে ধবল। আমার ব্যাগ থেকে সেদিনকার পত্রিকাটা বার ক'রে বললাম, 'এটা টাইপ ক'রে নিয়ে আসুন।'

একটু পরেই নিয়ে এল।

দেখলাম একটিও ভুল নেই।

'বেশ, ওই এখন কাজ করুক তাহলে—'

বড়বাবু ভাইপোকে নিয়ে চলে গেলেন।

ছেলেবেলার একটা গল্প মনে পড়েছে।

এক মাসিকপত্রে গগন ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি বেরিয়েছিল। খুব ভালো লেগেছিল আমার। সেটি বাঁধিয়ে রেখেছিলাম আমার পড়ার ঘরে। কিছুদিন পরে আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা রইলেন আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন। তিনি চলে যাওয়ার পর দেখলাম ছবিটি নেই। তিনিই ছবিটি নিয়ে গেছেন একথা বলবার সাহস আমার হয়নি। স্বচক্ষে তাঁকে নিতে দেখি নি। মাকে জিজ্ঞেস করে ছিলাম, আমার ছবিটা কোথা গেল। তিনি ধমকে উঠলেন, বললেন, আর একটা ছবি টাঙা না

ওখানে। কে নিয়ে গেছে তা কি ক'রে বলব। যে পেরেকে ছবিটা টাঙানো ছিল সেই পেরেকটার উদ্দেশ্যে ছোট একটি কবিতা লিখেছিলাম মনে পড়ছে—

ওগো ছবিহীন পেরেক
তোমার সঙ্গে কিসের উপমা দেব
স্বামীহীনা বিধবার
না, পুত্রহীনা জননীর ?
উপমা যাই হোক
তোমাকে নিঃসঙ্গ রাখব না
টাঙিয়ে দেব আর একটা ছবি।

টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। একটা ক্যালেণ্ডারের ছবি। সিনেমা অভিনেত্রীর। টাঙিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—এ কি করলাম। ছবিটাকে নামিয়ে দিলাম। উপড়ে ফেললাম পেরেকটাও। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। হাতে যেটুকু হাতখরচ দিতেন তা দিয়ে ভালো ছবি কেনা সম্ভব ছিল না। এখন হাতে আমার অনেক অনেক টাকা। এখন বুঝেছি টাকা দিয়ে ছবি কেনা যায় না। আজকাল তাই দূরে থেকে ছবি দেখি শুধু।

'কেন যাচ্ছ ওখানে'

বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলে তুমি।

উত্তর দিই নি। কিন্তু তুমি থামলে না। রাস্তার রিকশাওলার ঝুনঝুন, নানা-রকম মোটরের হর্ন, বাস স্টপে বাসের জন্য অপেক্ষমাণা তরুণীর সপ্রশ্ন দৃষ্টি, আমার পিছনের চাকাটার কচকচ শব্দ সবেতেই যেন মূর্ত হয়ে উঠল তোমার ওই প্রশ্নটা। রাস্তার একটা ছুটন্ত ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে যখন জোরে ব্রেক দিলাম তখন ব্রেকের আওয়াজেও তুমি যেন ধমকে উঠলে—কেন যাচ্ছ ওখানে।

তবু গেলাম।

মনে হল যদিও তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন ওখানে যাচ্ছি কিন্তু তুমি জান, তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না, কেন ওখানে যাচ্ছি। পরে এও মনে হল তুমিই যেন ঠেলে আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে দেবার জন্যে। বার বারই তো তুমি এই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছ। কেন করেছ জানি না যে। বিস্মিত হই বার বার। প্রশ্ন করি, উত্তর পাই না।

গলিতে যখন ঢুকলাম তখন দেখলাম একটা মরা কুকুর রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে। কোনো মোটরের তলায় চাপা পড়েছে সম্ভবত। সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। দুটো কাক চোখ দুটো ঠুকরে খাচ্ছে। পাশেই একটা ভাঙা ডাস্টবিন। ময়লা উপচে পড়ছে। তার পাশেই উড়ছে ফরসা একটা ন্যাকড়ার ফালি। তাতে শৌখিন পাড় লেগে আছে একটু। জরির পাড়। কে ওই শাড়ি পরত, কোথায় সে এখন, তার শাড়ির টুকরো রাস্তায় অমনভাবে উড়ছে কেন, এই সব ভাবনার টুকরোগুলোও মনের মধ্যে এল আর

উড়ে গেল। ন্যাকড়ার ফালিটাও নাচতে নাচতে চলে গেল আমার দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে। সে নাচের মধ্যে একটু ব্যঙ্গের খোঁচাও অনুভব করলাম যেন।

তীব্র উত্তুরে হাওয়া বইছে।

···সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম।

উঠেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মিস মিত্রের ঘরে একটা তালা ঝুলছে। নেম-প্লেট নেই। কয়েক মুহূর্ত আমার নির্বাক দৃষ্টি নীরবে যা বলেছিল তা লিখলে একটা কাব্য হয়। কিন্তু আমি কাব্য করবার চেষ্টা করি নি। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিলাম। নেমে এসে একতলার সেই ভদ্রলোকটিকে ডেকেছিলাম কড়া নেড়ে। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন। ওত পেতে ছিলেন যেন।

'মিস মিত্র কোথা গেছেন বলতে পারেন'

তাঁর মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটল।

বললেন, 'তাঁরা এখান থেকে চলে গেছেন'

'কোথায়'

'জানি না।'

কুড়ি

একটা কথা আমার বার বার মনে জাগছে। শ্রীলতার বাবার ডায়েরিটা না পড়লে ও হয়তো আমার কাছ থেকে এমনভাবে সরে যেত না। যদিও আমি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করি নি, তবু নিগূঢ়ভাবে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে আমি ওর জীবনচরিত সব জেনে ফেলেছি। অনুমান করেছিল। ওর মনে হয়েছিল মুখোশটা তো ছিঁড়ে গেল। এরপর আমার কাছে আর মুখ দেখাতে পারে নি সে। যদি পারত তাহলে কি হত? আমি কি ওকে ঘৃণা করতাম? না ওর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হতাম? ওকে সদুপদেশ দেবার দুর্বুদ্ধি আমার মাথায় জাগত? কি হত তা জানি না। হ্যাঁ, আসল কথা জানি না। মাথায় অকস্মাৎ লাঠি পড়লে বাবা রে বলব, না মাগো বলব, না, কে রে শালা বলব তা যেমন বলা শক্ত, এ-ও তেমনি। এইটুকু বলতে পারি একটি রহস্যময় শূন্যতার মাঝখানে বসে আছি, আর ভারী আরাম বোধ করছি। হ্যাঁ, আরাম। ফোড়াটা ফেটে গেলে যে ধরনের আরাম হয় সেই ধরনের আরাম।

···তুমি হাসছ, তা দেখতে পাচ্ছি। তোমার হাসিটা দেখতে পাচ্ছি সামনের গাছটায় প্রচ্ছন্ন হলদে পাখির পালকের ঝলকে। অথচ তুমি রয়েছ আমার মনের নেপথ্যে। এই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানির খেলা আর কতদিন চালাবে তুমি। এই নিরবচ্ছিন্ন বহু রাগ-রাগিণী-সমন্বিত সংগীত কি সমে এসে কোনোদিন থামবে না? দেখা দেবে না সংগীত সরস্বতী? নির্জন ঘরে একা বসে আছি। এ সময়ে যদি আসতে···মূর্তিমতী হয়ে বলতে যদি কিছু···

দ্বার ঠেলে খুকু প্রবেশ করল।

সঙ্গে একটি অচেনা ভদ্রলোক। খুকু এসে প্রণাম ক'রে বলল, 'ইনি মিস্টার রায়। এর কথা আপনাকে একদিন বলেছিলাম। পুলিসে বড় চাকরি করেন ইনি।'

মিস্টার রায় নমস্কার করলেন।

'আজ আপনার ছুটি তো?'

'হ্যাঁ—'

'আমারও ছুটি। আপনার কাছে এসেছি বিশেষ একটি আশা নিয়ে'

'কি বলুন—'

'ফরমাশ করতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রাননী বলেছিল আপনি অনেকগুলো যন্ত্র বাজাতে পারেন। আমারও সংগীতে সামান্য অনুরাগ আছে। আর আমার ভাবী পত্নী চন্দ্রাননী তো আপনার শিষ্যা। সে হিসেবে হয়তো একটু দাবিও আছে আপনার উপর। যদি কিছু বাজিয়ে শোনান তো কৃতার্থ হব'

খুকুর দিকে চেয়ে দেখলাম।

মাথা হেঁট ক'রে মুচকি মুচকি হাসছে।

সেদিনের সেই অদ্ভুত দিবাস্বপ্নটাও মনে পড়ল। সেই দিবাস্বপ্নে মিস্টার রায়ের যে চেহারা দেখেছিলাম তা একেবারে অন্যরকম। মনে হল সে দেখাটা কি মিথ্যে? যা দেখছি তাই কি সত্যি? যা দেখছি তাও হয়তো আর একটা স্বপ্ন। দার্শনিক চিন্তার স্রোতে কিন্তু বেশীক্ষণ গা ভাসিয়ে থাকতে পারলাম না। শংকরাচার্যের বেদান্তদর্শনকে সরে দাঁড়াতে হল। আবদার-তরল কণ্ঠে খুকু অনুরোধ করল, 'বেহালায় ভৈরবীর আলাপটা ওঁকে শুনিয়ে দিন। নিয়ে আসি বেহালাটা?'

'চল ওই ঘরেই চল'

পাশেই আমার বাজনার একটা আলাদা বড় ঘর আছে। সেইখানেই আমার সব রকম বাজনা থাকে। মেজেতে ফরাশ আর তাকিয়া। পিয়ানো বাজাবার জন্য ছোট একটা টুল আছে পিয়ানোর সামনে। সেই ঘরে গেলাম সবাই। ফরাশেই বসলাম।

...একটু পরেই বেহালায় শুরু হয়ে গেল ভৈরবী। উদাসিনীর আশা আকাঙ্ক্ষা কান্নার সুর বাজতে লাগল। আমার মনের ভিতর আর একটা সুর কিন্তু পল্লবিত হচ্ছিল নানাভাবে। তপতীর কথা কি উনি তুলবেন? সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না তো। পরে বলবেন কি?

...বেহালা বাজতে লাগল। কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম মনে নেই। বোধহয় অনেকক্ষণ। কোথায় যেন তলিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনের মিনতিই যেন ভৈরবীর সুরে সুরে বলছিল—তুলো না, তুলো না তপতীর কথা। স্পর্শ ক'রো না ওকে।

থামতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিস্টার রায়। 'চমৎকার। চমৎকার—'

তখন আমি বললাম, 'এইবার আপনি একটা শোনান'

'ও রে বাবা, আপনার সামনে'

'তাতে কি হয়েছে। বাজান বাজান একটা। কি যন্ত্র বাজান আপনি'

'সেতার নিয়ে টুংটাং করি একটু'

আমার সেতারটা এগিয়ে দিলাম তাঁকে। অনেক পীড়াপীড়ির পর বাজালেন শেষকালে। ভৈরবীই বাজালেন। দেখলাম অপূর্ব বাজান। আমিও উচ্ছ্বসিত হয়ে

তারপর খাবার এল, কফি এল, পান এল, সিগারেট এল।

আমার অনুরোধে খুকুও শেষে গীটারে গজল বাজাল একটা। চমৎকার বাজাল। বেশ শিখেছে। তারপর মিস্টার রায় সসংকোচে বললেন, 'আগামী পনেরই অগ্রহায়ণ আমাদের বিয়ে। যাবেন নিশ্চয়ই। আর একটি অনুরোধ আছে—'

'কি—'

'আপনি যদি আশীর্বাদ ক'রে একটা কবিতা লিখে দেন তাহলে—'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'দেব'

তারপর তারা চলে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম।

সমস্ত শরীরের গ্রন্থিগুলো যেন শিথিল হয়ে গেছে। মহাশূন্যে ঝুলছি, কিন্তু একেবারে নিরালম্ব নয়। অবলম্বন আছে একটা এখনও। তপতী।

মনের দিকে চেয়ে দেখলাম তুমি হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে আছ। নির্নিমেষ চেয়ে আছ। তোমার হাসি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। একটা নিরাকার নির্নিমেষ হাসি, কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারছি না। হাসির মধ্যে একটু ব্যঙ্গেরও আমেজ রয়েছে যেন।

তার পরই খড়্গটা পড়ল।

যে সুতোটা ধরে ঝুলছিলাম সেটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ।

ফোন বাজল।

উঠে গেলাম পাশের ঘরে।

'হ্যালো, কে—ও সৌরভ, অনেক দিন তোমার খবর পাই নি। বদলী হয়েছ? ও শুনি নি তো। কীট্‌সের কবিতার অনুবাদগুলো চাও? ও ভালো হয় নি ভাই। কবিতার অনুবাদ হয় না। আচ্ছা এসো একদিন। দেব তোমাকে, তবে ছাপিও না। তোমার সহকর্মী মিঃ রায় এসেছিলেন। এই একটু আগেই গেলেন। অনেকক্ষণ গানবাজনা হল। আমার পাশের বাড়িতে তার বিয়ে হচ্ছে। শুনেছ? মেয়েটি আমার ছাত্রী। বরযাত্রী আসবে? মিঃ রায় আসতে আমার ভাই একটু ভয় হয়েছিল। ভাবছিলাম যদি তপতীর কথা তোলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না খবর? না, কিছু জানি না তো। খবরের কাগজ আমি পড়ি না—'

সৌরভ বললে, 'ও তুমি তা হলে শোন নি। তপতীর বান্ধবী শ্রীলতা মিত্রের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে পুলিস তপতীকে ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় ধরতে পারে নি। রিভলভার মুখে পুরে সে আত্মহত্যা করেছিল'

এর পরও সৌরভ আরও কি সব যেন বলেছিল। আমি শুনি নি। সে যখন থেমে গেল তখনও আমি রিসিভারটা কানে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চোখের উপর ফুটে উঠেছিল কাঁচা-হাতের বড় বড় অক্ষরে লেখা সেই চিঠিটা—আপনি জয়ী হয়েছেন। এতে খুব খুশী হয়েছি। মুগ্ধ হয়ে গেছি। শতকোটি প্রণাম জানাই···।

জয়ী হয়েছি? আমি?

পাগলের মতো পিয়ানো বাজাচ্ছিলাম। কি বাজাচ্ছিলাম জানি না। সুরের ঝড়

বইছিল শব্দের সমুদ্রে তুফান তুলে। কাঁপছিল চারদিক। ঘরের দেওয়াল, জানলার শার্সি, এমন কি পাখাটাও যেন যোগ দিয়েছিল সুরের সেই তাণ্ডবনৃত্যে। মনে হচ্ছিল অসংখ্য পাখি ডাকছে। বুক-ফাটা কান্নার দ্রুত অতিদ্রুত সুর তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আকাশকে যেন টুকরো টুকরো করতে চাইছে। বিলাপ যেন গর্জন করছে ভর্ৎসনার রূপ ধরে। চতুর্দিক মন্থিত হচ্ছে যেন।

···বাজিয়ে চলেছি···পাগলের মতো বাজিয়ে চলেছি। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। বাজিয়ে চলেছি, কিন্তু কোনো শব্দ নেই।

মৃত্যু হল নাকি আমার ?

চারিদিকে অন্ধকার।

নীরন্ধ্র অন্ধকার।

অন্ধকারেও বসে পিয়ানো বাজিয়ে যাচ্ছি। শব্দ হচ্ছে না। সুর হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। মনের মধ্যে একটা সুরই কেবল নিঃশব্দে বাজছে। নিঃশব্দে সে শুধু একটি কথাই বলছে—মোহ নেই, মোহ নেই, মোহ নেই। নিঃশব্দ নির্মোহ সেই সুরের প্রশান্ত প্রবাহে অবগাহন করছে আমার সমস্ত সত্তা। মোহ নেই, মোহ নেই, মোহ নেই···না, না, না।

ক্রমশ অন্ধকার আলোকিত হল।

দেখলাম একটি জ্যোতির্ময়ী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

তবু চিনতে পারলাম।

তুমি এসেছ।

তারপর আবিষ্কার করলাম, তুমি দাঁড়িয়ে নেই, তুমি চলছ। আমি অনুসরণ করলাম তোমায়। কিন্তু তোমার কাছাকাছি যেতে পারলাম না। তুমি অতি দ্রুত বেগে চলেছ, ক্রমশ আরও দূরে চলে যাচ্ছ। দূরে, দূরে, আরও দূরে। ক্রমশ তোমাকে একটা ক্ষীণ আলোকরেখার মতো মনে হতে লাগল। ক্ষীণ, কিন্তু উজ্জ্বল। ভয় হতে লাগল তোমাকে বুঝি হারিয়ে ফেলব। ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে যেতে হল। সামনে এক নদী। তরঙ্গসংকুল বিরাট নদী। হেঁটে পার হওয়ার উপায় নেই। সাঁতার তো জানি না। তুমি দেখলাম পেরিয়ে গেছ। ওপারে দূরে অনেক দূরে আলোক-রেখাটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। ব্যাকুলভাবে ছোটাছুটি করতে লাগলাম নদীর ধারে।

সহসা আবির্ভূত হল একটা লোক।

'কে আপনি'

'আমি হারু'

'চিনতে পাচ্ছি না'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলেন। অত মন দিয়ে পড়লেন আমার ডায়েরিটা, ভুলে গেলেন সব। আমি মশাই শ্রীলতার বাবা, যার আসল নাম ছিল শিলু—মনে পড়েছে ?'

'পড়েছে। নমস্কার। আপনি এখানে—'

'হ্যাঁ, আপাতত এখানেই আছি। পথভোলা লোককে পথ দেখিয়ে দিই। গোত্ত খাওয়া লোক তো, এ কাজটা পারি। কোথা যাবেন আপনি'

'আমি ওপারে যাব। ওই যে আলোর রেখাটা দেখা যাচ্ছে—'

'ওখানে তো সবাই যেতে পারে না। আমি রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারি, আমি কিন্তু ওখানে যেতে পারি না। বাগানে আটকে পড়ি—'

'বাগান মানে?'

'এই নদী একটা বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাগানটাকে জল যোগান দেওয়াই এই নদীর কাজ'

'কার বাগান'

'তা জানি না। আসুন'

বাগানে পৌঁছলাম গিয়ে।

'অপূর্ব বাগান। ফুলের বাগান। নানা রঙের নানা আকৃতির সহস্র সহস্র ফুল ফুটে আছে চারিদিকে। গন্ধে পরিপূর্ণ আকাশ বাতাস। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হায়ু নিঃশব্দে কখন অন্তর্ধান করেছে বুঝতে পারি নি।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তপতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যেন।

'দাঁড়াবেন না এখানে। বাগান পেরিয়ে যান। দাঁড়িয়ে পড়লে আর এগুতে পারবেন না। উনি আপনার জন্য সমুদ্রের তীরে অপেক্ষা করছেন'

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম।

তপতীকে দেখতে পেলাম না কোথাও।

তপতীর কণ্ঠস্বরই আবার অনুনয়ের সুরে বললে, 'দাঁড়াবেন না, দাঁড়াবেন না, এগিয়ে যান'

এগিয়ে গেলাম।

দ্রুতপদেই এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হল অদৃশ্য কি একটা যেন টানছে আমাকে। আমার সর্বাঙ্গ যেন বিরাট একটা অভিকর্ষের আকর্ষণে ছুটে চলেছে অজানার দিকে। আমি থামতে পাচ্ছি না। আলোকের রেখাটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি শুনতে পেলাম তারপর। দেখলাম রেখা আর রেখা নেই। তুমি দাঁড়িয়ে আছ, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপূর্ব জ্যোতি, অদ্ভুত এক মহিমার পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। সেই পরিমণ্ডলকে ঘিরে যা বিকীরিত হচ্ছে তা কেবল জ্যোতি নয়, শোভা নয়, আলো নয়, ছটা নয়, তা পরিপূর্ণ প্রকাশ। তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম লালের পটভূমিকায় তারপর একটা ছবিতে। তারপর নানা অভিব্যক্তিতে দেখেছি তোমায়, অনুভব করেছি তোমার অনন্যতা, কখনও গানের মীড়ে, কখনও পাখির গানে, কখনও ফুলের হাসিতে, আরও কত অজস্র প্রকাশলীলায়—আজ সে সমস্ত মিলে তুমি সম্পূর্ণ প্রকাশের যে পরিমণ্ডলে মূর্ত হয়েছো তাকে বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই।

তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

তবু তোমাকে চিনেছি।

তোমার পিছনে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন তুমি হাত তুলে বললে, ওই দেখ বন্দরে সোনার তরীরা দাঁড়িয়ে আছে। সব শেষেরটা তোমার তরী।

দেখলাম আমার তরীতেও রামধনু রঙের পতাকা উড়ছে।

রঙ্গ-তুরঙ্গ

উৎসর্গ

রঙ্গ-তুরঙ্গের বিখ্যাত সওয়ার
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী
প্রিয়বরেষু

কল্পনা দেবীরই আরাধনা করছিলাম। তাঁর অনুগ্রহ চাই। তা নাহলে কোন গল্পই লেখা যায় না। আরাধনা করলেই যে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তিনি আকাশ-চারিণী, অনন্ত-বিলাসিনী। তিনি প্রসন্ন হলেই তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব। যে ভাষা তিনি শুনতে পান তা আকুলতার ভাষা। আকুল হয়েই ডাকছিলাম তাঁকে। মাঠে বসেছিলাম। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল। চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম মানুষ চাঁদের বুকে পা দিয়ে এল, কিন্তু চাঁদের হাসি তো একটুও কমে নি। তার স্পর্শে এখনও কুমুদরা ফুটছে আমাদের সরসীতে, হাস্নুহানা রজনীগন্ধারা আকুল হচ্ছে আমাদের বাগানে। কিছুই তো বদলায় নি। ভূগোলে তেপান্তরের মাঠ নেই কিন্তু তবু তেপান্তরের মাঠে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেই চিরকালের রাজপুত্র। তেপান্তরের মাঠে এখন হয়তো শহর বসেছে, কিন্তু সে শহরের নাম আমাদের আনন্দলোকে নেই, রূপকথায় স্থান হয় নি তার। চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম, যত মানুষই নাবুক ওখানে, চাঁদ—আমাদের চাঁদ—যেমন ছিল তেমনি থাকবে। থাকবে, কারণ ও যে দূরের, অনেক দূরের, কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেছি ওকে আমরা। ওর মাটিতে স্বপ্ন নেই। স্বপ্ন আছে আমাদের মনে। সে স্বপ্নের উপর কোনও যন্ত্র নামাতে পারবে না কেউ কোনদিন।

একটা হ্রেষা ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম।

দেখি সামনে প্রকাণ্ড একটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে।

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম ঘোড়া যখন মানুষের ভাষায় কথা কইলো।

"আমাকে কল্পনা দেবী পাঠিয়েছেন। আপনি পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা ভাবছিলেন তাই আমাকে বললেন তুমি ঘোড়ার বেশেই যাও। ওর গল্পকে পিঠে করে নিয়ে যাও ভবিষ্যৎলোকে। ও ভবিষ্যৎলোকের কথাই ভাবছে। অতি-দূর ভবিষ্যতে নিয়ে যাও ওর কাহিনীকে।"

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। নির্বাক হ'য়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

"অতি দূর ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে ?"

"বলেন তো, পৌরাণিক যুগেও নিয়ে যেতে পারি। কল্পনা দেবী আমাকে যা-খুশি করবার অধিকার দিয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি কাল ভোরেই শুরু করুন আপনার গল্প। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠতে পারবেন ?"

"পারব।"

"তাহলে ব্রাহ্ম মুহূর্তেই শুরু করুন।"

ইতি ভূমিকা।

আমার গল্পে আছেন অধ্যাপক চঞ্চল মৌলিক, তাঁর বন্ধু সরোবর সান্যাল, আছে ফুটকি, আছে সোহাগা, আছে নহুষ। এদের নিয়েই গল্প শুরু। পরে আরও অনেকের দেখা পাওয়া যাবে যেমন যেমন আবির্ভূত হবেন তাঁরা।

অতিদূর ভবিষ্যতের যে যুগে গিয়ে অধ্যাপক মৌলিক হাজির হলেন সে যুগের

নাম এ যুগের ভাষায় বলা যাবে না। কড়ি যেমন এ যুগে অচল শতাব্দীর হিসাবও তেমনি অচল হ'য়ে গেছে সে যুগে। সে যুগের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন সূর্যের আলো নাকি পৃথিবীতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে যায়। কতটা ক্ষয়ে যায় তা নাকি তাঁরা সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে মাপতেও পেরেছেন। সেই মাপ অনুসারেই নাকি সময়কেও মাপা হচ্ছে। সে মাপের সংকেতিক চিহ্ন 'ক্ষ'। একটি 'ক্ষ' মানে এক পদ্ম শতাব্দী। অর্থাৎ এক হাজার চক্ষ শতাব্দী। এই মাপ অনুসারে আমাদের শতাব্দী পরমাণুর মতো ছোট্ট হ'য়ে গেছে সে যুগে। অচলও হয়ে গেছে।

চঞ্চল মৌলিক যে যুগে গিয়ে হাজির হলেন তা ক্ষ-৪৯; কবে থেকে 'ক্ষ' এই মাপের সিংহাসন দখল ক'রে আছেন তা জানা নেই, কতদিন থাকবেন তা-ও অবশ্য অজানা। ভবিষ্যতের সবই অজানা। শুধু চঞ্চল মৌলিক নয় তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু সরুও (যাঁর পুরো নাম সরোবর সান্যাল) ছিটকে গিয়ে পড়লেন, এ যুগ থেকে আগামী যুগে। এঁরা বাল্যকালে যখন পাঠশালায় পড়তেন তখন এঁদের দুজনের চেহারা নাকি একরকম ছিল। এখন কিন্তু দু'রকম হয়ে গেছেন দু'জন। সরু খুব সরু হয়ে গেছেন আকারে। মাথায় টাক পড়েছে, নাকটাও হয়ে গেছে খাঁড়ার মতো। সামনের দিকে ঝুঁকে চলেন, অথচ লাঠি নেন না। সরোবর নামটাও সার্থক করেছেন তিনি। খোঁজ করলে তাঁর মধ্যে সরোবরের অনেক কিছু নাকি পাওয়া যায়। শ্যাওলা গুগলি থেকে আরম্ভ ক'রে খলসে, বাটা, পোনা, পাঁক, মশার বাচ্চা এমন কি কুমুদ কহ্লার, পদ্মও নাকি মিলবে তাঁর মধ্যে। চঞ্চল মৌলিক কিন্তু নিজের নাম সার্থক করতে পারেন নি। ছেলেবেলায় নাকি খুব চঞ্চল ছিলেন, এখন কিন্তু মুটিয়ে গেছেন খুব, থপ থপ করে চলেন। মৌলিকতাও কিছু নেই তাঁর। ছাত্রজীবনে বই মুখস্থ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে ভালো নম্বর পেয়েছিলেন। তারই জোরে ভালো কলেজে প্রফেসারি পান একটা। সপ্তাহে পাঁচ ঘণ্টা ক'রে বক্তৃতা দিতেন। মামুলি ভাবে ফুটকি ব'লে একটি মেয়ের প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। পারেন নি। অর্থাৎ কোনও রকম মৌলিকতা ছিল না তাঁর। এখন রিটায়ার করেছেন। ইজিচেয়ারে কিংবা বিছানায় বালিশ ঠেস দিয়ে শুয়ে নভেল নাটক পড়েন। বাছ-বিচার নেই। যা পান তাই পড়েন। মাঝে মাঝে পুরনো বইয়ের দোকানে গিয়ে সস্তায় যা পান কিনে আনেন। ফুটপাথ থেকে বই কিনতেও তাঁকে অনেকে দেখেছে। সুযোগ পেলে পরচর্চাও করেন। এ বিষয়েও বাছ-বিচার নেই। ক্ষেন্তি ঝিয়ের সঙ্গেও করেন, আবার বিদ্বান প্রফেসার, বা ভুঁই-ফোড় নেতাদের সঙ্গেও করেন। যখন যেমন জুটে যায়।

কি করে ছিটকে গিয়ে পড়লেন এঁরা অদ্ভুর ভবিষ্যৎ যুগে ক্ষ-উনপঞ্চাশের খপ্পরে?

যুক্তি-সম্মত উত্তর দেওয়া যাবে না।

যা ঘটেছিল তাই বলছি শুধু।

সেদিন চঞ্চলবাবু যথারীতি কফি খেয়ে একটি নাটক আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়ে। বইটা তিনি ফুটপাথে কিনেছিলেন। কিনেছিলেন 'সোহাগা'

অভিন্ন-হৃদয় বঁধু সরুর ভাবী নাতবউ। এই নাটকের নায়িকার নামও সোহাগা। নাতনী সোহাগা আমেরিকায় পড়তে গেছে। হঠাৎ তার নামটা এই মলাট-ছেঁড়া নামটা দেখে। সোহাগা তাঁর একমাত্র নাতনীর নাম। শুধু তাই নয় সে. তাঁর নাটকের পাতায় দেখে কিনে ফেললেন তিনি বইটা নগদ চার আনা পয়সা খরচ করে। সেই বইটাই পড়তে শুরু করব করব করছিলেন এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন সরু!

বললেন, "মোটা, সোহাগা ভেগেছে।"

সরু চঞ্চলকে মোটা বলে ডাকে।

"ভেগেছে? মানে?"

সোজা হয়ে উঠে বসলেন চঞ্চল।

"নহুষকে চিঠি লিখেছে, আমি ফিরব না। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। আমি অতিদূর আগামী যুগে বে-ঠিকানা হয়ে হারিয়ে গেলাম।"

"আগামী যুগে?"

"তাই তো লিখেছে—"

"আগামী যুগে, মানে?"

"তুমি প্রফেসার মানুষ, মানে-টানে তো তোমারই জানবার কথা।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন চঞ্চল।

"নহুষ কি বলছে?"

"নহুষ চিঠিটা আমাকে দিয়ে চলে গেল। কিছু বললে না। একটু পরে তার ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম ইজি-চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ফুঁক ক'রে যাচ্ছে। একটু গলা-খাঁকারি দিলুম, ভাবান্তর হল না। মনে হল নহুষ—No-হুঁশ হয়ে গেছে।"

নহুষ সরু সান্যালের একমাত্র নাতি। সোহাগার ভাবী পতি।

চঞ্চল মৌলিক ফোনটা তুলে পুলিশ কমিশনারকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সরু হোঁস হোঁস করে নস্যি নিলেন বার দুই।

"তোমাকে তখুনি বারণ করেছিলাম মেয়েটাকে আমেরিকায় পাঠিও না।"

চঞ্চল বাঁ হাত তুলে কথা কইতে বারণ করলেন। ফোনে তিনি একটি বামাকণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। তারপর যা ঘটল তাকে অদ্ভুতই বলতে হয়। তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল, ঢুলু-ঢুলু হয়ে এল চোখ দুটি। তারপর তিনি টলতে লাগলেন।

বিস্মিত সরু জিজ্ঞেস করলেন—"কি হল তোমার?"

"নেশা"

"নেশা?"

"যে মেয়েটি কথা বলছে তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা মাদকতা আছে—অদ্ভুত কি যেন একটা—আমার ঘোর-ঘোর লাগছে—"

"কোন মেয়ে"

"কি জানি। আমি পুলিশ কমিশনারকে রিং করেছিলাম—" মোটার দিকে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সরু। লোকটার ভীমরতি ধরল নাকি!

"ফোনে মেয়ের গলা শুনেই বেসামাল হয়ে পড়লে। কি কাণ্ড!"

"ফুটকির গলা শুনলাম। যে ফুটকিকে যৌবনে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু পাই নি, যে ফুটকির জন্যে দেওয়াল টপকাতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল, যে ফুটকিকে—তুমি তো সবই জান সরু, তোমার কাছে কখনও তো কিছু গোপন করি নি। তুমি তো সব জান—"

"যে ফুটকি টাকার লোভে চুটকি-ওলা ভুসি সিংকে বিয়ে করেছিল আর ঠেকুয়া হজম করতে না পেরে আমাশায় ভুগে ভুগে মারা গিয়েছিল—তার গলা শুনতে পাচ্ছ? রাবিশ! এনসেন্ট হিস্ট্রীর (encient history) হর্ষবর্ধনও ফিরবে না, তোমার ফুটকিও ফিরবে না। যে চল্লিশ বছর আগে মারা গেছে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে তুমি!"

"পেলাম ভাই। আমার কি ইচ্ছে হয়েছিল জান? সেকালে 'সীতা' নাটকে শিশির ভাদুড়ী যেমন—'কে রে কার কণ্ঠস্বর' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আমার ইচ্ছে হয়েছিল তেমনি করে চেঁচিয়ে উঠি। কিন্তু সময় পেলাম না, কট্ করে কেটে দিলে। আমি এখন কি করি সরু—"

শুয়ে পড়। তোমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তুমি বড্ড বেশী খাওয়ার অত্যাচার করছ। সেদিন তোমার এখান থেকে খেয়ে যাওয়ার পর আমার কি অবস্থা হয়েছিল জান? পরদিন বরফ জল দিয়ে শৌচ করতে হয়েছিল। তবু জ্বলুনি কমে নি। তোমার ব্লাড প্রেসার আজকাল কত?"

"ও সব আর মাপাই না আজকাল—"

মোটা অসহায়ের মতো চাইতে লাগলেন ফ্যাল ফ্যাল করে। করুণ কণ্ঠে বললেন—"স্বপ্ন ভীড় করে আসছে মনে। নানা রঙের স্বপ্ন। রাগ করিস নি, এখন কি করি তাই বল,—স্বপ্নে মাথা 'জাম' হয়ে আসছে—"

"নস্যি নাও। নেবে?"

"নিই নি কখনও, নেব?"

"নাও। আমি তো নস্যি নিয়েই মাথা সাফ করি।"

নস্যি নিয়ে চঞ্চল ক্রমাগত হাঁচতে লাগলেন।

"কয়েকবার হাঁচলেই স্বপ্ন-টপ্ন সব বেরিয়ে যাবে। আরও হাঁচ—"

ছিপ ফেলে মৎস্য শিকারী যেমন ফাতনার দিকে চেয়ে থাকে তেমনি ভাবে মোটার দিকে চেয়ে রইলেন সরু। আরও কয়েকটা প্রচণ্ড হাঁচি হল মোটার।

"কি রকম লাগছে এখন?"

"ফাঁড়াটা কেটে গেল বোধহয়। মাথার 'জাম' ভাবটা আর নেই। অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে—"

রুমাল দিয়ে চোখ নাক মুখ মুছতে লাগলেন মোটা।

"হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। স্বপ্নগুলো প্রথম নেবড়ে গেল, তারপর থেবড়ে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল। এখন খুব ক্ষীণ একটা পিঁ পিঁ শুনতে পাচ্ছি কেবল। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে পিকলু বাজাচ্ছে কে যেন।"

"আর এক টিপ নস্যি নেবে?

"না—"

"নাও না বাবা। ব্যাপারটার মুলোচ্ছেদ করে ফেলাই তো ভালো।"

"আর হাঁচতে পারব না। পেটে ব্যথা হয়ে গেছে। অত হে'চেছি বলেই বোধহয় কানে ঝি' ঝি' বাজছে।"

"বাজুক। সোহাগার সম্বন্ধে কি করা যায় সেইটে ভাব আগে। সে আগামী যুগে চলে গেছে এর মানেটা কি। আগামী যুগে যাবে কি করে। যাওয়া যায় না কি। সে-ও পাগল-টাগল হয়ে গেল না তো! আমার সেই ভয়ই হচ্ছে—"

চমকে উঠলেন মোটা।

হকচকিয়ে গেলেন আবার।

"ভাই পিকলু বলছে, আয় আয় আয়। উত্তরে কে যেন বলছে আসছি আসছি আসছি। দ্বৈত কণ্ঠস্বর—"

"কি আপদ! নে আর এক টিপ নে—"

নস্যির ডিবেটা খুলে এগিয়ে ধরলেন সেটা। চঞ্চল হয়তো এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারতেন না, কিন্তু পরমুহূর্তেই যা ঘটল তা আশ্চর্যজনক তো বটেই রোমাঞ্চকরও। কেন জানি না দুজনেরই মনে হল এটা একটা আবির্ভাব। দ্বারপ্রান্তে গুলতি-হাতে যে কিশোর বালকটি এসে দাঁড়াল সে যে রাস্তার সাধারণ ছোঁড়া নয় তা দুজনেই অনুভব করলেন। অপরূপ কান্তি তার। সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে যেন। মাথা ভরতি কালো কোঁকড়া চুল। নয়ন দুটি ইন্দীবরতুল্য, চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত, মুখের হাসি অনুপম।

সে মুচকি হেসে বললে—"নস্যিতে হবে না ফুটকি বললে—"

"ফুটকি!"

মোটার নীচের ঠোঁটটা থর থর করে কাঁপতে লাগল আবার। সরু জিজ্ঞেস করলেন—"ফুটকির খবর জান তুমি?"

"জানি—"

মোটা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"কোথায় সে—"

"ফুটকি অতীত লোকে আছে। সে টেলিফোন গার্লের কণ্ঠে ভর করে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল একটু আগে। কিন্তু আপনি এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তার কথা শুনতে পেলেন না। আমি তখন সেখানে ছিলাম, তাই আমাকেই সে বলে দিলে খবরটা আপনাকে দিতে—"

"তুমি কে—"

"আমি কল্পনা—"

"কল্পনা?"—সরু বললেন—"আমার ধারণা কল্পনা স্ত্রীলিঙ্গ—"

মুচকি হাসলো ছেলেটি।

কিছুক্ষণ হাসি মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—"ভুল ধারণা ওটা। আমি ব্যাকরণের এলাকার বাইরে বাস করি"

মোটা সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে।

"কি খবর পাঠিয়েছে ফুটকি?"

"খবর তো শুনলেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। সে আমাকে অনুরোধ করছে আপনারা যদি আগামী যুগে যেতে চান তার ব্যবস্থা যেন আমি করে দি"

"ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি?"

"নিশ্চয় পারব। এই যে গুলতি এনেছি। গুলতির উপর এই যে ছোট চামড়াটি দেখছেন তার উপর আপনারা উঠে বসুন, আপনাদের এক নিমেষে আমি ছুঁড়ে দেব আগামী যুগে—"

সরু হেসে উঠলেন।

"তুমি উন্মাদ না কি। গুলতির ওইটুকু চামড়ায় আমরা দুজন বসব কি করে?"

"চামড়া বড় হয়ে যাবে, গুলতিও বড় হয়ে যাবে—"

"তুমি ছুঁড়বে কি করে?"

"আমিও বড় হয়ে যাব। দেখবেন? দেখুন।" দেখতে দেখতে কিশোর-বালক রূপান্তরিত হল এক বিরাট দৈত্যে। ছোট গুলতি হল বিরাট গুলতি। গুলতির চামড়াটা হয়ে গেল দোলনার মত। দোলনার চারদিকে ফুলের সমারোহ। মনে হল—রবীন্দ্রনাথ এইটে দেখেই বোধহয় লিখেছিলেন, 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা'—"

বিস্ময়ে সরু মোটা দুজনেরই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে সরু বললেন—"কি কাণ্ড!"

মোটার মনে একটা নূতন বাসনা জাগল। বললেন, "যদি ফুটকির কাছে যেতে চাই আমাদের অতীত যুগেও ছুঁড়ে দিতে পার?"

"পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনার সুবিধা হবে না। কারণ আপনার স্ত্রী জগদম্বাও সেখানে আছেন। ফুটকির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁর। ভিতরের কথা তিনি সব জেনেছেন। সেখানে আপনি গিয়ে পেঁছিলে একটা ধুন্দুমার বেঁধে যাবার সম্ভাবনা। অতীত যুগে এখনও প্রচুর ঝাঁটা আছে। তবে একটা কথা শুনলে আপনি হয়তো সান্ত্বনা পাবেন। ফুটকির এখনও দুর্বলতা আছে আপনার সম্বন্ধে। তাই সে টেলিফোন গার্লের কণ্ঠস্বরে ভর করে আপনার বিপদের সময় সাহায্য করতে চাইছিল, কিন্তু আপনি বেসামাল হয়ে পড়লেন। ফুটকিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে—"

সরু একটু চটেছিলেন।

"মোটা একটা কথা শুনবি?"

"কি—"

"ফরগেট্ ফুটকি"

বলেই নস্যির কোটো বার করে জোরে জোরে নস্যি নিতে লাগলেন।

"নস্যিটাও ফুরিয়ে গেল—"

দৈত্য বললেন—"যদি আগামী যুগে যেতে চান আর দেরি করবেন না। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

"আবার কোথায় যাবে?"

"তা আপনাকে বলা যাবে না। আসুন—"

"আপনি তো ছুঁড়ে দেবেন বলছেন, তারপর কোথাও পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে না তো"

"না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। খুব আস্তে নাবিয়ে দেব আপনাদের"

সরু মোটা দুজনেই চ'ড়ে বসলেন গুলতির উপর। বসে ভারি আরাম পেলেন।

চড়েই কিন্তু নেবে পড়লেন মোটা।

"চেক বুকটা নিয়ে যাই। আমাদের চেক আগামী যুগে চলবে তো"

"আপনার ব্যাঙ্কে যদি টাকা থাকে তাহলে আপনাদের চেক ওরা নেবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলে নেবে ঠিক। ওরা বিজ্ঞানে অদ্ভুত উন্নতি করেছে। কোথা থেকে যে কি করে ফেলে তাজ্জব ব'নে যেতে হয়। নিয়ে নিন চেক বুকটা। ওদের কারেন্সি কিন্তু খোলামকুচিতে। খোলামকুচির উপর স্ট্যাম্প মেরে দেয়—"

মোটা তাড়াতাড়ি চেক বুকটা বার ক'রে নিয়ে নিলেন।

"আসুন, আর দেরি করবেন না।"

আগামী যুগে ক্ষ-৪৯এ গিয়ে হাজির হলেন সরু মোটা। ফুলের মতন পড়লেন যেন আকাশ থেকে। একটুও কষ্ট হল না। পড়লেন যে রাস্তার উপর তা সোনা দিয়ে বাঁধানো। সব রাস্তাই সোনা দিয়ে বাঁধানো। বাড়িগুলো রঙীন প্ল্যাসটিকের। স্বপ্নপুরী যেন। ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই। হাওয়ায় গানের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কে গাইছে বোঝা যাচ্ছে না।

অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা।

সরু বললেন, "লোকজন দোকানপাট কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। নস্যি কিনতে হবে যে, একদম ফুরিয়ে গেছে—"

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশের ছোট একটা ঢাকনি খুলে গেল আর তার থেকে বেরিয়ে এল একটা মোটা নল। নলের গায়ে মানুষের ছবি।

"এ কি রে বাবা। নলের গায়ে মানুষের ছবি দেখছি। সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে, মোটা,—"

নলের ভিতর থেকে শব্দ হল—"খেৎ খেৎ!"

তারপরই সাইরেন বেজে উঠল। নলটা ঢুকে গেল মাটির তলায়। ঢাকনি বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা নল ছুটে এল চারদিক থেকে। একটা নল বলল, "কে আপনারা, কোথা থেকে এসেছেন?"

মোটা অধ্যাপক লোক তিনি গুছিয়ে উত্তর দিলেন।

"আমাদের পরিচয় আমরা ভারতবাসী। এখনই সেখান থেকে এসেছি। এখন সেখানে ইংরেজি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ, বাংলা ১৩৭৫ সাল, স্বাধীন ভারতের ১৮৯০ শকাব্দ—"

"ও, আপনারা প্রাচীন ইতিহাসের লোক দেখছি। আসুন, স্বাগত। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আপনাদের পেয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে। অতীতের রোমান্স এখনও আমাদের মন থেকে লোপ পায় নি—"

পাশের নলটি ধমক দিল—"খেৎ, খেৎ—"

প্রথমে যিনি কথা বলছিলেন তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে থেমে গেলেন।

তারপর বললেন, "সেকেলে কুসংস্কার মরেও মরতে চায় না। মাঝে মাঝে তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি। আমাদের সঙ্গে সর্বদাই তাই লোক থাকে একজন। 'ধেৎ ধেৎ' বলে সাবধান করে দেয়। আপনাদের ভাষায় 'ধেৎ ধেৎ'-এর তর্জমা করলে হবে 'কি বাজে বকছেন'। আমাদের অত কথা বলবারও সময় নেই। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে তাই একটা নল ঘোরে আমাদের সংযত করে দেবার জন্য। নলের ভিতর একটা যন্ত্র আছে সেটা টিপলেই 'ধেৎ ধেৎ' আওয়াজ বেরোয়। আসুন।"

"আমাদের আপনি প্রাচীন ইতিহাসের লোক বলছেন?"

"হ্যাঁ অতি প্রাচীন। এখন ভারত-টারত বলে কিছু আর নেই। সব সীমান্ত লোপ পেয়েছে এখন। যতদূর মনে পড়ছে প্রাচীন জগতের একজন মনীষী—ওয়েন্ডেল উইলকি—ওয়ান ওয়ার্ল্ড (One world) বলে একটা বই লিখেছিলেন—"

"পড়েছি, পড়েছি"—মোটা বললেন।

"নস্যি কোথায় পাওয়া যাবে বলুন তো। আমার নস্যি একদম ফুরিয়ে গেছে—"

সরু বলে উঠলেন হঠাৎ।

"নস্যি, দোক্তা, সিগারেট, বিড়ি, হুঁকো গড়গড়া এ সব মিউজিয়মে আছে। বাজারে পাবেন না।"

"তাই না কি। তাহলে উপায়। আমার তো নস্যি না হলে চলবে না—নেশা তো—"

"নেশার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে। ঢুকুন এর ভিতরে, না না, ভয়ের কিছু নেই। আমরা সবাই নলের ভিতর ঢুকেই বাইরে ঘোরা-ফেরা করি। স্বরূপে রাস্তায় বেরোবার নিয়ম নেই। মানবজাতির সাম্য স্বপ্ন সফল করবার চেষ্টা করছি আমরা। আগে সুন্দর-কুৎসিৎ, রোগা-মোটা, লম্বা-বেঁটে, ফরসা-কালো এসব নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে মানব-সমাজে। ধরুন, ক্লিওপেট্রা বা মার্ক অ্যান্টনির সাক্ষাৎ যদি নলের মাধ্যমে হত তাহলে ইতিহাসের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। প্রণয়কে কেন্দ্র করে যেসব কাণ্ড আগে হয়েছে তার অবশ্য একটা অন্যদিকও আছে—"

"ধেৎ, ধেৎ"

সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলো পাশের নলটি।

থেমে গেলেন ভদ্রলোক। সাইরেনের শব্দ হল আবার। দুটি নল এগিয়ে এল। নলের পরিধি বেশ বড়। অনেকটা স্টীমারের চোঙের মতো। নীচে রবারের ছোট ছোট চাকা আছে। নল দুটির কপাট খুলে গেল। দেখা গেল চমৎকার একটি চেয়ারের উপর শোভনীয় একটি কুশন পাতা রয়েছে।

"ঢুকে পড়ুন ওতে। না না, ভয়ের কোনও কারণ নেই। ও নল স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্র। সেকালের পুষ্পকরথের আধুনিক সংস্করণ। কোন সারথি নেই। কিন্তু যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন সেইখানে নিয়ে যাবে আপনাকে। আপনি রোগা, আপনি মোটা, কিন্তু আপনারা ঢুকলেই ও নল সঙ্কুচিত বা বিস্ফারিত হয়ে আপনাদের স্থান করে দেবে। ঢুকুন কোন ভয় নেই।"

"আমার নস্যির ব্যবস্থাটা কখন করবেন ?"

"এখুনি, চলুন, বিজ্ঞান পাড়ায় যাওয়া যাক। নলে চড়ে বলুন, আমাকে বিজ্ঞানপাড়ায় নিয়ে চল, ঠিক নিয়ে যাবে। নস্যি ঠিক পাবেন কিনা বলতে পারি না, কিন্তু ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।"

"আমার মশাই কিধে পেয়েছে—"

বলেই মোটা বোকার মত সলজ্জ হাসি হাসলেন একটা।

"সে ব্যবস্থাও হবে"

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

"বাই, আইনস্টাইন, সেকালের চমৎকার দুটি জীবন্ত নমুনা হাজির হয়েছেন আপনারা। চমৎকার, চমৎকার, চলুন—"

মোটার আত্মসম্মানে বোধহয় একটু আঘাত লাগল।

বললেন, "আইনস্টাইনও তো সেকালের লোক মশাই—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেকালই তো একালের জন্য সিঁড়ি তৈরী করেছে। সেকালকে খেলো করবার স্পর্ধা আমার নেই। আপনাদের পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। চলুন, চলুন।"

নলে ঢুকে পড়লেন তাঁরা।

বিজ্ঞান পাড়ায় গিয়ে তাম্রকুট বিভাগে হাজির হলেন সবাই। সে বিভাগের অধ্যক্ষও একটি নলের ভিতর বসেছিলেন। যিনি সরু মোটাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন,—"তা'-মশাই প্রাচীন ইতিহাস থেকে দুটি ভদ্রলোক এসেছেন। নমুনা হিসাবে দুজনেই অপরূপ। একজন নস্যি খুঁজছেন, তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম। ওঁর নস্যির নেশাটা মিটিয়ে দিন। কষ্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক—"

"অবশ্যই দেব"

সরু মোটা দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দু'জনের ঠিক এক কণ্ঠস্বর।

সরু কথা কইলেন—"মোটা—"

"কি" —উত্তর দিলেন মোটা।

ঠিক একই কণ্ঠস্বর। দু'জনের আওয়াজ দু'রকম নয়, একরকম। বাঁশীর মত। নিশ্চয়ই যন্ত্রের কৌশল। আশ্চর্য হয়ে গেলেন দুজনে। একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল।

"আর একটু কাছে সরে আসুন—"

"কি রকম নস্যি দেবেন ? আমি র মাদ্রাজি নিই।"

"আমি নস্যি দেব না। যে যে শিরা-উপশিরা নস্যি নিলে উত্তেজিত হয় আমি তাদেরই উত্তেজিত করব আর আপনি নস্যি নেওয়ার সুখ উপভোগ করবেন।"

"বলেন কি মশাই, নস্যি দেবেন না ?"

"চুপ করে বসে থাকুন—"

"নাবব ?"

"না। আমি এখান থেকেই সব করছি। নাববার দরকার নেই"

সরু যে নলে বসেছিলেন তার পিছন দিকের জানলা খুলে গেল। খুট করে

শব্দ হ'ল একটা। সঙ্গে সঙ্গে মুখোশের মতো একটা জিনিস গপ্ করে বসে গেল সরুর মাথায়।

"বাপ রে—"

অস্ফুট কণ্ঠ শোনা গেল সরুর।

অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনালো।

মোটা এমনিতেই বেশ ভয় পেয়েছিলেন। সরুর আর্তনাদ শুনে আরও ঘাবড়ে গেলেন।

"সরু, সরু, কি হল ভাই।"

সরু নীরব।

"কোন ভয় নেই। আপনি চেঁচামেচি করবেন না।"

ধমকে উঠলেন 'তা'-মশাই।

তবু চেঁচামেচি করতে লাগলেন মোটা। ফট্ করে মোটার নলের পিছন দিকের জানলাও খুলে গেল এবং একটা গ্যাগ্ এসে চেপে ধরল মোটার মুখ। নিঃশব্দ হয়ে গেল মোটাও। তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হল।

একালের হিসাবে মিনিট দশেক কাটল।

"বাস্ হয়ে গেছে। আর নস্যি নেওয়ার ইচ্ছে থাকবে না" সম্ভবত তা-মশাই বললেন এটা।

সরুর মুখ থেকে মুখোশ সরে গেল, মোটার মুখ থেকে গ্যাগ্।

"এবার ইতিহাসের পাড়ায় চলুন।"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

"সে ব্যবস্থাও হবে। ই-মশাই খা-মশাইকে খবর দিলেই কিছু খাবার এসে যাবে। চলুন। আপনাদের নলকে বলুন ইতিহাসের পাড়ায় চল।"

ইতিহাস পাড়ার দিকে অগ্রসর হলেন সরু, মোটা, অ-মশাই (অভ্যর্থনা বিভাগের অধিকর্তা) এবং তাঁর সহিস, যিনি মাঝে মাঝে 'ধেৎ ধেৎ' বলে রাশ টেনে ধরেন তাঁর।

ইতিহাস-পাড়ায় ই-মশাইও একটা বিরাট ঘরের মধ্যে ছিলেন একটা নলের ভিতর।

অ-মশাইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ই-মশাই, জীবন্ত ইতিহাস নিয়ে এসেছি আমি। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের জলজ্যান্ত দু'জন লোককে। একজন নস্যি নিতে চাইছেন, আর একজন খাবার খেতে চাইছেন। নস্যির ব্যবস্থা তা-মশাই করেছেন আপনি আর এক জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন"

সরু বললেন—"আমারও খিদে পেয়েছে খুব"

"বেশ আপনার খাওয়ার ব্যবস্থাও হবে"

"তুই কেমন আছিস সরু"

মোটা প্রশ্ন করলেন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে।

"বুঁদ হয়ে গেছি। খাসা লাগছে। আসল নস্যি নিয়েও এত ভালো কখনও লাগে নি"

ই-মশাই নলের ভিতর বসেই যোগাযোগ করেছিলেন খা-মশায়ের সঙ্গে।

বলছিলেন—"১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের দু'জন লোককে নিয়ে এসেছেন অ-মশাই। তাঁদের খিদে পেয়েছে। হ্যাঁ, তাঁদের পেট আছে বই কি। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মানুষ ও'রা। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি ও'দের। আচ্ছা, আপনারা কি খেতে চান বলুন তো"

মোটা বললেন, "মাছের ঝোল ভাত পেলেই চলবে আপাতত। খাওয়ার শেষে একটু ক্ষীর বা পায়েস পেলে খুশি হব"

সরু বললে—"আমি ফুচকা খাব। লাইট খাবার খেতে চাই। ফুচকা খুব হাল্কা জিনিস"

ই-মশাই খ-মশাইকে একথা বলতেই তিনি বললেন, "তা তো অসম্ভব। আপনি তো জানেন আমাদের দেশের কোন লোকেরই পেট নেই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সার্জনরা আমাদের পেট বাদ দিয়েছেন। এখন সব খাবার ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়ে দেওয়া হয়—হ্যাঁ ভালো কথা আপনার ইন্‌জেক্‌শন্‌ নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আসবেন একদিন। আপনি তো জানেনই আমরা সব খাদ্যকে জলীয় করে অ্যামপুলে পুরে ফেলেছি। সেই অ্যামপুলই পাঠিয়ে দিচ্ছি গোটাকতক—"

"আরে এসব তো আমি জানি। কিন্তু ও'রা অতিথি সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন। শুধু অতিথি নয়, মহামান্য অতিথি, সেকালে যাঁদের ভি, আই, পি, বলা হত অনেকটা সেই রকম। এ'দের সাধ অপূর্ণ রাখাটা কি ঠিক হবে? এ'দের একজন নস্যি চেয়েছিলেন, অ-মশাই তা-মশাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি অ্যাটমিক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর মনে নস্যি নেওয়ার অনুভূতি সঞ্চার করেছেন। কিন্তু আমার মতে তাঁর জন্যে নস্যির ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল। এক কাজ করুন। "যা-খুশী" বড়ি আর আছে আপনার কাছে?"

খা-মশাই বললেন, "মাত্র দুটি আছে। ও বড়ি তৈরি করতে বেশী খরচ হয় তাই বেশী করি নি। মোটে দশটি করেছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রেসিডেণ্টই তো আটটি নিয়ে নিয়েছেন"

"আচ্ছা ও দুটো পাঠিয়ে দিন। আমার নামেই খরচ লিখুন, আমি এর জবাবদিহি করব। আমাদের সংবিধানে লেখা আছে যে বাইরের অতিথিদের আমরা সম্যক পরিচর্যা করব, খরচ যতই হোক। অতীতে ভারতবর্ষে অতিথিবৎসলতা গৃহস্থের মহৎ গুণ ব'লে বিবেচিত হ'ত। পুরাণে পড়েছি মহামতি কর্ণ—"

"থেৎ থেৎ—"

পাশের একটি নল থেকে সহিস রাশ টেনে ধরলেন। থেমে গেলেন ই-মশাই।

একটু পরেই এসে গেল দুটি "যা-খুশী" বড়ি। বড়ি দুটি ই-মশায়ের নলের মধ্যে এসেছিল। তিনি যন্ত্রযোগে সে দুটি চালান ক'রে দিলেন সরু আর মোটার নলে।

বললেন—"আপনাদের জন্য "যা-খুশী" বড়ি আনিয়েছি। পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলুন। এ অদ্ভুত বড়ি। বড়ি খাওয়ার পর যা খুশী করতে পারবেন। আপনাদের কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে না।"

বড়ি দুটি টপটপ গিলে ফেললেন সরু মোটা।

"খেয়েছি। এইবার কি করব"

"এইবার ইচ্ছা করুন কি খেতে চান। আপনাদের নলের মধ্যেই খাবার এসে যাবে"

সত্যিই মোটার নলের মধ্যে মাছের ঝোল ভাত আর ক্ষীর এসে গেল চমৎকার বাসনে বাহিত হয়ে। সরুর নলে এল ফুচকা আর এল চমৎকার মশলা দেওয়া ফুচকার সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়ার তেঁতুল জল। অদৃশ্য হস্ত যেন সাজিয়ে দিয়ে গেল তাদের সামনে। ফুরিয়ে গেলে আবার পরিবেশন করল। সপাসপ আর মুচমুচ আওয়াজ বেরুতে লাগল মোটা আর সরুর নল থেকে। স্ফটিকপাত্রে কেওড়া দেওয়া ঠাণ্ডা জল আর সোনার ডিবের চমৎকার মিঠে পানও এল। সরু মোটা দু'জনেই ভারি তৃপ্তি পেলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারি তৃপ্তি পেলাম। প্রথম প্রথম আমাদের একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু আপনাদের আতিথেয়তা, ভদ্রতা আর নিপুণতা—"

সাঁহিস সাবধান করলেন, "ধেৎ, ধেৎ—"

মোটার উচ্ছ্বাস নিবে গেল।

সরু মনে মনে বললেন, "ভদ্রতা না কচু। কথার মাঝখানে ধেৎ ধেৎ করাটা কি ভদ্রতা না কি।"

অ-মশাই বললেন, "ই-মশাই আমি যাই তাহলে। আমার কাজ আছে। এঁরা আপনার কাছেই থাকুন"

"বেশ"

স-সাঁহিস অ-মশাই চলে গেলেন।

ই-মশাইয়ের সাঁহিস গেলেন না।

ই-মশাই তখন সরু-মোটার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন।

"এইবার আপনাদের দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করব। উত্তর দেবেন আশা করি। একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দিই। অসত্য কিছু বলবেন না। এখানে মিথ্যা বললেই সেটা ধরা পড়ে যায় সত্য-যন্ত্রে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে ওঠে। সে এক মহা ঝামেলা। সুতরাং অনুরোধ করছি—"

"না না, মিথ্যে বলব কেন। আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক। কি জানতে চান বলুন"

"আর একটা কথা মনে রাখবেন। আপনারা যা বলবেন তা যন্ত্রে রেকর্ডেড হয়ে যাবে।"

"একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে। মিথ্যে কথা কেউ যদি বলে তাহলে সেটা সত্য-যন্ত্রে ধরা পড়ে কি করে?"

"মিথ্যা বলবার সময় প্রত্যেক লোকেরই মস্তিষ্কে একটা বোধ জাগে যে সে মিথ্যা ভাষণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্ক থেকে একটা অদৃশ্য ঢেউ উঠে আন্দোলিত করে ইথারকে। সেই আন্দোলন ধরা পড়ে সত্য-যন্ত্রে।"

"উপন্যাস বা গল্প লেখা হয় না এখানে? সেগুলোও তো মিথ্যে।"

"লেখক গোড়াতেই যদি স্বীকার করে নেন যে তিনি কাল্পনিক কিছু সৃষ্টি করছেন তাহলে সেটা আর মিথ্যা বলে ধরা হয় না। সেগুলো রেকর্ডেড হয়। এখানে ছাপা হয় না কিছু। লেখার রেওয়াজও উঠে গেছে অনেকদিন।"

সরু বললেন, "অদ্ভুত আজব দেশে এসেছি তো! নিন এখন কি জিজ্ঞেস করবেন বলুন। মোটা তুমিই উত্তর দাও—"

ই-মশায় প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কেন এসেছেন এখানে"

"আমার নাতনী এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকে খুঁজতেই এসেছি আমরা"

"নাতনী? দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনাদের নাতি-নাতনী হয়, না?"

"হয় বই কি। আপনাদের হয় না?"

"একদম না। আমাদের কারও সঙ্গে কারোর রক্তের সম্পর্ক নেই। আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছি সে নীতির মর্ম হচ্ছে যে কৃত্রিমতাই মানব-সভ্যতার মানদণ্ড। যে যত কৃত্রিম সে তত সভ্য। যে যত অকৃত্রিম, যে যত স্বাভাবিক সে তত অসভ্য। আমার মা বাবা কেউ নেই, অন্তত আমি তাদের খবর জানি না, খবর জানবার উপায়ও নেই। ফ্যাক্টরিতে আমার জন্ম। শুধু আমার কেন, আমাদের সকলেরই। আত্মীয়-স্বজন বলতে আপনারা যা বোঝেন তা আমাদের নেই"

"কি রকম? আশ্চর্য তো। বাপ-মার খবর জানেন না? আত্মীয়-স্বজন নেই?"

"না। বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি হয়েছে। আমরা সব টেস্টটিউবে (test tube) জন্মগ্রহণ করেছি। খাবার খেয়েছি কৃত্রিম যন্ত্রে, স্তন্যপান করিনি কখনও"

"বলেন কি মশাই!"

"সত্যি কথাই বলছি। আমরা প্রকৃতির সন্তান নই, আমরা বিজ্ঞান-চর্চার ফল, বুদ্ধির ফসল। আপনারা যে ধরণের সুখ দুঃখে কম্পিত হন তা আমাদের নেই। নাতনীর খোঁজে আমরা কোনদিন বেরুব না। আপনারা যাকে আপনজন বলেন, তা আমাদের নেই, আমরা প্রগতির প্রতীক মাত্র। আমাদের স্নেহ ভালবাসা প্রেম ঘৃণা—"

"ধেৎ ধেৎ—"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে হল ই মশাইকে।

"আপনার নাতনী পালিয়ে এসেছেন এখানে? কোথা থেকে এলেন, কেমন করে এলেন, বলতে পারেন?"

মোটাই উত্তর দিলেন। সরু অ্যাটমিক নস্যি নিয়ে বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিলেন তিনি।

"মেয়েটা আমেরিকায় ফিজিক্স পড়তে গিয়েছিল। সেখান থেকেই সে এখানে এসেছে। অন্তত এই কথাই জানিয়েছে আমাদের। লিখেছে আমি অতি দূরে আগামী যুগে বেঠিকানা হয়ে হারিয়ে গেলাম—"

"কি করে এসেছেন তিনি এখানে তার কোনও আন্দাজ দিতে পারবেন?"

"না। হয়তো আমরা যেমন করে এসেছি সেও তেমনি ভাবে এসেছে"

"আপনারা কি করে এলেন?"

"কল্পনার গুলতির সাহায্যে—"

"ও, বাই ফ্যান্‌সি—কল্পনা—হ্যাঁ আমাদেরও কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। সে যুগের সঙ্গে এ যুগের যোগাযোগ তিনিই করেছেন। আরও ভবিষ্যৎ যুগের আভাসও দিয়েছেন। চন্দ্রলোক থেকে বরফের চাঙড় এনে তা গলিয়ে জল করে

জল থেকে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পাবার সম্ভাবনা রয়েছে এর আভাস উনিই দিয়েছেন। উনিই বি-মশাইকে জানিয়েছেন চাঁদের উপরের ওই ধুলো আছে তা হয়তো সিমেন্টের চেয়ে ভালো—ভালো কিনা অবশ্য পরীক্ষা করে দেখা উচিত—বি-মশায়ের মগজে কল্পনা প্রায়ই প্রভাব বিস্তার করে—"

"বি-মশাই কে?"

"বিজ্ঞান-বিভাগের অধিকর্তা। আমাদের নাম সব আমাদের বিভাগের আদ্যক্ষর দিয়ে হয়। থাক সে কথা, আপনার মাস্তনীকে চিনব কি করে আমরা"

"তার নাম সোহাগা। চিবুকে একটি তিল আছে। রূপসী। ইন্দ্রাণী হবার যোগ্যতা রাখে সে"

"তাই নাকি। তাহলে একটা খবর দিই আপনাকে। কয়েকদিন আগে স্বয়ং ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন। তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন ব্রহ্মহত্যা করেছিলেন বলে। এখন গা-ঢাকা দিয়ে 'টুর' করে বেড়াচ্ছেন—"

"ইন্দ্র? তিনি কি করে এলেন পৌরাণিক যুগ থেকে?"

"আপনারা যেমন করে এসেছেন। কল্পনাই তো সবাইকে 'পাস' দেন। সাহায্য করলে যে কোন লোক অতীত ভবিষ্যৎ সব লোকেই যেতে পারেন। তিনিই একমাত্র এরোপ্লেন যা অনায়াসে ত্রিলোক বিহার করতে পারেন। তিনিই—"

"ধেৎ ধেৎ"

"ও একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। সোহাগা নাম মেয়েটির? নাম নিয়ে সুবিধে হবে না। এখানে কারো নাম নেই, কারও নাম সম্বন্ধে কারও কোনও ঔৎসুক্যও নেই। তবে ও'র চিবুকের তিলটা হয়তো কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকবে। চোখ দুটো কেমন?"

"পদ্মপলাশলোচন।"

"নাক"

"কবিভাষায় বললে, বলতে হবে—তিলফুল জিনি। অর্থাৎ অবর্ণনীয়"

"ও বাবা এ তো সাংঘাতিক মাল দেখছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপনার বন্ধুটি আপনার সঙ্গে এসেছেন কেন? ও'রও কেউ পালিয়ে এসেছে নাকি"

লম্বু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

সে গান গেয়ে উঠল হেঁড়েগলায়—"কাত হয়ে পড়েছি দাদা হারিয়ে গেছে

"গান গাইছেন কেন?"

আবার গান গেয়েই উত্তর দিলেন তিনি।

"বুঁদ হয়ে গেছি দাদা, অবশ হয়ে গেছি"

তারপর অবশ্য তিনি হেসে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "কামাল করেছেন আপনাদের বি-মশাই। এমন নস্যি কথনও নিই নি"

"তাই গান গেয়ে ফেললেন"

"আমি আগে যাত্রার দলে ভিড়েছিলাম মশাই। তাই গান গেয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। এসব কথা ছেড়ে দিন। আমার মাস্তবৌকে খুঁজে বার ক'রে—"

"আপনার মাস্তবৌয়ের নাম কি? কেমন দেখতে"

"ওই সোহাগা মুখপুড়ির সঙ্গেই আমার নাতি মহুয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। যদিও এখনও বিয়ে হয় নি তবু ওকে আমি নাতবৌ বলেই ভাবি। আর ওকে আমি নাতবৌ করবই। খুঁজে দিন আপনারা, হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব। মহুয়ের মনে দাগা দিয়ে চলে এসেছে চণ্ডী মেয়েটা। ভয় হচ্ছে মহুর সন্ন্যাসী না হ'য়ে যায়—"

"খুব কষ্ট হয়েছে দেখছি আপনার"

"প্রাস রাগ"

ই-মশাই চুপ ক'রে রইলেন।

"ধরে দিতে পারবেন তো ?"

"চেষ্টা তো করবই। ভাবছি আগে স-মশাইকে খবর দেব, না একেবারেই চু-মশাইকে বলব"

"ও'রা কে—"

"স-মশাই হচ্ছেন সন্ধান-বিভাগের অধিকর্তা আর চু-মশাই চুম্বক বিভাগের। চু-মশাই যদিও পদার্থ বিজ্ঞানের চুম্বক নিয়েই নানা গবেষণা করেন, কিন্তু তিনি সম্প্রতি আর একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। আবিষ্কার করেছেন মনশ্চুম্বক। ওই চুম্বক চালু ক'রে দিলে ফেরারি আসামী জাতীয় লোকেরাও ধরা প'ড়ে যায়। আমি ভাবছি আপনার নাতনী কি ফেরারি আসামীর পর্যায় পড়বে ?"

মোটা বললেন, "না, না তা পড়বে কেন—"

"আলবৎ পড়বে"—সজোরে প্রতিবাদ করলেন মনু—

"ও চোর, মন-চোর। মহুষটাকে একেবারে ফতুর ক'রে দিয়েছে। সে ছোকরা ক্রমাগত সিগারেটে রিং ক'রে যাচ্ছে। শালী কম পাজি না কি। চু-মশাইকে খবর দিন আপনি"

ই-মশাই চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল

তারপর বললেন, "আচ্ছা স-মশাইকে জিজ্ঞেস করি কি করা উচিত। তবে তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেতে দেরি হবে একটু। কারণ, প্রথমত উনি কানে কম শোনেন, দ্বিতীয়ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ব'লে কোন কথার চট্ ক'রে উত্তর দিতে চান না। ততক্ষণ আপনারা এক কাজ করুন না। পাশের ঘরে চ'লে যান। সেখানে সিনেমা দেখবার ব্যবস্থা আছে। নানারকম ডকুমেণ্টারি ছবি করেছি আমরা। আপনাদের যুগে যা হ'ত তা ছবি ক'রে রেখে দিয়েছি। দেখে ভালো লাগবে। খুব ছোট ছোট ছবি। ছ-মশাই বুঝিয়ে দেবেন আপনাদের। একটা কথা মনে রাখবেন— এ যুগে ওসব ঘটনা আর ঘটে না। আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। আপনাদের যুগ এখন আমাদের কাছে ইতিহাসের ছবি মাত্র। আপনারা আপনাদের যুগে যেমন ইতিহাসের বইয়ে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের ছবি, রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ছবি, জুলু দেশে মেয়েদের ছবি, নাদির, তৈমুর, চেংগিসের ছবি দেখেছেন—এও অনেকটা তেমনি। ওতে আপনারা নিজেদের স্বরূপ দেখে আনন্দ পাবেন। নিজের ছেলে-বেলার উলঙ্গ ছবি দেখলে যেমন মজা লাগে ওই সব ছবি দেখে সেই রকম মজা পাই আমরা। আপনারাও পাবেন। পাশের ঘরে চলে যান, আমি ছ-মশাইকে বলে দিচ্ছি। আপনারা সবাকে বলুন ছবির ঘরে নিয়ে চল তাহলেই নিয়ে যাবে। আমি ততক্ষণ স-মশাইয়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করি"

সরু ও মোটা নল-বাহিত হ'য়ে উপনীত হলেন পাশের ঘরে।

ছু-মশাই ব'লে যাচ্ছিলেন।

"ওই দেখুন গুণ্ডার দল একটি অসহায় কুমারী মেয়ের উপর বলাৎকার করছে। এ ঘটনা প্রায়ই হ'ত আপনাদের যুগে। এর চেয়ে আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হ'ত যখন সে মেয়েকে সমাজ গ্রহণ করত না। ওই দেখুন, পরের ছবিতে ধর্ষিতা মেয়েটি নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে গেছে, কিন্তু কেউ তাকে গ্রহণ করছে না। ওরা সবাই কাঁদছে কিন্তু ওকে গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছে না। সমাজের ভয়ে সবাই ভটস্থ। এর অবশ্যম্ভাবী ফল যা ঘটত তা পরের ছবিটিতে দেখুন। মেয়েটি বেশ্যা হয়েছে। দেখুন, ওর হাসির ভিতরও চোখের জল লুকিয়ে আছে। তার পরের ছবি দেখুন—সে আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে আড়কাঠা থেকে।

স্ত্রীলোকদের এ রকম আত্মহত্যা সে যুগে প্রায়ই হ'ত, খবরের কাগজের পাতায় এ সবের বিবরণও ছাপা হ'ত। সে যুগের লোকেরা সে সব খবর পড়ত, কিন্তু প্রতিকারের কোনও চেষ্টা অনেকদিন হয় নি।

প্রতিকারের চেষ্টা হ'ল অনেক দিন পরে। সবাই ভাবলেন মেয়েদের লেখা পড়া শিখিয়ে তাদের উপার্জনক্ষম ক'রে দিতে পারলেই বুঝি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। ঘন ঘন তাদের নানা সমস্যায় বিচলিত ক'রে তুলতে লাগল। বিপথেও গেল অনেকে। ওই দেখুন একটি কলেজ-গামী মেয়ে একটি ছোকরার সঙ্গে প্রেম করছে। আত্মহত্যাও করত অনেকে। অনেকে বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ে ভিন্ন জাতে বিবাহ করত। সে যুগে স্ত্রীলোকরা প্রায়ই আত্মহত্যা করতেন। এর প্রধান কারণগুলি হ'ল—প্রেম, গুণ্ডা, আর্থিক অনটন, স্বপ্নভঙ্গ, আশাভঙ্গ। অনেকে পাগলও হ'য়ে যেত। আমরা এ যুগে সে সবের মূলোচ্ছেদ করেছি"

"কি ক'রে?"

"আমরা বুঝেছি অধিকাংশ ঝামেলার মূলে আছে ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা থেকেই লোভ, লোভ থেকেই পাপ, পাপ থেকেই অশান্তি। আমরা দুটো বড় ক্ষুধার—খাদ্য ক্ষুধার এবং যৌন ক্ষুধার মূলোচ্ছেদ করেছি। এ যুগে কারো পেট বা অন্ত্র নেই, কারো যোনি নেই। সার্জারির বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। আমাদের সার্জনরা সকলের পেট, অন্ত্র যোনি কেটে বাদ দিয়েছেন। আমরা ফ্যাক্টারিতে জন্ম গ্রহণ করি টেস্টটিউবের মধ্যে। ফ্যাক্টারিতেই আমাদের শৈশব কৈশোর অতিবাহিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হলেই যেতে হয় সার্জনদের কাছে। তাঁরা পুরুষের শুক্রকীট এবং মেয়েদের ডিম্বকোষ সংগ্রহ করেন ল্যাবরেটরিতে। তার থেকেই ভবিষ্যৎ বংশ সৃষ্টি করেন জীব-বিজ্ঞানীরা টেস্ট-টিউবে। আপনাদের যুগে গর্ভবতীর ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা আপনারা আগে থাকতে ঠিক করতে পারতেন না। কিন্তু এ যুগের বিজ্ঞানীরা তা পেরেছেন। এ যুগে সম সংখ্যক ছেলেমেয়ে ল্যাবরেটারিতে তৈরি হয়—"

"আপনাদের যুগ তাহলে খাসি-খাসিনীর যুগ! বলেন কি মশাই"

বিস্ময় প্রকাশ করলেন মোটা।

সরু বললেন—"মানুষকে ছাগল বলাটা ঠিক হবে না। খোজা-খোজানী বলতে পার"

সরযূর মনে আর একটা কৌতূহল জাগল। ফিনান্স বিভাগে চাকরি করতেন তিনি।

"আচ্ছা, আপনাদের শুক্রকীট আর ডিম্বকোষের বার্ষিক বরাদ্দে ঘাটতি বাড়তি হয় না"

ছ-মশাই উত্তর দিলেন—"হয়। মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায় কিছু। কিন্তু সে ঘাটতি পূরণের উপায়ও আবিষ্কার করেছেন একজন বিজ্ঞানী শুক্রগ্রহে তিনি একটি শুক্রমহাসাগরের সন্ধান পেয়েছেন। সে মহাসাগরে কোটি কোটি শুক্রকীট কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। শুক্রকীটে ঘাটতি পড়লে সেইখান থেকে আনা হয়। আর একজন বিজ্ঞানী ডিম্বকোষের খনি আবিষ্কার করেছেন চন্দ্রলোকে। বহু কোটি যুগ পূর্বে বহু নারীদেহ সেখানে নাকি বরফে চাপা পড়েছিল। তাদের দেহ এখনও অবিকৃত আছে। ডিম্বকোষ খারাপ হয় নি। চন্দ্রলোক থেকে ডিম্বকোষ আনবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে"

"চন্দ্রলোকে এত নারীদেহ গেল কি করে!"

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মোটা।

সরযূ বললেন—"নারী আবার দরকার কি। চন্দ্র নিজেই তো একটা অফুরন্ত নারী। যোগেন জ্যোতিষী বলতেন চন্দ্রের সঙ্গে নারীর কি একটা যোগও আছে, চন্দ্র মনের কারক, আর নারী রহস্যময়ী—কিন্তু আমি বোধহয় গুলিয়ে ফেলছি—কিন্তু যোগাযোগ আছে একটা। ইংরেজ কবিদের কাছে চাঁদ শী (she) হি (he) নয়। যাক ও কথা। একটা কথা কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। খাদ্য-ক্ষুধা, যৌন-ক্ষুধা আপনারা হয়তো জয় করেছেন কিন্তু সব রকম ক্ষুধাকে জয় করতে পেরেছেন কি? ক্ষুধা তো নানা রকম—"

"না পারি নি। কিন্তু যে ক্ষুধাকে জয় করতে পারি নি তা যে কি রকম ক্ষুধা তা-ও বলতে পারব না। সেটাকে আপনারা আত্মার ক্ষুধা বলতে পারেন, কিন্তু আমরা আত্মাকে এখনও যন্ত্রে যাচাই করতে পারি নি, তাই ও বিষয়ে জ্ঞান আমাদের অস্পষ্ট, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আকাশ-পথে হু হু করে' উড়ে যাই, স্বপ্ন দেখি জ্যোৎস্নালোকে—"

"থেৎ, থেৎ—"

থামিয়ে দিলেন তাঁকে সাহিস।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হলেন তিনি।

"এইবার আর একটা ছবি দেখুন। আপনাদের যুগের ইলেক্‌শনের ছবি। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্বদেশে এই কাণ্ড হ'ত আগে। ভোটারদের ভোলাবার জন্য কি না করত গদি প্রার্থীরা। ওই দেখুন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জনসভায় তুমুল বক্তৃতা। প্রতিশ্রুতির বান বইয়ে দিচ্ছেন নেতারা। শুধু তাই নয়—এই ছবিতে দেখুন ওই মোটা লোকটিকে হাত করবার জন্যে মস্ত বড় একজন ধনীলোক মোটরে করে এসেছেন, হাতজোড় করছেন ওর কাছে, গোপনে গোপনে হয়তো আরও কিছুর ব্যবস্থা করেছেন—ওই মোটা লোকটির হাতে প্রচুর ভোট। এই দেখুন এক জায়গায় পোলিং বুথে আগুন জ্বলছে। এই ছবিটাতে দেখুন ইলেক্‌শনকে কেন্দ্র করে ভয়ানক রায়ট লেগেছে, মারামারি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি চলছে, বন্দুক,

[illegible] ব্যবহার করছে কেউ কেউ। লুটপাট, গ্রামজ্বালানি, ধর্ষণ সবই চলছে। অর্থাৎ এ-ও একটা লড়াই। মনে পড়িয়ে দেয় হূনদের, তাতারদের, এট্টিলা-জেঙ্গিসখাঁদের, আলেকজাণ্ডার-অ্যানটনি-জুলিয়াস-সিজারদের, নেপোলিয়ন হিটলারদের। আপনাদের ইলেকশনটা তাঁদেরই কর্মপদ্ধতির রকমফের মাত্র। যুদ্ধ করে' ভিক্ষে করে', ঘুষ দিয়ে কৌশল করে' যেমন করে' হোক জিততে হবে। প্রাচীন বর্বর পদ্ধতির এটা পুনরাবৃত্তি, খোলটা কিছু বদলেছে মাত্র—"

[illegible] আগে এ নিয়ে চিন্তা করতেন অনেক। কিন্তু ডায়াবিটিস হওয়ার পর তাঁর চিন্তা কম-জোর হয়ে গেছে। ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামান না আজকাল। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'তে তাঁর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

"আপনাদের এখানে ইলেকশন নেই বুঝি—"

"আছে। কিন্তু এখানে কেউ গদি-প্রার্থী নেই। এ অঞ্চলের সমস্ত লোকের যথার্থ পরিচয় রেকর্ডেড হয়ে আছে আমাদের লাইব্রেরিতে। সেখানে সব সময়ই সকলের পরিচয় বিঘোষিত হচ্ছে। সকলেই সকলের সম্যক পরিচয় জানে। ইলেকশনের সময় কাউকে পোলিং বুথে যেতে হয় না। নিজের নলের ভিতর বসে' তিনি নীরবে ইচ্ছা করেন অমুক ব্যক্তি এবার প্রেসিডেণ্ট হোন। তাঁর সে ইচ্ছা আলোকের বিন্দুরূপে রেকর্ডেড হয় বিরাট একটা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে। একজনের ইচ্ছা একবারের বেশী রেকর্ডেড হবার উপায় নেই। আমাদের পারমাণবিক যন্ত্র মানুষের চেয়েও বেশী বিচক্ষণ, আর সে নির্বিকার বলে' পক্ষপাতহীন। তার রেকর্ডের উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। যিনি সবচেয়ে বেশী ভোট পান তাঁকে আমরা সকলে মিলে অনুরোধ করি রাষ্ট্রপতি হবার জন্য। আমাদের সমস্ত বিভাগের অধিকর্তারা, সমস্ত কর্মচারিরাও এইভাবে নির্বাচিত হন। কেউ প্রার্থী হন না—"

"যদি দুটি লোক সমসংখ্যক ভোট পান?"

"তাহলে টস করা হয়—"

"আপনাদের প্রেসিডেণ্ট, মানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কি"

"এখানে কোন বিশেষ পদাধিকারীর বিশেষ ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক লোকের হৃদয় জয় করেছেন বলে' তাঁকে আমরা সর্বাধিক সম্মান দিই। তাঁর মূর্তি—তাঁর নলের ছবি—আমাদের খোলাম কুচিতে ছাপা হয়। তিনি একাধিক "যা খুশী" গুলি পেতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের শাসন ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। রাজ্য শাসন করে বিভিন্ন বিভাগগুলি। আর প্রত্যেকটি বিভাগ যন্ত্র-চালিত। যন্ত্রশাসিতও বলতে পারেন। অর্থাৎ আমরা সভ্য, আমরা কৃত্রিম—"

"রাষ্ট্রপতির যদি কোন ক্ষমতাই না থাকে তাহলে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করবার দরকার কি?"

"আমরা কৃত্রিম হলেও আমরা যে মানুষ, আমাদের যে শ্রদ্ধা করবার বাসনা এবং শক্তি আছে—এই বোধটাকে জাগ্রত রাখবার জন্যেই রাষ্ট্রপতি থাকা দরকার। সব দেশের রাষ্ট্রপতিরা মাঝে মাঝে মিলিত হন, চিন্তা করেন কি করে' মানব জাতির আরও উন্নতি হবে—"

"কোথায় মিলিত হন?"

"তা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করেন। কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্যে, কখনও

অতীত লোকে কখনও আরও দূর ভবিষ্যতে। প্রত্যেকেই "যা খুশী" গুলি খেয়েছেন তো, যা খুশী করতে পারেন—"

"যা খুশী" গুলি তো আমরাও খেয়েছি—"

"তাহলে আপনারাও পারবেন। এইবার দেখুন আপনাদের র‍্যাশনের দোকানের ছবি। এটা দোকানের অভ্যন্তরের দিক। ওই দেখুন দোকানদার কিছু চাল সরিয়ে রেখে বাকি চালটার কাঁকর মেশাচ্ছে। ওই সরিয়ে রাখা চালটা কালো বাজারে বেচবে। এইবার বাইরের দিকটা দেখুন। কি প্রকাণ্ড 'কিউ'। ওই দেখুন 'কিউ'য়ের ভীড়ে একটা পকেটমার আর একজনের পকেট মারছে। আর একটা ছোঁড়া দেখুন ওই মেয়েটার দিকে চেয়ে বাঁ চোখ কোঁচকাচ্ছে। ওই মোটা ভদ্রলোকটিকে কতকগুলো পাজি ছেলে "হাতী বাবা হাতী বাবা' বলে' খেপাচ্ছে। ওই বুড়ি বেচারীর কি কষ্ট দেখুন, কিছুতে এগোতে পাচ্ছে না বেচারী। আরও কত রকম কি হচ্ছে দেখুন না। অথচ কিউ না দিয়েও উপায় নেই। পেটের দায়ে সবাই এই দুর্গতি বাধ্য হয়ে সহ্য করছে। আমরা এ সমস্যার সমাধান করেছি—"

"হ্যাঁ, আমরা শুনেছি সে সব—"

"পেটের দায়ে আপনাদের যুগে আরও নানান কাণ্ড হয়েছে। এই দেখুন মা তার সন্তানদের হত্যা করছে, ওই দেখুন মিলের কর্মীরা ধর্মঘট করছে, এই দেখুন ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছে, এই দেখুন ধানের গোলা লুট হচ্ছে,—আরও দেখবেন।"

"না, ওসব তো অহরহ দেখছি। খবরের কাগজে তো এই সব খবরই ফলাও করে ছাপা হয়"

"পতিতাদের ছবি দেখবেন ?"

"না থাক, দরকার নেই—"

"আপনাদের আগেকার যুগে পতিতারা ঘৃণ্য ছিল। দেখুন এই ছবিটা। সারি সারি সব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই কোণের মেয়েটি বুকের আঁচলের তলায় টর্চ লুকিয়ে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেটি জেলে নিজের উন্নত বক্ষের দিকে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনাদের যুগে আপনারা তাদের সম্মানের আসনে বসিয়েছেন, তাদের শিল্প প্রতিভার আদর করেছেন, তাদের ছবি সাময়িক পত্রিকায় ছেপেছেন। এটা আপনাদের আর্ট-প্রীতির লক্ষণ—কিন্তু—"

হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন ই-মশাই।

মানে, ই-মশায়ের নল॥

"ও মশাই, আপনাদের সোহাগা এখান থেকেও ভেগেছে—"

"ভেগেছে ? তার মানে ?"

"ওর তো দুটো মানে হয় না। ভেগেছে ইন্দ্রের সঙ্গে। চু-মশাই যা বলছেন তার রেকর্ড শুনুন। রেকর্ড করে এনেছি। বাজাচ্ছি সেটা—"

কুট করে একটি শব্দ হল।

রেকর্ড বাজতে লাগল।

"চিবুকে তিল-ওলা একটি মেয়েকে আমাদের চরেরা পাকড়াও করেছিল। তার নাম ডঃ সোহাগা অং-এ ডিগ্রি কবুল করেছিলেন। তিনি পদার্থবিদ্যায় মেধাবিনী

ছারে এ-ও জেরা করে' আমরা বুঝেছি। সেকালে পৃথিবীর যে অংশ আমেরিকা বলে' চিহ্নিত হয়েছিল সেই অংশই তিনি হার্ভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন এ খবরও মিথ্যে নয়। এই যুগের নাগরিক হয়ে এই যুগেই তিনি বাস করবেন এ ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা রাষ্ট্রপতির দফতরেও পেশ করা হয়েছিল। এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটল। রাজ্যচ্যুত পলাতক দেবরাজ এসে আমাদের রাষ্ট্রপতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আমাদের রাষ্ট্রপতি সর্বদেশের পৌরাণিক যুগের বিশেষজ্ঞ। স্বয়ং ইন্দ্রকে অতিথিরূপে পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বলুন কি ভাবে আপনার পরিচর্য্যা করতে পারি। ইন্দ্র কোন ভণিতা না করে' সংক্ষেপে বললেন, মদ আর মেয়েমানুষ চাই। অমৃতে অরুচি ধরে' গেছে। শচী উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী তেঁবাসী তরকারির মতো হয়ে গেছে। মাদকতা তো নেইই, পচা গন্ধ ছাড়ছে। আপনি নতুন কোন মাল আমদানী করুন।"

রাষ্ট্রপতি বিস্মিত হয়ে বললেন, "বলো কি। শচী, উর্বশী, মেনকা, রম্ভার আর মাদকতা নেই? ও'রা তো চিরযৌবনা—"

"তাই তো আরও বিপদ। বদলায় না। ওরা আসলে ফুরিয়ে গেছে; প্রমাণও পেয়েছি। বিশ্বকর্মার তিন-মাথা-ওলা ছেলে বিশ্বরূপটা যখন ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তপস্যা করছিল তখন ওই অপ্সরাদের পাঠিয়েছিলাম তাকে ভোলাবার জন্যে। পারলে না মশাই। আমাকেই বজ্র দিয়ে মারতে হ'ল তাকে। তক্ষার সাহায্যে তার মুণ্ডপাত করলাম। সেই হ'ল আমার কাল। বিশ্বকর্মা আবার সৃষ্টি করলেন বৃত্রাসুরকে। তার সঙ্গে মানসসরোবরের তীরে শতাধিক বছর ধরে' যুদ্ধ করেছি। ছলে বলে কৌশলে শেষটায় যখন তাকে মারলাম তখন জড়িয়ে পড়লাম ব্রহ্মহত্যার পাকে। এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। নহুষ ইন্দ্র হ'য়ে বসেছে স্বর্গে—"

"আমি সব জানি। কিন্তু আপনি যে আমার কাছে আসবেন তা প্রত্যাশা করি নি। খুব খুশী হয়েছি অত্যন্ত খুশী হয়েছি, আপনি আসাতে। আপনাকে আমি যতটা পারি আনন্দ দেবার ব্যবস্থা নিশ্চয় করব। এখন এই গুলিটা দিচ্ছি, আপনি খেয়ে ফেলুন। এর নাম "যা খুশী" গুলি, আপনার ইচ্ছামত সব কিছু পাবেন। এটা আমাদের একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। একটা খবরও আপনাকে দিচ্ছি। সোহাগা নামে একটি বিজ্ঞানী মেয়ে এখানে এসেছে। সে এখানেই বসবাস করতে চায়। মেয়েটি অসাধারণ রূপসী। বিদুষীও—"

"বিদুষী। তাহলেই সেরেছে—"

"কেন, আলাপ করে' দেখুন না"

"আমি একটা ঘোড়া লুট করে' এনেছিলাম একবার কুবেরের অশ্বশালা থেকে। চমৎকার দেখতে। দেখলেই চড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু চড়তে পারলাম না। কাছে গেলেই কামড়াতে আসে, চার পা তুলে চাঁট ছোঁড়ে। তাড়িয়ে দিতে হল শেষকালে। বিদুষীরা অনেকটা সজারুর মতো, কাছে গেলেই গায়ের শত শত কাঁটা খাড়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিদুষী মেয়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও নেই আমার তেমন। ওদের দেখলে ভয় করে। একবার একটি বিদুষী ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখে শিস দিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সম্মার্জনী নিয়ে তেড়ে এসেছিল সে। পালাতে পথ পাই না—"

"কিন্তু পুরাণে তো আপনি প্রেমিক বলে' বিখ্যাত—"

"আমি জীবনে যে সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি তারা সবাই মূর্খ। অপ্সরা-গুলি সব ক-অক্ষর গোমাংস, শচী একটি আকাট। সে পুলোমনা ঋষির মেয়ে বটে, তবু আকাট। বিয়ে হবার আগেই আমি ওর সতীত্ব নষ্ট করেছিলাম, ভয় হল ওর বাবা হয়তো আমাকে অভিশাপ দেবেন, তাই ওর বাবাকে হত্যাও করেছিলাম। মানে, আত্মরক্ষার জন্যে করতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এত কাণ্ডের পর মেয়েটা বোধ হয় আর আমার দিকে ফিরে চাইবে না। কিন্তু মশাই, অবাক হয়ে গেলুম যখন দেখলাম ও পিতৃঘাতিকেও বিয়ে করবার জন্যে লালায়িত। অনেক মেয়েই আমাকে বিয়ে করবার জন্যে লালায়িত হয়েছিল। কারণটা কি জানেন? আমার রূপ, আমার অমরত্ব এবং সর্বোপরি ইন্দ্রাণী হবার লোভ। অধিকাংশ মূর্খ মেয়েই ইন্দ্রাণী হ'তে চায়। কিন্তু ওই বিদুষী মেয়েদের মানদণ্ড আলাদা। হয়তো ও'দেরও ভিতরে ভিতরে ইন্দ্রাণী হবার লোভ আছে, কিন্তু প্রথমেই সেটা প্রকাশ করবেন না। প্রথমেই আপনাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেবেন। তাছাড়া আর কাউকে তো ইন্দ্রাণী করাও যাবে না। শচী দেবী বহাল তবিয়তে আছেন, থাকবেনও চিরকাল, কারণ উনি অমরা—"

"জানি, জানি, আমি সব জানি"—রাষ্ট্রপতি বললেন—

"আপনার নীতির কোন সমালোচনাও আমি করছি না। আপনি দেবরাজ, আপনি আমার অতিথি, আপনি যাতে সুখী হন তাই আমার কাম্য। তাই একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি পৌরাণিক যুগে বিদুষী রমণীরা নীতির নিগড়ে সব সময়ে নিজেদের শৃঙ্খলিতা ক'রে রাখেন নি। স্বয়ং সরস্বতীই এর উদাহরণ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে সরস্বতী কৃষ্ণ-কণ্ঠ-সমুদ্ভূতা। তিনি কিন্তু জনক কৃষ্ণকেই কামনা করেছিলেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে বলেন নারায়ণকে ভজনা করতে। নারায়ণের তখন দুই স্ত্রী বর্তমান—লক্ষ্মী এবং গঙ্গা। দুটি স্ত্রী নিয়েই অত্যন্ত বিব্রত হয়ে ছিলেন তিনি। তৃতীয় স্ত্রী সরস্বতী গিয়ে জুটতেই ত্র্যহস্পর্শ হয়ে গেল। তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠলেন নারায়ণ। শেষে তিনি বললেন—'আমি একা তোমাদের তিনজনকে পেরে উঠব না। লক্ষ্মী আমার কাছে থাকো, গঙ্গা মহাদেবের কাছে যাও, আর সরস্বতী যাও ব্রহ্মার কাছে। আবার কোনো পুরাণের মতে ব্রহ্মাই সরস্বতীকে সৃষ্টি করে-ছিলেন। ব্রহ্মার তিনি মানস-কন্যা। কিন্তু কন্যাকে বিয়ে করবার জন্যেই আকুল হয়েছিলেন তিনি। কন্যাও রাজি হয়ে গেলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নীতিতে বাধল না কিছু। ইয়োরোপীয় পুরাণের গল্পে সাইপ্রাসের রাজা পিগম্যালিওন অনেকটা এই কাণ্ড করেছিলেন। নিজের তৈরি হাতীর দাঁতের এক কুমারী মূর্তির প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় আফ্রোদিতের কাছে প্রার্থনা করে জীবন্ত করেছিলেন তাকে এবং তার গর্ভে পাফাস (Paphus) নামক সন্তানেরও জন্মদান করেছিলেন। পুরাণে সব রকম হয়েছে। সুতরাং আপনি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। সোহাগা হয়তো আপনার নাগালের মধ্যে আসতেও পারে—"

"সোহাগা কিন্তু পৌরাণিক যুগের মেয়ে নয়, আধুনিকা সে। সে হয়তো ইতি-মধ্যেই কারও প্রেমে পড়েছে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছে। চু-মশাই মনশ্চক্ষুক দিয়ে এ খবরটি জোগাড় করেছে। তার মানসলোকে যে মানুষটির নাম অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে আজো তার নাম নহুষ।"

"নহুষ? নহুষ তো আমার স্বর্গ দখল ক'রে ব'সে আছে। সেই না কি—"

"সোহাগার মনে যে নহুষ আছে তার ফোটোও তুলেছেন চু মশাই। আমার কাছে আছে সেটি। দেখবেন?"

"দেখি দেখি—"

ইন্দ্র নহুষের ফোটোটি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

"না, এ অন্য নহুষ। ক্যাবলা ক্যাবলা চেহারা। আপনার কাছে আর একটি "যা খুশি" গুলি প্রার্থনা করছি? দেবেন?"

"আর একটা চাইছেন কেন?"

"সোহাগার কাছে যাব এখুনি। আর তাকেও একটা খাওয়াব।"

"এখুনি যাবেন?"

"তার আগে একটু সুরা পান করতে চাই। মর্ত্যলোকে বিহার প্রদেশে তাড়ি নামে এক অপূর্ব সুরা পাওয়া যায় শুনেছি। কখনও খাই নি—"

"বেশ তো খান না। "যা খুশী" গুলি তো খেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই তাড়ি এসে যাবে। তবে আমি শুনেছি ব্র্যাণ্ডি, শেরি, হুইস্কি, বিয়ার, আর পোর্ট একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে না কি খুব ভালো লাগে—"

"বেশ, আগে তাড়িটা খাই। তারপর আপনার পথ্যরং চেখে দেখব"

প্রচুর মদ খেলেন ইন্দ্র এবং ইন্দ্র রূপেই নেশাটা উপভোগ করলেন রাষ্ট্রপতির বৈঠকখানায় ব'সে। তারপর বললেন—"দিন আর একটা "যা খুশী" গুলি। সোহাগার অভিসারে বেরিয়ে পড়ি—"

গুলিটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের চেহারাটি বদলে ফেললেন। ছিলেন ইন্দ্র, হয়ে গেলেন নহুষ। সরুর নাতি নহুষ।

সোহাগার কাছে গিয়েও হাজির হলেন অবিলম্বে।

"এ কি, তুমিও এখানে এসে গেছ নাকি, তোমাকে নিয়ে আর পারি না—"

ছদ্মকোপে বলে উঠল সোহাগা।

"তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারছি না—"

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল সোহাগার। দু'পা পেছিয়ে গেল সে।

"কে তুমি। তুমি নহুষ নও—"

"তার মানে?"

"আমাকে দেখে তোমার মুখে যে রকম বোকা-বোকা হাসি ফুটে ওঠে সে রকম হাসি তো তোমার মুখে ফুটল না"

নহুষের মুখে সঙ্গে সঙ্গে বোকা-বোকা হাসি ফুটে উঠল। ইন্দ্র নিপুণ অভিনেতা।

"চল, ফিরে চল—"

"না, আমি ও সমাজে ফিরে যাব না। ওখানে গেলেই তোমাকে বিয়ে করতে

হবে আর আমাকে [illegible] কাপড় দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গৃহলক্ষ্মী সাজতে হবে। তা আমি পারব না"

"এইটে খাও—"

"কি ওটা? লজেন্স?"

"খেয়েই দেখ না। খেলে যা খুশী করতে পারবে। অদ্ভুত ম্যাজিক গুলি। এখানকার রাষ্ট্রপতির কাছে উপহার পেয়েছি। খেয়ে ফেল—"

"তুমি খাও না"

"আমি খেয়েছি একটা। দুটো পেয়েছিলাম। তোমার জন্যে এনেছি এটা—"

"খাব?"

"খাও"

গুলিটা খেয়ে ফেললে সোহাগা।

"যা খুশী করতে পারব? তুমি পার?"

"নিশ্চয়"

"আচ্ছা, ভেড়া হও তো—"

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ভেড়া হয়ে গেলেন। ধপধপে সাদা লোমওলা ভেড়া। সোহাগা তার পিঠে চেপে বসল।

"বাঃ চমৎকার। কি নরম তোমার লোম। বরাবর ভেড়া হয়ে থাকবে? আমি তোমার পিঠে চড়ে বেড়াব"

"একবার নাব তো"

সোহাগা নাবতেই ভেড়া মুহূর্তে আবার মানুষ হয়ে গেল।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সোহাগার দিকে চেয়ে।

"আমিও যা খুশি গুলি খেয়েছি। আমি যদি বলি মানুষ ভেড়া হ'য়ে থাকুক—"

"মানুষও সঙ্গে সঙ্গে বলবে মানুষ ভেড়া হবে না। দুই বিপরীত শক্তিতে তখন কাটাকাটি হয়ে যাবে। কিচ্ছু হবে না"

"তাহলে গুলি খেয়ে আর লাভ কি হল? তুমি তো সর্বদাই আমার ইচ্ছাকে বাধা দেবে—"

"দুজনে মিলে স্বর্গলোক রচনা করি চল। সে স্বর্গলোকে আমি হব দাস, তুমি হবে সম্রাজ্ঞী। পুরোণো সমাজে আমরা আর ফিরব না। আমাদের স্বর্গলোক নিজের মতো করো সৃষ্টি কর তুমি। চল—"

"আমি কিন্তু এখানেই থাকতে চাই—"

"তাহলে আমিও থাকব—"

এই সময় একটি নল এসে দাঁড়াল তাদের কাছে।

"আমি রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে আসছি। শ্রীমতী সোহাগা দেবী এ যুগে বসবাস করবার জন্যে যে আবেদন করেছেন তার উত্তরে জানানো হয়েছে যে তিনি এখানে থাকতে পারেন যদি এখানকার আইন-কানুন মানতে তিনি সম্মত হন। প্রথমেই তাঁকে সার্জনদের কাছে যেতে হবে। অন্ত্রহীন এবং যৌন-হীন ব্যক্তিরাই এ দেশের অধিবাসী হবার যোগ্য। বাইরের লোক অতিথি হিসাবে এখানে দুদিনের বেশী থাকতে পারেন না। তৃতীয় দিনে হয় তাঁদের চলে যেতে হবে নয়তো সার্জনদের

কাছে যেতে হবে। সার্জনদের সার্টিফিকেট নিয়ে আবেদন করলেই সোহাগা দেবীকে এ যুগের অধিবাসী রূপে গণ্য করা হবে"

এ কথা বলেই নলটি চলে গেল।

একটু পরেই দেখা গেল দুটি চখা-চখী আকাশ-পথে উড়ে যাচ্ছে।

চখা বলছে—"আমরা যে স্বর্গলোক সৃজন করব সে স্বর্গে আমি হব ইন্দ্র তুমি হবে শচী—"

"না আমি শচী হতে চাই না, তোমাকেও ইন্দ্র হ'তে হবে না। যদি কিছু হতেই হয় তাহলে আমি হব প্রোটন আর তুমি ইলেকট্রন হয়ে আমার চারদিকে বনবন করে ঘুরবে। পারমাণবিক জগতই হবে আমাদের নব-স্বর্গ"

এর পর সোহাগা দেবীর আর কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

ই-মশাই বললেন—"চু-মশাইয়ের রেকর্ড আপনারা শুনলেন। এবার আপনারা কি করবেন স্থির করুন। আমার কাজ আছে, আমি চললুম—"

ই-মশাইয়ের নল অন্তর্ধান করল।

"আরে কচু খেলে যা—"

বলে' উঠলেন সরু।

"টেমপার লুজ কোরো না। এখন কি করা যায় তাই ভাব—"

"অবিলম্বে এখান থেকে সটকে পড়া উচিত। আর কিছুক্ষণ থাকলে তো ওরা আমাদের কেটেকুটে সাফ করে' দেবে—"

"কিন্তু সটকাই কি করে'। কল্পনার গুলতিতে চড়ে' এখানে ছিটকে পড়েছি। এখান থেকে পালাব কি করে'।"

ছ-মশাই বললেন, আপনাদের একটা পরামর্শ দিতে পারি। দু'জনেই আপনারা "যা-খুশী" গুলি খেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই আপনারা স্বস্থানে ফিরে যেতে পারেন—"

"কিন্তু এখন স্বস্থানে তো আমরা ফিরতে চাই না। আমরা সোহাগাকে পাকড়াও করতে চাই"

"আপনারাও চখা-চখী হয়ে ওদের অনুসরণ করুন তাহলে"

"ও বাবা, সে সাহস নেই আমাদের। হঠাৎ কোন শিকারী যদি গুলি ছুঁড়ে আমাদের ঘায়েল করে' ফেলে আর তারপর রোস্ট বানিয়ে খেতে উদ্যত হয়—কি করব আমরা। আমাদের সঙ্গে তো ইন্দ্র থাকবে না"

মোটা বললেন—"তাছাড়া ওই মহাশূন্যে তারা কোনদিকে গেছে তাই বা ঠিক করব কি করে?"

সরু ভুরু কুঁচকে চুপ করে' রইলেন।

মোটা তার দিকে চেয়ে বললেন—"জাঁতি-কলে পড়ে' গেছি ভাই"

সরু হাসলেন। তারপর বললেন—"আমার গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে না। আধুনিক সম্পাদকদের ভাষায় আমার বলতে ইচ্ছা করছে—নিদারুণ পরিস্থিতি। কোন মোর্চায় কার সঙ্গে সামিল হয়ে কি রকম সমঝোতা করলে যে কার্য উদ্ধার হবে জানি না তা কে বলে দেবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন ছ-মশাই? ভাল কথা আপনাদের এ যুগে ভাষা সমস্যা নেই?"

"না, আমরা যে যার মাতৃভাষায় কথা কই। অন্য ভাষাভাষী লোকদের যখন আমরা আমাদের মনোভাব বোঝাতে চাই তখন আমরা নানারকম ইঙ্গিত আর চিহ্নের সাহায্য নিই। সেটা কারো ভাষা নয়। সেটা অনেকটা সেকালের ইজিপ্টের হিয়ারোগ্লিফিক্‌স-এর (hieroglyphics) মতো। এই সংকেত ভাষার বিশেষজ্ঞরা আমাদের সব বিভাগে কাজ করেন। আপনারা যে অঞ্চলে এসে পড়েছেন সেটা বাঙালী প্রধান জায়গা। তাই আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না।"

"কি রকম সাংকেতিক ভাষা আপনাদের?"

সরুর কৌতূহল জাগ্রত হল।

"ছবিতে দেখিয়ে দিচ্ছি"

কুট করে' একটি শব্দ হল।

"এই দেখুন। একটি মানুষ, তার পাশে একটি এরোপ্লেন। এটির মানে মানুষটি এরোপ্লেনে করে যাবেন। আবার এই ছবিতে দেখুন, এরোপ্লেনের মুখটি উল্টো দিকে ফিরে আছে। এর মানে মানুষটি এরোপ্লেনে ফিরচেন। আর একটি ছবি দেখুন—"

"ওসব থাক মশাই"—মোটা অধীর হয়ে থামিয়ে দিলেন তাকে—"আমরা যে সংকটে পড়েছি তার থেকে কি করে ত্রাণ পাব তার উপায় বলে দিন আগে। সরু, তোমার এই সব বাজে ব্যাপার ভালো লাগছে এখন? আশ্চর্য।"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সরু।

"যান্ত্রিক নস্যি নেওয়ার পর থেকে মনটা একটু বেশী চনমনে হয়ে পড়েছে ভাই। ঠিক বলেছ, আসল সমস্যা থেকে স'রে গেছি। ছ-মশাই দয়া ক'রে আমাদের সমস্যাটার উপর একটু আলোক-পাত করুন। সত্যিই আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি"

তারপর হঠাৎ হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে উঠলেন—"হাত ধ'রে তুমি টেনে তোল সখা—"

"আরে কি করছিস সরু, ভাঁড়ামির একটা সময়-অসময় আছে তো।"

আবার গান গাইলেন সরু।

"লাগছে না ভালো আমারও—ইমন সারং পিলু ভৈরবী খামারও। ছ-মশাই, আপনি কৃপা না করলে গেলাম আমরা নির্ঘাত, দয়া করুন, দয়া করুন প্রাণনাথ।"

ছ-মশাই খুক খুক ক'রে হাসছিলেন।

বললেন—"কল্পনা আপনাদের এখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই শরণ নিন আবার—"

"কিন্তু তার নাগাল পাব কি করে। মোটার প্রণয়িণী ফুটকি তাকে পাঠিয়েছিল আমাদের কাছে। টেলিফোন গার্লের কণ্ঠে ভর করে' খুব খেল খেলেছিল মেয়েটি। অবাক কাণ্ড করেছিল। কিন্তু এখন তাকে আমরা পাব কি ক'রে। তাছাড়া আপনারা আমাদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন নলের ভিতর। এ নলের দময়ন্তী আছে কি না জানি না—থাকলেও তিনি আমাদের দয়া করবেন কি?"

আবার খুক খুক করে হাসলেন ছ-মশাই।

"না এ নলের দময়ন্তী নেই। এ নল পৌরাণিক নল নয়, পারমাণবিক নল। পাশের ঘরে চলে যান আপনারা। পাশের ঘরটা জিরো রুম (zero room), সেখানে

আমাদের ওপর আপনাদের কোন কাজের ভার দেবেন না। কৈলাসের পর সীমান্ত নিবাত নিষ্কম্প। সেখানে গিয়ে আপনারা দুজনে কল্পনাকে স্মরণ করুন। একাগ্র চিত্তে দাবী করুন তাঁর আবির্ভাব। আপনারা দুজনে "খা-খুশী" গুলি খেয়েছেন, মনে হয় আপনাদের দাবী ফলপ্রসূ হবে। কল্পনা আসবেন এবং আপনাদের সমস্যার সমাধানও করবেন।

জিরো রুমে পাশাপাশি দুটি নলের মধ্যে ব'সে সরু আর মোটা কল্পনার ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে ছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু কোন ফল হল না। সরু বললেন, "মোটা একাগ্রভাবে ভাবছ তো?" মোটা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—"না ভাই একাগ্রভাবে ভাবতে পাচ্ছি না। ফুটকির মুখটা বারবার মনে ভেসে উঠছে—"

"তাহলেই মেরেছে! ও মেয়ে ডোবাবে তোমাকে"

"তুমি একাগ্র হ'তে পেরেছ?"

"না, পারছি কই। কেবলি মনে হচ্ছে সেই নস্যির মুখোশটা আর একবার পরলে হত। নেশাটা ফিকে হয়ে এসেছে—"

"এই মাটি করেছে—"

"শুধু মাটি নয়, গোবর-মেশানো মাটি। এখন কি করা যায় বলতো—"

মোটা বলল—"নল থেকে বেরিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে মাটিতে সুখাসনে ব'সে ধ্যান করি এস। ধ্যান মানে নাম জপ। কলিকালে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ধ্যান করতে পারে না। মন বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এসো আমরা জপ শুরু করি—"

"ঠিক বলেছ—"

দুজনে নল থেকে বেরিয়ে মেঝেতে বসলেন।

সরু বললেন—"কি মন্ত্র জপ করি বলতো—"

"মনে মনে বারবার বল, কল্পনা এসো, কল্পনা এসো, কল্পনা এসো—"

"ওর সঙ্গে একটা 'দোহাই' জুড়ে দিলে কেমন হয়"

"বড্ড বড় হয়ে যাবে। জপের মন্ত্র যত ছোট হয়, ততই ভালো"

"বেশ"

নিমীলিত নয়নে জপ ক'রে যেতে লাগলেন দুজনে। তাদের মনে হ'তে লাগল যুগ যুগান্তর পার হয়ে যাচ্ছে।

"আমি এসেছি—"

দুজনেই চোখ খুলে দেখলেন সেই অনিন্দ্যকান্তি কিশোরটি এসে দাঁড়িয়েছে—। মুখে মৃদু হাসি। সরু মোটাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সে বললে—"দুটো খবরও এনেছি। সোহাগা ইন্দ্রের শচী হয়েছে। আর এ খবর পেয়ে আপনাদের নহুষ চলে' গেছে পৌরাণিক যুগে। সেখানে গিয়ে সে হয়েছে চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষ। তপস্যা করছে ইন্দ্রত্ব লাভ করবে ব'লে। ইন্দ্রত্ব লাভ করলেই সে শচীকে দখল করবে এই তার ধারণা হয়েছে—

"পৌরাণিক যুগে সে চলল কি করে?"

"আমিই তাকে দিয়ে এসেছি। এখন আপনারা কি করবেন বলুন। ইন্দ্রের নাগাল ধরতে পারবেন না। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। সোহাগাও তার সঙ্গে আছেন সম্ভবত। আপনারা বাড়ি ফিরে যাবেন, না পৌরাণিক যুগে যাবেন?"

"রামঃ, বাড়ি ফিরে কি করব। সেখানে গিয়ে সেই তো চর্বিত-চর্বণ করতে হবে। সেই খবরের কাগজ, সেই র‍্যাশন, সেই গদি নিয়ে নেতাদের রেষারেষি, সেই বান, সেই মড়ক, সেই দুর্ভিক্ষ, সেই বিক্ষোভ, সেই মীটিং। না, বাড়ি ফিরব না। পৌরাণিক যুগেই যাব। কিন্তু যাব কি করে, হাতে গুলতি দেখছি না তো"

"পৌরাণিক যুগে গুলতি চড়ে যাওয়া যায় না। গর্তের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সমস্ত প্রাচীন অনুসন্ধান গর্ত খুঁড়ে হয়। সেখানে যদি যেতে চান গর্তের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—"

"ও বাবা, তাই নাকি? গর্ত কোথায় পাব? এখানে তো সব সোনা দিয়ে বাঁধানো। এরা গর্ত খুঁড়তে দেবে কি! খেৎ খেৎ করে তেড়ে আসবে—"

"আপনারা যদি চান, আমিই গর্ত হয়ে যাব। আমার ভেতরই ঢুকে পড়বেন আপনারা"

মোটা বললেন, "আমি ঢুকতে পারব তো?"

"পারবেন। কিন্তু আপনাকে একটা বিষয় সাবধান করে' দিচ্ছি। পৌরাণিক যুগে হিড়িম্বারা আছে। তারা মোটা মানুষ পছন্দ করে। ভীমসেন মোটাসোটা ছিলো বলেই একজন হিড়িম্বা তাঁকে পছন্দ করেছিল—"

"কি যে বলেন—"

লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন মোটা।

সরু বললেন—"ফুটকি এসে জুটবে না তো সেখানে"

"পরলোক থেকে পৌরাণিক লোকে সহজে যাওয়া যায়। তবে তিনি বোধহয় আসবেন না। বাতে খুব ভুগছেন—"

"তাই নাকি"—আকুল হয়ে উঠলেন মোটা—"তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন একবার। আহা বাতে ভুগছে। আমিই যাব তার কাছে—"

"আমিই যাব তার কাছে"—মুখ ভেংচে বলে' উঠলেন সরু—"তুমি যাবে কেন? গেলেই কি সে তোমার চিনতে পারবে? খেয়ে খেয়ে তো হাতীর মতো হয়েছ—"

কল্পনা বলল—ফুটকিকেও আপনি চিনতে পারবেন না। মাথার সামনে টাক পড়েছে। দাঁত নেই, গাল তুবড়ে গেছে, মুখময় মেচেতা, দুটো হাঁটুই ফোলা, অবলম্বার কাঁধে হাত রেখে অতি কষ্টে চলা-ফেরা করেন—"

"তাহলে—"

ইতস্তত করতে লাগলেন মোটা।

সরু বললেন—"তাহলে শুনবে? অথরিটি কোট করছি। কবিগুরুর কথা—ফুরায় যা তা রে ফুরাতে—ভ্রষ্ট মালার ছিন্ন কুসুম ফিরে যাসনে তা কুড়াতে। [illegible] ফুটকি। ভুলতে না পার স্মৃতিলোকের ফুটকিকেই বারবার নিরীক্ষণ কর না বাবা

বখেড়া বাধাচ্ছ কেন। বেরিয়েছি আমরা সোহাগার খোঁজে মাঝ রাস্তায় তুমি ফুটীক ফুটীক করে' হেদিয়ে পড়ছ, এর কোন মানে হয়?"

কল্পনা বললে—"আমার কিন্তু বেশী সময় নেই। আপনারা প্রস্তুত হোন। এখনই আমি রূপান্তরিত হ'য়ে আপনাদের পৌরাণিক লোকে পেঁাছে দেব"

"সেখানে গিয়েই নহুষের দেখা পাব তো?"

"খুঁজতে হবে। পৌরাণিক যুগ প্রকাণ্ড যুগ। অনেক জটিলতা সেখানে। এক একজনের একাধিক নাম। একাধিক লোকের এক নাম। চেহারাও নানারকম। খুঁজতে হবে। খুঁজলে পেয়ে যাবেন।"

"আপনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন বড় ভালো হত"

"আমার সময় নেই। আমাকে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল সব জায়গায় ঘুরতে হবে। মর্ত্যে এখন কবিরা, ইলেকশন নেতারা, বিজ্ঞানীরা প্রণয়ী-প্রণয়িনীরা ক্রমাগত ডাকাডাকি করছেন আমাকে। সেইজন্যে আপনাদের পৌরাণিক যুগে পেঁাছে দিয়েই আমি অন্তর্ধান করব। আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারব না। এবার আপনারা প্রস্তুত হোন, আমি গর্ত হয়ে যাচ্ছি। গর্ত হলেই তার ভিতর ঢুকে পড়ুন আপনারা। আসুন—"

নিমেষের মধ্যে কল্পনা বিরাট একটা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। রূপান্তরিত হয়েই ফেটে গেল সশব্দে। গহ্বর বেরিয়ে পড়ল একটা।

"কি কাণ্ড! আমার কি মনে হচ্ছে বলব?"

সরু বললেন।

"বল"

"আমরা দুজনেই বোধ হয় পাগল হয়ে গেছি।"

"তোমার কথা বলতে পারব না। আমি কিন্তু পাগল হই নি। তুমিও হও নি। আমাদের দুজনেরই ক্ষিদে পেয়েছিল। পাগলদের কখনও ক্ষিদে পায় না। নস্যি নেবার ইচ্ছে হয় না—"

"দেখ, যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে সব হয়। সব হওয়া সম্ভব। যাক গে ওসব কথা। ওই গর্তে ঢুকবে?"

"ঢুকব বই কি। তুমি একটু উঁকি মেরে দেখ না"

সরু উঁকি মেরে দেখলেন।

"ভিতরে সিঁড়ি আছে দেখছি। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। তাহলে এস আর দেরি কোরো না। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। দেখো, মাথা বাঁচিয়ে"

ঢুকে পড়লো তাঁরা গর্তের মধ্যে।

হামাগুড়ি দিয়েই অগ্রসর হতে লাগলেন সিঁড়িগুলোর দিকে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হতে লাগল একটা। সিঁড়িগুলো সরে সরে যেতে লাগল তাঁদের কাছ থেকে। সরু বললেন, "ও মোটা, ও যে দেখছি মরীচিকা সিঁড়ি! কাছে গেলেই সরে যাচ্ছে। এদের নাগাল পাওয়া যাবে না—"

মোটা হাঁস ফাঁস করছিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "সোহাগাই মারবে আমাদের। আমরা দুজনেই বুড়ো হয়েছি। কিন্তু এখনও মায়ার লল্‌কানিতে লটপটিয়ে যাচ্ছি। শঙ্করাচার্য পড়েছি, কিন্তু উপলব্ধি করিনি। সবই যে মায়া

মায়াই যে যত অনর্থের মূল এ কথা জেনেছি কিন্তু বুঝি নি। জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর, বাঁচাও আমাদের—"

শঙ্করের নাম উচ্চারণ করবামাত্র সিঁড়িগুলো এগিয়ে এল কাছে। দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন।

সরু বললেন—"নাম-মাহাত্ম্যের এ রকম প্রমাণ আগে পাই নি ভাই। চল আর দেরি নয়। জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর—"

তর তর করে' নেমে গেলেন দুজনে।

পৌরাণিক যুগে পেঁছে দেখলেন, চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

শরতের মেঘ যেন নেমেছে আদিগন্ত, শাদা প্রাচীরের মতো ঘিরে আছে সব। দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। ধোনা তুলো যেন স্তূপীকৃত হয়ে আছে চারদিকে।

"এ যে নতুন রকম প্যাঁচে পড়া গেল হে"

"কুয়াশা ঠেলেই আস্তে আস্তে এগোনো যাবে—"

"সামনে যদি গর্ত-টর্ত থাকে—"

"তাহলে?"

"আরে একটু দম নিতে দাও না। হড়বড় করছ কেন"

হঠাৎ এক জায়গায় কুয়াশা নানাবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে উঠল।

"চল ওই দিকেই যাওয়া যাক"

গিয়ে দেখলেন সপ্তবর্ণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে এক দিব্যকান্তি যুবক দাঁড়িয়ে আছেন।

মোটা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

সরু কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ইঙ্গিত করলেন—প্রণাম কর।

নিজেও প্রণত হলেন তিনি। মোটা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পৌরাণিক কায়দায় তিনি সম্বোধন করলেন তাঁকে।

"মহাভাগ, আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হলাম আমরা। আমাদের দুর্ভাগ্য আপনার সম্যক পরিচয় আমরা জানি না। এ দেশে আমরা আগন্তুক। আত্মপরিচয় দিয়ে অনুগৃহীত করুন আমাদের"

"আমি ইন্দ্রধনু"

"যে ইন্দ্রধনু আমরা আকাশে দেখতে পাই?"

সরু কণ্ঠস্বরকে সশ্রদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন।

"যেটা দেখতে পান সেটা আমার নকল। মেঘ আর আলোর চাতুরী। আমি সেই ইন্দ্রধনু যা মহর্ষি অগস্ত্য রামকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর বনবাসকালে। যে ইন্দ্রধনু দিয়ে রাম রাবণকে নিধন করেন—আমি সেই ইন্দ্রধনু। সুরপতি ইন্দ্র তাঁর সমস্ত শক্তি আমার ভিতর সঞ্চারিত করে মাতলির হাত দিয়ে যাকে পাঠিয়েছিলেন রামচন্দ্রের কাছে, আমি সেই ইন্দ্রধনু। কিন্তু আমি অপূর্ণ—"

তাঁর অঙ্গের সপ্তবর্ণ আকুলতায় যেন কাঁপতে লাগল। লকলক করতে লাগল শিখার মতো।

ভয় পেয়ে গেলেন দুজনেই।

ইন্দ্রধনু বলতে লাগলেন—"আমার মধ্যে কোটি কোটি বর্ণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি প্রকট করতে পেরেছি মাত্র সাতটিকে। বাকিগুলি সূক্ষ্ম কল্পনা-রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহাশূন্যে। আমি সেই চোখের অপেক্ষায় আছি যে সবগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। সেই মহাচক্ষুষ্মান মহাপুরুষকে আমি খুঁজছি—"

"নহুষ কোথায় আছে এখানে বলতে পারেন ?"

"না। আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত জ্ঞান একমুখী হয়ে অন্বেষণ করছে সেই দিব্যদৃষ্টিপূর্ণ মহাত্মাকে যিনি আমার পূর্ণরূপ দেখতে পাবেন, যিনি আমার স্বরূপ প্রচার করবেন উদাত্ত কণ্ঠে। আমি আর কিছু জানি না আর কিছু জানতেও চাই না—"

সপ্তবর্ণ বিকিরণ করতে করতে চলে গেলেন ইন্দ্রধনু।

সরু বললেন, "ওর পিছু পিছু যাবে ?"

"গিয়ে লাভ হবে কি —"

অন্তর্হিত হলেন ইন্দ্রধনু। তাঁর আর চিহ্নমাত্র রইল না কোথাও।

"ওই দেখ, ওই দেখ, ওটা কি—!"

স্বর্ণদ্যুতি চকমক করে উঠল কুয়াশার পটভূমিকায়, মনে হল স্বর্ণবিদ্যুৎ জাল যেন ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে।

একটু পরে সেটা স্থির হল। তখন বোঝা গেল ওটা সোনার হরিণ। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সরু মোটা দুজনেই। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। হরিণ নিজেই কথা কইল।

"আপনাদের চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনারা আমাকে চিনি-চিনি করেও চিনতে পারছেন না। আপনাদের আন্দাজ ভুল হয় নি। আমি রামায়ণের সেই মারীচ, সোনার হরিণ সেজে সীতাকে ভোলাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাম-ভক্ত বাল্মীকি একটা ভুল খবর লিখেছেন তাঁর রামায়ণে। রামের বাণে আমি মরি নি, আমার মুক্তিও হয় নি। রাম আমার মা তাড়কাকে বধ করেছিল, সে হত্যার প্রতিশোধ নেব ব'লে আমি বেঁচে আছি। রামকেই আমি খুঁজছি, রামই আমার ধ্যানজ্ঞান—"

"ভারতবর্ষে আজকাল রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুনেছি, সেখানে যদি যান রামের দেখা পেতে পারেন—"

"এ যুগের ভারতবর্ষেও আমি গেছি। সেখানে কালোবাজারি আর স্যাকরারা আমাকে ধরবার জন্যে নানারকম ফাঁদও পেতেছিল। কিন্তু যে রামকে আমি খুঁজছি সে রাম সেখানে নেই। আসল রামকে, সীতাপতি রামকে, রাবণারি রামকে, আমার মাকে যিনি বধ করছিলেন সেই রামকে আমি খুঁজে বার করবই—খুঁজে বার করবই—"

এক লম্ফে সোনার হরিণ কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"শুনুন, শুনুন, নহুষ কোথায় আছে বলতে পারেন ?"

কুয়াশার ভিতর থেকে হরিণ উত্তর দিল।

"না। আমি রাম ছাড়া আর কাউকে চিনি না। চিনতে চাইও না—"

কুয়াশার বুকে আর একবার স্বর্ণবিদ্যুৎ ঝকমক করে উঠল। মায়ামৃগ অন্তর্ধান করল বিদ্যুদ্বেগে।

"মোটা, এ তো ভারি বিপদে পড়া গেল দেখছি। এই কুয়াশার মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমরা। আস্তে আস্তে এগোনো যাক চল—দাঁড়াও দাঁড়াও—"

সরু কপালের উপর হাত দিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

"ওই দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে—"

"খুব ক্ষিদে পেয়েছে ভাই। ওই গর্তের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে—"

"চল ওই ধোঁয়া লক্ষ্য করেই যাওয়া যাক। হয়তো কোন হালুইকরের দোকান আছে—"

মোটা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দেখলেন দূরে একটা কুজ্ঝটিকা-স্তূপের উপর থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

"বেশ দূর মনে হচ্ছে"

"যত দূরেই হোক, ওই দিকেই যেতে হবে। ক্ষিধে আমারও পেয়েছে। তাছাড়া নস্যি নিতেও ইচ্ছে করছে। স্বাভাবিক ভদ্র দু' একজনের নাগাল পেলেই হবে—চল"

"একটা কথা বলব?"

"কি আবার"

"হাত ধরাধরি করে যাই দুজনে। যদি পড়ে-টড়ে যাই—"

"তুমি পড়লে কি আমি তোমাকে সামলাতে পারব?"

"তবু ধর—"

হাত ধরাধরি করেই দুজন অগ্রসর হতে লাগলেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে। পথ সুগম নয়। প্রস্তরাকীর্ণ। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরও আছে।

অবশেষে তাঁরা কুয়াশা পেরিয়ে যেখানে গিয়ে হাজির হলেন সেখানে দেখলেন একটি ছোট বাড়ির বারান্দায় বসে একটি বৃদ্ধ মুনিগোছের লোক পরোটা সেঁকছেন। মুনি খর্বকায়। মাথার চুলে এবং দাড়িতে খাবছা খাবছা টাক পড়েছে। মুনি নিবিষ্টচিত্তে পরোটা সেঁকছিলেন, ওঁদের দেখতেই পেলেন না প্রথমে। মোটা গলা-খাঁকারি দিতে চোখ তুলে চাইলেন। তখন তাঁরা দুজনেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তাঁকে।

"কে আপনারা—"

"আমরা আগন্তুক—"

"কি চান—"

"বড়ই ক্ষুধার্ত হয়েছি দুজনে। এখানে কোথায় খাবার পাওয়া যায় যদি বলে দেন দয়া ক'রে—"

"উপবেশন করুন আপনারা—"

তাঁরা বসতেই দুটি ভূর্জপত্র এগিয়ে দিলেন তিনি তাঁদের দিকে এবং যে ক'টি পরোটা সেঁকেছিলেন সবগুলি দিয়ে দিলেন তাঁদের। তারপর ঘরের দিকে বললেন, "লোপা, এদের চরু আর শূল্যপক্ক বরাহমাংস দিয়ে যাও।

ভিতর থেকে প্রশ্ন এল—"কাদের—"

"বেরিয়ে দেখ, অতিথি এসেছেন"

অপরূপ রূপসী লোপামুদ্রা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন দু'জনেই। এ রকম একটি রূপসী যে ওই কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন তা প্রত্যাশা করেন নি তাঁরা। বল্কল পরিধান করেছিলেন বলে তাঁর শরীরও প্রায় অনাবৃত। হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন মোটা।

রূপসীর চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল।

বললেন—"সব পরোটাগুলি দিয়ে দিয়েছ দেখছি—"

"চরু আর মাংস যা আছে তাও দিয়ে দাও"

"তাহলে আমরা কি খাব"

"আপাতত বায়ু ভক্ষণ ক'রে থাকতে হবে। এঁরা ক্ষুধার্ত অতিথি, এঁদের সৎকার আগে করতে হবে"

মোটা বললেন, "মহর্ষি, আমরা ক্ষুধার্ত বটে কিন্তু অভদ্র নই—"

সরু বললেন, "না, আপনাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারব না। আপনি মহৎ এবং কৃপালু, আপনার মহত্ত্বের সুবিধা নিয়ে আপনাদের অসুবিধায় ফেলব না আমরা। আপনার পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করুন আমাদের। আমরা আমাদের নাতি নহুষকে খুঁজতে এখানে এসেছি। সে পালিয়ে এসেছে পৌরাণিক লোকে—

মুনিবরের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

বললেন—"আমার কর্তব্য কি তা আমি জানি। আপনাদের মৌখিক ভদ্রতা আমাকে কর্তব্য থেকে বিচলিত করতে পারবে না। আপনারা আগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। লোপা, এঁদের পরিচর্যা কর—"

মোটা আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সরু চোখের ইশারায় বারণ করলেন তাঁকে। তাঁর ভয় হ'ল, মুনি-ঋষি লোক, হঠাৎ যদি ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে বসেন তাহলে আর এক বিপদ হবে।

লোপামুদ্রা উৎকৃষ্ট চরু এবং শূল্যপক্ক মাংস দিয়ে গেলেন। জলও দিলেন দু'টি মৃন্ময় পাত্রে। খেয়ে খুব তৃপ্তি হল দুজনেরই।

মোটা গদ্গদকণ্ঠে বললেন, "মা, আপনার কথা চিরদিন মনে থাকবে আমাদের"

কিন্তু লোপামুদ্রা বিন্দুমাত্র বিগলিত হলেন না এ কথায়।

এঁটো পাতা আর মাটির পাত্র দুটি বাইরে ফেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন।

মহর্ষি তখন স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"তুমি কাম্যক বনে চলে যাও। সেখান থেকে কিছু কন্দ সংগ্রহ করে নিয়ে এস। তোমার সুপুত্র ইধ্ম যতদিন না টাকাকড়ি পাঠাচ্ছে ততদিন কন্দ খেয়েই থাকব আমরা। কন্দও উৎকৃষ্ট খাদ্য—"

এ কথায় লোপা চোখে হাত দিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। বল্কলবসনা না হ'লে হয়তো চোখে আঁচল দিতেন।

মুনি বললেন, "অতিথিদের সামনে আত্মহারা হওয়াটা অশোভন। তুমি নিজেকে সংযত কর"

লোপামুদ্রা চোখ থেকে হাত সরিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বললেন—"আমার ছেলের নিন্দা আমি সইতে পারি না—"

মুনি একটু চটে গেলেন এবং সরু-মোটার উপস্থিতি অগ্রাহ্য ক'রে যে সব কথা বললেন তা মুনি ঋষি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

"তোমার ছেলে আমারও ছেলে। তার সম্বন্ধে যা বললাম তা নিন্দা নয়, তা তার সম্বন্ধে সত্যভাষণ। স্বার্থবুদ্ধি সকলকে বিভ্রান্ত করে ইধ্মকেও করেছে। এই স্বার্থবুদ্ধিটি সে পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। তুমি কি করেছিলে তা মনে করে দেখ। সঙ্গম-প্রার্থী হয়ে যখন তোমার কাছ গেলাম তখন তুমি কি পরিমাণ বসন-ভূষণ আমার কাছ থেকে দাবী করেছিলে তা স্মরণ কর। তোমার এই স্বার্থবুদ্ধি তোমার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এখন তা নিয়ে পরিতাপ করা বৃথা। তুমি যাও, কন্দ সংগ্রহ করে আন—"

মুনি-পত্নী ভিতরে চলে গেলেন এবং একটু পরে একটি ছোট কোদাল হাতে ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

সরু-মোটা দুজনেই হাত জোড় ক'রে উবু হয়ে বসেছিলেন।

মুনি বললেন—"এখানে সাধারণত কেউ আগন্তুকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চান না। কারণ আগন্তুকরা সাধারণত লঘুচিত্ত হন। অবিশ্বাসী মন নিয়ে এখানে আসেন। কেউ আসেন আমাদের নিয়ে গবেষণা করার ছলে নিজের বিদ্যা আস্ফালন করতে। হস্তী যদি শুণ্ড আস্ফালন করে দেখতে খারাপ লাগে না কিন্তু ছুঁচো যদি নাসার অগ্রভাগ কুঞ্চিত প্রসারিত করে' হস্তী-মাহাত্ম্য লাভ করতে চায় তাহলে বড়ই হাস্যকর হয় সেটা। বিরক্তিকরও হয় অনেক সময়। কেউ কেউ আবার আসেন প্রমাণ করতে যে আমরা সত্য নই, আমরা কবিদের উদ্ভট সৃষ্টি। তৃতীয় আর একদল আমাদের কুসংস্কারের প্রতিচ্ছবি বলে প্রমাণ করতে চান। অর্থাৎ আপনাদের ভাষায় যাদের ফাজিল ফক্কোড় ডেঁপো বলে তারাই আসে এখানে। এইসব কারণে আমরা তাদের প্রায় আমল দিই না। একমাত্র বিশ্বাসের মুকুরেই আমাদের সত্যরূপ দেখা যায়। সে বিশ্বাস কি আছে আপনাদের?"

সরু বললেন, "আছে—"

"কি করে' বুঝব তা"

"আমরা দুজনেই মূর্খ এবং স্বল্পবুদ্ধি। বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাছাড়া এখন বিপদে পড়েছি, বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছি তাই, কারণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সামর্থ আমাদের নেই। ভগবান দয়া করলেই নহুষকে আমরা খুঁজে পাব। ভগবানই বোধহয় আপনার মতো মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আমাদের এনে দিয়েছেন"

"আপনাদের চোখ মুখ দেখে আমারও মনে হয়েছিল আপনারা লঘুচিত্ত নন। তাই আপনাদের প্রশ্রয় দিয়েছিলাম"

"আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন"

"সত্যি জানতে চান?"

"নিশ্চয়। দয়া করে' বলুন—"

"আমি মিত্র-বরুণের পুত্র ঘটোদ্ভব অগস্ত্য। এককালে অনেক কিছু করেছি।

সমুদ্রশোষণ করেছি, বিন্ধ্য পর্বতকে নুইয়েছি, বাতাপিকে হজম করেছি, সদ্গতি-লোলুপ পূর্বপুরুষদের মুক্তির জন্য বিবাহ করেছি। কোনও কুমারীকে পছন্দ না হওয়াতে লোপামুদ্রাকে সৃজনও করেছি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সৌন্দর্য আহরণ করে'। তার গর্ভে উৎপন্ন করেছি ইধ্মকে। কোন কোন গবেষক এর নাম দিয়েছেন দৃঢ়স্যু। কিন্তু ওটা ভুল, আমি ওর ইধ্মবাহ নামই রেখেছিলাম। সংক্ষেপে ইধ্ম বলে ডাকি। নক্ষত্রলোকে বাস করেছি অনেকদিন। দক্ষিণ আকাশে আমার নামে চিহ্নিত একটি নক্ষত্রও আছে এখনও। আমি কিন্তু এখন এই ছোট অগস্ত্য আশ্রম বানিয়ে এখানে আছি। এই আশ্রমে স্বয়ং রামচন্দ্র এসেছিলেন। তাঁকে আমি বৈষ্ণবধনু, অক্ষয় তূণীর এবং আরও নানারকম অস্ত্র দিয়েছিলাম—"

এই পর্যন্ত বলে মুনি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—"জীবনে করেছি অনেক কিছু। তপস্যালব্ধ শক্তি সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তপস্যা করতে ইচ্ছে করে না। পেরে উঠি না, শরীরে কুলোয় না। এখন ইধ্মর ভরসাতেই থাকি। কিন্তু সে সব সময় টাকা-কড়ি পাঠাতে পারে না। শুনছি একটা অপ্সরার পাল্লায় পড়েছে। সবই মেনে নিয়েছি। যখন টাকাকড়ি পাঠায় তখন পরোটা মাংস চরু খাই। যখন পাঠায় না, তখন কন্দ খেয়ে থাকি"

মুনিবর নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"আপনাদের নাতির নাম কি বললেন ?"

"নহুষ"

"নহুষ ? আমি চন্দ্রবংশের এক নহুষকে চিনতাম। তার পালকি বয়েছিলাম দিনকতক। আপনাদের নহুষ কি পালকি চড়ে ?"

"তাতো জানি না। এখানে এসে সে যে কি করছে তা আমাদের অজ্ঞাত—এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন"

"চড়লে আমি তার পালকি-বাহক হতে পারি। বড় টানাটানির মধ্যে আছি"

"কিন্তু তাকে পাব কোথায়"

"দাঁড়ান একটু ধ্যানে বসি। ধ্যানযোগে খবর পেয়ে যাব তার"

চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন অগস্ত্য।

তাঁর সামনে চোখ বুজে হাতজোড় করে গদগদ হয়ে বসে রইলেন সরু আর মোটা। কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না। একটু পরে দুজনেরই চোখ পিটপিট করতে লাগল। সরু মোটার কাছে আর একটু ঘেঁসে এসে ফিস ফিস করে বললে—"মহর্ষির কাছে জেনে নিতে হবে এখানে র মাদ্রাজি নস্যি কোথায় পাওয়া যায়—"

মোটা বললে—"চুপ—"

আবার দুজনের চোখ বুজে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হল অগস্ত্যের।

বললেন, "দেখুন, আপনাদের নহুষ নকল-নহুষ হয়ে তপস্যা করছে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে। সে কি ম্লেচ্ছ বিদ্যায় পারদর্শী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে ফিজিক্সে ডি. এস. সি.। সোহাগার সঙ্গে তার বিয়ে হবার ঠিকঠাক। এমন সময় সোহাগার কি মতিচ্ছন্ন হল সে চলে গেল আগামী যুগে। যেখানে আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম ইন্দ্র তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছে—"

"ইন্দ্রের স্বভাব ওইরকমই হয়েছে আজকাল। বৈদিক যুগে তিনি মহান দেবতা ছিলেন, পৌরাণিক যুগে তিনি হয়েছেন ইন্দ্রিয়াসক্ত। তবে ভাববেন না, ঢিট্ হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত। বিরাট শক্তি আর অগাধ ঐশ্বর্য মানুষকে ঠিক থাকতে দেয় না। যিনি আসল নহুষ ছিলেন—যাঁর নকল আপনাদের নাতি হয়েছেন এখন—তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও প্রথম প্রথম খুব আত্মসংযম করে ভোগবিলাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই জন্যেই তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন কিছু দিনের জন্য। কিন্তু ইন্দ্রত্ব লাভ করেই তাঁর চারিত্রিক অধঃপতন হল। তিনি শচীকে কামনা করতে লাগলেন। শচী খুব চালাক মেয়ে। সে একটি কৌশল করল। বলল আপনি যদি ঋষি-বাহিত যানে আমার কাছে আসেন তবেই আমি আপনার আলিঙ্গনে ধরা দেব। নহুষ যে তপোবলে কতটা শক্তি অর্জন করেছিল তার ধারণা ছিল না শচীর। সে ভেবেছিল কোনও ঋষি তার পালকি বইতে রাজি হবে না। কিন্তু ঋষিরা পুণ্যবানের বশ। ঋষিদের ডাক পড়ল। অতবড় পুণ্যবান বীর্যবান রাজার আহ্বানকে উপেক্ষা করা অনুচিত মনে করলেন ঋষিরা। আমারও ডাক পড়েছিল। কিন্তু আমার যাবার খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আদেশ অমান্য করতে পারলাম না, কারণ নহুষ পুণ্যবান, যতক্ষণ তার খুঁত না ধরা পড়ে ততক্ষণ তার আহ্বান উপেক্ষা করা শক্ত। গেলাম। নহুষ বললেন, আমি শচীর কাছে যাব। আমার শিবিকা তোমাদের বহন করতে হবে। খুব রাগ হল মনে মনে। কিন্তু উপায় নেই। শেষে তুলতেই হল পালকি। নহুষ অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে লাগলেন। শাস্ত্রজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি, যদিও চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারেন নি। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন খুব। উত্তেজনার কারণ অঙ্গিরা বললেন—এ সময় শাস্ত্র আলোচনায় তিনি যোগ দিতে অনিচ্ছুক। কারণ পরস্ত্রীর কাছে অভিসার করার সময় শাস্ত্র আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অশোভন বলে মনে করেছ তিনি। রেগে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন নহুষ। আমার মাথায় এসে লাগল একটা লাথি। আমি ছুতো পেয়ে গেলাম। অভিশাপ দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। নহুষ অজগর সাপ হয়ে গেল। আর ইন্দ্র শুনেছি ব্রহ্মহত্যা করে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে এখন—"

চুপ করলেন অগস্ত্য।

"আমাদের নহুষ তাহলে—"

"আপনাদের নহুষ নকল-নহুষ। তবু আসল নহুষের মত কিছু কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হবে ওকে। স্ত্রীলোকের পাল্লায় যে-ই পড়ুক তার নিস্তার নেই। আমি পুত্রার্থে বিয়ে করেছিলাম, আমার হাড়ির হাল হয়েছে। তবে একটা বাঁচোয়া, আপনাদের নহুষ পরস্ত্রীকে কামনা করছে না। করছে নিজেরই ভাবী বধূকে। তবু

ভুগতে হবে। আপনারা ম্লেচ্ছ অঞ্চলে চলে যান। সেখানে তার দেখা পেয়ে যাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন তার পালকির যদি দরকার হয় তাহলে আমি বেয়ারা হতে রাজি আছি। তবে আমার আর লোপার খাই-খরচটা দিতে হবে। পালকিও আমি জোগাড় করতে পারব—"

"তার পালকির দরকার কেন হবে—"

"মনে হচ্ছে যেন হবে"

মোটা বললেন, "ম্লেচ্ছ-অঞ্চল কোন দিকে তা আমরা চিনব কি করে? আমরা পথঘাট তো কিছুই চিনি না"

"এখানকার পথঘাট দুর্গম। নদী অরণ্য পর্বত চারিদিকে ছড়ান"

সরু অনুনয় করে বললেন, "আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন মহর্ষি। আপনি কৃপা করলে—"

"খরচ করতে পারবেন?"

"পারব। কিন্তু আমার কাছে পৌরাণিক মুদ্রা নেই। আধুনিক যুগের একটা চেকবুক সঙ্গে এনেছি। চেক দিতে পারি। তাতে কি চলবে"

"হনুমানকে ডাকি তাহলে। আপনাদের আধুনিক যুগের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সব যুগের সঙ্গেই আছে। খুব চৌকশ লোক। বুদ্ধিও আছে, শক্তিও আছে অসীম। ও যদি আপনাদের বহন করে নিয়ে যেতে রাজি হয় তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকবে না। ও আপনাদের কাঁধে করে নিয়ে যাবে। তবে বিনা পয়সায় ও কিছু করতে চায় না আজকাল"

"আমরা পারিশ্রমিক দেব ওঁকে। আপনি ওঁকে খবর দিন। উনি কোথায় থাকেন"

অগস্ত্য এ কথার কোন জবাব না দিয়ে হাত তুলে তুড়ি দিলেন দু বার।

সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন মহাবীর হনুমান।

অগস্ত্যকে প্রণাম করে বললেন, "আপনার কি প্রয়োজন মহর্ষি, আমাকে স্মরণ করেছেন কেন"

"আমার প্রয়োজনের জন্যে স্মরণ করি নি। স্মরণ করেছি এই দুটি ভদ্রলোকের জন্য। এঁরা আধুনিক মর্ত্যলোক থেকে এসেছেন। নাতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে ছোকরা আছে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে। কিন্তু এঁরা এখানকার পথঘাট চেনেন না। এঁদের কাঁধে করে তুমি পৌঁছে দিতে পারবে? এঁরা তোমার পারিশ্রমিক দেবেন। একটা চেক দেবেন বলছেন—"

"চেক? কোন ব্যাঙ্কে—"

"স্টেট ব্যাঙ্কে—"

"হ্যাঁ ভালো ব্যাঙ্ক। নিতে পারি চেক—"

মোটা চেক বুক বার করলেন পকেট থেকে। ফাউন্টেন পেনটাও।

"কত টাকার চেক দেব"

"হাজার টাকার। আজকাল টাকার দাম কিই বা বলুন"

"ঠিক বলেছেন। আগেকার এক টাকা এখন দশ টাকার সমান। হাজার টাকাই দিচ্ছি—"

এক হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন মোটা।

হনুমান বললেন—"আমি চললুম—"

"কোথা—"

"চেকটা ভাঙিয়ে আমার মা অঞ্জনাকে টাকাটা দিয়ে আসি"

"তিনি কোথায় থাকেন"

"সুমেরু পর্বতে। আমার বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। একলাফে যাব, একলাফে আসব। চেকটা কার নামে দিয়েছেন—"

"শ্রীমহাবীর—"

"না না, আপনি সেল্‌ফ (self) বলে দিন। বেয়ারার চেক দেবেন আর চেকের পেছন দিকে একটা সইও করে দেবেন"

অগস্ত্য হেসে বললেন—"মহাবীর চৌকশ লোক—"

মোটা আবার একটা চেক লিখলেন। হনুমান সেটা নিয়ে অন্তর্ধান করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

অগস্ত্য মুগ্ধ হয়েছিলেন ফাউন্টেন পেনটি দেখে।

"বাঃ, চমৎকার কলমটি তো। ওর ভিতর বুঝি কালী থাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"চমৎকার, আমরা খাগের কলমে লিখেছি দোয়াতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে। সে এক দুর্গতি ছিল আমাদের সময়"

"আপনি কলমটা নেবেন ?"

"না। আজকাল আর লেখাপড়া করবার সময় পাই না। কি করব কলম নিয়ে। ঘরের কাজ কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকি। নিজেকেই পরোটা সেঁকতে হয়—"

সরু বললেন, "মুনি-পত্নী বুঝি অন্য কাজ নিয়ে থাকেন ?"

"হ্যাঁ। ওকে আটা পিষতে হয়। কন্দও খুঁড়ে আনতে হয়। শ্রমসাধ্য কাজ ওই করে সব"

"কিন্তু আপনাদের মতো ত্রিভুবন বিখ্যাত দম্পতি এত কষ্ট করে আছেন দেখে বড় আশ্চর্য লাগছে। একটু ইঙ্গিত করলেই তো অনেকে আপনাদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসবেন—"

"তা হয়তো আসবেন। কিন্তু আমি স্বাবলম্বী হওয়াটাকেই শ্রেয়ঃ মনে করি। জীবনে কখনও কাউকে খোশামোদ করি নি, কখনও কোনও অন্যায়কে ক্ষমা করি নি। উদ্ধত মদগর্বী লোককে শাস্তি দিয়েছি বরাবর। বৃদ্ধ বয়সে কারো সাহায্য ভিক্ষা করা অসম্ভব আমার পক্ষে। বৃদ্ধ বয়সে আমার স্বাভাবিক রক্ষাকর্তা আমার পুত্র। সে যদি নিজ কর্তব্য অবহেলা করে তার ফল সেই ভোগ করবে। আমি খাসা আছি, আমার কোন কষ্ট নেই। কাম্যক বনে প্রচুর কন্দ পাওয়া যায়, খেতেও খুব ভালো। যদি একটু অপেক্ষা করেন আপনাদের খাওয়াব। লোপা এখুনি এসে পড়বে—কিন্তু এ কি। হনুমান যে ফিরে এল। খুব শিগগির এসেছে তো। বাহাদুর বটে—"

একলম্ফে মহাবীর এসে হাজির হলেন।

"চলুন এবার। আমার কাঁধে চ'ড়ে যাবেন তো"

"যা বলবেন তাই করব—" সরু বললেন—"কিন্তু আপনার কাঁধে আমরা দুজনে চড়ব কি করে"

"শরীর বাড়াব—এই দেখুন"

দেখতে দেখতে হনুমান দৈত্যাকৃতি হয়ে গেলেন।

"এইবার আসুন। দু কাঁধে দুজন বসুন আমার মাথা ধরে। আসুন—"

দুজনকে দুহাতে তুলে হনুমান তাঁদের কাঁধের উপর বসিয়ে দিলেন।

"মাথাটা ভাল করে ধরে থাকবেন। কারণ আমি লাফাব"

অগস্ত্য বললেন, "রাস্তায় নানারকম দৃশ্য দেখতে পাবেন। মহাবীর, ওদের বুঝিয়ে দিও সব"

"যে আজ্ঞে"

তারপরই লম্ফ দিলেন মহাবীর।

আকাশ-পথে চলেছিলেন তাঁরা।

সত্যিই নানারকম দৃশ্য দেখা যেতে লাগল নীচে।

চিত্রকূট পর্বত, বধূসরা নদী, কাম্যক বন, অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনাপুর, গঙ্গা যমুনা, মথুরা বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র, ভূগোলের নানাস্থানে অবস্থিত পৌরাণিক স্থানগুলো পাশাপাশি কে যেন সাজিয়ে রেখেছে ছবির মতন। গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট, এমন কি সিউমেরিয়নদের রাজত্বভূমি, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদী—সব যেন আঁকা রয়েছে একটা স্বপ্নের পটভূমিকায়।

হনুমান বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন।

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন তাঁরা।

হঠাৎ এক জায়গায় প্রচুর কোলাহল শোনা গেল। শিখা আর ধূম আবৃত ক'রে ফেলল গগনমণ্ডলকে। অনেক নর-নারীর দেহ উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল আকাশে। হনুমান একটু সরে ভিন্ন পথ ধরলেন।

"কি হচ্ছে ওখানে?"

"দক্ষযজ্ঞ। বীরভদ্র এখনও আসেন নি। দক্ষ বারবার জন্মাচ্ছে আর বীরভদ্র তাকে বারবার ধ্বংস করছেন। ক্রমাগত চলেছে এই কাণ্ড। আপনাদের আধুনিক যুগেও ভিন্ন নামে হচ্ছে এসব। ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। সরে যাওয়াই ভাল—"

বেশ কিছু দূরে সরে গেলেন তিনি।

একটা বিরাট অরণ্য পেরিয়ে একটা নূতন দেশে হাজির হলেন তাঁরা। সামনে প্রকাণ্ড একটা পাহাড়। তার পরই সমুদ্র। তাঁরা দেখে অবাক হলেন পাহাড়ের গায়ে একটি দিব্যকান্তি তরুণ শৃঙ্খলিত অবস্থায় টাঙানো রয়েছেন। সম্পূর্ণ নগ্ন তিনি। হাত-পা পাহাড়ের সঙ্গে শৃঙ্খলিত। পাহাড়ের নীচে একটি চমৎকার বকনা গাই ঊর্ধ্বমুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কথা বলছে যুবকটির সঙ্গে।

"এরা কে মহাবীরজি"

সরু প্রশ্ন করলেন।

"পাহাড়ের উপর যিনি টাঙানো রয়েছেন তাঁর নাম প্রমেথিউস (Prometheus)—ইনি স্বর্গ থেকে অগ্নি এনে মানুষদের দিয়েছিলেন। এই অপরাধে গ্রীক স্বর্গের ইন্দ্র জিউস (Zeus) ওঁকে এই পাহাড়ে শৃঙ্খলিত করে রেখেছেন। রোজ সকালে একটি ঈগল পাখী এসে ওর যকৃত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় ছোকরাকে। রাত্রে যকৃতটি আবার ঠিক হয়ে যায়। সকালে আবার আসে ঈগল পাখী। কিন্তু এ যন্ত্রণা ওঁকে বেশীদিন ভোগ করতে হবে না। হারকিউলিস্ এসে উদ্ধার করবেন ওঁকে—"

মোটা বললেন, "হ্যাঁ কলেজে পড়বার সময় গল্পটা পড়েছিলাম। মনে পড়ছে। শেলী খুব চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন প্রমেথিউসকে নিয়ে। কিন্তু ওই গরুটি কি করছে ওখানে—"

"ও গরু নয়। ও একজন রাজকুমারী। নাম আইও (Io)—জিউস ওর প্রেমে পড়েছিলেন। জিউসের স্ত্রী হেরা তাই ক্রোধান্ধ হয়ে মেয়েটির এই দুর্দশা করেছে। ওই দেখুন ছুটল আবার—"

"কি রকম—"

"যে রকম চিরকাল হয়। জিউস হেরার কাছ থেকে মেয়েটিকে লুকোতে গিয়ে নিজেই তাকে বকনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। হেরা বকনাটিকে জিউসের কাছ থেকে চেয়ে নেয় এবং ওর পিছনে একটি সাংঘাতিক ডাঁশ মাছি লাগিয়ে দেয়। সেই ডাঁশ মাছির কামড়ের জ্বালায় বেচারী ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। ওরও মুক্তি হবে একদিন—"

মোটা বললেন—"এ গল্পটাও পড়েছি মনে হচ্ছে—"

ধমকে উঠলেন মহাবীরজী।

"গল্প গল্প করছেন কেন। কোনটাই গল্প নয়, সবই সত্যি। আমার কথাও তো গল্পে পড়েছিলেন, কিন্তু আমি কি গল্প ?"

"আজ্ঞে না। আপনি তো প্রত্যক্ষ সত্য"—সরু বলে উঠলেন তাড়াতাড়ি। মোটার দিকে চোখের ইশারায় ইঙ্গিত করলেন সে যেন আবার বেফাঁস কিছু বলে না বসে। সরুও মনে মনে ঠিক করলেন পারতপক্ষে কথা কইবেন না। হনুমানের কাঁধে চড়ে শূন্য দিয়ে যাচ্ছেন সাবধান থাকাই ভাল। একটু পরে কিন্তু তিনিই বলে উঠলেন—"ওটা কি ? ওটা কি ?—"

আকাশপথে একটি রূপবান যুবক হু হু ক'রে উড়ে যাচ্ছিলেন। তার এক হাতে অদ্ভুত রকম চকচকে একটা ঢাল, অন্য হাতে শাণিত তলোয়ার। পায়ের স্যাণ্ডালে ডানা, কাঁধ থেকে ঝুলছে রূপোর একটা বাক্স—।

মোটাও অবাক হয়ে গেলেন দেখে।

হনুমান বললেন—"উনি পারসিউস (Parseus) মেডুসাকে বধ করতে যাচ্ছেন—"

সরুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল—"গল্পটা কি", কিন্তু তিনি সামলে নিয়ে বললেন—"ঘটনাটা কি—"

"লম্বা ঘটনা। পরে জেনে নেবেন। প্রত্যেকটি ঘটনার বর্ণনা যদি দিতে হয়

তাহলে তো দম ফুরিয়ে যাবে আমার। ম্লেচ্ছ অঞ্চলে পৌঁছতেও দেরি হয়ে যাবে অনেক—"

"তাহলে থাক—"

একটি লম্ফ দিয়ে হনুমান গ্রীক অঞ্চলটা পার হয়ে গেলেন।

আবার সমুদ্র। ভূমধ্যসাগর।

বিরাট একটা নৌকো দেখা গেল। অসাধারণ নৌকো। মনে হল মুক্তো দিয়ে তৈরি বিরাট একটা ময়ূর যেন। নৌকোর মাঝি-মাল্লারা পুরুষ নয়, অপরূপ বেশে সজ্জিতা যুবতী নারী সব। প্রত্যেকের হাতে রুপোর দাঁড়। নানা বেশে ভূষিতা ক্রীতদাসীরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে নানা ভাবে। মানবী নয়, অপ্সরার দল যেন। নৌকোর সামনের দিকে সোনার একটি চাঁদোয়া দুলছে। তার নীচে মণিমাণিক্য-খচিত চমৎকার পালঙ্ক একটি। পালঙ্কের উপর নীল মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধা-শোয়া অবস্থায় বসে আছেন একজন মোহিনী নারী। অনিন্দ্য সুন্দরী তিনি। তাঁর পরিধানে জাফরান রঙের পোশাক। পায়ের নীচে আর আশেপাশে নানা রঙের ছোট বড় বালিশ। সমুদ্রের দিকে স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন তিনি। অস্ট্রিচের পালক দিয়ে তৈরি পাখা দিয়ে হাওয়া করছে ক্রীতদাসীরা। ময়ূরপঙ্খী তীরবেগে এগিয়ে চলেছে, উড়ছে বেগুনী রঙের রেশমী পাল।

"কে উনি—"

মোটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"ক্লিওপেট্রা। টারশিষের (Tarshish) দিকে চলেছেন অভিসারে। মার্ক এন্টনি এসেছেন সেখানে—"

সরু বললেন, "নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। ইতিহাসটা ঠিক মনে পড়ছে না"

"বাড়ি গিয়ে পড়ে নেবেন"

হনুমান দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁদের।

সারি সারি শিবির সন্নিবেশিত হয়েছে সমুদ্র-সৈকতে। একটা শিবিরের সামনে সৈন্যদের ভীড়। শিবিরের ভেতর থেকে আনতনয়না একটি সুন্দরী বেরিয়ে এল। তার পিছু পিছু বেরিয়ে এল একজন উন্নত মস্তক বলিষ্ঠ যুবক। চীৎকার করে সে সৈন্যদের বলল—"তোমরা রাজার আদেশে ওকে নিতে এসেছ নিয়ে যাও। বাধা দেব না আমি। কিন্তু এর প্রতিশোধ নেব। আগামেম্‌নন্‌কে (Agamemnon) বলে দিও এ অপমান আমি সহ্য করব না। আমি যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হলাম।"

মোটা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

"পোশাক দেখে মনে হচ্ছে গ্রীক—"

"ঠিকই বলেছেন, ওরা ম্লেচ্ছ গ্রীক। ট্রয়ের যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে মেয়েমানুষ নিয়ে। অ্যাকিলিসের (Achilies) কাছ থেকে ব্রাইসিস্‌কে (Briseis) কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাগামেম্‌নন্‌। হোৎকা গোছের লোকটা।

এর ফলও ভুগতে হয়েছিল বাছাধনকে। ফেরত দিতে হয়েছিল ব্রাইসিসকে সুব শুদ্ধ—"

"তাই নাকি—"

সরু বলে' উঠলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আরও কিছু প্রশ্ন করেন এ বিষয়ে। কিন্তু মোটা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলেন। হনুমান রেগে গিয়ে যদি কাঁধ-ঝাড়া দেন তাহলে সমুদ্রে পড়ে যাবেন তাঁরা। হনুমান তখন সমুদ্র পার হচ্ছিল।

সাগর পার হয়ে অনেক অরণ্য, নদী পর্বত দেখা গেল। সরু মোটা হনুমানের মাথাটি শক্ত করে' ধরে বসে রইলেন টুঁ শব্দটি না করে'। কিন্তু একটু পরেই যা দেখা গেল তাতে সরুর পক্ষে আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। দেখলেন একটি ল্যাংটো মেয়ে এলোচুলে মাঠামাঠি ছুটছে। আর তার পিছু পিছু ছুটছে একদল লোক। মেয়েটিকে একটু পরেই ধরে ফেলল তারা। টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা হাটের মাঝখানে। সেখানে একটা উঁচু আড়গড়ার মতো ছিল, তার ভিতর পুরে ফেললে তাকে।

"ওটা কি কাণ্ড মহাবীরজি, যদি রাগ না করেন বলুন না ব্যাপারটা খুলে—"

হনুমান ঘোঁৎ করে' শব্দ করলেন একটা। কিন্তু সরুর অনুরোধ রক্ষা করলেন।

বললেন—"ব্যাবিলনের হাটে মেয়ে নিলাম হচ্ছে। ওই মেয়েটা পালাচ্ছিল তাই ধ'রে নিয়ে এল। কসাইরা যখন খাসি পাঁঠার দল কিনে নিয়ে যায় তখন তার থেকে একটা ছিটকে পালালে সেটাকে যেমন ধরে' নিয়ে আসে অনেকটা তেমনি আর কি—"

সরু মোটা দুজনেই মাংসাশী। নিরামিষাশী হনুমানের এই শ্লেষবাক্যে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন দুজনেই। সরু মনে মনে বললেন—'চাষা যেমন মনের স্বাদ জানে না তুই ব্যাটা বাঁদর তেমনি জানিস না মাংসের স্বাদ। মাটন রোস্ট তো কখনও খাস নি, কলা মুলো খেয়ে দিন কাটাস, বড় জোর দু'একটা উকুন—"

মোটা কিন্তু হনুমানকে তৈলাক্ত করাই সমীচীন মনে করলেন।

"কত কি দেখালেন আমাদের, কত কি শিখলাম—"

"কত কি দেখালেন আমাদের, কত কি শিখলাম—"

"আমি মূর্খ মানুষ আমি আপনাদের কি শেখাতে পারি। আমি শুধু এইটুকুই জানি দেখারও শেষ নেই, শেখারও শেষ নেই। উ—প্—"

বিরাট একটা লম্ফ দিয়ে হনুমান সোঁ সোঁ করে' উপরে উঠতে লাগলেন। টাল খেয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হ'ল সরু মোটা দু'জনেরই।

"কি কাণ্ড করছেন স্যার"

ইংরেজি বেরিয়ে পড়ল সরুর মুখ দিয়ে।

"মানসলোকে যাচ্ছি। আপনাদের যখন এত দেখার ইচ্ছে তখন নতুন একটা জিনিস দেখাব—আপনাদের। এর কথা পুরাণে লেখা নেই। বিশ্বকর্মা গোপনে সৃষ্টি করেছেন এটা। রোদনের যাদুঘর, আপনাদের ভাষায় মিউজিয়াম (museum)—"

একটু পরেই তাঁরা চেরাপুঞ্জীর মতো একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। ঝর ঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে সেখানে। নানা আকারের মেঘ জমে' আছে চতুর্দিকে। আর নানা কণ্ঠের রোদনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বুক-ফাটা হাহাকার সব।

হনুমান বলতে লাগলেন—"অদ্ভুত জায়গা ওটি। ওই শুনুন সত্যবানের জন্য

সাবিত্রী কাঁদছে, রামের জন্য সীতা, ইন্দুমতীর জন্য অজ, শৈব্যার জন্য হরিশ্চন্দ্র, ইন্দ্রজিতের জন্য প্রমীলা, রাবণের জন্য নিকষা, হেক্‌টরের জন্য অ্যান্ড্রোম্যাচি (Andromache), সতীর জন্য শিব, কর্ণের জন্য কুন্তী, শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধা, লক্ষ্মণের জন্য উর্মিলা, দুষ্মন্তের জন্য শকুন্তলা, কচের জন্য দেবযানী, মৃত পঞ্চপুত্রের জন্য দ্রৌপদী, নুরজাহানের জন্য শের আফগান, দারার জন্য সাজাহান, সিরাজ-উদ্দৌলার জন্য লুৎফুন্নিসা, বুদ্ধের জন্য যশোধরা,—পৌরাণিক ঐতিহাসিক বহু কান্না এখানে একত্রিত করে' রেখেছেন বিশ্বকর্মা। আমি সব ঠিক করে' বলতে পারলাম না, যে কটা মনে পড়ল বললাম। এ একটা অদ্ভুত জায়গা"

"সত্যিই অদ্ভুত—"

"এইবার তাহলে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে যাওয়া যাক। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু মক্ষিকার রূপ ধারণ করে থাকব—"

"সে কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্লেচ্ছরা হনুমান দেখলেই ধরে' ফেলে আর তার শরীরের ওপর নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়। সুতরাং আমি সাবধানে থাকতে চাই। এ অঞ্চলে পারতপক্ষে আসি না। কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশ উপেক্ষা করতে পারলাম না—"

"আপনাকে তাহলে আমরা পাব কি করে"

"তিনটি তুড়ি মারবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে হাজির হব।

ভাল করে' মাথাটা ধরে থাকুন। প্রচণ্ড একটা লাফ দেব এবার—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড লাফটি দিলেন তিনি এবং অনতিবিলম্বে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে উপনীত হলেন।

ম্লেচ্ছ অঞ্চলে পদার্পণ করে মোটা বুঝলেন তাঁরা বিলেতে এসেছেন। তিনি প্রথম যৌবনে বিলেতে গিয়েছিলেন। পথঘাট পার্ক প্রভৃতি দেখে তাঁর এ কথাটা মনে হল। কিন্তু কাছে-পিঠে কোনও লোক দেখতে পেলেন না যে জিজ্ঞেস করবেন জায়গাটার নাম কি। রাস্তার পাশে একটা সবুজ লন (lawn) ছিল, তার ওপারে হলদে রঙের বাড়ি দেখতে পেলেন একটা। সেই বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবেন কিনা ভাবছিলেন এমন সময় সেই বাড়িরই দরজা খুলে একটি লোক বেরিয়ে এসে হা হা করে হেসে উঠল। সাহেবি পোষাকপরা, মাথার চুল উসকো খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ইংরেজিতে তিনি বললেন—"আসুন, আসুন, আসুন। আপনারা যে আসবেন তা জানতাম আমি। আমি যে বিশপ (Bishop) হয়েছি সেই খবর এনেছেন তো? রোজই প্রতীক্ষা করি কেউ না কেউ খবরটা নিয়ে আসবে। এসথার (Esther) কি কোনও খবর পাঠিয়েছে?"

সরু বললেন—"পাগল মনে হচ্ছে—"

সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

"আসুন, আসুন, প্লীজ স্টেপ-ইন (please, step in)—" মোটা ইতস্তত করতে লাগলেন।

সরু বললেন, "চল এগিয়ে যাই। পাগল বড় ভয়ানক জীব"

"প্লীজ কাম—"

মোটা বললেন—"দুর্গা বলে' এগিয়ে তো পড়া যাক। তারপর যা হয় হবে—"

মোটা অগ্রসর হলেন। সরুকেও অগত্যা তাঁর পিছু পিছু যেতে হল।

সাহেবের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা হল।

আমি বাংলা তর্জমা করে দিচ্ছি।

"সাহেব জড়িয়ে ধরলেন মোটাকে, শেক হ্যাণ্ড করলেন সরুর সঙ্গে। তারপর বললেন, "আপনারা আসবেন তা আমি জানতাম। আমাকে বিশপ করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত, না? জানতাম দিতেই হবে। এস্থার কোন খবর পাঠায় নি? তার ঠিকানাটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। সে বলেছিল খবর পাঠাবে। কিন্তু এখনও পাঠায় নি। হয় তো আর কারও প্রেমে পড়ে গেছে—হা-হা-হা-হা—মেয়েমানুষদের ব্যাপার বোঝেনই তো—"

মোটা সবিনয়ে প্রশ্ন করল—"আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"আমি সামান্য লোক। নাম জোনাথন সুইফ্‌ট্ (Jonathan Swift)—পাদরিগিরি করতাম, বইটইও লিখেছি দু'একটা"

মোটা বললেন—"সরু প্রণাম কর—"

উভয়েই প্রণাম করলেন সসম্ভ্রমে।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সাহেব।

"কি ব্যাপার, এ কি কাণ্ড!"

মোটা বললেন—"আমরা ভারতবাসী। মহৎ লোককে আমরা এইভাবেই শ্রদ্ধা জানাই"

"আপনারা ভারতবাসী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আমি বিশপ হয়েছি কি না সে খবর তাহলে তো আপনাদের জানবার কথা নয়"

"একটা খবর কিন্তু জানি আপনি বিশপের চেয়ে অনেক বড় হয়েছেন, রাজার চেয়েও বড়—"

"কি রকম?"

"আপনি গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স্-এর লেখক। বিশ্ব সাহিত্যে আপনার কীর্তি অক্ষয়, রসিক সমাজে আপনার সম্মান অতুলনীয়—"

হা হা করে হেসে উঠলেন সাহেব।

তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে ঢুকে গেলেন ঘরের ভিতরে। এক টিন বিস্কুট নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

টিনের ঢাকনা খুলে বললেন—"এগুলো কি বলুন তো"

"বিস্কুট"

আবার হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

"না, না আসল বিস্কুট নয় খ্যাতির বিস্কুট। খেলে পেট ভরে না, মুখে দিলেই হাওয়া হয়ে যায়। এই রকম খ্যাতির বিস্কুট, খ্যাতির কেক, খ্যাতির রুটি মাখন, খ্যাতির জ্যাম জেলি, খ্যাতির বীফ-ষ্টিক, খ্যাতির মাটন চপ্ আমার বাড়িতে রোজ এসে জমা হচ্ছে। কিন্তু আমার ক্ষিদে মিটছে না। এ সমস্ত ফাঁকি, সমস্ত ফাঁকা, সমস্ত হাওয়া। হয় তো আমি অনাহারে মরেই যেতাম, কেবল একটি জিনিস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—

নেকটার অব মেমরি (nectar of memory)—স্মৃতির সুধা পান করে বেঁচে আছি আমি। এসথারকে (Esther) ভালবাসতাম, সেও আমাকে ভালবাসত, এরই স্মৃতি সঞ্জীবনী সুধার মতো। এই সুধা পান করে আমি বেঁচে আছি। খ্যাতি ট্যাতি সব বাজে। প্রেমই সব চেয়ে সেরা জিনিস। যারা প্রেমে পড়তে পারে তারাই সেরা মানুষ। সেদিন একটি যুবক এসেছিল আমার কাছে, সে প্রেমে পড়েছে, তার প্রণয়িণীকে নিয়ে এক হোমরা চোমরা দেবতা না কি ইলোপ (elope) করেছে। সে এখানে এসেছিল তপস্যা করে সেই দেবতাকে জব্দ করবে বলে—"

"তার নাম কি বলুন তো"

"ন্যাউস"

"নহুষ নয় তো"—বলে উঠলেন সরু।

"হতে পারে। ওই ধরণেরই কি একটা নাম বলেছিল সে। আপনারা তাকে চেনেন না কি"

"তারই খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। সে আমার নাতি"

"আই সি (I see)—তাকে আমি গালিভার বানিয়ে দিয়েছি। সে এখন লিলিপুটদের দেশে আছে"

"কি সর্বনাশ। সে দেশ আবার কতদূর—"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন সুইফ্‌ট্‌।

"বলুন না কত দূর। কি করে যাব সেখানে"

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সরু।

"বেশী দূর নয়। জানলা খুললেই তাকে দেখতে পাবেন।"

"আসুন—"

সাহেব পাশের জানলাটা খুলে দিলেন।

জানলার নীচেই প্রকাণ্ড মাঠ। তার উপর নহুষ শুয়েছিল চোখ বুজে। তার হাতে পায়ে বুকে পেটে মাথায় সর্বাঙ্গে সরু সরু দড়ির বাঁধন। তার আশেপাশে অনেক ছোট ছোট মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোটা সবিস্ময়ে দেখল দুই একজন মই লাগিয়ে তার পেটে ওঠবার চেষ্টা করছে। পেটে উঠলেও কোন বিপদের সম্ভবনা আছে বলে মনে হল না। কারণ মানুষগুলি সত্যিই খুব ছোট ছোট। এক ইঞ্চির বেশী লম্বা বলে কাউকে মনে হল না।

"কি ব্যাপার হচ্ছে ওখানে—"

সুইফ্‌ট্‌ জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর বললেন—"আপনার নাতি তপস্যা করছে। ওই দড়িগুলো হচ্ছে সংযমের বাঁধন"

"কি রকম?"

"তত্ত্বটা শুনুন তাহলে। চেয়ারে বসুন ভাল করে"

সরু মোটা দুজনেই দুটো চেয়ারে বসলেন।

"বলুন"

"তত্ত্বটা হচ্ছে, তপস্যার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। আমার মতে তার প্রথম

ঘাপ হচ্ছে নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করা। আপনাদের দেশেই ছান্দোগ্য উপনিষদ রচিত হয়েছিল। সেই উপনিষদে উদ্দালক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তৎ ত্বম অসি। এ ধারণাটা মনে বদ্ধমূল করতে হলে তাকে এমন একটা পরিবেশে থাকতে হবে যেখানে সবাই তার চেয়ে অনেক ছোট, যেখানে তার মনে হবে আমি সর্বশক্তিমান, আমি বৃহৎ। এই ধারণাটা তার মনে যখন পাকা হয়ে যাবে তখন তাকে নিয়ে যাব ব্রবডিংনাগদের (Brobdingnag) দেশে যেখানে বৃহদাকার দৈত্যরা বাস করে। তাদের কাছে গিয়ে ন্যাউস বুঝতে পারবে আসলে সে কত ছোট। তার দর্প চূর্ণ হবে, মনে বিনয় জাগবে। বুঝতে পারবে এদের তুলনায় সে কত নগণ্য। আর একটা জ্ঞানও তার হবে পৃথিবীতে ছোট বা বড় কিছু নেই। একজনের তুলনায় আর একজন ছোট বা বড় বা সমান। এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। ন্যাউস এখন যে লিলিপুটদের কাছে আছে তারা আমার গালিভার্স ট্রাভলসের (Gullivers Travels) লিলিপুট নয়? ওরা হচ্ছে আমাদের সমাজের সাধারণ বর্বর মানুষ। তাদের তুলনায় ও যে অনেক বড় এ জ্ঞান ওকে আগে লাভ করতে হবে। ওকে যে ব্রবডিংন্যাগদের (Brobdingnug) কাছে পাঠাব আবার তারাও গল্পের ব্রবডিংন্যাগ নয় তারা সত্যিকার মহামানব। তাদেব মধ্যে গ্যালিলিও আছেন, নিউটন আছেন, ডারবিন আছেন, ফ্যারাডে আছেন, পৃথিবীর সমস্ত ইনটেলেকচুয়াল জায়েণ্টরা (Intelectual Giant) আছেন। সেখানে গিয়ে ন্যাউস জানতে পারবে কি করে ওই লম্পট দেবতার কবল থেকে সে তাব প্রণয়িণীকে উদ্ধাব করতে পারবে। মহামানবদের মধ্যেই কেউ ওকে সাহায্য করবেন। বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্ভব হবে না। কারণ আমি যা শুনেছি—Your Indra is a subtle tricky fellow—

সবু বাংলাতে বললেন—লোকটা বদ্ধ পাগল দেখছি। সুইফট্ হেসে জিজ্ঞেস করলেন—"What do you say ?"

মোটা হেসে বললেন, "He says you are mad."

"No doubt I am, but you are no less."

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—সবু সহর্ষে বললেন—

"আমরা শুধু পাগল নই থার্ড ক্লাস পাগল। তা না হলে ওই দুটো বখা ছোঁড়া ছুঁড়ির পিছনে ছোটাছুটি করছি। কতক্ষণ যে নস্যি নিই নি। নস্যির জন্যে প্রাণটা খাঁ খাঁ করছে। আমাকে একটু দয়া করবেন সাহেব, আপনি তো দেখছি যাদুকর। আমাকে একটু র মাদ্রাজি নস্যি আনিয়ে দেবেন—"

"নিশ্চয়, সে আর শক্ত কি"

সাহেব রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন আর ধুলো নিয়ে এলেন এক মুঠো।

"নিন—"

"এ যে ধুলো সাহেব"

"চোখ বুজে এইটেই টানুন আর ভাবুন নস্যি নিচ্ছেন। মনই সব। মনে করুন এইটেই নস্যি, তাহলেই নস্যি হয়ে যাবে এটা। নিয়েই দেখুন না"

"নেব ?"

"নিন"

হোঁস হোঁস করে এক টিপ ধুলোই নাকে গুঁজে দিলেন সরু। তারপর আর এক টিপ। চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর।

"বাঃ, এতো চমৎকার জিনিস দেখছি। অবিকল নেপোর দোকানের ঘিয়ে ভাজা র মাদ্রাজি—বাঃ বাঃ বাঃ"

"আমরা এখন তাহলে কি করি বলুন তো"

"আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। দিন দুই পরে লিলিপুটদের দেশ থেকে ব্রবডিংনাগদের দেশে যাবে। সেখানে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচয় করতে কিছুদিন সময় লাগবে। আমার বিশ্বাস কারো না কারো নেকনজরে পড়ে যাবে ও। তিনিই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন ওঁকে। তারপর ইন্দ্রের ব্যূহ ভেদ করে প্রণয়িণীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে। তবে তো আসবে। চট করে হবে না। দেরী হবে—"

আবার নস্যি নিলেন সরু।

একটু উত্তেজিত হয়ে আরক্ত নয়নে বললেন—"আমরা ততক্ষণ কি করব?"

"আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে"

"অতদিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব?"

"আমি আপনাদের স্ট্যাচু (Statue) করে দিচ্ছি"

"স্ট্যাচু?"

"হুঁ্যা। পাথর কখনও অধীর হয়ে ছটফট করে না"

"তারপর?"

"তারপর আপনার নাতি যখন ফিরে আসবে তখন আপনাদের আবার মানুষ করে দেব"

"পারবেন তো"

"নিশ্চয়ই পারব। আপনারা চোখ বুজে বসুন"

"কি বল সরু, রাজি আছ?"

"ছটফট করার চেয়ে পাথর হয়ে থাকাই তো ভালো। খিদে তেষ্টাও থাকবে না"

"তাহলে চোখ বুজে বসুন আপনারা"

পাশাপাশি বসলেন দু'জনে চোখ বুজে।

সুইফ্‌ট্‌ স্ট্যাচু করে দিলেন তাদের।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

কতদিন যে কেটে গেল তার ঠিক নেই। তারপর হঠাৎ একদিন নহুষ আর সোহাগা এসে হাজির হল সুইফ্‌টের বাড়িতে।

"হ্যালো, তোমরা এসে গেলে"

"হুঁ্যা। আপনার পরামর্শ না পেলে—"

"ওসব কথা থাক। কি হল বল সেখানে।"

"সে অনেক কাণ্ড। প্রথমে কেউ পাত্তাই দিলেন না কিছুদিন। তারপর একদিন

দেখা হল কিরোর (Cheiro) সঙ্গে। তাঁর ফোটো দেখেছিলাম, চিনতে পারলাম। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম—'সার, আমার হাতটা দেখবেন দয়া করে। আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার উড্-বি ওয়াইফকে (would-be-wife) নিয়ে ইন্দ্র পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে কিনারা করতে পাচ্ছি না।' কিরো মনোযোগ সহকারে আমার হাতটি দেখলেন। তারপর বললেন—'তারা যেখানে আছে সেখানে যাওয়া শক্ত।' জিজ্ঞাসা করলাম—'কোথায় আছে তারা ?' কিরো বলল—'তারা নাইট্রোজেন আটমে ঢুকেছে। মেয়েটি হয়েছে প্রোটোন (Proton) আর ইন্দ্র ইলেক্‌ট্রন হয়ে তার চারদিকে বন বন করে ঘুরছে। আপনি এক কাজ করুন। আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ আপনাকে সুপরামর্শ দিতে পারবে না। অনেকক্ষণ খুঁজে আইনস্টাইনের দেখা পেলাম। দেখলাম তিনি তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন। অপেক্ষা করে রইলাম। বেহালা থামতেই গেলাম তাঁর কাছে। সব কথা বললাম। তিনি বললেন রাদারফোর্ড (Rutherford) অ্যাপারেটস (apparatus) দিয়ে নাইট্রোজেন অ্যাটমকে বম্ করতে হবে। তাহলেই প্রোটোনটা ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে। থাম আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নিজেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ছিট্‌কে বেরিয়ে এল সোহাগা—"

"I congratulate you. তোমার সোহাগাকে দেখে আমার এস্‌থারকে (Esther) মনে পড়ছে। এ দুটি স্ট্যাচুকে চিনতে পারছ ?"

"না। কে ওঁরা—"

"তোমার ঠাকুর্দারা। তোমাদের খোঁজে এখানে এসেছিলেন। আমি ওঁদের স্ট্যাচু করে রেখে দিয়েছি। বড় ছটফট করছিলেন। দাঁড়াও এঁদের জীবন্ত করে দিই—"

পরমুহূর্তেই সরু মোটা দুজনেই জীবন্ত হয়ে গেলেন।

নহুষকে দেখে সরু বললেন—"রাসকেল কোথাকার! কি ভোগানটা ভুগিয়েছ আমাদের জান ?"

মোটার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোহাগাকে দেখে।

"সত্যি বড় ভাবনায় পড়েছিলুম আমরা"

"দাদু আমি পি. এইচ. ডি. হয়েছি—"

"এবার বাড়ি চল, আর দেরি নয়"

"যাব কি করে ? আপনারা ফিরবেন কিসে—"

"আমরা হনুমানের পিঠে চড়ে এসেছি, তার পিঠে চড়েই ফিরব, তোরা যাবি কিসে ?"

নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তাঁরা। সুইফ্‌টের দিকে চেয়ে বললেন, "সাহেব তুমি তো যাদুকর, তুমি কোন ব্যবস্থা করতে পারবে ?"

"নো, আমার এস্‌থারকে (Esther) বার বার মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে, সে হয়তো আসবে। হয়তো অসম্ভব সম্ভব হবে—দেখি রাস্তায় বেরিয়ে একটু, হয়তো সে আমার বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছে না—"

সাহেব বারান্দা থেকে নেমে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

মোটা বললেন—"উনি আর কিছু করবেন না। নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। আবার এস কল্পনার ধ্যান করি—"

সরু বললেন—"হয়েছে। এস এক কাজ করা যাক। আমরা চল অগস্ত্যকে বলে যাই, তিনি পালকির ব্যবস্থা করুন। তিনি মহর্ষি লোক তিনি সুব্যবস্থা করে দেবেন। চল আমরা হনুমানকে ডেকে বেরিয়ে পড়ি"

সংকেত করবা মাত্র হাজির হলেন মহাবীর। দুজনকে পিঠে তুলে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন এক লাফে।

একটু পরেই অগস্ত্য হাজির হলো একটি সোনার পালকি নিয়ে। সঙ্গে সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ট।

অগস্ত্য বললেন—"তোমরা দুজনেই উঠে বস। বেশ বড় পালকি। কুবেরের কাছ থেকে চেয়ে আনলুম—"

নহুষ বললেন—"আমাদের দুজনকে বইতে পারবেন ?"

"আটজন আছি। খুব পারব। উঠে পড়, বেশী দেরি কোরো না। পালকিটা কালই ফেরত দিতে হবে। কুবেরের বউ বাপের বাড়ি যাবেন কাল। ওঠ ওঠ দেরি কোরো না—"

নহুষ ও সোহাগা পালকিতে উঠে বসতেই আটজন ঋষি তুলে নিলেন পালকিটিকে—এদিকে চারজন, ওদিকে চারজন।

"হুমরো হুমরো হুমরো—"

ঋষি-কণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হল সুইফট্ সাহেবের সঙ্গে। তিনি উৎসুক নেত্রে দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটা মাঠে।

"গুড্ বাই, মিস্টার সুইফট্—"

নহুষ সোহাগা দুজনেই মুখ বাড়িয়ে অভিবাদন করলেন তাঁকে।

"গুড্ বাই, গুড্ বাই—"

স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন করলেন সুইফট্। তারপর আবার দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলেন সোৎসুক দৃষ্টি মেলে।

ভাষণ

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। এই বিজয়া-সম্মেলন-সভায় যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ জানাইতেছি।

আজকাল অনেকেরই মুখে অভিযোগ শুনি, আর ভালো সাহিত্য-সৃষ্টি হইতেছে না।

কথাটা অমূলক নয়।

কিন্তু যে সাহিত্যিকরা সাহিত্য-সৃষ্টি করেন তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার কোনও প্রচেষ্টা কি আমাদের সমাজে আছে? অনেক দুঃখে আমার 'মরজিমহল' নামক রোজনামচায় এই ছড়াটি লিখিয়াছিলাম—

যারা বই লেখে—চড়ে না তাদের হাঁড়ি,
যাঁরা বই ব্যাচে—তাঁদেরই গাড়ি-বাড়ি।
আম ফলিয়ে আমগাছ পায় না কোনো মূল্য,
আম-বেচে বাগান-ওলাই ক্রমাগত ফুললো।
সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে চলছে বেচা-কেনা
সৃষ্টিকর্তা পায় না কিছু, করতে হচ্ছে দেনা।

যেখানে সমাজের প্রতিস্তরেই অসাধুতা, অন্যায় ও অবিচার, যেখানে সমস্ত সমাজই অসুস্থ, সেখানে ভালো সাহিত্য হইবে কি করিয়া? বৃক্ষের শাখাপত্র যখন শুষ্কপ্রায় তখন সে বৃক্ষ কি ভালো ফুলে-ফলে সুশোভিত হইতে পারে?

পারে না।

তাই অধিকাংশ সাহিত্যই এখন হতাশার সাহিত্য, নাকে-কান্নার সাহিত্য, বলিষ্ঠ পৌরুষের বা বৃহৎ আদর্শের সাহিত্য নয়। আদর্শ আমরা মুখে আওড়াই, জীবনে তাহাকে প্রতিফলিত করিতে পারি না। এখন আমরা আমাদের মানসিক-কণ্ডূয়ন তৃপ্ত করিবার জন্য বই পড়ি, উচ্চ-আদর্শের অমৃত পান করিবার জন্য নয়, তাই আমাদের দেশে এখন লঘু, চুটকি সাহিত্যেরই কদর বেশী। বৃহৎ সৃষ্টিকে উপলব্ধি করিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বৃহৎ সৌধ নির্মাণ করাইবার সঙ্গতি আমাদের নাই, আমরা ছোটখাটো ফ্ল্যাট লইয়াই সন্তুষ্ট আজকাল। তাই বাজারে ফ্ল্যাট বানাইবার মিস্ত্রিদেরই ভিড় বেশী। প্রতিভাবান সৌধশিল্পীরা অন্তর্ধান করিয়াছেন। যে অর্থ-নৈতিক ও নৈতিক বনিয়াদের উপর সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, সেই বনিয়াদটার ভিত্তিই নড়িয়া গিয়াছে। যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ-উপার্জন করাই এখন অর্থনীতি, যেন-তেন-প্রকারেণ আত্মসুখ ভোগ করাই এখন জীবন-নীতি। বলা বাহুল্য এ ধরনের নীতি মনুষ্যত্বের নীতি নয়।

আমরা আজ মনুষ্যত্বহীন অর্থাৎ সর্বস্বহীন। সুখ, শান্তি, আহার, বিহার, সাহিত্য, শিল্প—সবই যেন একটা পঙ্কিল আবর্তে আবর্তিত হইতেছে। এই ঘূর্ণাবর্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আমাদের মৃত্যু আসন্ন।

এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে আমাদের উদ্ধার করিবেন আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা, যাঁহাদের দেহে-মনে অমিত শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। বিদ্রোহ করিতে হইবে।

আর সাহিত্যিকের কাজ হইবে সে বিদ্রোহকে সাহিত্যে রূপায়িত করা।

এই দুর্দিনে সেই যৌবনেরই স্বপ্ন দেখিতেছি—

তোমারেই ডাকি শুধু হে যৌবন প্রাণ বহ্নিময়
মূর্ত কর কবি-কল্পনারে,
হে অভিষ্ট-বর্ষী দেব, অন্ধকারে কর জ্যোতির্ময়

নমস্কার।*

সৃষ্টিধর্মী কাব্য

সৃষ্টিধর্মী কাব্যসাহিত্যের (এর মধ্যে ছোটগল্প উপন্যাস পড়ে) প্রধান কথা হচ্ছে রস। রসোত্তীর্ণ না হলে তা কাব্যসাহিত্যের আসরে কিছুতেই পাঙ্‌তে। হবে না, তার যতই না অন্য গুণ থাক। সৃষ্টিধর্মী কাব্যের আর একটি প্রধান গুণ অনন্যতা। পল্লী-গ্রামের বা শহরের বা প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা করার মধ্যে একটা নিপুণতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাতে যদি অনন্যতা না থাকে, তা হলে তাকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলতে ইতস্ততঃ করব। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, তিলোত্তমা, আয়েসা, কমলাকান্ত—এসব অনন্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিখিলেশ, শচীশ দামিনী এরাও। অর্থাৎ এদের মতো লোক কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এরা কারও 'কপি' নয়। এরা কবি-দেরই সৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী বা দেবদাস বা শ্রীকান্ত রসোত্তীর্ণ, মনকে খুব নাড়া দেয়—কিন্তু ও-সব সৃষ্টিতে অনন্যতা আছে কি? ও-সব চরিত্র রসোত্তীর্ণ উপাদেয় কিন্তু অনন্য নয়। একটি অনন্য সৃষ্টি করেই Swift পৃথিবীর সাহিত্য স্রষ্টাদের আসরে সসম্মানে অভ্যর্থিত হয়েছেন সে বইটির নাম গ্যালিভার্স ট্রাবেলস্। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। আর একটা মনে পড়ছে Alice in wonder Land, আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেয়া' (Thais) আর একটি। শেক্‌সপীয়র এরকম অনন্য সৃষ্টি অনেক করেছেন। গ্যেটের 'ফাউস্ট' বা মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' অনন্য সৃষ্টি। ভিক্টর Hugve 'লা মিজারেবলস্'-এ যে জাঁ ভালজাঁ, বা পাদ্রী, বা ফ্যানটিন সৃষ্টি করেছেন সেগুলি অনন্য। অনবদ্য। বিদেশী সাহিত্যের এরূপ অনন্যতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারতেও আছে। বাংলা সাহিত্যে কিন্তু বেশী নেই। বাংলা সাহিত্যে আমরা জোর দিই—সাহিত্যের বিষয়ে উপর। ইনি শ্রমিকদের কথা লিখেছেন, উনি গ্রাম-বাংলার কথা লিখেছেন, তিনি কয়লাখনির চিত্র এঁকেছেন, আর একজন মধ্যবিত্তদের ছবি এঁকেছেন। অনেক সময়েই চিত্রগুলি ভালো হয়েছে, রসোত্তীর্ণও হয়ে উঠেছে—কিন্তু সেগুলি অনন্য সৃষ্টি হয় নি। কারণ

* 'সাহিত্যতীর্থ' একবিংশ বার্ষিক 'কথাসাহিত্যিক ও কবি সম্মেলনে' প্রদত্ত তীর্থপতির অভিভাষণ। ২৬শে কার্তিক, ১৩৮১ পাথুরিয়াঘাটা মল্লিক বাড়ির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত।

সেগুলি বাস্তব জীবন্ত চরিত্রগুলির 'কপি', সৃষ্টি নয়। অনেক সময় যাঁরা বলেন যে অমুক সাহিত্যিক দেশের মাটি থেকে রস টেনে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বলেই খুব উঁচু দরের সাহিত্যিক, তাঁরা ভুলে যান যে অনন্য সৃষ্টি না করতে পারলে স্রষ্টা, সাহিত্যিক হওয়া যায় না ; তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন, পুরস্কার পেতে পারেন, কিন্তু স্রষ্টা হতে হলে সৃষ্টিতে অনন্যতা থাকা প্রয়োজন।

যা ছিল না তাই তোমাকে করতে হবে সৃষ্টি
তবেই হবে স্রষ্টা
বিশ্বকর্মা নকল কভু করেননি কো কারো
তাইতো তিনি স্রষ্টা।

কেন ?

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। যে সংকট সমাধানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তা জীবন-মরণ সংকট। সে সংকট আমাদের জাতির দেহে ও মনে জোঁকের মতো বসে রক্ত শোষণ করছে। সে জোঁককে যদি আমরা সরাতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্য যা যা প্রয়োজন তার দাম এত বাড়ছে এবং মান এত কমছে যে ভদ্রলোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

এই সংকটের মূলে আছে আমাদের অসাধুতা, অপটুতা এবং অধুনা প্রচলিত রাজনীতি। মনে হয় স্বাধীনতা যেন ভদ্রলোকদের পক্ষে দুঃসহ অভিশাপ হয়েছে একটা।

সব জিনিষের দাম এত বেশী কেন ? ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বেতন এত বেশী কেন ? স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার জায়গায় গুণ্ডামি চলছে কেন ? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যকর্মে এত গাফিলতি কেন ? রাস্তায় রাস্তায় এত জঞ্জাল কেন ? আমরা নিয়মিত আলো বা জল পাচ্ছি না কেন ? এরকম আরও অনেক 'কেন' আছে। আপনারা সবাই ভুক্তভোগী—তা জানেন।

এ সবের একটা কারণ বোধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় কারণ, অতি-ধনী বণিকদের আরও ধনী হবার লোভ, আর তৃতীয় আমাদের সরকারের অক্ষমতা। জানি না সত্য কি না, কিন্তু গুজব শুনি, শাসনবিভাগের সঙ্গে এই সব ধনী কালোবাজারীদের বাধ্যবাধকতা আছে নাকি। জানি না এ কথা সত্য কি না। প্রয়োজনীয় সব জিনিষের দাম তো বাড়ছেই, সব জিনিসের সঙ্গে ভেজালও মেশানো হচ্ছে। চালে ভেজাল, ডালে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, প্রসাধন জিনিসে ভেজাল, বাসনের ধাতুতে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, পয়সায় ভেজাল—আজকাল তামার পয়সা আর রুপোর টাকা দুর্লভ—এ ছাড়া সাহিত্যে ভেজাল, শিক্ষায় ভেজাল, সংস্কৃতিতে ভেজাল। সবই একটা ওপর-চকচকে ভেলকি, ভিতরে শাঁস নেই, বাইরেই চাকচিক্য।

এর ফলে আমাদের দেহে ও মনে নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধিও দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যবান শিশু আজকাল কদাচিৎ দেখতে পাই। বয়স্কদেরও অনেকেই পেটের অসুখ, হাঁপানি, বা যক্ষ্মায় ভুগছেন, লিভারের দোষ তো ঘরে ঘরে। ক্যানসার রোগও বাড়ছে আজকাল। অন্ত্রের ক্যানসার সম্ভবত অতিরিক্ত ভেজাল খাবার খেয়েই হচ্ছে। আগে তো এত হ'ত না। ফল খাওয়া তো আমরা ভুলে গেছি, আম লিচুও দুর্মূল্য, কেজির হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। আম, লিচু নাকি বিদেশে গিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে, আমরা খেতে পাচ্ছি না। ভিটামিনের অভাবের জন্য যেসব ব্যাধি তা আমাদের দেশে প্রচুর। ভাল টাটকা ফল, টাটকা দুধ, ঘি, মাখন, টাটকা শাক-সব্জী খেলে তা নিবারিত হয়, কিন্তু সে সব জিনিস দুর্লভ এবং দুর্মূল্য। হিমঘরে রাখা, বরফ দেওয়া জিনিসের খাদ্যগুণ এবং স্বাদ বহুল পরিমাণে কমে যায়। আমাদের মানসিক ব্যাধিও বাড়ছে। পাগলের সংখ্যা—বিশেষতঃ মেলানকোলিয়া, আত্মহত্যা-প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক বেশী আজকাল। সুস্থ সবল মানসিকতা সম্পন্ন লোক ক্রমশই বিরল হয়ে আসছে। আমরা কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন, আমরা এ সব নিয়ে বৈঠকখানায় আলোচনা করি, বড় জোর সভা করে বক্তৃতা দিই, অথবা খবরের কাগজে চিঠি লিখি। তারপর যা হচ্ছে তা মেনে নিই। আমাদের সহনশীলতা অতুলনীয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে এদেশে না খেয়ে দলে দলে লোক 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' বলে চীৎকার করেছে, তারপর রাস্তার ধারে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছে—কিন্তু একটি দোকানও লুট করেনি।

আমাদের প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ সফল হয় না, কারণ আমাদের একতা নেই। আমরা সকলেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আমরা কেবল নিজের কোলের দিকে ঝোল টানি, গা বাঁচিয়ে চলতে চাই। আমরা যদি বাজারে পিকেটিং করি যে এত দাম দিয়ে কেউ যেন জিনিস না কেনেন, তাহলে তা সফল হবে না। কারণ আর এক দল লোক গোপনে আরও বেশী দাম দিয়ে সে জিনিস কিনবেন। এই যদি আমাদের জাতীয় চরিত্র হয় তাহলে আমাদের প্রতিবাদই বা কে শুনবে আর প্রতিরোধ করেই বা কি হবে? আমাদের দেশের লোকই সব জেনে শুনে কালোবাজারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং মনে হয়, দেবে।

কালোবাজারীরা অন্য দেশেও আছে। কিন্তু অন্য দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে এত সচেতন, এত একতাবদ্ধ যে কালোবাজারীরা যথেচ্ছাচার করতে পারে না। আমেরিকায় মাংসওলারা মাংসের দাম বাড়াবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেখানকার ক্রেতাদের প্রবল প্রতিরোধে তা করতে পারে নি। বড়দিনের ভোজে টার্কি খাওয়া সাহেবদের একটা চিরাচরিত বিলাস, একবার টার্কি বিক্রেতারা দর বাড়াবার চেষ্টা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের মারফত জনসাধারণ তাদের জানিয়ে দিলেন যদি দাম বাড়ানো হয় আমরা কেউ টার্কি খাব না। টার্কির দাম বাড়েনি। আমি এক চেন-স্মোকার সাহেবকে দেখেছিলাম যতক্ষণ তিনি Made in England মার্কা দেশলাই পান নি, ততক্ষণ সিগারেট খাননি। Made in England দেশলাই পেতে তাঁর ২৪ ঘণ্টা লেগেছিল। ওদের একতা আছে, মনের জোর আছে, তাই ওরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুনিয়ায়। আমাদের কিছু নেই তাই আমরা চারদিক থেকে মার খাচ্ছি আর নাকে কাঁদছি। আমাদের দেশে সাধু লোকদের চেয়ে অসাধু লোকদের একতা বেশী। অসাধু লোকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—গভর্ণমেণ্ট এদের চটাতে সাহস করেন না। তাই এরাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করছে।

আমাদের চরিত্রবল যদি দৃঢ় হয়, আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকার কষ্টস্বীকার করতে আমরা যদি বদ্ধ-পরিকর হতে পারি—আমাদের সুদিন ফিরে আসবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমাদের নির্ভর হল আমাদেরই শক্তি। আমাদের আবেদন-নিবেদন শুনে কেউ আমাদের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে না।

আমাদের যদি সভ্য জাতি বলে পরিচয় দিতে হয় তাহলে সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে হবে। শুধু বাক্যের বুদ্বুদ কাটলে কিছু হবে না। আশা করি আমরা তা পারব। নমস্কার।*

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে কবিদের মনে যে ভাবোদ্রেক হয় সাধারণ লোকের মনে তাহা হয় না। বর্ষা আসিলে তাঁহারা বিপন্ন হইয়া পড়েন। প্রিয়ার অপেক্ষা ছাতা-জুতার কথাই তাঁহাদের বেশী মনে পড়ে। সাধারণ লোকেদের মধ্যে যাঁহারা রসিক তাঁহাদের মধ্যে কিছু লোক আড্ডা-রসিক। তাঁহারা বর্ষার ঘনঘটায় ঘনীভূত আড্ডায় জমিয়া পরনিন্দা, পরচর্চা, ভূতের গল্প করিতে ভালোবাসেন। আর যাঁহারা ভোজন-রসিক তাঁহাদের মনে পড়ে খিচুড়ির কথা, প্রিয়ার কথা নয়। তাছাড়া আমার মনে হয়, যে প্রিয়ার কথা আমরা কালিদাসে, বৈষ্ণব-পদাবলীতে, রবীন্দ্র কাব্যে পড়িয়াছি সে রকম প্রিয়া এ যুগে বিরলও বটে। ধাক্কাধাক্কি করিয়া যাঁহার সহিত ট্রামে বাসে উঠিতে হয়, আপিসে যাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, বাজার করিতে হয়, তিনি নিশ্চয় তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বধরোষ্ঠি—পর্যায়ের প্রিয়া নন, তিনি বহি-প্রকৃতি নকল-দশনা রুজ-রঞ্জিতাধরোষ্ঠি এবং তিনি সবলা। প্রিয়ারা প্রায়ই অবলা হন। এ যুগে সে প্রিয়া নাই। সেদিন পর্যন্ত ছিল। কবি মোহিতলালের যুগেও ছিল। তিনি তাঁহার 'বাদল রাতের গানে' লিখিয়াছেন—

বাদল মেঘের অশ্রুজলে
দেখছি যে তার কুম্ভ ভরা
উছলে ওঠে কক্ষ তলে
আঁকড়ে তবু বক্ষে ধরা

ঠিক এরকমটি আজকাল আর দেখা যায় না। ছাতা-মাথায়, বর্ষাতিগায়ে পাদুকা-শোভিতা রমণীরাই আজকাল সুলভ। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'আষাঢ়' কবিতায় আছে—

মনের কামিনী ফুটেছে আজিকে বনের কামিনী সাথে
পেয়ে কি মাধুরী আজিকে আদুরী ঝাঁকের দাদুরী মাতে

সাধারণ লোকেদের মধ্যে অনেকেই জানেন না দাদুরী মানে ব্যাং। ব্যাঙের ডাক তাঁহারা পছন্দ করেন না। কামিনী ফুলও খুব বেশী লোক চেনে না, যাঁহারা চেনেনও

---

* লেক টাউনে মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্য মহিলাদের কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলসভায় পঠিত ভাষণ।

তাঁহারা বর্ষায় তাহা লইয়া মাথা ঘামান না। তাঁহারা আজকাল মাথা ঘামান র‍্যাশান লইয়া।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বর্ষা' কবিতাটিতে প্রিয়াকে লইয়া বেশী মাথা ঘামান নাই। তাঁহার কবিতার সুরটি অন্য রকম—

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলি জেগেছে
ছাই মাথা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে, ছুঁয়েছে সব ঠাঁই
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই।
মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে
বিশাল শাখা পাতায় ঢাকা শালের বনেতে
হঠাৎ ছুটে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে
ভিজিয়ে দিল ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে।

এ কবিতায় ঘননীল-বসনার দেখা পাই না। এ কবিতায় মেঘদূতে বর্ণিত হস্তিযূথ বা উড্ডীয়মান পর্বতশৃঙ্গের মতো মেঘের বর্ণনাও নাই—এ কবিতাটি তবু চমৎকার। এ কবিতার শেষ স্তবকে আছে—

বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগলি মেতেছে
ছিন্ন কাঁথা সূর্য শশীর সভায় পেতেছে
আপন মনে গান গাহে সে—নাই কিছু দৃকপাত
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।

কিন্তু এ যুগের আমরা বর্ষা দেখিয়া কি মুগ্ধ হই? হই না। বরং বিরক্ত হই। মনে হয় জ্বালাতন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় তাঁহার 'নববর্ষা' কবিতায় যে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

শ্যাম গম্ভীর নব-মেঘে আজি উঠে বাজি মৃদু মৃদঙ্গে
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি
ধারা-মঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক যে গভীর সহানুভূতির সহিত 'বাদলে' কবিতায় পল্লী-বর্ষার চিত্র আঁকিয়াছেন—

প্রাতে ঝিম ঝিম ঝরিতেছে জল
কৃষক পুরানো 'বোথে'
যতনে মাথায় রেখে
ছুটে যায় ক্ষেত-পানে পুলক-বিহ্বল,
মাঠে কিছু নাই আর
থই থই চারিধার
অজয়ে নামিছে জল করি কলকল।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্ষায়' কবিতায় যে আবেগভরে বর্ষার বর্ণনা করিয়াছেন—

যূথী মালঞ্চে ফুল।
মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি
ধূলা কাদা মাখা পাঁপড়িতে ঢাকা কামিনী তরুর তলা
দূর নির্জনে তমালের ডালে
শ্যামলা মালতী সুধাধারা ঢালে
বন-তমালের কানে কানে তার কি কথা হ'ল না বলা—

মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়ার শিব-ভক্ত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় বিদেশে রোগশয্যায় শয়ন করিয়া এক বর্ষাহীন 'আষাঢ়-মধ্যাহ্নে' যে কল্পনাভরে শিবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

নীলমূর্তি বর্ষাকাশ শতচ্ছিন্ন বেশ বাস
উদাসীন কারেও না চায়
পূবের জানালা ঘেঁষে বিল্বশাখা নুয়ে এসে
কণ্টকিত ত্রিপত্র নাচায়
শাখাও দিগন্ত ফুঁড়ে উচ্চতাল চূড়ে চূড়ে
রুদ্রসেনা তুলেছে ত্রিশূল
অচেনা বিদেশ বাসে কোথা হতে কানে আসে
অদূরে নদীর কুলকুল।
ভগ্ন দেহ রুগ্ন মন নিবিড় নীল গগন
বাতায়নে লৌহদণ্ড সারি
মাঠ পরে মাঠ শুধু আষাঢ়েও করে ধূ ধূ
হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি—

সে আনন্দ, সে সহানুভূতি, সে আবেগ, সে কল্পনা আমাদের কি আছে? নাই। আজকালকার আমরা নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক, ক্ষুধিত, বঞ্চিত, ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের মতো উদ্‌ভ্রান্ত অসহায়। আমরা কোনও কিছুই আর প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি না। সে শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই ব্যঙ্গরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জন্য 'বর্ষায়' নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহাতেও কবিত্বের নাম-গন্ধ নাই। তাহা নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক কবিতা। সেই কবিতাটি আপনারা শুনুন। হয়তো ভাল লাগিবে।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ। বাতাসে পাতাঝরে ঝুপঝাপ্।
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঠাল সব। পড়িছে চারিদিকে ধুপ ধাপ্।
বজ্র কড় কড় হাঁকে। গিন্নী শুয়ে বৌমাকে। 'কাপড় তোল বড়ি তোল।'
ঘন হাঁকে। অমনি ছাদের উপর দুপ্‌দাপ। —আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে।
জোলো হাওয়া বহে বেগে। ছেলেরা বেরোতে না পেরে রেগে। ঘরের ভিতরে করে হুপ্‌হাপ্। —ছুটিল একি হল ভাবি। উর্ধ্বলাঙ্গুল গাভী। এ সময়ে মুড়ি দিয়ে রেকাবি রেকাবি ফুলুরি খেতে হয় কুপ্‌কাপ্।—বৃষ্টি নামিল তোড়ে। রাস্তা কদর্মে ভোরে। ছত্রমস্তকে রাস্তার মোড়ে। পিছলে পড়ে সবে ঢুপ্‌ঢাপ।—ভিজিছে নিঝঝুম পাখী। শালিক ফিঙে টিয়া পাখী। আমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী। ঘরেতে বসে আছি চুপচাপ।

এমন বাস্তববাদী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু আধুনিক কবি বলিয়া গণ্য নন। তাহার কারণ বোধহয় তাঁহার কবিতার মানে স্পষ্ট বোঝা যায়। বর্ষাকেও কি আমরা ভালো বুঝিতে পারি? বলিতে ইচ্ছা করে—

হে বর্ষা—
স্নিগ্ধ তোমার মেঘের তলে
বিদ্যুতেরি বহ্নি জ্বলে
তোমার ঘন অন্ধকারে
চাই যাহারে পাই না তারে।
তোমার বৃষ্টি তোমার ঝড়ে
মোদের সৃষ্টি লুটিয়ে পড়ে
তবু তোমায় চাই যে কেন
বলতে পার?

নমস্কার।*

নিরানন্দের নববর্ষ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা সকলে আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। এই সভায় যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাঁহাদের প্রণাম এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ জানাইতেছি। আর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি সম্প্রতি পরলোকগত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, প্রতিভাবান সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলীকে এবং প্রবীণ সাহিত্যবন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে।

বঙ্গবাসীর মুকুট হইতে সহসা কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল। প্রার্থনা করি তাঁহাদের অন্তরআত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

আজ শুভ নববর্ষের প্রথম দিন, আজ আমাদের আশা ও আনন্দের দিন। কিন্তু কোথাও কোনো আশার আশ্বাস নাই, নিরানন্দে সমস্ত বুক ভরিয়া রহিয়াছে। এই রাজ্যের কু-শাসনে আমরা জীবন্মৃত। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহার মূল কারণ অবশ্য সামগ্রিকভাবে আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন। গভর্ণমেণ্ট এ অধঃপতন রোধ করিবার কোনো আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বাজারে থিয়েটারের নামে যে ধরনের বেলেল্লাগিরিকে প্রশ্রয় দিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুলে যে ভাবে রাজনীতির দলাদলি সক্রিয় তাহাতে মনে হয় না আমাদের ছেলেদের

---

* সাহিত্য-তীর্থের আষাঢ়রস্ত প্রথম দিবসের সভায় তীর্থপতির ভাষণ। সাহিত্য-তীর্থের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের সরকার মাথা ঘামান। তাঁহারা বারংবার দিল্লী যান, জেলায় জেলায় 'টুর' করেন এবং বক্তৃতা দেন।

সাহিত্যিকদের কর্তব্য এমন কিছু সৃষ্টি করা যাহা দেশের মনকে মহতের দিকে বৃহতের দিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। কোনো কোনো সাহিত্যিক হয়তো তাহা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের শ্রম পণ্ডশ্রম হইতেছে—সে সব লেখা 'পপুলার' হয় না। অধিকাংশ সাহিত্যিকই পপুলার হইবার জন্য ব্যস্ত। সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলিও সাহিত্যের অগ্রগতিকে বাধা দিতেছে।

আমাদের দেশে কয়েকটি খবরের কাগজ আছে। কিন্তু তাহারা সব খবর নিরপেক্ষ-ভাবে প্রচার করে না। নিজেদের মনোমত বা দলগত খবরগুলি 'ফ্লাস' করে, অপ্রিয় সত্য খবরগুলি 'ব্লাকআউট' করে। সুতরাং এমন খবরের কাগজ দেশকে সত্যপথে চালাইতে পারে না।

কোনোদিক দিয়াই আশার আলো দেখিতে পাইতেছি না। তবে কি আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? না।

আসুন, এই শুভদিনে আমরা কয়জন দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, আমরা শত বাধা বিপদ সত্ত্বেও সত্য-শিব-সুন্দরের দিকেই অগ্রসর হইব। সত্যের পথ ক্ষুরস্য ধারা, হয়তো রক্তাক্ত বরণে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে তবু আমরা থামিব না। আসুন এই শপথ গ্রহণ করিয়াই আজ নববর্ষের উদ্বোধন করি। নমস্কার।*

আলো

মাননীয় সভাপতিমহাশয়,
সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

— আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের এই উৎসবের দিনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। উৎসবে আমরা সেই আনন্দ অন্বেষণ করি যে আনন্দ অন্য কোন মাপ-কাঠি দিয়া মাপা যায় না। আনন্দের মাপকাঠি আনন্দই। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি আনন্দময় উৎসবের দিনে। আনন্দ লাভই জীবনের পরম-প্রাপ্তি। ভগবানকে ঋষিরা আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াছেন। সেই আনন্দ-স্বরূপকে আমরা নানাক্ষেত্রে নানাভাবে খুঁজিয়া বেড়াই। আমাদের সাহিত্য শিল্প-সঙ্গীত, সংস্কৃতি সবই এর জন্য।

ইলেকট্রিসিটি যন্ত্রসহযোগে আমাদের বাহিরে অন্ধকার দূর করে। যন্ত্র বিকল হইলেই তাহা নিবিয়া যায়। কিন্তু উৎসবের আলো, মনের আলো, উৎসবের আকাঙ্খা সুন্দরের আকাঙ্খা। সে আলো অনির্বাণ।

কামনা করি আপনাদের উৎসব আনন্দময় হোক। নমস্কার।*

---

* 'সাহিত্যতীর্থ' একবিংশ বর্ষে নববর্ষ বরণোৎসবে তীর্থপতির অভিভাষণ।

* ১২।১২।৭৩ তারিখে State Electricity Board-এর বার্ষিক উৎসব (রবীন্দ্রকানন)-এ পঠিত ভাষণ।

বক্তৃতা ও কাজ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুণ। ইতিপূর্বে একটা সভায় আমি মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। কাগজে দেখিয়াছি আপনারাও পায়ে-হাঁটিয়া একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। ফল কিন্তু কিছুই হয় নাই। আমাদের এখন বক্তৃতা দিবার বা মিছিল করিবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বিপক্ষ দলেরও স্বাধীনতা আছে সে সব বক্তৃতা অগ্রাহ্য করিবার। আমরা যদি একতাবদ্ধ হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতে পারি তাহা হইলে শুধু বক্তৃতা বা ফাঁকা আন্দোলনের দ্বারা কোনও কাজ হইবে না। মূল্যবৃদ্ধি সত্যই বন্ধ করিতে হইলে আপনাদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সক্রিয় হইতে হইবে। এবং তাহা হইতে হইলে—সর্বপ্রথম চাই নির্ভীক চরিত্র বল। এই চরিত্র বলের মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগে, প্রত্যক্ষ করিয়াছি মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—এই পণ না করিলে কোন দুঃসাধ্য কাজ করা যায় না। আমাদের সরকার জানেন যে জনগণের ভোট লইয়া তাঁহারা শাসক-মঞ্চে পাঁচ বৎসরের জন্য আসিয়াছেন—এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে সেই জনগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে তবু তাঁহারা এই বিষয়ে উদাসীন। ইহাতে মনে হয়, হয় তাঁহারা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে অক্ষম অথবা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে অনিচ্ছুক। আমরা ইহার প্রতিকার করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছি? শুধু বক্তৃতা করা আর সভা করা? এবং সেই বক্তৃতা ও সভার সচিত্র খবর সংবাদপত্রে বাহির করা? কিন্তু আমার মনে হয় ইহাতে কিছুই হইবে না। শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সে শক্তি অহিংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু বক্তৃতা দিয়া কালোবাজারীদের মন গলাইতে কেহ পারে নাই আমরাও পারিব না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশক্তি সংগ্রাম না করিলে সে অন্যায়কে কখনও দমন করা যায় না। কয়েকদিন পূর্বে বাসের পাঁচ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল। সে তুমুল কাণ্ডের মূলে কিন্তু দেশের দুঃখমোচনের প্রেরণা ছিল না, ছিল বামপন্থী-দক্ষিণপন্থীদের কলহ। রাস্তায় গাড়ি থামাইয়া, দেশবাসীদের চরম দুর্দশায় নিক্ষেপ করিয়া একদল বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সরকারকে অপদস্থ করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশবাসীর দুঃখে বিচলিত হইলে তাঁহারা অনেক পূর্বেই এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা করেন নাই, মাঝে মাঝে কেবল বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা করা সোজা, প্রকৃত কাজ করা শক্ত। আমরা যদি আশা করি আমাদের হইয়া কেহ আমাদের দুঃখ মোচন করিয়া দিবেন তাহা হইলে সে আশা ফলিবে না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে হইবে, নিজের বলেই বলীয়ান হইতে হইবে। কথাটা খুবই পুরাতন, আমরা কিন্তু বার বার সেটা ভুলিয়া যাই; তাই আর একবার মনে করাইয়া দিলাম। নমস্কার।*

---

* ১৪।১২।৭৩ তারিখে Information Center-এ Consumers Action Forum-এর সভায় সভাপতির ভাষণ।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক (২)

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুণ। আপনাদের এই সাহিত্য-সম্মেলনে আমি একটি কথাই বলব, সেটি হচ্ছে এই যে, কেবল সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা করে বা সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা শুনে প্রকৃত সাহিত্য-চর্চা হয় না। সাহিত্য আসর বিনোদনের উপলক্ষ্য নয়, সাহিত্য সাধনার বস্তু। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করবেন তাঁদের প্রয়োজন প্রতিভার, প্রয়োজন অধ্যাবসায়ের, প্রয়োজন অধ্যয়নের আর প্রয়োজন স্তুতি নিন্দার উর্ধ্বে বিহার করবার ক্ষমতার। অরসিক পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা মেটান যেসব ফেরিওলা-সাহিত্যিক, প্রায়ই তাঁরা ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হন। তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্য সাময়িক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করে, তাঁরা চিরন্তন পিপাসার সুধা সৃষ্টিকরতে পারেন না। পুরাতন মাসিকপত্রের পাতা ওল্টালে এরকম অনেক মৃত বিস্মৃত সাহিত্যিকের কঙ্কাল দেখতে পাবেন। যাঁরা প্রকৃত সাহিত্য উপভোগ করেন তাঁদের সংখ্যাও কম। লেখা ছাপা হলেই তা যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় না, তেমনি ছাপা লেখা যিনি পাঠ করতে পারেন তিনিই রসিক সমঝদার নন। রসিক সমঝদার হতে হলেও যে বিশেষ গুণ থাকা দরকার তা ভগবান সবাইকে দেন না।

আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানে ভোট নিয়ে সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করা হয়, এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। আজকাল সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও যে সব লেখা প্রকাশিত হয় সে সব লেখা গুণে উৎকৃষ্ট বলে প্রকাশিত হয় না, কোনও একটা বিশেষ দলের লেখা বলে প্রচারিত হয়। এই সব দলের দলপতি সাহিত্যিক নন, ধনী। তাঁদের পারিষদরাই সেখানে বড়বড় সাহিত্যিক। এই যেখানে দেশের অবস্থা সেখানে সাহিত্য-সভা করে সাহিত্যের বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি? তাছাড়া যখন সারা দেশে এত বেকার, এত অন্নহীন, এত বস্ত্রহীন, যে দেশে শিক্ষার নামে প্রহসন চলছে, যেখানে জীবনের প্রতি স্তরে দুর্নীতি সেখানে সাহিত্যের কি কোন স্থান আছে? যে সমাজ সুসাহিত্য সৃষ্টি করবে, সুসাহিত্য উপভোগ করবে সে সমাজ আজ অনুপস্থিত। সেই ভদ্রলোকের সমাজ আগে সৃষ্টি করতে হবে, তারপর সাহিত্য। সে সমাজ সৃষ্টি করবে কে? আদর্শবাদী যুবকেরা। ইতিহাসে দেখি তারাই যুগে যুগে দেশের দুর্গতি দূর করেছে, তারাই সংস্কারের অগ্রদূত, তারাই চিরকাল পঙ্কোদ্ধার করে, তারাই জঙ্গল পরিষ্কার করে, তারাই দুর্গমকে সুগম করে। অসম্ভবকে সম্ভব করবার, অসাধ্যকে সাধ্য করবার ক্ষমতা তাদেরই, তাদেরই মুখপাত্র হয়ে শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—সম্ভবামি যুগে যুগে। কিন্তু আমাদের দেশে কোথায় তারা? নমস্কার।*

* সারা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন, বৈদ্যবাটিতে (৩।১১।৭৪) সভাপতির ভাষণ।

মানুষ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মানসিক ব্যাধিবিশারদ চিকিৎসকবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা সকলে আমার প্রীতিও নমস্কার গ্রহণ করুন। মানুষের বিষয়েই দু'চার কথা বলি। মানুষই মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয়। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে-শিল্পকলায়, শৃঙ্খলায়, বিশৃঙ্খলায় যুদ্ধে, শান্তিতে সর্বত্র মানুষ। কখনও সে ভক্তিতে গদগদ, কখনও সে বিদ্রোহে উন্দম, কখনও সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও সে অশ্রুতে বিগলিত। যে মানুষ মৃত্যু-ভয়ে ভীত, সেই মানুষই আবার হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে উঠতে পারে, ফাঁসির আগে তার ওজন বেড়ে যায়। যে মানুষ খাওয়ার জন্য লোলুপ সেই মানুষই আবার স্বেচ্ছায় অনশন করে মৃত্যুবরণ করে। মানুষের মধ্যে রামা, শ্যামা আছে, আবার কানাইলাল, যতীনদাসও আছে। অদ্ভুত জীব এই মানুষ। মোটামুটি আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কিছু মিল আছে কিন্তু অমিলই বেশী। মনে হয় প্রত্যেক মানুষই একটি আলাদা জগত যেন। প্রত্যেক জগতেরই নিয়ম-কানুন ভাব-ভঙ্গী বিশ্বাস-অবিশ্বাস একেবারে আলাদা, মানুষই শ্মশানে-মশানে ঘুরে মাংস মদ খেয়ে শবাসনে বসে শক্তি-সাধনা করে, মোক্ষ লাভ করবার চেষ্টা করে। মানুষই আবার পুষ্পালংকৃত বেদীতে বালগোপালকে চন্দন মালায় সজ্জিত করে মালপোর ভোগ দিয়ে সেই একই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হ'তে চায়। কোনও মানুষের জীবনের মূল-সুর ভালোবাসা, কারো ঘৃণা, কারো হিংসা, কারো কৌতূহল, কারো বিস্ময়, কারো লোভ, কারো কাম। তার মনের সুরের সঙ্গে সমাজের মনের সুর যদি না মেলে তাহলেই অশান্তি, তাহলেই দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ ও নানা অসুখ। অসুখের বহিঃপ্রকাশও নানারকম। এদেরই নানারকম সমন্বয়ে কেউ কবি, কেউ খেয়ালী, কেউ নেতা, কেউ যোদ্ধা, কেউ বা আবার উন্মাদ পাগল। মানুষ এমন একটা অদ্ভুত সৃষ্টি যে কোনও একটা অঙ্কের ফরমুলায় তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। নোবেল লরিয়েট ডাক্তার Alexis Carrel তাঁর Man the Unknown নামক বিখ্যাত পুস্তকের গোড়াতেই লিখেছেন—Those who investigate the phenomena of life are as if lost in an inextricable Jungle in the midst of a magic forest, whose countlife trees unceasingly change their···and shape. চিকিৎসক ও রোগী দুজনেই এই বিচিত্র মায়াকাননের অধিবাসী। কে বেশী পাগল তা অনেক সময় বোঝা যায় না। বোঝা যায় না কারণ মানুষ সত্যই দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মতো জটিল, ফ্রয়েডের বিশ্ববিখ্যাত গবেষণাও সম্পূর্ণরূপে সে হেঁয়ালির জট ছাড়াতে পারে না। তখন কেনোপনিষদের সেই চিরন্তন প্রশ্নটি মনে জাগে—

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণম্ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তং
কেনেষিতাং বাচম্ ইমাং বদন্তি—
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি—

এর বঙ্গানুবাদ—

মনকে নিবিষ্ট করে কোন্ সে চালাক
প্রাণকে চালিত করে কোন্ কর্ণধার
কাহার ইচ্ছায় মোরা বাক্য বলিতেছি—
চক্ষু দেখে কর্ণ শোনে প্রেরণায় কার—

এ প্রশ্নের উত্তর ঐ উপনিষদেই আছে। কিন্তু সে উত্তরকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হ'লে যে সাধনা দরকার তা আমাদের নেই। তাই আমাদের মনে হয়—

মানুষ নামক জীব
জানি না তো বাঁদর কিম্বা শিব,
কখনও বা লাল তিনি, কখনও বা সবুজ
কখনও বা খুব বুদ্ধিমান কখনও বা অবুঝ।
মনে হয় খামখেয়ালী বহুরূপী তিনি
কখনও বা কুইনাইন কখনও বা চিনি
কখনও বা গদ্য তিনি কখনও বা গান
হ'তে পারে হয়তো বা তিনিই ভাগবান।

এসব মনে হওয়ার কারণ আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে আমাদের এই বহুবৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য আছে। আমরা সকলেই আনন্দ-কামী। আনন্দেরই সন্ধানে আমরা কেউ কবি, কেউ যোগী, কেউ ভোগী, কেউ ত্যাগী, কেউ তস্কর, কেউ সাধু। এই আনন্দলাভই সমস্ত মানুষের একান্ত ঈপ্সিত লক্ষ্য। সে আনন্দের সন্ধান কে আমাদের দেবে। বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞান না, আধ্যাত্মিক তন্ময়তা? ভোগ না ত্যাগ? যুদ্ধ না শান্তি? প্রেম না অপ্রেম? এরই উত্তর শোনবার জন্য সমস্ত মানবসভ্যতা আজ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এই উত্তরের উপরই নির্ভর করছে এই সামাজিক, রাজনৈতিক, তামসিক, রাজসিক, আধ্যাত্মিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আমরা সুস্থ থাকতে পারব কিনা। যে আনন্দ কখনও মলিন হয় না সেই আনন্দের সন্ধানে আমাদের যাত্রা এখনও অব্যাহত আছে, অনেক পর্বত, অনেক অরণ্য, অনেক মরুভূমি, অনেক সমুদ্র আমরা পার হয়েছি কিন্তু এখনও আমরা লক্ষ্যে পেঁছিতে পারি নি।

এক দিগন্তের পরে দেখা দেয় দিগন্ত নবীন
এক পর্বতের পরে আর এক পর্বত
সমস্যার সমাধান হয়নি আজিও
ফুরায় নি পথ। —নমস্কার

কবিরাই সত্যদ্রষ্টা

বঙ্গীয় কবি-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। বঙ্গীয় কবিপরিষদের দশম বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। বাঙালী কবিদের নাম আজ পৃথিবীব্যাপী। ইহার প্রথম কারণ রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় কারণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আজ বাংলা ভাষাকেও পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। বাংলা কবিতার প্রচার-গণ্ডী যেমন বাড়িয়াছে তেমনি বাঙ্গালী কবিদের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে যাহা খুশি কবিতার আকারে লিখিয়া তাহা ছাপাইলেই আমাদের খ্যাতি বাড়িবে না। রসিক-সমাজে যাহা সত্যই কবিতা বলিয়া গণ্য সেইরূপ কবিতাই বিশ্বের দরবারে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার পরই প্রশ্ন উঠিবে ভালো কবিতা কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মিষ্টত্ব কি তাহা কি আপনি কথায় বলিয়া বুঝাইতে পারেন? পারা সম্ভব নয়। মিষ্ট তিক্ত কটু কষায় লবণ, কোন স্বাদেরই স্বরূপ বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ভগবান রসনা নামক যে যন্ত্রটি আমাদের দিয়েছেন সেই কেবল নির্ণয় করিতে পারে কোনটা কি স্বাদের। আমরা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ উপভোগ করি, চক্ষু দিয়া যাহা উপভোগ করি অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা পারি না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কাব্যজগতের তেমনি। সকলে কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে না, সকলে কাব্য উপভোগও করিতে পারে না। যাঁহারা কাব্য সৃষ্টি করেন তাঁহাদের নাম কবি, যাঁহারা উপভোগ করেন তাঁহাদের নাম রসিক। যে রস কাব্যের প্রাণস্বরূপ সেই রসের বিচারক রসিক। একমাত্র রসিকই বলিতে পারেন কোনও কাব্য রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা। চক্ষু যেমন আলো-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, কর্ণ যেমন শব্দ-বিষয়ে, জিহ্বা যেমন স্বাদ-বিষয়ে তেমনি রসের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রসিক। এখন প্রশ্ন উঠিবে—রস কি? আলো কি তাহা যেমন চক্ষুর মাধ্যমে বুঝিতে হয়, মিষ্টত্ব কি তাহা রসনার দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তেমনি রস কি তাহার সন্ধানও পাওয়া সম্ভব রসিকেরই মাধ্যমে। তবু রসের নানাবিধ সংজ্ঞা আলঙ্কারিকেরা নির্দেশ করিয়াছেন। একটা সংজ্ঞা—ভাবতন্ময় চিত্তে আত্মানন্দ প্রকাশই রস। এই রস ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। নীরস হেঁয়ালিপূর্ণ রচনা কখনও কাব্যের মহিমা লাভ করিবে না। রসই কবিতার প্রাণ। কোনরূপ চালিয়াতি বা অবান্তর ঢং রসের ক্ষেত্রে অচল। রস অতিশয় সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিস, কোনও স্থূলতার ভার বহন করিতে তাহা অক্ষম—তা সে ভার পাণ্ডিত্যেরই হোক বা মূর্খতারই হোক। প্রকৃত কবিতা হইবে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল প্রকাশ যাহা শুনিবামাত্র তাহার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে রসিকের মনে কোনও সন্দেহ থাকিবে না, যাহা টিনের শুষ্ক গুঁড়া দুধ নহে, যাহা মাতৃস্তন্যক্ষরিত অমৃত। যাঁহারা প্রকৃত কবি তাঁহারাই রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখিতে পারেন, যাঁহারা কবিযশঃপ্রার্থী অকবি তাঁহারা পারেন না। এই কবিযশঃপ্রার্থী অকবিরাই তাঁহাদের

কবিতা ব্যাখ্যা করিবার জন্য আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেন বড় বড় পণ্ডিতদের সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করেন, বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে কান ঝালাপালা করিয়া দেন। প্রকৃত কবিতার জন্য এত প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত কবিতা—সন্ধ্যার মতো, ঊষার মতো, জ্যোৎস্নার মতো, মধ্যাহ্ন দীপ্তির মতো, পুষ্পের মতো, অরণ্যের মতো, সমুদ্রের মতো, নদীর মতো, নির্ঝরের মতো, পর্বতের মতো—তাহার মহিমা, তাহার শোভা, তাহার বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতার বক্তব্য চির পুরাতন, পরিবেশনের কৌশলে তাহা নিত্যনূতন রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ, শ্রীচৈতন্যের যুগ, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর যুগ, পাঁচালি, কবি গান যাত্রার যুগ, ঈশ্বর গুপ্ত—রঙ্গলাল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নবীনচন্দ্র সেন—বিহারীলাল চক্রবর্তীর যুগ, তাহার পর রবীন্দ্রনাথের যুগ, এখনও রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিতেছে। প্রত্যেক যুগেই পরিবেশনের কৌশলে, নবীন আঙ্গিকের আবির্ভাবে কবি-কল্পনার বিশিষ্ট প্রবণতায় একই বক্তব্য নূতন রূপ, নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। অসাধ্য-সাধন-পটিয়সী কবি-প্রতিভাই তাহা সম্ভব করিয়াছে। এই কবি-প্রতিভা জন্ম-লব্ধ। চেষ্টা করিয়া বিদ্বান হওয়া যায়, কবি হওয়া যায় না। একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—নারদ নাকি একদিন ভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'প্রভু আপনার তো কোনও অভাব নাই, আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার গৃহিণী। আশা করি আপনার আর কোনও সাধ নাই।' ভগবান উত্তর দিয়াছিলেন —'আছে। আমি কবি হইতে চাই'।

প্রকৃত কবি সত্যই দুর্লভ। তাই তিনি শ্রদ্ধেয়। নকল কবি সাজিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা যেন প্রকৃত কবিকে শ্রদ্ধা করিতে পারি। কাহারও মধ্যে কবি-প্রতিভা যদি থাকে, তাহা যথাসময়ে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে—সেই অনাগত কবিকে অভিনন্দন করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করি। কবিরাই সৃষ্টিকর্তা, কবিরাই সত্যদ্রষ্টা, কবি প্রতিভাই সত্য শিবসুন্দরের মিলন-ভূমি—তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম।*

গীত-বিতানে সভাপতির ভাষণ

শ্রদ্ধেয় আচার্য মহাশয়, গীত-বিতানের কর্তৃপক্ষরা, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীরা, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ এই সমাবর্তনে যাঁহারা উপাধিলাভ করিলেন তাঁহাদের জীবন সঙ্গীতময় হোক, তাঁহাদের সাধনা সেই সিদ্ধিলাভ করুক যাহার কবিতা-রূপ এই:

সারা জীবন বিরহ ব্যথা
সয়েছি অহরহ

* বঙ্গীয় কবি পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণ।

সুরের পথে এসেছি আজ প্রভু
আমারে লহ লহ।

গান মানব-সভ্যতার প্রাচীন সম্পত্তি। আদিম মানুষ কবে কোন প্রয়োজনে কথায় সুর লাগাইয়াছিল তাহা আমরা যদিও সঠিক জানি না তবু অনুমান করিতে পারি। দূরের মানুষকে ডাকিবার প্রয়োজনে কিংবা ব্যথাবেদনার দুঃসহ পীড়নে অথবা আনন্দের আতিশয্যে আদিম মানবও সুরের সহায়তা লইয়াছিল একথা মনে করিলে খুব অসঙ্গত হইবে না। তাহার পর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সুরের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। সে এখন কাব্যশাস্ত্রের দশটি রসেরই মূর্ত করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে। আজকাল সে ব্যবসায়ের পণ্যও হইয়াছে। কিন্তু যে সুর গায়কদের এবং শ্রোতাদের মনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয় তাহা প্রিয়তমের নিকট আত্মনিবেদনের সুর। এই আত্মনিবেদন গদ্যে করা যায় না, কবিতাতেও সম্পূর্ণরূপে করা যায় না, সুরের সাহায্যেই খানিকটা করা যায়, তাহাও যখন সম্ভব হয় না তখন সাধক নির্বাক হইয়া সমাধিস্থ হন। ভারতীয় সঙ্গীতের লক্ষ্য প্রিয়তমের নিকট মনোবাসনা পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সুরই তাহার শ্রেষ্ঠ যান। এই আত্মনিবেদন কখনও ভৈরবীতে, কখনও আশাবরীতে, কখনও সারং-এ, কখনও দেশে, কখনও ইমনে, কখনও বেহাগে, কখনও বাগেশ্রীতে মূর্ত হইয়াছে। আমাদের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী এই আত্মনিবেদনের বার্তা বহন করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমাদের দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার সুর—যেমন রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউল মনের মানুষের খোঁজেই ব্যাকুল। ওস্তাদী গানে কথা কম। সুরই সেখানে সব। 'বাজুবন্ধ্ খুলি খুলি যায়' অথবা 'আয় না বালম্ ক্যা করু সজনী' প্রভৃতি বিখ্যাত গান সুরের লীলাময় বিস্তারই সকলকে মুগ্ধ করে এবং ওই সামান্য দুই চারিটি কথার কাব্য ইঙ্গিতই আমাদের উতলা করিয়া দেয়। বাংলা গান কিন্তু শব্দ বহুল। তাহার দুইটি রূপ। একটি সুরবিহীন কবিতার রূপ, আর একটি সুর সমন্বিত গানের রূপ। উভয় রূপেই তাহা রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরও অনেকের গানে ইহার প্রমাণ মিলিবে। সুর-বিহীন রূপে আর সুর-সমন্বিত রূপে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত। ঘরে বসিয়া একটা ভালো নাটক পড়িলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সে আনন্দ শতগুণ হয় সে নাটক রঙ্গমঞ্চে সু-অভিনীত হইলে। তখন সে নাটকের অনেক প্রচ্ছন্ন রূপ যেন পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। তেমনি শব্দ-বহুল বাঙ্লা গানেরও রূপান্তর ঘটে যখন সে সুরের লীলামঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহাতে যদি হৃদয়াবেগের জীবন্ত ছোঁয়া না লাগে তাহা হইলে গানের বক্তব্যটি ঠিক যেন শিল্প-মহিমা লাভ করে না। এইজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত সকলের কণ্ঠে ঠিক ওত্‌রায় না। রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতা যাহার স্পর্শে অনির্বচনীয় সুরে পরিণত হয় তাহা কেবলমাত্র স-র-গ-মের বিভিন্ন বিন্যাসমাত্রই নয় তাহা এমন একটা আকুতিময় দরদ যাহা তাঁহার গানকে প্রাণময় করে।

অতীতের সুর-স্রষ্টারা স-র-গ-মের বিভিন্ন বিন্যাস করিয়া অতীতযুগে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী, সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের অনুসরণে অনেক গান লিখিয়াছেন। বস্তুত বাংলায় তাঁহার লেখা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এ যুগের একজন কীর্তিমান সুর-স্রষ্টাও। তিনি বহু নিজস্ব সুর সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তাঁহার চিত্রসৃষ্টির মতোই বিস্ময়কর। সে-সব সুরে শাস্ত্রীয় সুরের আভাস আছে, অনেক সময় বিদেশী সুরের আমেজ পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া আরও এমন একটা কিছু আছে যাহা প্রায় অবর্ণনীয় কিন্তু যাহা না থাকিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অঙ্গহানি হয়, সে জিনিসটি প্রাণের ছোঁয়া।

জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আজকাল সঙ্গীতের প্রভাব পড়িয়াছে। সঙ্গীত আজকাল জনপ্রিয় হইয়াছে, যন্ত্রের মাধ্যমে তাহা সর্বস্থানে প্রচারিত হইতেছে। সঙ্গীতের এই অতি সুলভতার জন্যই সঙ্গীত কিন্তু তাহার পূর্বমর্যাদা হারাইয়াছে। যে সম্ভ্রম লইয়া আগে আমরা গুণীদের নিকট যাইতাম, আজকাল সে সম্ভ্রম আর নাই, কারণ এখন গুণীদের কাছে যাইতে হয় না, রেডিওর বোতামটা ঘুরাইয়া দিলেই সে গুণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই এবং সে গুণী যখন রেডিওতে গান গাহিতে থাকেন তখন আমরা মনোযোগ দিয়া শুনিও না। গল্প করি।

গান-বাজনার অতি সুলভতা সত্ত্বেও কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর অমর্যাদা এখনও তেমন প্রকট হয় নাই। কারণ প্রতিভা এমন একটা জিনিস যাহাকে সহজে তুচ্ছ করা শক্ত। সে প্রতিভাকে রক্ষা করিতে হইলে শুধু যে সাধনা করা দরকার তাহাই নহে সেই সাধনাকে অব্যাহত রাখার জন্য দৈহিক ও মানসিক সংযমেরও প্রয়োজন। যে কোনও শিল্পসাধনাই তপস্যা বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এই তপস্যাই করিয়া গিয়াছেন। তপস্যার প্রধান মন্ত্র আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ। তাঁহার বহু সঙ্গীতে এই ভাবটিই ফুটিয়াছে বলিয়া তাহা মহৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যে শিল্পী এই সৃষ্টিকে কণ্ঠে বা বাদ্যযন্ত্রে মূর্ত করিবেন তাঁহাদের মনের ভাবটিও অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। আগেই বলিয়াছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের ও শব্দের ভূমিকা ছাড়া মনের ভূমিকাও প্রবলভাবে বর্তমান।

বিটোফেন সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Music is the mediator between the spiritual and sensuous life. যে সেতু আধ্যাত্মিক জগতের সহিত ইন্দ্রিয় জগতের যোগসাধন করে তাহা কেবল বাক-সর্বস্ব ও ধ্বনি-সর্বস্ব নহে, তাহা মনোময়। এই সত্যটি শিল্পীদের স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। —নমস্কার।

ছাত্রদের প্রতি

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। সর্বপ্রথমেই দেশবরেণ্য নেতা সর্বজনপ্রিয় রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক, মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য পার্শ্বচর, ভারতীয় শিষ্টাচারের সৌম্য প্রতীক, বিদ্বান, বিদগ্ধ, মহৎ চরিত্রের আধার, ভারতের প্রথম প্রেসিডেণ্ট রাজেনবাবুকে হারাইয়া সমস্ত দেশ আজ শোকে বিহ্বল। মনুষ্যত্বের যে মহৎ

আদর্শকে তিনি জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন সেই আদর্শ যদি আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করে তাহা হইলেই আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সার্থক হইবে। তাঁহার তম লোকের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে ইহা কল্পনা করা শক্ত। তবু আশা করিয়া থাকিব যে তাঁহার মহত্ত্বের যোগ্য উত্তরাধিকারী আবার আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করিবে।

প্রায় প্রতিবৎসরই পাটনায় কোন-না-কোন সাহিত্য-সভায় যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছি। কিন্তু নানা কারণে আসা ঘটিয়া ওঠে নাই। সাংসারিক ও শারীরিক বাধা-বিঘ্ন তো ছিলই, কিন্তু যাহা থাকিলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা সহজ হয় সেই উৎসাহেরও অভাব ছিল। কোনও সাহিত্য-সভায় যোগদান করিতে আর তেমন উৎসাহ পাই না। ক্রমশঃ ইহা বুঝিয়াছি নানারূপ সামাজিক হুজুকের মত এইসব সাহিত্য-সভাও প্রধানতঃ একটা হুজুক মাত্র। আমরা সাহিত্য ভালবাসি না, সাহিত্যকে লইয়া হুজুক করিতে ভালবাসি। এ কথা অবশ্য সত্য যে সাহিত্যকে ভালবাসা সহজ নয়, সাহিত্যকে ভালবাসিবার অধিকার বা ক্ষমতা সকলের নাই। প্রকৃত সাহিত্য-স্রষ্টার মত প্রকৃত সাহিত্য-রসিকও বিরল। বহুকাল আগে লিখিয়াছিলাম ঃ

চন্দন তবুও আছে এবং থাকিবে চিরকাল
চন্দন-রসিকও আছে হয়তো সংখ্যায় তারা কম
গড্ডলিকা সম কভু হয় না তো রসিকের পাল
সুরসিক বিধাতার অপরূপ এই তো নিয়ম।

এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ রসিকের দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ বেরসিকদের চাপে সর্বদা ম্রিয়মান, শুধু এ যুগেই নহে, সর্বযুগেই। কবি ভবভূতি তাঁহার কাব্য লিখিয়া তাঁহার সমসাময়িক যুগের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা, সুতরাং কোনও সময়ে কোথাও না কোথাও তাঁহার সমানধর্মী লোকের আবির্ভাব ঘটিবে এবং তখন হয়তো তিনি তাঁহার সৃষ্ট কাব্য উপভোগ করিবেন।

বর্তমান যুগে যে সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা কম তাহার প্রমাণ অজস্র। জনপ্রিয় পুস্তক, জনপ্রিয় সিনেমা প্রভৃতির অশিল্পত্বই তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। যে সব 'হিট' বইয়ের সম্বর্ধনা গর্জনে আকাশ-বাতাস নিনাদিত তাহারা যে রসিকের রসবোধকেও hit করিয়া অবসন্ন মূর্ছিত করিয়া দেয় ইহা তো সর্বজনবিদিত সত্য।

সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল অনুষ্ঠান সারা দেশ জুড়িয়া ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে সাহিত্য-নিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় যে পাওয়া যাইবে না ইহা একরূপ নিশ্চিত।

এই সব কারণে সাহিত্য-সভায় আমি পারতপক্ষে যোগদান করি না।

কেবল সাহিত্য নয়, ধর্ম লইয়াও আমাদের দেশে বাড়াবাড়ির অন্ত নাই। নানা রঙের নানা ধর্ম-সভায় নানা বেশ ধরিয়া নানারূপ ধর্মধ্বজীরা প্রায়শঃই যাহা করিতেছেন তাহা আত্মপ্রচারেরই নামান্তর। প্রকৃত ধর্মের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই, থাকিলে ক্রমবর্ধমান পাপের স্রোতে আমাদের সমাজ এমনভাবে ডুবিয়া যাইত না। জীবনের সর্বক্ষেত্রই আজ যেন অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের বিহারভূমি।

সাহিত্য এবং ধর্ম একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। সাহিত্যে এবং ধর্মেই মানব নিজের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আবিষ্কার করিয়াছে। যাহা কেবলমাত্র ভঙ্গী-সর্বস্ব, দেহ-সর্বস্ব, সমাজ-

সর্বস্ব বা কোনও বিশেষ মতবাদ-সর্বস্ব যাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়াও জীবনাতীত, যাহা মানুষকে কোন আর্থিক সম্পদ দান করে না, আনন্দই যাহার একমাত্র ধ্যেয় এবং একমাত্র পুরস্কার—সেই আধ্যাত্মিকতাই সাহিত্য এবং ধর্মের লক্ষ্য। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এই আধ্যাত্মিকতারই সাধনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ আধ্যাত্মিকতায়, সাহিত্য এবং ধর্ম মানবমনের এই চরম বিকাশসাধন করিবার জন্য সতত উন্মুখ।

এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগিবে। অধিকাংশ মানুষই যদি বেরসিক এবং অধার্মিক হয় তাহা হইলে সাহিত্য-সভা এবং ধর্ম-সভার এত ধুম কেন? মনে হয় ইহার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ, মানবসমাজের প্রায় আদিযুগ হইতে সাহিত্য ও ধর্ম যে শুধু সম্মানের আসন পাইয়াছে তাহা নয়, যাহারা সাহিত্য এবং ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে তাহারাও সম্মানিত হইয়াছে। খোলাখুলি ভাবে 'আমি বেরসিক', 'আমি অধার্মিক' এ কথা কোন সামাজিক মানব স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। নিজেদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার জন্যই অনেক সময় তাই তাহারা ঘটা করিয়া সভা আহ্বান করে, মন্দির স্থাপন করে, এই কারণেই তাই এত সাহিত্যিক মুখোশ এবং গৈরিকের আড়ম্বর। ইহার আর একটা কারণও হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই হয় জ্ঞাতসারে না হয় অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পাইবার জন্য সত্যই উন্মুখ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মত আমরা সকলেই একটা পরশ-পাথর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। পরশ-পাথর কিন্তু দুর্লভ। ভাগ্যবলে তাহা দৈবাৎ মিলিয়া যায়। কিন্তু এ কথা সকলে জানে না, কিংবা মানিতে চায় না। তাই সন্ধানীদের ভিড় শ্বাসরোধকর, তাহাদের মধ্যে ভণ্ড, সবজান্তা বা মোহগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও কম নয়, তাই প্রকৃত রসপিপাসু বা রস-স্রষ্টারা এই সব সভায় আসিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

এইসব কারণে সাহিত্য-সভায় অংশ-গ্রহণ করিতে প্রায়ই ইতস্ততঃ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দ্বিধা বা অনিচ্ছা টেকে না। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে তাহা আর উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহাদের অনেক দোষ আছে জানি, এজন্য বহুবার তাহাদের অনেক ভর্ৎসনাও করিয়াছি, ব্যঙ্গও কম করি নাই, উপদেশ দিয়াছি, প্রতিজ্ঞা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া স্থিরও করিয়াছি আর যাইব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ডাক আসিলে সাড়া না দিয়া পারি নাই। অনেকদিন আগে তাহাদের উদ্দেশ্যে যে ছোট কবিতাটি লিখিয়াছিলাম অনুভব করি সেই কবিতার ভাবটাই আমার মনের স্থায়ী ভাব। নানা সময়ে তাহার কিছু অদলবদল হইয়াছে সত্য, কিন্তু মূল ভাবটা ঠিক আছে। কবিতাটি এই:

তোমাদের ভালোবাসি, তোমাদেরই ভালোবাসি
তোমাদের ছাড়া আর কার কাছে আসব
তোমরা কাঁদলে পরে আমাকে কাঁদতে হবে
তোমরা হাসলে পরে হাসব।
জীবনের হাটে বাটে তোমাদের খেলা হাসি
তোমাদের কলরবে অসীমের বাজে বাঁশি
তোমরা চোখের মণি, তোমরা বুকের ধন

তোমরা অপরাজেয়, তোমরা চিরন্তন
তোমাদেরই ভালবাসি
চিরকাল বাসব
তোমরা কাঁদলে পরে আমাকে কাঁদতে হবে
তোমরা হাসলে পরে হাসব।

যাহারা ভালবাসার ধন, তাহাদের সহিত যখন মুখোমুখি হই তখন কিন্তু যে কথাটা তাহাদের বলিতে ইচ্ছা করে তাহা সব সময়ে বলিতে পারি না। কারণ কথাটা খুবই ছোট অথচ খুবই বড়। 'তোমাদের ভালবাসি' মাত্র এই কথা বলিয়া কি সভার বক্তব্য শেষ করা যায়? যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ লইয়া খানিকটা আবোল-তাবোল বকি, বাস্তব সাহিত্য বড়, না অবাস্তব সাহিত্য বড় তাহা লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব ভাল না মন্দ, সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রকৃত সংজ্ঞা কি এইসব গুরু-গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া আসল বক্তব্যটা হইতে দূরে সরিয়া যাই।

কিন্তু, 'তোমাদের ভালবাসি'—এইটাই আসল বক্তব্য। তোমাদের ভালবাসি তাই তোমরা যখন বেকার হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াও তখন বড়ই কষ্ট হয়, যখন তোমরা রকে উপবিষ্ট হইয়া সকলের উপহাসাস্পদ হও তখন প্রাণে বড়ই লাগে, তোমরা যখন মনুষ্যত্ব-মর্যাদা ভুলিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধনী দুরাত্মার নিকট শির অবনত কর তখন আমারও শির লজ্জায় অবনত হইয়া যায়। তোমাদের ক্রমবর্ধমান অবনতির দিকে চাহিয়া বারংবার নিজেকেই প্রশ্ন করি কেন এমন হইল। বহুকাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—তাঁহার মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল, বস্তুতঃ ভারতের মনীষীগণের চিত্তাকাশে দুই-একটি প্রশ্নের কশাঘাতই বিদ্যুৎবহ্নিতে বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: "Why is it that we, three hundred and thirty millions of people have been ruled by the last thousand years by any and every handful of foreigners?"

এ প্রশ্নের তিনি উত্তরও দিয়াছেন: "Because they had faith in themselves and we had not. I read in the newspapers how one of our poor fellows is murdered or illtreated by an Englishman howls go all over the country. I read and weep and the next moment comes to my mind who is responsible for it all···not the English···it is we who are responsible for all our degradation."

রবীন্দ্রনাথেরও ওই এক কথা:

কার নিন্দা কর তুমি, মাথা কর নত
এ তোমার, এ আমার পাপ—

শ্রীঅরবিন্দ আরও বিশদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন: "Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism." শত্রু বাহিরে নাই, শত্রু আমাদের ভিতরে আছে। এখন আমরা

স্বাধীনতা পাইয়াছি, আমাদের বাহিরের শত্রু ইংরেজ আমাদের হাতে শাসনভার সমর্পণ করিয়া বিদায় লইয়াছে কিন্তু আমাদের অন্ধকার ঘুচিয়াছে কি? ঘোচে নাই, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। বরং মনে হইতেছে তিমির গাঢ়তর হইয়াছে। বিবেকানন্দ কথিত degradation, রবীন্দ্রনাথ কথিত পাপ আমাদের সমাজের সর্বস্তরকে আজও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারি নাই। স্বদেশীযুগে আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করিতেছিলাম তখন অনেকের মনে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল সে অগ্নিও নির্বাপিত হইয়াছে। এখন আমরা নানারূপ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত রাজনীতির স্রোতে খড়ের কুটার মত ইতস্তত: ভাসিয়া চলিয়াছি। লক্ষ্য শুধু স্বার্থসিদ্ধি, মহত্তর আর কোনও লক্ষ্য নাই। ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য বিদ্যালাভ বা চরিত্র-গঠন নহে, লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ চাকুরি লাভ করা। তাহাদের অভিভাবকদের জীবনেও উচ্চতর আদর্শ নাই, একমাত্র আদর্শ টাকা। আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না এই নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ আমাদের ক্রমশঃ সর্বস্বান্ত করিতেছে। গজভুক্ত কপিত্থবৎ আমরা বাহিরের ঠাট-ঠমক কোনক্রমে বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছি। আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার আমরা এ বিষয়ে এখনও উদাসীন। শুধু ছাত্রসমাজ নহে, সমস্ত দেশই যেন আজ ভাঙনের মুখে ধ্বংসোন্মুখ। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয়, আমরা বাঁচিয়া আছি কি? মনে হয়—

আমরা মরিয়া গেছি সে কথা বুঝিনি মোরা আজও
  আমরা বাঁচিয়া নাই, বাঁচিবার করি শুধু ভান
দেখিতেছ শোভা-যাত্রা? ও যে শব-যাত্রা ভাই
  চলেছে মড়ার দল হস্তে বহি প্রেতের নিশান।
মুখেতে মেরেছে লাথি, পাষাণে দলেছে রোজ বুক
  ছাড়ায়ে গায়ের চামড়া, বানায়েছে যারা চটিজুতা
তাহাদেরি জয়গান গাহি দিয়া সুর-তাল-মান
  তাহাদেরি সেবা করি পাইলেই সুযোগ বা ছুতা।
মোদের জীবন্ত বল? এ বড় আজব দেশ ভাই,
  মরিলেই দাহ করা নয় জেনো এ দেশের কেতা
জীবন্তকে এরা শুধু মাঝে মাঝে পোড়াইয়া মারে
  সচল মড়াই করে জীবনের অভিনয় হেথা।
এখানে মৃতের দল নাচে গায় নানান আসরে
  মড়ারাই প্রিয়-প্রিয়া এদেশের মিলন বাসরে।

প্রেত-লোকের এই বীভৎস কল্পনায় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বারাবর অবসন্ন হইয়া থাকা মনের ধর্ম নয়। শেষ পর্যন্ত অন্তরনিবাসী আশাবাদীর কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাই।

অন্তর্যামী বলেন: "তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু সমগ্র সত্য নহে। সবই ভস্ম নহে, ভস্মের নীচে অগ্নিও আছে। হয়তো তাহা কণামাত্র, তবু তাহা অগ্নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু মেঘ দেখিয়া হতাশ হইও না, বিস্মৃত হইও না যে মেঘের অন্তরালে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের দীপ্তিও আছে। এই

বিশ্বাসকেই অবলম্বন কর। স্মরণ কর রবীন্দ্রনাথের কথা। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তিনি আশা করিয়া গিয়াছেন সংকটের দুর্যোগ চিরস্থায়ী হইবে না। পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া অপরাজিত মনুষ্যত্বের মহিমা আবার আত্মপ্রকাশ করিবে। আশা করিয়া থাক ওই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির, মেঘান্তরালবর্তী ওই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মহাবির্ভাব ঘটিবে। এই মহা হট্টগোলের মধ্যেও অনুপম সঙ্গীত আত্মগোপন করিয়া আছে, বিশ্বাস রাখ সেই সঙ্গীতই একদিন আবার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিবে।"

এই বিশ্বাসের আশ্রয়ভূমি সন্ধান করিতে গিয়া যে ছাত্রছাত্রীগণ, তোমাদেরই কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। মনে পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ঃ—

মানুষ হয়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে
যুগের আগে এগিয়ে চলে হাস্যমুখে গর্বভরে
প্রয়োজনের ওজন মতো আয়োজন সে করতে পারে
ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের চোখের মণি ·····ওই আমাদের বুকের বল
ওই আমাদের অমর প্রদীপ ওই আমাদের আশার স্থল।

তোমাদের উপরই সকলের আশা। তোমাদের মধ্যেই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত। তোমরা সাহিত্যিক না হও ক্ষতি নাই, কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা না হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। কিন্তু তোমাদের মানুষ হইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইবে। শুভ্রচরিত্র স্বদেশপ্রেমিকই অন্তর দিয়া দেশের দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করিতে পারেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের যুগে এইরূপ তীক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই দেশ জাগিয়াছিল। তাই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ আবার মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাকে মোহমুক্ত করিতে হইবে। সে দায়িত্ব তোমাদের। সে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে শুভ্র সৎচরিত্র চাই, তীক্ষ্ম অনুভূতি চাই। দেশের দুঃখকষ্ট প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে, তবেই তাহার প্রতিকার আসিবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "Feel, therefore, my would be reformers, my would-be patriots. Do you feel? Do you feel that millions are starving to-day and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it made you almost mad? Are you seized with that one idea of the misery of ruin, and have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your children even your bodies? That is the first step to become a patriot···"

আমাদের দেশে এরূপ patriot এখন নাই। আশা করিব তোমাদের মধ্য হইতে সত্য-সন্ধী দেশগতপ্রাণ পরার্থপর দেশ-প্রেমিকের আবির্ভাব আবার ঘটিবে।

বহুকাল আগে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় দেশের যুবক দের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইটি পাঠ করিয়া আজ আমার বক্তব্য সমাপন করিব ঃ

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দিনে রবে নির্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী ? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক।
শঙ্কাহীন বীর্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত্ত
সমস্ত জীবন জ্বালি পথ-প্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল ঃ কীর্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতি-পটে, আশার কল্পনা-নভে করে ঝলমল
লক্ষ-বর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আজ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট ক্ষোভ অসম্মান সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয় গ্লানি ?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, স্বীয় মূর্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞভূমে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্বলিত কর।*

পোষাক-প্রসঙ্গ

গত চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যার আধিব্যাধিতে শ্রীযুক্ত লীলা মজুমদারের লেখা 'আধিব্যাধি' রস-রচনাটি পড়ে ভারি ভালো লাগল। তিনি ঠিকই ধরেছেন। মনের রোগ আর দেহের রোগ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট একথা বড় বড় বিজ্ঞানিরাও স্বীকার করেছেন। এ-ও মনে হ'চ্ছে যে ভবিষ্যতে মনই সব রোগের উৎস বলে স্বীকৃত হবে। দেহের রোগ ব'লে আলাদা আর কিছু থাকবে না। এমন কি চুলকানি বা আবের কারণ নির্ণয় করবার জন্যেও আমাদের হয়তো মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হ'তে হবে শেষ পর্যন্ত।

তাঁর আর একটা 'আবিষ্কার'ও চমকপ্রদ মনে হল। মনের রোগর সঙ্গে যে পোষাক-আসাকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এটা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি অর্থনৈতিক মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে এ যুগে ড্রেন-পাইপ প্যাণ্টালুন পরা (কালো, প্রায় কালো, ঘোর কালো রঙের) পুরুষদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আত্মপ্রশংসা করা হবে ব'লে বোধহয় তিনি বিনয়বশতঃ মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। আমরা কিন্তু বলছি মেয়েরাও এবিষয়ে পিছিয়ে নেই। তাঁদের কোমর ও পেটকাটা জামা যে এই দুর্দিনে অর্থনৈতিক দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে তাতে আর সন্দেহ কি ? এর চরম পরিণতি হ'য়েছে ওদেশের 'টপ্‌লেস' পোষাকে। আশা করছি এদেশেও অচিরে তা প্রচলিত হবে এবং আমাদের মানসিক রোগ ও অর্থনৈতিক ক্লেশ দূর ক'রতে পারবে।

* পাটনা কলেজের বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে হ'চ্ছে। পশুপক্ষীদের মানসিক রোগ নেই। তারা কোন জটিল কমপ্লেক্সে ভোগে না। এর কারণ সম্ভবতঃ তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পোষাক-আসাকের বালাই তা'দের নেই। উলঙ্গ থাকাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, আর, 'back to nature' হওয়াকেই আধুনিক বিজ্ঞান স্বাস্থ্যের অনুকূল ব'লে দাবী করছেন। ওদেশে nudist সম্প্রদায় স্থাপিত হ'য়েছে। সমুদ্রতীরে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে সূর্যালোকসেবী উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ নরনারীর দল আজকাল আর চক্ষুর বা শালীনতার পীড়াদায়ক নয়। এদেশেও মহাভারত এবং পুরাণখ্যাত দীর্ঘতমা ঋষি 'গোধর্ম' পালন করতেন। অর্থাৎ তিনি nudist ছিলেন।

মনে হয় এদেশের আধুনিক যুবক-যুবতীরাও এবার এদিকে সচেতন হ'য়েছেন। হাফপ্যান্ট পরা হাতকাটা জামা গায়ে স্যান্ডাল পায়ে যুবকদের দেখলে মনে হয় তাঁরা ক্রমশঃ স্বাভাবিক নগ্নতার দিকেই ঝুঁকছেন। এ বিষয়ে মেয়েরাও পশ্চাৎপদ নন। এগারো হাত বা বারো হাত শাড়ি পরেও দেহ শোভাকে উগ্রভাবে লোকচক্ষুর সমক্ষে প্রকট করবার কৌশলও তাঁদের মধ্যে অনেকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন দেখছি। এসব আশার কথা।

অর্থাৎ যে 'গোধর্ম' ভবিষ্যতের ধর্ম হবে, যে নগ্ন পশু-সভ্যতা পরে বিজ্ঞান অনুমোদিত স্বাস্থ্যসম্মত সভ্যতা বলে গণ্য হবে, তারই মহড়া অর্থাৎ রিহার্সাল চলছে। ড্রপসিন যখন উঠবে তখন আমরা মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত হ'য়ে সেই নবনাটকের অভিনয়ে যা প্রত্যক্ষ করব তার নাম 'প্রগতি', স্রেফ্ প্রগতি।

গবেষণা*

বিজ্ঞানীরা বরাবরই আমার শ্রদ্ধাভাজন। আজ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র, আমিও চল্লিশ বছর ডাক্তারি করেছি। সাহিত্য সেবা করেছি অবসর সময়ে, অনেক সময় রাত জেগে। সেই সাহিত্যই এখন আমার জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। আমি যদি সুযোগ পেতাম, আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকতো, আমাকে পথ দেখাবার মত যদি কোনও গুরু পেতাম, তাহলে হয়তো সাহিত্য-সেবা না করে বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি সে সুযোগ পাই নি। এখন তার জন্য আমার ক্ষোভও নেই। এখন আমি বুঝেছি গবেষণার অর্থ যদি সত্যকে উদ্ঘাটন করা হয়, তাহলে তার জন্যে লেবরেটরি অপরিহার্য নয়। অন্য পথে চলেও সত্যের দেখা পাওয়া সম্ভব। বিটোফেন, রাফায়েল, শেক্সপীয়র, কলম্বাস, আইনস্টাইন সভ্য মানব-সমাজে আজ সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, কারণ এঁরা সকলেই সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। এঁদের সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক জগতের দিকপালদের নাম করি, তাহলেও সেটা বেমানান হবে না। মহর্ষি রমন, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরাও সত্যদ্রষ্টা। এই সব সত্যদ্রষ্টা

* যাদবপুরস্থ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেসন অব সায়েন্সের বার্ষিক উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ।

কিন্তু সত্যকে অপরোক্ষ করেছেন এক পথে গিয়ে নয়। প্রত্যেকেরই ভিন্ন পথ, ভিন্ন মাধ্যম, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন গুরু। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের পথ বিভিন্ন, কিন্তু এক জায়গায় এঁরা অভিন্ন। এঁরা প্রত্যেকেই চির-উৎসুক, চির-পিপাসী, চির-উৎকণ্ঠ, চির-উদগ্রীব। সত্যকে দর্শন করবার জন্যে একটা অতন্দ্র উন্মুখতা এঁদের সকলকে যেন সদা আকুল করে রেখেছে। আর এইখানেই গবেষণার মূল মন্ত্র নিহিত আছে। আকুলতা বা আগ্রহে কোন রকম ফাঁকি থাকলে সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে না, তা বারবার আমাদের এড়িয়ে যাবে। ছোটখাটো কৌতূহল থেকেই গবেষণার শুরু হয়। যেমন ধরুন, কোনও বিজ্ঞানের ছাত্র যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, মানবশিশুর মত উদ্ভিদশিশু বা মৎস্যশিশুকেও দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি না, তাহলে এ থেকেই একটা গবেষণার পথ খুলে যেতে পারে এবং সে পথ দিয়ে কোন নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী যদি অগ্রসর হতে চান, তাহলে হয়তো তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু না-ও পেতে পারেন কিংবা হয়তো এমন অভাবিতপূর্ব কিছু পেতে পারেন, যা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল এবং যা হয়তো বিজ্ঞান-জগতে বিস্ময়কর কোনও নূতন গবেষণার সূচনা করবে। এধরনের গবেষণা অনেকটা বুনো হাঁসের পিছনে ছোটাছুটি করবার মত। হাঁসকে প্রায়ই পাওয়া যায় না, যদিও বা পাওয়া যায় তখন দেখা যায় যে, আমার দৃষ্টি-বিভ্রম হয়েছিল, কাককে হাঁস ভেবেছিলাম। সত্যি হাঁসও পাওয়া যে না যায়, তা নয়—মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যাক আর না যাক, এই ছোটাছুটিতেই একটা আনন্দ আছে, সেই আনন্দই গবেষকদের পুরস্কার আর ওই ছোটাছুটির পথে হাঁস ছাড়া আরও অনেক লক্ষণীয় বস্তু তাঁর চোখে পড়ে এবং ছোটাছুটি করতে করতে অবশেষে বিজ্ঞানীর মনে শিক্ষার সেই পরম গুণ বিনয় বোধ দেখা দেয়, যখন তিনি নিউটনের মত বলতে পারেন—জ্ঞানসিন্ধুর উপকূলে আমি কয়েকটি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করেছি।

এরকম খামখেয়ালীভাবে আমাদের দেশে গবেষণা কিন্তু হয় না। হওয়া সম্ভবও নয় বোধ হয়। খামখেয়ালী গবেষণায় যে আনন্দ, রুটিনবদ্ধ বরাদ্দ মাপের গবেষণায় সে আনন্দ নেই। সেটাও যেন একটা task হয়ে পড়ে। তাছাড়া আর একটা জিনিস হয়েছে এ যুগে, যে যুগটাকে টাকা-নিয়ন্ত্রিত যুগ বললে খুব ভুল হবে না। এই টাকা-নিয়ন্ত্রিত যুগে একটা পাটোয়ারি বুদ্ধি সকল শিক্ষিত লোককে সম্মোহিত করছে। সকলেরই এক চিন্তা, কি করে দু-পয়সা হবে। এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে অনেক সাহিত্যিক সেই ধরনের বই লিখছেন, যে ধরনের বই বাজারে বেশী কাটবে। শিল্পীও সেই ধরনের ছবি আঁকছেন, যার বাজার দর আছে। এমন কি, আধ্যাত্মিক পন্থীরা সেই ধরনের গুরু খুঁজছেন, যিনি তাঁর আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা করে দিতে পারেন। গুরুরাও অধিক পরিমাণে শিষ্য আকর্ষণ করবার জন্যে এমন সব 'মিরাকুল' দেখাচ্ছেন, যা দেখলে বা শুনলে সত্যই অবাক হতে হয়। স্কুল-কলেজে ছেলেরা বিদ্যার বদলে ডিগ্রী চাই। কারণ বাজারে বিদ্যার কদর নেই, ডিগ্রীর কদর আছে। এখন ডিগ্রীর কদরও নেই, তাই ছেলেমেয়েরা আন্দোলন করছে বিদ্যা, ডিগ্রী কিছু চাই না—চাকরি চাই। সর্বত্রই টাকা আর টাকা। বস্তুতঃ টাকা না হলে চলেও না। সুতরাং গবেষণার ক্ষেত্রেও এই টাকা তার প্রভাব বিস্তার করেছে, সব গবেষণাই আজকাল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা মতলব-চালিত। এই বিষয়ে থীসিস লিখে একটা ডক্টরেট পেলে

চাকরির সুবিধা হবে বা অন্য কোন আধিভৌতিক উন্নতি হবে—এই মানদণ্ডই সকলকে গবেষণায় যদি প্রবৃত্ত করে তাহলে গবেষণা হয়তো কিছু হয়। কিন্তু গবেষণার আনন্দ লাভ হয় না, সত্য অনেক সময় নাগাল থেকে ফস্‌কে যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে না হতে পারে, তা আমি বলছি না। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন ভাগ্যবান গবেষক গবেষণার পর একটা চাকরি পেলেই গবেষণার ইতি হয়ে যায়। আমাদের দেশে হালে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে উল্লেখযোগ্য কি কি গবেষণা হয়েছে, তা আমার জানা নেই। যতদূর শুনেছি তেমন কিছু হয় নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন আমরা বিদেশীয়দের দ্বারা প্রভাবিত, গবেষণার ক্ষেত্রেও তাই, আমাদের চিন্তা বা কল্পনার অনন্যতার তেমন কোন প্রমাণ আমাদের গবেষণায় নেই—যেমন ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণায়। পাটোয়ারি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা সেই মহৎ লোকে উত্তীর্ণ হতে পারছি না, যেখানে উত্তীর্ণ হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র 'অব্যক্ত' লিখেছিলেন। যে মহৎ লোকে উত্তীর্ণ হয়ে আচার্য আইনস্টাইন মোৎসার্ট বা বীটোফেনের সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে যেতে পারতেন, যিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, যিনি বেলজিয়ামের রাণীর নিমন্ত্রণে গিয়ে হেঁটে তাঁর প্রাসাদে পেঁছেছিলেন। রাণী যখন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার জন্যে যে 'কার' পাঠিয়েছিলাম সেটা আপনি ব্যবহার করলেন না কেন' ? আইনস্টাইন হেসে উত্তর দিলেন—It was a very pleasant walk, Your Majesty। চিত্তের যে স্বাধীনতা থাকলে সত্য কথা সহজভাবে বলা যায়, অর্থের কারাগারে বন্দী হয়ে আমরা সে স্বাধীনতা হারিয়েছি। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজা টলেমি ইউক্লিডের কাছে জ্যামিতি শিখতেন। একদিন তিনি অধীরভাবে প্রশ্ন করেছিলেন—Isn't there a shorter way of learning geometry than through your method ? ইউক্লিড উত্তর দিয়েছিলেন—সায়ার, আপনার রাজত্বে দু-রকম রাস্তা আছে। একটা সাধারণ লোকদের চলবার জন্যে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। আর একটা রাজপরিবারদের চলবার জন্য ভাল রাস্তা। কিন্তু জ্যামিতিতে একটি মাত্র রাস্তাই আছে। সকলকেই সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়ঃ There is no royal road to learning.

এযুগের আমরা রূঢ় সত্য উত্তর কি অকপটে দিতে পারি কোনও ক্ষমতাশালী হোমরা-চোমরা ব্যক্তির মুখের উপর ? পারি না। বরং চেষ্টা করি তাঁর মন রেখে চলতে। আমরা স্বাধীন নই, আমরা পরিবেশের কারাগারে বন্দী, ষড় রিপুর কারাগারে বললেই আরও ঠিক বলা হয় সেটা। তাই আমরা মহৎ কিছু করতে পারছি না। গবেষণা মানে সত্যের সন্ধান, সে সন্ধান কি ভীতু, মিথ্যাচারী লোকের দ্বারা সম্ভব ?

তবু আমার আশা আছে এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের গবেষণা-প্রবণতা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। বাঙালীর ছেলেদের স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা আছে। স্বপ্নই গবেষণার প্রেরণা। আপনারা যদি এই সব খামখেয়ালী স্বপ্নবিলাসী ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্যে একটা ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান খোলেন—যেখানে যে কোনও বৈজ্ঞানিকের যে কোনও আজগুবি স্বপ্নকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে দেখবার সুযোগ থাকবে—তাহলে আমার মনে হয়, গবেষণার নূতন একটা দিগন্ত দেখা দেবে আমাদের দেশে। একই মাটি থেকে একই রস আহরণ করে পাশাপাশি দুটো গোলাপ গাছ দু-রঙের ফুল ফোটাচ্ছে কি উপায়ে ? আমাদের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে eosinophil বলে যে

কণিকা আছে, সেটি eosin-এর রং নেয় কেন? eosin-এর জ্ঞাতি flurosin-এর রঙ কেন নেয় না? Eosin একটা bromine compound। তাহলে কি ইওসিনোফিলের সঙ্গে আমাদের শরীরের bromine metabolism-এর কোন সম্পর্ক আছে? Iodine metabolism নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আছে thyroid: ইওসিনোফিল কি তাহলে thyroid-এর মত bromine নিয়ন্ত্রণকারী ছোট ছোট ভাসমান gland? এই ধরনের নানারকম এলোমেলো উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্ন প্রশ্ন নিয়ে আসবে সেখানে বিজ্ঞানের নানা বিভাগের ছাত্রেরা। সে প্রশ্নের সদুত্তর দেবার জন্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপক কি পাওয়া যাবে? শুধু অধ্যাপক নয়, তাদের কল্পনা যে ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র নয়, এটা প্রমাণ করবার ব্যবস্থাও থাকা চাই সে প্রতিষ্ঠানে।

আমার এই প্রস্তাবটা হয়তো হাস্যকর মনে হবে, তবু আমার মনে হয় সুস্থ স্বাধীন অনন্য নির্ভীক বিজ্ঞানীরাই অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট গবেষণা-দিগন্তের দিকে অগ্রসর হবার যোগ্য। তাঁদের উৎসাহ দিলেই আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর গবেষকদের দেখা পাওয়া যাবে।

কিন্তু হায়। আমাদের দেশে এই অসম্ভব কি সম্ভব হবে?

মুর্শিদাবাদে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ,

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। সর্বপ্রথমেই আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি সেই মহামনস্বী মহাপুরুষকে, বঙ্গ সাহিত্যের সেই দিকপালকে বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠসাধক সেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে যাঁহার জন্মভূমিতে আজ এই সম্মিলন-সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার প্রেরণায়, আগ্রহে এবং চেষ্টায় একদা এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, যাঁহার প্রতিভা-কিরণে বঙ্গ সাহিত্যের প্রবন্ধ বিভাগ আজ সমুজ্জ্বল। জানি না, তিনি স্বর্গলোক হইতে আমাদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন কি না, কিন্তু একথা বার বার বলিব আমরা তাঁহার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। শুনিয়াছি যে 'হল'এ আজ এই সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই হলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। প্রাতঃস্মরণীয় শব্দটি অভ্যাসবশত লিখিয়াই কিন্তু মনে হইল, সত্যই কি বিদ্যাসাগর আজ প্রাতঃস্মরণীয়? সেই ঋজু-মেরুদণ্ড তেজস্বী ব্রাহ্মণকে, যিনি ব্যথা-হতাশা-কুসংস্কার-অশিক্ষা-লাঞ্ছিত বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য নিজের ধন-মান-স্বাস্থ্য-সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি আমরা একবারও মনে করি? যাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্রবল বাঙালী সমাজের উন্নতিকল্পেই একদা নিয়োজিত হইয়াছিল তাঁহার জীবনী কি আমরা আজকাল পাঠ করি? যে উত্তরটা মনে জাগিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে সংকুচিত হইতেছি। বাঙালী পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে ভুলিয়াছে, তাহার প্রতিভা

নিত্যনূতন মহাপুরুষ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। নূতন মহাপুরুষের ভিড়ে পুরাতনেরা হারাইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একটু উদ্ধৃত করিতেছি :

"রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধারলাভ করিতে হইয়াছিল...বস্তুতই বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বিবেচিত হইতে পারে।...পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উর্ধ্বে অবস্থিত যে তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌সংযত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালী উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব-খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।"

হিমালয়কে অবজ্ঞা করিলে হিমালয় ছোট হইয়া যায় না, বিদ্যাসাগরের মহতী কীর্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হিমালয়ের মতোই অভ্রভেদী। তাঁহাকে আমি শত সহস্র প্রণাম নিবেদন করিলাম। আজকাল দেশে এমন কোনও নেতা নাই যাঁহাকে প্রণাম করিলে মনে হয় ধন্য হইলাম। প্রণম্যের সন্ধান করিতে হইলে ইতিহাসের পাতা উলটাইতে হয়। বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগরকেও ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম আজ। মনে মনে প্রার্থনা করিলাম—আবার তুমি আবির্ভূত হও, তোমার মতো কর্মবীরেরই এখন প্রয়োজন। যে জেলায় আজ আমাদের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই মুর্শিদাবাদ জেলায় পলাশীর যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে একদা নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক-প্রধান মিস্টার ক্লাইভ ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম পত্তন করিয়া ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইতিহাস বলে ক্লাইভ শৌর্য বলে বিজয়ী হন নাই, হইয়াছিলেন কৌশল অবলম্বন করিয়া এবং সে কৌশল সফল হইয়াছিল কারণ বাঙালী জাতি অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলার শাসন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তাঁহারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। নবাবের দম্ভ তাঁহাদের আত্মসম্মানকে, তাঁহাদের আদর্শবোধকে লাঞ্ছিত বিক্ষত করিতেছিল। তাই সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া ইংরেজকেই সে রাজসম্মানে অভিষেক করিয়াছিল। এইটিই বাঙালী চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সে আদর্শবাদী এবং তাহার আদর্শ এমন নিখুঁত, এমন তুঙ্গী যে তাহার নাগাল সে আজও পায় নাই। কিন্তু তাহার নাগাল পাইবার জন্য সে সর্বদা সচেষ্ট এজন্য সে যুগে যুগে নানা মত অবলম্বন করিয়াছে—নানা পথে দুর্গম যাত্রা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। অনার্য বাঙালী আর্য হইয়াছে, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইয়াছে, তারপর বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করিয়া মাৎস্যন্যায়ের কবলে পড়িয়া নিদারুণ অত্যাচার ভোগ করিবার পর এই বাঙালীই অষ্টম শতকে গোপাল দেবকে নেতা করিয়া সাধারণতন্ত্র বা রিপাবলিক্ স্থাপন করিয়াছে। পাল বংশ সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিবার পর যখন আদর্শভ্রষ্ট হইল, তখনও বাঙালী তাহা সহ্য করে নাই, সুদূর কর্ণাট প্রদেশ হইতে সেন বংশের লোক আনিয়া বাংলার সিংহাসনে বসাইয়াছিল।

সেন রাজারাও বেশীদিন বাঙালীর আদর্শ চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারেন নাই, তখন বাঙালী জনসাধারণই মহম্মদ বখ্তিয়ার খিলিজিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। মুসলমানদের সাম্যবাদই সম্ভবত বাঙালীর মনে আশা জাগাইয়াছিল, তাহারা হয়তো ভাবিয়াছিল সমাজের নানাবিধ অসাম্য-জনিত ব্যবস্থা মুসলমানরাই দূর করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল মুসলমানরা এদেশে সাম্যের মহিমা প্রচার করিতে আসেন নাই, আসিয়াছেন রাজত্ব করিতে। তাঁহারা প্রভু, তাঁহারা নবাব, তাঁহারা শাহানসাহ, তাঁহারা দরিদ্রের কেহ নন, তাঁহাদের বিলাসের তাণ্ডব-লীলায় দরিদ্রের ক্রন্দন, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বারবার ভাসিয়া গেল ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। বাংলাদেশে ইহার নানাবিধ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং উত্তরবঙ্গ নিবাসী রাজা গণেশের মতো অবিস্মরণীয় হিন্দুরাজার অভ্যুদয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ছোট খাটো আরও নানা ঘটনা ঘটিয়াছিল সে সবের বিস্তৃত পরিচয় দিবার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙালী ইহার শেষ জবাব দিয়াছিল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে। তাহার পরই ইংরেজের আবির্ভাব। ইংরেজদের লইয়াও বাঙালী কম মাতে নাই। তাহাদের ন্যায়বিচার, তাহাদের ধর্ম, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের সাহিত্য বেশ কিছুদিন বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যে-ই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাহারা শাসকের ছদ্মবেশে শোষক, আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার ছুতায় তাহারা আমাদের শাশ্বত ঐতিহ্যকে চূর্ণ করিতেছে অমনি আমাদের টনক নড়িল। ইহার প্রমাণ সেকালের সংবাদপত্র-সমূহে মুদ্রিত আছে। যে রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনে উৎসাহী হইয়াছিলেন সেই রামমোহন রায়ের সহিতই ইংরেজ সরকারের নানা বিষয়ে মতের অমিল হইতে লাগিল এবং তিনি আমাদের দেশে যে রেনেসাঁসের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার মূলকথা—অতীতের দিকে ফিরিয়া চাও, আমাদের ঐতিহ্যের মহিমা বিস্মৃত হইও না। আমাদের বেদান্ত উপনিষদ ত্যাগ করিয়া বাইবেলের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। তিনি হিব্রু শিখিয়া পাদরিদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিলেন আর স্থাপন করিলেন ব্রাহ্মধর্ম। সে যুগের বাংলাদেশ যদিও ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানাইয়াছিল কিন্তু তাহার কাছে আত্মবিক্রয় করিয়া একেবারে নিজেদের আদর্শ বিসর্জন করিয়াছিল একথা ইতিহাস বলে না। এ বিষয়ে কিছুদিন পূর্বে আমি একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই উদ্ধৃত করি—
"ইংরেজী সভ্যতার তীব্র স্রোতে ভাসিয়াও বাঙালী কিন্তু আত্মসম্মান হারাইয়া আদর্শ-ভ্রষ্ট হয় নাই। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান হইয়াও বাঙালীত্ব বজায় রাখিলেন। রসিক কৃষ্ণ, রাম গোপাল, রাধানাথ, রামতনু সমাজ বিদ্রোহী হইয়াও মনে প্রাণে স্বদেশী রহিলেন, মাইকেল মধুসূদন হোমার মিলটন ভজনা করিয়াও অবশেষে 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' লিখিলেন রামমোহন রায় সাহেবদের অধীনে দেওয়ানি করিয়াও খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া খৃষ্টধর্মমুখী বাঙালী চিত্তকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কটকি চটি, থান ও চাদর পরিয়া লাটসাহেবের প্রাসাদ পর্যন্ত বিচরণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিতে করিতে লিখিলেন 'আনন্দমঠ', দীনবন্ধু লিখিলেন 'নীলদর্পণ', নবীনচন্দ্র লিখিলেন 'পলাশীর

যন্ত্র', হেমচন্দ্র গাহিলেন 'ভারত সঙ্গীত', ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাস্তিক প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ হইলেন, ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডিকে সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত করিয়া বাঙালী কেশবচন্দ্র সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিরাট পরিকল্পনা করিলেন, বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বাঙলার পল্লীপ্রান্তে আসিয়া বিশ্বভারতীর আসন পাতিলেন, বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর প্রেম বৈরাগ্য ভরে ঐশ্বর্যের শিখর হইতে দেশের ধূলিতে নামিয়া আসিতে পারিলেন, ইংরেজদের প্রভুত্ব-প্রতীক লোভনীয় আই. সি. এস চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্র স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতে ইতস্তুতঃ করিলেন না।

আদর্শবাদী বাঙালী কোনও সভ্যতার সংঘাতেই আদর্শচ্যুত হয় নাই। আদর্শের জন্য সে সব সহ্য করিতে পারে। পারে না কেবল অসাম্য ও সংকীর্ণতা।"

তাহার আদর্শের কষ্টিপাথরে যখন ইংরেজ শাসনের স্বরূপ ধরা পড়িল তখন সে নিশ্চেষ্ট রহিল না। বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ স্থাপন করিলেন কংগ্রেস এবং সে প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিলেন ভারতের সর্বপ্রদেশের মনীষীগণকে। ইহার কিছুদিন পরেই লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ করিয়া দিলেন। কারণ ইংরেজ বুঝিয়াছিল যে সারা ভারতে বাঙালীই ইংরেজের একমাত্র শত্রু। তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া দিতে পারিলেই সে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ বজ্র বিস্ফোরণে বিদ্রোহী বাঙালির প্রতিবাদ ভারতের আকাশকে সচকিত করিয়া তুলিল। সে যুগের অনুশীলন সমিতি, সে যুগের বোমা পিস্তলের গর্জন, সে যুগের অরন্ধন, রাখীবন্ধন, সে যুগের নেতাদের কণ্ঠে জ্বালাময়ী বক্তৃতাবলী, সে যুগের উদাত্ত কবিকণ্ঠে স্বদেশী গান, সে যুগের সংবাদপত্র 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা', সে যুগের বিদেশীপণ্য বর্জনের উদ্দীপনা, সে যুগের আদর্শ-উদ্দীপ্ত বাঙালী যুবক-যুবতীদের ফাঁসিকাঠে আত্মবিসর্জন, আন্দামানে নির্বাসন, কারাগারে কারাগারে নিষ্ঠুর নির্যাতন-বরণ সারা দেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করিল যে ইংরেজ সরকার ভাঙ্গা বাংলাকে আবার জুড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। শুধু তাহাই নয়, সে যুগের ইতিহাস এমন একটা পটভূমিকা সৃষ্টি করিল, এমন একটা মঞ্চ প্রস্তুত করিল যাহার উপর দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধী পরবর্তী যুগে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর কংগ্রেসের ইতিহাসে যে সব উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। যে সব কীর্তি-অকীর্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। একটি ঘটনা কিন্তু উল্লেখ করিতেই হইবে—সেটি নেতাজী সুভাষকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়ন। কংগ্রেসের এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির নাগালের বাহিরে গিয়া নেতাজী যে মহতী কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহার ইতিহাস আজও সুবিদিত। বাঙালী সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথমে স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন তাঁহার I. N. A. বাহিনীর কার্যকলাপ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বাহিনীকেও বিচলিত করিয়াছিল। ইংরেজের দ্রুত ভারত ত্যাগের ইহাও না কি একটা প্রধান কারণ। নেতাজী যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন তখনই বাঙালী অনুভব করিয়াছিল যে কংগ্রেস স্বদেশপ্রেমিক আদর্শবাদী স্বার্থ-লেশহীন প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা একটি বিশেষ ছাপ দেওয়া রাজনৈতিক দল মাত্র, নিজেদের দলকে শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখাই সে দলের মূল লক্ষ্য, দেশ উপলক্ষ্য মাত্র। ইংরেজ যখন আমাদের স্বাধীনতা দান

করিল তখন কংগ্রেস নেতারাই সে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে বঙ্গ বিভাগ লইয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু সেই বঙ্গদেশকেই তাঁহারা দুই টুকরা করিয়া গদিতে বসিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। দেশ বিভক্ত হইবে না, সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য, একথা বারবার তাঁহারা নানা সভায় নানা পুস্তক-পুস্তিকায় প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তাঁহারা সে লক্ষ্য হ'তে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। দেখা গেল ক্ষমতায় সমাসীন হওয়াই তাঁহাদের লক্ষ্য। বঙ্গ বিভাগের ফলে বাংলা দেশের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, বহু নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। অপমানের কালিমা বহু সভ্য শিক্ষিত বাঙালী পরিবারকে কলঙ্কিত করিয়াছে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা আজও সরকারের কৃপাপ্রার্থী হইয়া স্বদেশে বিদেশে অরণ্যে মরুতে নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও অভাবের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জীবন যাপন করিতেছেন। আমাদের অন্ন নাই, আমাদের শিক্ষা নাই, আমাদের উপার্জনের ক্ষেত্র নানা দিক হইতে সীমিত হইয়া আসিতেছে, এক কথায় ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা বাঙালীকে সব দিক দিয়াই পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে বাঙালীর পঙ্গুত্বের খবর বারবার পাওয়া যাইবে। কিন্তু আর একটা বিস্ময়জনক খবরও বারবার মিলবে, পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও বাঙ্গালী বারবার গিরি লঙ্ঘন করিয়াছে। যে মন্ত্রবলে তাহা সম্ভব হইয়াছে তাহা তাহার শিল্পী-চেতনা-সম্ভূত আদর্শ বোধ, তাহা সত্য শিব সুন্দরকে জীবনে পরিস্ফুট করিবার নির্ভীক আগ্রহ। অনার্য বাঙালী আর্য হইয়াছিল, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইয়াছিল, মাৎস্যন্যায়ে বিব্রত বাঙালী অষ্টম শতকে গোপাল দেবের নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই গোপালদেবের প্রতিষ্ঠিত পালবংশ যতদিন বাঙালীর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে নাই ততদিন সে পাল বংশের রাজত্ব সহ্য করিয়াছিল কিন্তু যেই সে আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইল পাল রাজারা অপসারিত হইলেন, আসিলেন সেন রাজারা। সেন রাজাদের পরে মুসলমান, মুসলমানের পরে ইংরেজ এবং ইংরেজের পর কংগ্রেস ওই একই মনোভাবের ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি। এবারকার নির্বাচনে দেখা গেল বাঙালী কংগ্রেসকেও বর্জন করিয়াছে। কারণ ওই একই।

সাহিত্য সভায় ইতিহাস এবং রাজনীতি লইয়া আলোচনা করিলাম কারণ ইতিহাসে এবং রাজনীতিতে বাঙালার যে মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সাহিত্যেও তাহা পরিস্ফুট। সত্য শিব এবং সুন্দরের সন্ধানে বাঙালীর সাহিত্যও বারংবার মত পথ আঙ্গিক পরিবর্তন করিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে পুরাতন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। প্রাচীনতম বাংলার নমুনা আমরা পাই কয়েকটি শিলা লেখে, বাঙালী পণ্ডিত সর্বানন্দ কৃত অমরকোষের টিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোহায়। ইহার পরই চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের উল্লেখ পাই। অনেকে মনে করেন জয়দেবের গীত-গোবিন্দ প্রথমে প্রাচীন বাংলার রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। কবি জয়দেব ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা দিয়াছে ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। বাংলা সাহিত্যের শৈশবে তাহা কেবল কবিতাতেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাহার মুখ্য বিষয়-বস্তু ছিল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য

কীর্তন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন বাংলা ভাষার জন্ম দশম শতাব্দীতে হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য সৃষ্ট হইয়াছে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে। এই শতকে যে সব কবির দেখা আমরা পাই তাঁহাদের মধ্যে আছেন রামায়ণকার কৃত্তিবাস ওঝা, পদরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার কবি চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা মালাধর বসু। এই কালেই মিথিলায় মহাকবি বিদ্যাপতির আবির্ভাব। বিদ্যাপতির প্রভাবও বাংলার অনেক বিখ্যাত পদরচয়িতাকে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে তুর্কিরা বাংলা দেশ আক্রমণ করে, সেজন্য বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভা কিছুকালের জন্য স্তিমিত থাকিয়া, পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু যে জিনিসটি লক্ষ্যণীয় তাহা এই যে বাংলা সাহিত্য এই সময়ে দেব-দেবীর উপাখ্যানেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখিয়াছে। নানাবিধ মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বাঙালী কবিরা সেই সময় বাঙালী রসপিপাসুদের চিত্ত যেন হিন্দু ধর্ম রসে আপ্লুত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। ইহা কি বাংলায় ইসলাম ধর্ম অভ্যুদয়ের প্রতিক্রিয়া? অসম্ভব নয়। কারণ ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের মহিমাময় কার্যকলাপ যাহা করিয়াছিল, তাঁহার সাম্যের বাণী, তাঁহার প্রেম ধর্ম প্রচার, তাঁহার সংকীর্তন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তৎকালীন বঙ্গসমাজে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাকে এক অভিনব ধরনের বিদ্রোহ বলিতে অত্যুক্তি হয় না। এই বিদ্রোহের বাণী—অর্থাৎ সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—এই বাণী সেকালের সাহিত্যেও নানাভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। তখনকার মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, পরমানন্দ গুপ্ত, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। তাঁহাদের রচনাতেও শ্রীচৈতন্যের বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বহুল প্রচার ও কাব্যগানে ব্রজবুলির প্রচলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা কিন্তু তাহা অতি মধুর। নূতনত্বের দিকে অভিনবত্বের দিকে বাঙালীর মন চিরকালই উন্মুখ। এই কৃত্রিম ভাষাতেই বাঙালী প্রতিভা যাহা সৃষ্টি করিল, তাহা প্রাণবন্ত, তাহা মৃত্যুঞ্জয়ী। রবীন্দ্রনাথও সেই ভাষাতে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের আর একটি সাহিত্য-কীর্তি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। অনেকেই চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। মুকুন্দরাম সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন। চণ্ডীমঙ্গল ছাড়াও কবিতায় তিনি নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য আত্মকাহিনী বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। সে হিসাবে মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী জীবনী-সাহিত্যে প্রথম পথ প্রদর্শক। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে পাঠান-মোগলের সংঘর্ষে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বাস্তবানুগ মর্মস্পর্শী বিবরণ আমরা ওই জীবন চরিতে পাই। অত্যাচারের ফলে মুকুন্দরামকে দেশ-ছাড়া হইতে হইয়াছিল, তিনিও একদিন 'রেফিউজি' হইয়াছিলেন এসবের বিস্তৃত বিবরণ তিনি তাঁহার কাব্যে দিয়া গিয়াছেন। মোগল রাজত্বের সময় যে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় আমরা পাই তাহাও মুখ্যতঃ বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাবরসে আবিষ্ট। কৃষ্ণলীলাই তখনও বাঙালী কবিদের প্রধান প্রেরণা। এই সময় মহাভারতকার কাশীরাম দাসের আবির্ভাব। এই সময় অনেক মঙ্গলকাব্যও রচিত হইয়াছিল। এই সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু নূতন স্বাদ

মেলে কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যে। ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় ইহার নায়ক। কুম্ভীর দেবতা কালুরায়ের কাহিনী এবং পীর বড় খাঁ গাজির কাহিনীও ইহাতে আছে। মঙ্গলকাব্যের একঘেয়েমির মধ্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ইহাতে আছে এবং ইহাই বাঙালী প্রতিভার বিশেষত্ব। অভিনবত্বের দিকে তাহা চিরকাল উন্মুখ। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। আরাকানের রাজসভায় সেই সময় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আরাকানের সভায় দৌলত কাজি ও আলাওল সমাদৃত হইয়াছিলেন। চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা বাংলা কাব্যে যে নূতন সুর বাজাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলিতেছেন—বঙ্গসাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়া নূতন ধরনের অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্যরচনার সম্মান মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুসলমান কবিরা শুধু যে নিছক ধর্মাত্মক কাব্যরচনার ধারা পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, ফার্সি ও প্রাচীন হিন্দী সাহিত্য হইতে অজ্ঞাত অভিনব কাহিনী সমূহ আনিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের সৃষ্টি করিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের জন্ম। ছন্দোবদ্ধ কবিতার সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করিয়া বাঙালী প্রতিভা যদিও মুক্ত আকাশের সন্ধান পাইল কিন্তু সে প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি আমরা দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এযুগের যে দুইটি সাহিত্যকারকে বাঙালী আজও মনে করিয়া রাখিয়াছে তাঁহারা গদ্যলেখক ছিলেন না। ছিলেন কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনেক মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচিত হইয়াছিল—কিন্তু বাঙালী তাহাদের মনে রাখে নাই। মনে রাখিয়াছে ভারতচন্দ্রকে এবং শক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে। ভারতচন্দ্রের রসবোধ, মৌলিকতা এবং অনন্য ভাষা আজও রসিক সমাজে সমাদৃত। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতগুলি আজও আমরা ভুলি নাই।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা করিল। এই বৎসর হুগলী শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে প্রথম বাংলা মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। বাংলা হরফ স্বহস্তে প্রস্তুত করেন উইলকিন্স সাহেব। পঞ্চানন কর্মকার পরে তাঁহার নিকট ইহা শিক্ষা করে।

সে যুগের গদ্য গ্রন্থগুলি এখন প্রায় অপাঠ্য বলিয়া মনে করি। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' প্রভৃতি পুস্তকে যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সহিত আধুনিক বাংলা গদ্যের তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে কত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী প্রতিভা কি অসাধ্যসাধন করিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (বত্রিশ সিংহাসন-প্রণেতা) সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনিই সেকালে বাংলা গদ্যকে একটা সুষ্ঠু রূপ দিয়াছিলেন। এই সময়ই কেরী মার্শমান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সক্রিয় চেষ্টায় বহু বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। বাংলার বহু মনীষীও সোৎসাহে সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের

উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় লিখিয়াছিলেন বেদান্ত দর্শন, শাস্ত্রবিচার বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ এবং ব্রহ্মসঙ্গীত। সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমের সংকলন করাইয়াছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। এযুগের অধিকাংশ গদ্য রচনাই সংস্কৃত, ফরাসী বা ইংরাজীর অনুবাদ। বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পত্তনের দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধারণ লোকের সাহিত্য পিপাসা কিন্তু তখন মিটিত কবিওয়ালাদের গীত ও যাত্রায়, অর্থাৎ তরজা, খেউড়, কবিগান, পাঁচালি ও হাফ্ আখড়াইয়ের মাধ্যমে। এই সব সাহিত্যকর্মে এবং তাহাদের জনপ্রিয়তায় বাঙালী মনের একটি বিশেষ প্রবণতার চিত্র আমরা দেখিতে পাই। রঙ্গ-রসিকতা, দল বাঁধিয়া প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা বাঙালী চরিত্রের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহা সে যুগের এই সব রচনায় পরিস্ফুট। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহার প্রভাব ছিল। আমার মনে হয় এখনও সে প্রভাব সম্পূর্ণ লোপ পাই নাই, বাঙালীর সেই পুরাতন প্রবৃত্তি এখন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। নানা রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ্য সভায় পরস্পরের বিরুদ্ধে নেতারা যাহা বলেন, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে যাহা লেখা হয়, এমন কি সমালোচনার ছলে লেখকদের নামেও যে সব উক্তি অনেক ক্ষেত্রে ছাপা হয় তাহাতে মনে হয় এই বিশেষ প্রবণতা এখনও আমাদের উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক জোগায়। এ প্রবণতা ভাল না মন্দ এ প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুধু বলা যায় যে ভাল মন্দ যাহাই হউক ইহাই অনিবার্য। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের বা হাস্যরসের উদ্ভবই এই মনোবৃত্তি হইতে। পশুরাই গড্ডলিকা দ্বারা চালিত হয়, ফ্যানাটিক্‌রাই নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়া দলবদ্ধ হইতে পারে। বাঙালী আত্মসচেতন, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শিল্পীর জাতি, তাহারা সকলেই একদলভুক্ত হইবে এ আশা দুরাশা। বাঙালীদের একাধিক দল থাকিবেই এবং পরস্পর পরস্পরের সমালোচনা করিবেই। সে সমালোচনা যে সব সময়ে সাহিত্যরস বর্জিত হইবে একথা বলা যায় না। মনে রাখিতে হইবে বাঙালীর ব্যঙ্গ-সাহিত্যের উৎসই এই সব সমালোচনা।

বাঙালীপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার মন। সে মন বৈচিত্র্যবিলাসী এবং বিদ্রোহী। তাহার এই বৈচিত্র্যবিলাসের চিহ্ন শুধু যে বাংলা সাহিত্যে বর্তমান তাহা নয়, তাহা তাহার আচার-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে, সামাজিক আবহাওয়ার নিত্য পরিবর্তনে দেদীপ্যমান। হিন্দু বাঙালী মুসলমান বাঙালী, খৃষ্টান বাঙালী, বৌদ্ধ বাঙালী, শাক্ত বাঙালী, বৈষ্ণব বাঙালী, ব্রাহ্ম বাঙালী, নাস্তিক বাঙালী সবাই বাঙালী।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় ছাপা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সাময়িকপত্রের মারফত বাঙালী যে শুধু বাংলা গদ্যের রসাস্বাদন করিল তাহা নয়, সংবাদপত্রের মারফত সে আত্মপ্রকাশও করিল। তখনকার 'সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গলা গেজেটি', 'সংবাদ কৌমুদী', সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকা পাঠ করিলে সে যুগের সজাগ বাঙালী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এবং সংবাদ প্রভাকরেই কবিতা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই—ইয়ং বেঙ্গলদের যুগে। এ যুগের নেতা ছিলেন অধ্যাপক ডিরোজিওর

শিষ্যগণ—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি মনস্বীগণ বাংলায় নব জাগরণের হোতা রূপে বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ইঁহারা ছিলেন বিদ্রোহী, সর্ববিধ সামাজিক সংস্কারের অগ্রদূত। তাঁহারা সেদিন যে আগুন জ্বালাইয়াছিলেন সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সে আগুন আজও জ্বলিতেছে। তাঁহাদের বিদ্রোহের মূল সুর ছিল যুক্তিবাদ এবং সে যুক্তিবাদ প্রধানত পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিধ্বনি। আহারে বিহারে চিন্তায় 'সাহেব' হওয়াই ছিল তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান এবং লক্ষ্য। ইহা সে যুগের রক্ষণশীল সমাজে যদিও উৎকট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে সে সময় যে মেকি আধ্যাত্মিকতা ও প্রাচীন সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মাবলী প্রাণহীন কুৎসিত তামসিকতায় পরিণত হইয়া আমাদের সমাজকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহার বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গল অকুণ্ঠ ভাষায় জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, সাহিত্যে ও সমাজে সুস্থ প্রাণবন্ত যুক্তিযুক্ত পাশ্চাত্ত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস তাঁহারা সেদিন করিয়াছিলেন তাহার ফল আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। ইহার পরই বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ইয়ং বেঙ্গলদের আন্দোলনের ফলে এদেশে স্কুল, কলেজ, নানাবিধ অ্যাসোসিয়েশন তো হইয়াছেই, স্ত্রী-শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলায় নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও এমন অনেক সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছে যাহার প্রভাব বাঙালীকে জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, মুক্তি সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়াছে। সে যুগের সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে ইহার অনেক খবর আছে। সেই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকূল হওয়ায় বাঙালীমনের উর্বরক্ষেত্রে সেদিন যে বীজ সেই যুগে উপ্ত হইয়াছিল তাহার ফসল আজও যেন অফুরন্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। এখন ১৯৬৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স একশত বাইশ বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা যে বিস্ময়কর ঐশ্বর্যে বঙ্গবাণী মন্দিরকে মণ্ডিত করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে নাই। এই প্রবন্ধে সে ঐশ্বর্যের সম্যক্ পরিচয় দিবার সুযোগ নাই, স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস শুধু বলিতে চাই। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'ইয়ং বেঙ্গল' একদা যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জয়ধ্বজা বহিয়া বাংলা সমাজকে আলোড়িত করিয়াছিলেন সেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোক আমাদের সাহিত্যকেও প্রদীপ্ত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শ না পাইলে হয়তো আমরা মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমকে পাইতাম না, কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ হইলেও তাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের নকলনবীশ ছিলেন না। তাঁহারা স্রষ্টা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর এবং কমলাকান্ত—একেবারে বাঙালী চরিত্র। মেঘনাদ-বধের রাবণও বাঙালী জীবনেরই

ট্র্যাজেডি যেন মূর্ত দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তো ভারতবর্ষেরই শাশ্বতবাণী নূতন সুরে ছন্দিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেন, কবিশেখর কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজি নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতি কবিগণের প্রত্যেকেরই লেখা স্বকীয়তার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইহাদের সকলের সৃষ্টিতে যে সুর বাজিয়াছে তাহা বিদেশী সুর নহে, খাঁটি স্বদেশী সুর। শরৎচন্দ্রের লেখায় আমরা আমাদেরই নিতান্ত আপনজনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিদেশী প্রভাব আমাদের একদা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সত্য কিন্তু আমাদের যুগন্ধর স্রষ্টা সাহিত্যিকরা যে কেবল কেরানীগিরি করেন নাই এ সত্য আমাদের সাহিত্যে আজ সমুজ্জ্বল। অতি আধুনিক সাহিত্যের কিছু লেখক—বিশেষ করিয়া যাঁহারা দুর্বোধ্য অতি-আধুনিক কবিতা লেখেন কিংবা যাঁহারা লালসা-উদ্দীপক নোংরা বই লিখিয়া বহির বাজারে সস্তায় নাম কিনিতে চান—বোধহয় তাঁহাদের সাহিত্য-প্রেরণা বিদেশী সাহিত্য হইতে আমদানী করিয়াছেন। কাব্যধর্মী সাহিত্য সম্বন্ধে এই সার সত্যটি সকলের মনে রাখা উচিত—বিষয় যাহাই হউক প্রকাশের আঙ্গিক যত বিচিত্রই হউক রসোত্তীর্ণ না হইলে সে রচনা সাহিত্যের বাজারে টিঁকিবে না। আমাদের সাহিত্য-জীবনের প্রথমকালে 'রমেশদার আত্মকথা,' 'পতিতার আত্মকথা' প্রভৃতি পুস্তক বাজারে আলোড়ন তুলিয়াছিল। আজকাল সে সব বইয়ের নামও শুনিতে পাই না। যাঁহারা অতি-আধুনিক কবিতা লিখিতেছেন তাঁহারা একটা নূতন আঙ্গিকে নূতন ধরনে রবীন্দ্র-প্রভাব-বর্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। এই নব প্রচেষ্টা হয়তো একদিন রূপে রসে সার্থক হইয়া উঠিবে। এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাঁহাদের দুর্বোধ্য রচনার সম্পূর্ণ রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া আছি। জীবনানন্দ দাশ অনেক দুর্বোধ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাঙালী রসিকের নিকট অমর হইয়া থাকিবেন তাঁহার 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' কাব্য দুইটির জন্য। এগুলি দুর্বোধ্য নহে।

অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সভায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই আবার বলিতেছি।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শাশ্বত সৃষ্টি কতটা হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান বর্তমান যুগের কোনও লেখক দিতে পারিবেন না। তাহার বিচার মহাকালের দরবারে যথাসময়ে হইবে। তবে একটা জিনিস বলা যায়, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর লেখা হইতেছে এবং তাহাদের বৈচিত্র্যও কম নয়। এই প্রাচুর্য আনন্দজনক। আমবাগানের প্রত্যেক গাছে যখন প্রচুর মুকুল আসে, মাঠে যখন কচি ধানের শ্যাম-সমারোহ দেখি তখনই প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত কয়টা আম পাকিয়া ঘরে আসিবে, অথবা কয় মণ ধান ভাণ্ডারে উঠিবে তখন এ হিসাব করিতে মন চায় না। সরস্বতী প্রকাশের দেবতা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বহুল সৃষ্টির বহুমুখী প্রকাশ-লীলায় তাঁহার মহিমার স্বাক্ষর। প্রকাশের আগ্রহ, ঔৎসুক্য এবং উন্মুখতাই জীবন্ত প্রাণের পরিচয় বহন করে। আজ যদি বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জোয়ার আসিয়া থাকে তাহা তো আনন্দের কথা। যে সব সমালোচক 'আজকাল বাংলা সাহিত্যে কিছুই হইতেছে না' বলিয়া বিলাপ করেন তাঁহাদের মধ্যে কাব্যরসিক হয়তো থাকিতে পারেন কিন্তু দূরদর্শী জীবনরসিক নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আমলেও

এই রব উঠিয়াছিল কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি এই সব আপ্তবাক্যোক্তি সত্যের মর্যাদা লাভ করে নাই। বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অনেক উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু উপন্যাস বা ছোট গল্পই নয়, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, কাব্যধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ, দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নানা পুস্তক, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ বিশেষ করিয়া নূতন ধরনের অনেক নাটক বঙ্গবাণীর মন্দিরকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নবনাট্য আন্দোলনে উদীয়মান নাট্যকারগণের আত্মপ্রকাশ করিবার যে প্রয়াস সূচিত হইয়াছে তাহাকে নাট্যামোদী মাত্রেই অভিনন্দন জানাইবেন।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই, অভাব সেগুলির পঠন-পাঠন ও প্রচারের। আজকাল বহুল প্রচারিত সাময়িক সংবাদপত্রগুলি মুখ্যত রাজনৈতিক পত্রিকা অথবা সিনেমা পত্রিকা। সে সব পত্রিকাগুলিতে সাহিত্যের যে খবর থাকে তাহা খুবই অসম্পূর্ণ এবং সেগুলি ছাপাইতে হইলেও কিছু তদ্বির-তোয়াজের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে বাঙালী সাহিত্য সাধকদের খবর, তাহাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, দেশকে সাহিত্যের বাণী দিয়া সুস্থ ও স্বচ্ছ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাজনীতি এবং সিনেমার ভিড়ে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গবাণীর কণ্ঠ আজ অবরুদ্ধ। সাহিত্যিকরা সুষ্ঠুভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। বাংলা সাহিত্যকে যদি ভাবীযুগে পথ-নির্দেশকের ভূমিকা লইতে হয় তাহা হইলে তাহার নিজস্ব একটি কাগজ থাকা প্রয়োজন, শুধু সাহিত্য এবং সাহিত্যিকই সে পত্রিকার মুখ্য বিষয় হইবে না, সে পত্রিকা বাঙালী মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের দর্পণ স্বরূপ হইবে। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হইলে ভালো হয়। স্বীকার করি ইহা অর্থসাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের স্বাধীন সরকার দেশকে গড়িয়া তুলিবার জন্য নানাবিধ হিতকর প্রকল্প রচনা করিতেছেন। সাহিত্যের উন্নতি কি সে প্রকল্পের অঙ্গীভূত হইতে পারে না? আজকাল সাহিত্যও একটা পেশা এবং সাহিত্যিকরাও আজকাল 'মেহনতি' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দেশ গড়িয়া তুলিতে হইলে সাহিত্যিকদের এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন একথা নিশ্চয়ই কোন সরকার অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সরকারের অর্থানুকুল্যে সাহিত্য পত্রিকা বাহির করিবার একটা বিপদ আছে। সে পত্রিকা কালক্রমে হয়তো সরকারী মুখপত্র হইয়া কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচার-পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশে আজকাল অনেক ছোট ছোট সাহিত্যিকগোষ্ঠীর খবর পাই। অনেক ছোট ছোট পত্রিকাও আছে। সে সব পত্রিকায় অনেক ভালো লেখাও প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া কি একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীতে মিলিত হইতে পারেন না? মোট কথা যেভাবেই হোক বাঙালী সাহিত্য-সাধকদের জন্য এমন একটি পত্রিকা চাই যাহাতে সাহিত্যের, মনুষ্যত্বের চিরন্তন আদর্শ নিঃশঙ্ক কণ্ঠে বিঘোষিত হইবে। সৎ সাহিত্যিকদের আর একটা মহা অসুবিধার কারণ প্রকাশক সমস্যা। প্রকাশকরা বলেন—ভালো বই বিক্রয় হয় না। বিক্রয় হয় যৌন-লালসা-সিক্ত বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস অথবা লঘু প্রেমের গল্প। প্রবন্ধের বই, কবিতার বই, উচ্চাঙ্গের উপন্যাস বা নাটকের নাকি কোনও বাজার নাই। যে দেশে কয়েক কোটী লোকের বাস, যে বাঙালীরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলিয়া সম্মানিত সেখানে ১১০০ বা ২২০০ বই বিক্রয় হইতে আট দশ বৎসর লাগে।

সেইজন্য অনেক লেখক-লেখিকা—লেখাই যাঁহাদের পেশা—তাঁহারা ভালো বই লেখার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পেটের দায়ে নাকি নিম্ন মানের নিকৃষ্ট বই লেখেন। ইহা যদি সত্য কথা হয়, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাগণ যদি ভালো বই কিনিয়া সৎ সাহিত্যের উৎসাহ না দেন তাহা হইলে সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নয়। আগেকার যুগের সাহিত্যিকরা শখের জন্য সাহিত্য-চর্চা করিতেন। রামমোহন যুগ হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত কেহই পেটের দায়ে সাহিত্য-চর্চা করেন নাই। করিয়াছেন প্রাণের দায়ে; প্রেমের দায়ে প্রতিভার তাগিদে। আজ কিন্তু যুগ বদলাইয়াছে। আজ অনেক সাহিত্যিকই পেশাদার সাহিত্যিক। সাহিত্য বেচিয়াই তাঁহাদের অন্নসংস্থান করিতে হয়। পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের রচিত উৎকৃষ্ট বই যদি না কেনেন তাহা হইলে এ ভাষার সাহিত্য-গৌরব অচিরেই বিনষ্ট হইবে। "মোদের গরব, মোদের আশা—আ-মরি বাংলা ভাষা"—এই গান তখন ব্যঙ্গের মতো শুনাইবে। সাহিত্যিকদের আরও নানারকম অসুবিধা আছে। অনেক সাহিত্যিকই প্রকাশকদের কবলস্থ, অনেক সাহিত্যিকের লেখা অন্যান্য ভাষায় বিনা অনুমতিতে বিনা পারিশ্রমিকে অনূদিত হয়, অনেক সময় তাঁহাদের নামও উল্লিখিত হয় না। পাকিস্তান অনেক বাংলা পুস্তক গায়ের জোরে আত্মসাৎ করিয়াছে। লেখকদের পক্ষে এ সব সমস্যা-সমাধান সহজ নহে। এই সব ব্যাপারে সাহায্য করিয়া আমাদের সরকার বাঙালী সাহিত্যিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না। বছরে একবার তাঁহারা একটি পুরস্কার- প্রহসন অভিনয় করিয়া মনে করেন যে সাহিত্যিকদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ এবং যথেষ্ট সম্মান দেখানো হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, বা ইচ্ছা করিয়াই হয়তো বুঝিতে চান না যে তাঁহাদের অনুগ্রহ-পুষ্ট গুটি কয়েক লোকের ভোট দ্বারা সাহিত্যের মান নির্ণীত হয় না। রসিক পাঠক-পাঠিকারা ভালো করিয়াই জানেন কোন্ লেখক ভালো, কোন্ লেখক মন্দ। ভোটের মহিমায় অযোগ্য লোকের মাথায় যখন পুরস্কারের মুকুট পরানো হয় তখন কেহ মুগ্ধ হয় না, সকলেই মনে মনে হাসে। ইংরেজ আমলে আমরা রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর জাতীয় লোকদের যে অনুকম্পার চক্ষে দেখিতাম ইহাদেরও সেই চক্ষে দেখি। সাহিত্যিককে পুরস্কার দিবার মালিক পাঠক-পাঠিকা সম্প্রদায়। তাঁহাদের শ্রদ্ধাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কোন্ লেখক সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া মাথা ঘামানো গভর্নমেন্টের পক্ষে নিতান্তই অব্যাপার। তাঁহারা আরও নানা উপায়ে সাহিত্যিকদের উপকার করিতে পারেন।

আমাদের যুগের আর একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সে সমস্যা ছাত্র-বিক্ষোভের সমস্যা, যুব-আন্দোলনের সমস্যা, উন্মত্ত কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সমস্যা। এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশেরই সমস্যা নহে, ইহা বিশ্বের সকল দেশেরই সমস্যা। যে যন্ত্রসভ্যতা তাহাদের মনে বহুবিধ ক্ষুধা জাগাইয়াছে, যে কামনা-রঞ্জিত কল্পনায় তাহাদের চিত্ত নানা রঙের স্বপ্ন দেখিতেছে কোনও রাজ্য বা সমাজব্যবস্থার পরিবেশেই সে ক্ষুধা মিটিতেছে না, সে স্বপ্ন সফল হইতেছে না, তাই এই বিক্ষোভ। ইহার উপরে আছে শিক্ষার অভাব, আদর্শের অভাব, দারিদ্র্যের তাড়না, পাশব প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিবার বহুবিধ প্ররোচনা, এমন কি ঘরেও স্থানাভাব। তাই এই সব কিশোর-কিশোরী-

যুবক-যুবতীরা আজ রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—সব ঝুট্ হ্যায়। সব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দাও।

এই ছেলেমেয়েদের আমি দোষ দিতে পারি না। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা লোক খারাপ নয়। তাহারা আদর্শবাদী। কিন্তু তাহারা ক্ষুধিত পীড়িত পিপাসিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত। তাহাদের দেখিয়া রাগ হয় না, কষ্ট হয়। আমার মনে হয় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তাহারা—অন্তত বাঙালী ছেলেমেয়েরা, একদিন তাহাদের পথ আবিষ্কার করিবে। সাহিত্য হয়তো তাহাদের সে পথের সন্ধান দিবে, হয়তো সে পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিবে, তবু আমি জানি পথ তাহারা আবিষ্কার করিবেই। অষ্টম শতকে যে উত্তেজনা গোপাল দেবকে নেতা করিয়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল, যে উত্তেজনায় রাজা গণেশ প্রমুখ রাজারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যে উত্তেজনা বঙ্গদেশকে উদ্বেলিত করিয়াছিল, যে উত্তেজনার বশে হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মদ্য সংযোগে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া নিজেদের ইয়ং বেঙ্গল নামে আখ্যাত করিয়াছিল, যে উত্তেজনা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যেউত্তেজনা অগ্নিযুগের বীরদের মরণের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, যে উত্তেজনায় বাঙালী কংগ্রেস গড়িয়াছিল এবং যে উত্তেজনায় সে আজ কংগ্রেসকে বর্জন করিয়াছে—সেই উত্তেজনার অগ্নিই আমি যেন ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অগ্নি নিজের পথ নিজেই করিয়া লয়। ইহারাও চিরকাল বিক্ষুব্ধ থাকিবে না। পথ পাইলেই শান্ত হইবে। কিন্তু সে পথ কী, কোথায়, কী তাহার স্বরূপ তাহা এখন নির্ণয় করা শক্ত।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এবং সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্রোহী শিল্পী বাঙালীর যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে আশা করিবার সঙ্গত কারণ আছে, যদিও এখন আমরা নানা ভাবে বিব্রত, নানা অত্যাচারে উৎপীড়িত, নানা আদর্শের সংঘাতে বিক্ষত, বিভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট তবু আমি জানি এই বাঙালী আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

একটি ছোট কবিতা দিয়া বক্তব্য শেষ করি—

ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর নাম
সূর্যসম জ্বলিয়াছে, জ্বলিবেও পুনরায়
এই আশা উচ্চ কণ্ঠে ব্যক্ত করিলাম।
স্খলন, পতন তার ঘটিয়াছে জানি বহুবার
কিন্তু জানি উদ্ভাসিত হইবে আবার
তাহার মহিমা
যে মহিমা, সিদ্ধ মনস্কাম।
সে আবার উঠিবেই
সে আবার ফুটিবেই
সে আবার চলিবেই
হাতে তার জ্বলিবেই
আদর্শের জ্বলন্ত মশাল
দগ্ধ করি বাধা বিঘ্ন

দীর্ণ করি তমিস্রা করাল।
সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন দেবীমূলে
জানি জানি সেই সত্যকাম
পুনরায় নিবেদিবে প্রাণের প্রণাম
নিসংশয়ে এই আশা উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করিলাম।

মুরলীধর কলেজে (মেয়েদের) প্রধান অতিথির ভাষণ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। কল্যানীয়া ছাত্রীরা,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুণ। আপনাদের উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করে আপনারা যে আত্মীয়-সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমরা লেখকরা সকলের আত্মীয় হ'তে চাই। সব সময় হতে পারি না, অনেক সময় হবার সুযোগ পাই না। আপনারা আমাকে সে সুযোগ দিয়েছেন বলে ভারি আনন্দ হয়েছে আমার। সভায়—বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় অনেকেই দেখেছি উপদেশ বর্ষণ করেন। দেশের এই দুর্দিনে তোমরা হ্যান হও ত্যান হও ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জানি দশ মিনিট বা পনের মিনিট উপদেশ দিলে কারও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটানো যায় না। আমি নিজেও একদিন ছাত্র ছিলাম। এখনও আমার অনেক ছাত্রবন্ধু আছে। আমি জানি ছাত্ররা আবেগপ্রবণ, তারা আদর্শবাদী, তারা প্রাণবন্ত, তাদের চেতনায় উন্মুখ প্রাণের সজীবতা। তারা হুজুকে, তারা অনেক সময় অন্যায় কাজও করে। কিন্তু তবু তাদের আমি ভালবাসি। তাই তাদের সভায় উপদেশ বর্ষণ করবার প্রবৃত্তি আমার হয় না। তবু সভায় কিছুতো বলতে হবে। তাই তোমাদের একটি ছোট গল্প পড়ে শোনাচ্ছি আজ। অনেকদিন আগে গল্পটি লিখেছিলাম। গল্পের নাম "মহীয়সী মহিলা"।

ট্রেনে বেশ ভীড় ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলাম। থার্ড ক্লাশের টিকিট। আমি একটি কামরার এক কোণে অতি কষ্টে বসবার জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম, কিন্তু আর বসবার জায়গা ছিল না। দাঁড়িয়েছিল অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একসঙ্গে জুটেছিলাম সেই কামরাটিতে। বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী সরদার এবং আরও বহুপ্রকার ইতর অথবা ভদ্রচেহারার লোক, কেবলমাত্র দেখে যাদের জাতিনির্ণয় করা অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে অমিল ছিল অনেক, মিলও হয়তো ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে একমত হয়েছিলাম। কামরায় আর যেন কেউ উঠতে না পারে। ওঠবার সম্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল, কারণ, কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন একজন ভোজপুরী সিপাহী। তার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে বিরাট লাঠি। চোখ মুখের দৃষ্টিও কমনীয় নয়। আর বাঁদিকের দরজায় ছিলেন সরদারজি। ঘন ভ্রূ, ঘন চাপাদাড়ি, গোঁফও মানানসই রকম ঘন—মনুষ্যবেশী সিংহ একটি। প্রায় কোন স্টেশনেই কেউ উঠতে সাহস করছিল না। বড় বড় দুটো জংশন পেরিয়ে গেল, সিপাহীজি এবং

সরদারজিকে দরজার কাছ থেকে একচুল নড়াতে পারলে না কেউ। সিপাহীজি এবং সরদারজির উপর সমস্ত কামরাটির ভার দিয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ দ্বারে অবশেষে শত্রু হানা দিল। স্টেশনটি খুব ছোট। সিপাহীজি ভাবতেই পারেন নি যে, এই স্টেশনে এমন একটা পল্টন এসে হাজির হতে পারে। তিনি তাই খৈনি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাম করতলের উপর কিছু তামাক পাতা এবং চুন রেখে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে মর্দন করছিলেন সেগুলি। তাঁর দুই হাত এবং মন—কোনটাই দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত ছিল না।

হঠাৎ বামাকণ্ঠে ভুল হিন্দীতে শোনা গেল—"রাস্তা ছোড়িয়ে না। কেবাড়িকা পাশ সংকা মাফিক খাড়া হ্যা কাহে—। হটিয়ে হটিয়ে—"

দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল একটি বলিষ্ঠা মহিলা গাড়ির হাতল ধ'রে ঝুলছেন। প্রকাণ্ড গোল মুখ, গোল গোল চোখ, চিবুকের তলায় দু'থাক চর্বি, নাকে নথ, নথে টানা। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর। সিঁথিতে জলজল করছে সিঁদুর।

"হটিয়ে হটিয়ে। ট্রেন বেশী নেই থামে গা, গার্ড সাহেব ঝাণ্ডি দেখাতা হ্যায়। হটিয়ে না—"

সিপাহীজি এ মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন একটু। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বর এবং মুখভাবে একটু কোমলতার আমেজ পাওয়া গেল।

"কুছভি জঘা নেই হ্যায় মাইজি—"

"আপ খোলিয়ে না, হটিয়ে না, হামলোক খাড়া হোকে যাঙ্গে। ই ট্রেন ফেল করনে সে বাবুজিকা নোকরি চলা যাগা, কাল জয়েনিং তারিক হ্যায়—হটিয়ে—"

"মগর—"

মহিলা আর অধিক বাক্যব্যয় না ক'রে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সিপাহীজি আর তাঁকে বাধা দিতে সাহস করলেন না। তাঁর ঈষৎ অনুকম্পাও হয়েছিল বোধ হয়। কারণ পরে জানা গেল তিনিও ছুটির শেষে কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। ছুটির শেষে কাজে জয়েন না করলে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে তা তাঁর জানা ছিল।

কপাটটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে ভোজপুরী পুরুষপ্রবরকে স্থানচ্যুত ক'রে ভদ্রমহিলা সমস্ত দরজাটি দখল ক'রে হাঁক দিলেন—"ওরে তোরা আয়, মণ্টু তুই আগে ওঠ, জিনিসপত্তরগুলো গোছাতে হবে, ঘণ্টু কোথা গেলি ; শণ্টু মিণ্টু কানটু বানটু—আয় না তাড়াতাড়ি সব ওঠ, হাবলি ওদিকে হাঁ ক'রে দেখছিস কি, উঠে পড় না টপ্ ক'রে—"

পিল পিল ক'রে নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে উঠে পড়লো। সরদারজি একটু এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—"ইয়ে তো জুলুম কি বাত হ্যায় মাতাজি,—"

"আপ চুপ রহিয়ে"

ভদ্রমহিলার ধমকে সরদারজি থতমত খেয়ে স'রে দাঁড়ালেন।

"এই কুলি, ইধার ইধার—"

তোরঙ্গ, সুটকেস, হোলড্-অল, নানা আকারের পুঁটলি, ঝুড়ি গোটা দুই, প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার, গোটা চারেক হাঁড়ি, গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তরমুজ, একটা বঁটি, তা ছাড়া একটা মুখ বাঁধা বস্তা…। প্রকাণ্ড কুঁজো।

ভদ্রমহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, কুলিরা এইসব তুলতে লাগল।

"আওর দো কুলি উপর চলা আও, চীজ বাস্‌ সরিয়াকে রাখ্‌খো। ওই উধারকা বাংক মে সব এলোমেলো হোকে হ্যায়, পহলে সব ঠিক কর দেও ···"

যে সব যাত্রীর জিনিস উক্ত বাংকে ছিল তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলমান মৌলভীটি তাঁর ফেজ আর বদনাটি নামিয়ে নিজের কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। ফেজটি শিরে ধারণ করলেন, বদনাটি অঙ্কে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও তাঁর ছোট ট্রাংকটি কোথায় রাখবেন ভেবে বিব্রত বোধ করছিলেন, ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে।

"সব ঠিক করকে গুছায়কে রাখ দেঙ্গে, আপলোক ঘাবড়াইয়ে নেই—"

সত্যিই দেখা গেল বাংকের জিনিসপত্রগুলো আগোছাল হয়েই ছিল। গুছিয়ে রাখাতে অনেকখানি জায়গা বেরোল। আমাকে সম্বোধন ক'রে ভদ্রমহিলা বললেন, "খোকা, তুমি বাবা পা-টা গুটিয়ে বোস্‌ তো, হ্যাঁ,—ওইখানে হোল্‌ড-অল আর বোরাটা থাক; বেঞ্চ দুটোর ফাঁকে। ওগুলোর উপরেই তুমি পা রাখ। তুমি বাবা পা দুটো একটুখানি সরিয়ে নাও,—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে"—

তারপর তিনি কামরাটার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"এই কুলি ট্রাংকটো ওই উধারকা কোণা মে লে চলো। দোনো বেঞ্চকা বিচ মে দে দেও। আপলোক মেহেরবানি করকে পয়ের মোড়কে বৈঠিয়ে—। শন্টু মন্টু ট্রাংকের উপর গিয়ে ব'স তোরা।"

শৌখীন পাঞ্জাবী-গায়ে নীল চশমা পরা একটি ছোকরা কোণে বসে' ব'সে পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। সে একটু ঝেঁজে ব'লে উঠল—"আপনি এমন ভাবে হুকুম করছেন যেন আমরা আপনার চাকর—"

"চাকর কেন হতে যাবে বাবা। তোমরা সব ছেলে। পা-টা গুটিয়ে বস লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেল। সবাইকে তো যেতে হবে। সব গুছিয়ে দিচ্ছি দেখ না, কারও কোন কষ্ট হবে না—। হ্যাঁ, ওই কুঁজোটা থাক।"

তারপর একটু হেঁট হয়ে দেখলেন বেঞ্চির তলাগুলো খালি আছে কি না।

"মিণ্টু, পুঁটুলিগুলো আর তরমুজ তিনটে এই বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দে। আর ঘণ্টুকে কোলে ক'রে তুই ওই কোণটায় চলে যা। ও বাবা পাগড়ি, মেয়েটাকে একটু দাঁড়াতে জায়গা দাও বাবা—"

একটি ক্রিশ্চান দম্পতি একটু বেশী জায়গা নিয়ে একধারে বসেছিলেন ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের সাহেবী পোষাক দেখে তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে নি। ভদ্রমহিলা করলেন। তিনি কানটু আর বানটুকে চালান করে দিলেন সেদিকে।

"তোরা ওই দিকে গিয়ে মেম-মাসীমার কাছে বস গিয়ে। হাবলিও যা—"

ক্রিশ্চান দম্পতি আপত্তি করলেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ, অ্যাটাশে কেস প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা ক'রে দিলেন শিশুগুলির। ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা তো বানটুকে কোলেই বসিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকেরও শিভ্যালরি উদ্বুদ্ধ হ'ল সহসা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে' বললেন—"আপ ভি বৈঠ যাইয়ে। ম্যায় খাড়া রহুঙ্গা।"

"না না, তুমি বাবা ব'স। আমার বসবার দরকার নেই। ওগো, তুমি কোথা গেলে, এইবার তুমি ওঠ না, ওঠ, ওঠ, ট্রেন আর কতক্ষণ দাঁড়াবে"

আড়ময়লা পাঞ্জাবীপরা ঝোলা-গোঁফ শীর্ণকান্তি একটি ভদ্রলোক উঠলেন।

"তুমি একটু জায়গা করে নাও কোথায়—"

"ইউ কাম হিয়ার, দেয়ার ইজ্ এনাফ্ স্পেস—"

ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

আমি তখন ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করলাম—"আপনি এসে এই হোল্ড্-অল্টার উপর বসুন। আমি পা গুটিয়েই বসছি—"

"তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা"

"না, কিছুমাত্র না"

"আজকালকার ছেলেরা সোনার চাঁদ সব। হীরের টুকরো"

ভদ্রমহিলা এসে গদীয়ান হয়ে হোল্ড্-অল্টির উপর অধিষ্ঠিতা হলেন। সব যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তখন ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল মিণ্টু ঘণ্টুকে কোলে করে কোণঠাসা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি—"মিণ্টু তুই এসে এখানে ব'স। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি"

"আপনি দাঁড়াবেন কেন। ওদের জায়গাও ক'রে দিচ্ছি। শেঠজি আপ থোড়া সে হাটকে বৈঠিয়ে।"

শেঠজির মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তবু তিনি স'রে বসলেন একটু। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'ল না। ওইটুকু জায়গায় ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টুর বসা অসম্ভব। শেঠজির পাশেই বসেছিল একটি সাঁওতাল যুবক। বলিষ্ঠ কালো চেহারা, চোখে মুখে নির্ভীক সরলতা, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। তার দিকে চাইতেই সে উঠে পড়ল এবং দরজার ধারে গিয়ে সরদারজির পাশে দাঁড়াল। ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টু বসল তার জায়গায়। সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে। এত ছোট স্টেশনে দু'তিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবার কথা নয়। কুলীরা পয়সা নিয়ে নেবে গেল। তবু ট্রেন ছাড়ে না। হঠাৎ দেখলাম স্টেশনমাস্টার মশাই পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখছেন।

"ও, আপনারা এইখানে উঠেছেন বুঝি। জিনিসপত্তর সব উঠে গেছে? বড্ড 'রাশ' আজকে। ট্রেন তাহলে ছাড়ি?"

একমুখ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, আমরা গুছিয়ে বসেছি। অনেক কষ্ট দিলুম বাবা আপনাকে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, না কষ্ট আর কি।"

নেমে গেলেন স্টেশনমাস্টার।

তারপরই শোনা গেল—"অল্ রাইট, অল্ রাইট"

ট্রেন ছাড়ল।

ভদ্রমহিলার এই অতর্কিত আক্রমণে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন দু'একজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন—"ওই টিফিন কেরিয়ারটা বাঙ্ক থেকে নামিয়ে দাও তো বাবা—।"

নামালাম।

বিরাট টিফিন কেরিয়ার। বেশ ভারী।

টিফিন কেরিয়ারটি খুলে ফেললেন তিনি। দেখলাম, প্রচুর লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা রয়েছে। ভদ্রমহিলা দুখানি ক'রে লুচি, একটু ক'রে তরকারি এবং একটি ক'রে রসগোল্লা প্রত্যেককে বিতরণ করতে শুরু করলেন। দু' একজন নিতে আপত্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই তিনি শুনলেন না।

"হাম আপকো মা-ই হ্যায়, লিজিয়ে, লজ্জা কি বেটা—" সকলকেই নিতে হল। সেই নীল চশমা-পরা ছোকরাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"তোমাকে একটু বেশী ক'রে দিচ্ছি। ছেলেমানুষ তুমি, দু'খানিতে তোমার কি হবে—"

ট্রেন চলছে। মুখও চলছে প্রত্যেকের। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল। ঘণ্টাখানের মধ্যেই আমরা সবাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে উঠলাম তাঁর এবং তিনিও অসংকোচে হুকুম করতে লাগলেন সকলকে। কোনও স্টেশনে আমরা তাঁর পান কিনে দিলাম, একটা জংসনে সকলকে চা খাওয়ালেন তিনি। সিপাহীজি আর একটা স্টেশনে রসগোল্লা কিনে আনলেন আবার। সর্দারজি কুঁজো হাতে ছুটলেন জল ভরতে। চানাচুরওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর কিনে আবার বিতরণ করতে লাগলেন তিনি সকলকে। সেই গরমে, সেই ভীড়ে, থার্ডক্লাস গাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।

এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকী উৎসবে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। একশ' বছর আগে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রাপ্ত জমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম, জড়িয়ে আছে মহাত্মা কালীকৃষ্ণ এবং প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতি। এটি বাঙালী সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র সে হিসেবে।

এই তীর্থক্ষেত্রে এসে একটি কথা কিন্তু আজ মনে হচ্ছে। বাঙালী সংস্কৃতি বললে যে ভদ্র সুমার্জিত নানা শিল্পসমৃদ্ধ সাহিত্য-সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির কথা মনে জাগে সে সংস্কৃতি এখনও কি বেঁচে আছে? পোশাক-পরিচ্ছদ যদি সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হয় তাহলে বলতে হয় বাঙালী পোশাক আমরা আজকাল বড় একটা পরি না। সাহিত্য ও শিল্প যদি সংস্কৃতির দর্পণ হয় তাহলে বলব সে দর্পণটিও ক্রমশ মলিন হয়ে আসছে। আমরা অনেক জিনিস কিনি। কিন্তু ভাল বই কিনি না, ভাল ছবি কিনি না। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা অসাধু প্রকাশকদের কবলে পড়ে নিপীড়িত হচ্ছেন, বাঙালী জনসাধারণ তাঁদের বাঁচাবার কোন চেষ্টা করেন না। প্রকাশকরা বলেন ভালো বইয়ের নাকি বিক্রি নেই। চানাচুর মার্কা চটুল সাহিত্য, সিনেমাগন্ধী লালসা-উদ্দীপক বই, অথবা সাময়িক রাজনীতি নিয়ে নানাধরনের উত্তেজক রচনারই নাকি বাজার আছে

এদেশে। ভালো কাব্যগ্রন্থের, ভালো জীবনচরিতের, ভালো উপন্যাসের, ভালো প্রবন্ধের একেবারেই চাহিদা নেই নাকি। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমরা বাঙালী সংস্কৃতি নিয়ে কতদিন আর গর্ব করতে পারব? আর একটা দুর্লক্ষণ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কিছুদিন আগে থেকে। আমরা পরের মুখে ঝাল খেতে শিখেছি। পাশ্চাত্ত্য দেশ যদি আমাদের কোনও গুণীকে সম্মান দেয় তাহলেই আমরা তাঁকে মাথাই করে নাচি। তার আগে নয়। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তা বিচারের ভার অন্য দেশের উপর অর্পণ করে আমরা যে দাস মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবজনক নয়। আমাদের দেশের যে সব গুণী-জ্ঞানী-শিল্পী সাহিত্যিক বিদেশে গিয়ে সম্মানলাভ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁদের সে প্রতিভার স্বীকৃতি আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আগে তেমন দিই নি, বিদেশের দরবার থেকে ছাপ মারা হবার পর দিয়েছি। এটা কি উঁচু দরের সংস্কৃতির লক্ষণ? তাছাড়া যে সব উপাদানগুলি সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে, যেমন সচ্চরিত্র, শোভন ব্যবহার, নিঃস্বার্থপরতা, তা কি আমাদের মধ্যে আছে? স্বদেশপ্রেম আজকাল Party Politics-এ রূপান্তরিত হয়েছে, বোমা বন্দুক নিয়ে বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করাই হয়েছে আজকাল বীরত্ব। আমরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভীড় করেছি, রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছি স্কুল কলেজ ভাঙছি, বিব্রত করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে। যে বাঙালী সংস্কৃতি কৃষি-সভ্যতায় শ্রীমন্ত হয়েছিল, যন্ত্র-সভ্যতার কবলে পড়ে তার যে রূপ বেরিয়েছে তা সংস্কৃতির রূপ নয়। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের চাকরি-লোলুপ ভিখারীর দলে পরিণত করেছে। যন্ত্রসভ্যতা সৃষ্টি করেছে নূতন ধরনের ক্রীতদাস। আমরা এখনও এ সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি নি। নি। যন্ত্রসভ্যতাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারব না। যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নূতন সংস্কৃতির পত্তন করতে হয় আবার। সে সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করবে আমাদের সচ্চরিত্র, আত্মসম্মানবোধ, সৌন্দর্যবোধ, বিদ্যাবত্তা আর এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করতে হবে ঘরে ঘরে, আর সে কাজের ভার নিতে হবে প্রধানত পিতামাতাদের এবং পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এ খুব সোজা কাজ নয়। এ একরকম তপস্যা। মাৎস্যন্যায়ের যুগে বাঙালী এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিল, সিদ্ধিলাভ করেছিল চরিত্রভ্রষ্ট মুসলমানী শাসনের অন্তিম যুগে। সিদ্ধিলাভ করেছিল মদগর্বিত ইংরেজদের অত্যাচারের নাগপাশ ছিন্ন করবার সময়। সে তপস্যা আবার শুরু করতে হবে। তবেই আমরা উদ্ধার পাব। পূর্ণ মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির ধারক, নির্মল চরিত্রের অনন্যতাই সংস্কৃতির দ্যুতি একথা উপলব্ধি করতে হবে, আর উপলব্ধি করতে হবে যে সংস্কৃতি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়। তা সাধনা-সাপেক্ষ তা পরের নকল বাহ্যাড়ম্বর নয়। তা স্বয়ম্প্রভ মাণিক্যের দীপ্তি। এ মাণিক্য আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু অনেক ধুলোয়, অনেক কাদায়, অনেক পঙ্কে মলিন হয়েছে বলে তার উজ্জ্বলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই মালিন্য দূর করতে হবে এবং আশা করি আমরা তা পারব। নমস্কার।